স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ

আরবের চাঁদ

অনুবাদ
শাহাদাত হুসাইন

লেখক পরিচিতি

স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ

১৯১৩ সালে অবিভক্ত ভারতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোর থেকেই জ্ঞান অর্জনের প্রতি ছিল তীব্র আগ্রহ। ১৭ বছর বয়সে পারিবারিক কারণে যখন বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ পাচ্ছিলেন না, তখন তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসক হেকিম মুহাম্মাদ আবদুল্লাহর কাছে তিনি পত্র লেখেন। যিনি প্রায় ষাটোর্ধ্ব গ্রন্থের প্রণেতা। ইউনানিশাস্ত্রে যাকে উস্তাজুল হুকামা বলা হয়। পত্রে তার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ পোষণ করেন। ১৯২৯ সালে হেকিম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তার বাড়িতেই থেকে যান। তার অনুমতি নিয়ে লাইব্রেরি থেকে চিকিৎসা ও ইতিহাসশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। এ দুটি ছিল তার প্রিয় বিষয়। এখানে অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি হেকিম সাহেবের নির্দেশনায় *আবে হায়াত* নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এরই মাঝে কয়েকটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। একসময় তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী লিখতে আগ্রহ প্রকাশ করলে হেকিম সাহেব খুশি মনে তার জন্য সাধ্যমতো সিরাতগ্রন্থের ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘ সময় ব্যয় করে তিনি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচনা করেন। দরবেশতুল্য হেকিম সাহেবের আচার-আচরণে স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ ভীষণরকম প্রভাবিত ছিলেন। ফলে বইয়ের ভাষা ও ভাবে ইসলামি চিন্তাধারার ব্যাপক ছাপ দেখা যায়। সাধারণ মুসলিমদের যাপিত জীবনের প্রতি অনাস্থার কারণে তিনি নিজেকে কখনো মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিতেন না, তবে নিজের অন্তরকে তিনি সমর্পিত করেছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ-নিষেধের ওপর।

আরবের চাঁদ গ্রন্থটি উর্দু সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদের অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। এই অনন্য বিরল প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১৯৩৯ সালে ইহজগৎ ত্যাগ করেন।

আরবের চাঁদ

স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ

অনুবাদ
শাহাদাত হুসাইন

মাকতাবাতুল হাসান

আরবের চাঁদ
প্রথম প্রকাশ : জিলকদ ১৪৪২/জুলাই ২০২১

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
ISBN : 978-984-8012-79-6
Web : maktabatulhasan.com

Fixed Price : 380 Tk

[দরদামে সময় বাঁচাতে বই কিনুন নির্ধারিত মূল্যে]
[বইটি দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বিতরণের ক্ষেত্রে থাকবে বিশেষ ছাড়]
Page : 387, Page in actual : 416, Forma : 26
Araber Chand
by Swami Laxman Prasad
Published by : Maktabatul Hasan Bangladesh
E-mail :info.maktabatulhasan@gmail.com I fb/Maktabahasan

* * *

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল এসেছেন। তোমাদের দুঃখকষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল এবং দয়ালু। [সুরা তাওবা : ১২৮]

* * *

আরবের চাঁদ

মূল উর্দু গ্রন্থ : আরব কা চান্দ
মূল : স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ
অনুবাদ : শাহাদাত হুসাইন

সম্পাদনাপর্ষদ
অনুবাদ নিরীক্ষণ : মাহমুদুল হাসান, আছিফুজ্জামান
তথ্য সম্পাদনা : মিশকাত আহমদ
ভাষা সম্পাদনা : রেদওয়ান সামী
বানান সমন্বয় : মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ, মুহিব্বুল্লাহ মামুন, নূর মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, সাজ্জাদ শরিফ
পৃষ্ঠাসজ্জা : আবু আফিফ মাহমুদ
প্রচ্ছদ : আখতারুজ্জামান

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

—তৃতীয় পর্ব—

CamScanner

চতুর্থ পর্ব

অনুবাদকের কথা

একদিন মাদরাসার গ্রন্থাগারে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গ্রন্থ দেখছিলাম। হঠাৎ একটি গ্রন্থের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াই। হাতে নিয়ে দেখি—একটি সিরাতগ্রন্থ, লেখক স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ। অর্থাৎ, একজন হিন্দু লিখেছে নবীজির সিরাত! হৃদয়ে একধরনের পুলক অনুভব করলাম। এতে নিশ্চয় ব্যতিক্রম কিছু আছে। সেখানে দাঁড়িয়েই পড়তে শুরু করি। কয়েক পৃষ্ঠা পড়েও ফেলি। এরপর পড়ার টেবিলে এসে শুরু করি ধারাবাহিক পাঠ। যতই পড়ি হৃদয়ে ততই যেন অন্যরকম এক ভালোলাগা ও ভালোবাসার পারদ বাড়তে থাকে। পড়ি আর ভাবি, একজন হিন্দু হয়েও আমাদের প্রিয় রাসুলকে এতটা ভালোবাসেন! রাসুলের ভালোবাসায় এভাবে মালা গাঁথতে পারেন! অথচ আমি, আমরা...

কিছুদিন পর আমার এক ওস্তাদ (আল্লাহ! তার ছায়াকে আমাদের ওপর আরও দীর্ঘায়িত করুন)-এর নিকট গ্রন্থটি নিয়ে গেলাম। তিনি সেদিন বেশ কিছু কথা বলেছিলেন। সেদিনের একটি কথা এখনো আমার কানে গুঞ্জরণ তোলে—'এই ধরনের গ্রন্থগুলো কিন্তু আমাদের জন্যও পরীক্ষা, তাদের জন্যও পরীক্ষা। তাদের জানাশোনা আছে কিন্তু ঈমান নেই। আবার রাসুলের প্রতি আমাদের ঈমান আছে, পাশাপাশি সিরাতের জ্ঞানও আছে, তবে ব্যক্তি বিশেষে তা নিতান্তই অপ্রতুল, যা একেবারেই কাম্য নয়।'

সত্যিই! আকাশ-বাতাস মুখরিত করে আমরা রাসুলের ভালোবাসার দাবি করি। অথচ দিনশেষে এতটাই হতভাগা রয়ে যাই যে, প্রতিদিন অল্পকিছু সময়ও সিরাতপাঠে ব্যয় করতে পারি না!

সিরাতগ্রন্থ অমুসলিম অনেকেই লিখেছেন। বিশেষভাবে প্রাচ্যবিদ অমুসলিম লেখকদের মধ্যে যারা সিরাত লিখেছেন, তারা বেশ আটঘাট বেঁধেই সিরাতের বিভিন্ন সুস্পষ্ট বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি উত্থাপনের অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। এই ধরনের লেখকদের লেখায় প্রভাবিত হয়ে অনেক মুসলিম লেখকও ইসলামি শরিয়তের স্বীকৃত বিভিন্ন বিষয়ে আপত্তি বা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে এমনকিছু অমুসলিম লেখকও রয়েছে, যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার টানে তাঁর প্রশংসা বাক্য লিখেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ তাদেরই

একজন। তার লেখার অন্যতম সৌন্দর্য এই, লেখার মধ্যে তিনি কোনো প্রচ্ছন্নভাব রাখেননি, বেশ সুস্পষ্টভাবে সিরাতের প্রতিটি দিক সংক্ষিপ্তাকারে হলেও তুলে ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পাশ কেটে যাওয়ার পন্থা গ্রহণ করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন,

'আমি যা-কিছু লিখেছি, নিজের বিশ্বাসের আলোকেই লিখেছি। কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়।'

জিহাদ ও মুজেজাসহ সিরাতের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাচ্যবিদ এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত মুসলিম লেখকরা যেখানে আপত্তি ও সংশয়ের তির নিক্ষেপ করেছেন, সেখানে তিনি সেসবের পক্ষে জোরালো যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে ভালোবাসার নজরানা পেশ করেছেন। কবিতার ছন্দে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, হৃদয়রাজ্যে তিনি আমাদের নবীজির জন্য ভালোবাসার কী এক সবুজ প্রাসাদ তৈরি করে রেখেছেন। প্রিয় নবীর ব্যথায় কখনো তিনি কাতরে উঠেছেন, আবার পর মুহূর্তেই কাফেরদের পরাজয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

এখানে একটি বিষয় সবার কাছেই স্পষ্ট হওয়া জরুরি যে, শুধু স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদই নয়; বরং যেকোনো অমুসলিম লেখক বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত লেখকের লিখিত ইসলামিগ্রন্থ পড়তে হলে অবশ্যই কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। তদ্রুপ এ গ্রন্থ পাঠেও আমাদের কিছু নীতি অনুসরণ করতে হবে। যথা :

১. এটি এক অমুসলিমের লিখিত সিরাতগ্রন্থ; তাই বইটি পাঠের সময় একটু সতর্ক হয়ে পড়া চাই। বইটির মৌলিক উদ্দেশ্য হলো বিশ্বনবীর প্রতি একজন অমুসলিমের ভালোবাসার চিত্র তুলে ধরা। শুধু সিরাতপাঠ এই গ্রন্থের মৌলিক উদ্দেশ্য নয়।

২. এটি সিরাতের কোনো মৌলিক গ্রন্থ নয়। সুতরাং এর কোনো কথা বা বক্তব্য দলিল হিসাবে নেওয়া সমীচীন হবে না। হ্যাঁ, যদি সেই কথাটি সিরাতের মৌলিক কোনো গ্রন্থে উল্লেখিত থাকে, তাহলে ভিন্ন বিষয়।

৩. কোথাও হয়তো দেখা যাবে যে, লেখক কোনো বিষয়কে ইসলামি আকিদা বা রীতিনীতি হিসাবে উপস্থাপন করেছেন; অথচ আদৌ তা ইসলাম সমর্থিত নয়। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাই এই ধরনের গ্রন্থপাঠের আগে ও পরে নির্ভরযোগ্য কোনো সিরাতগ্রন্থ অধ্যয়নে থাকা উচিত। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে

মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ-এর *নির্বাচিত প্রবন্ধ–১* বইটির ১০৫-১১৩ পৃষ্ঠাগুলো পড়ুন।

তবে আস্থার বিষয় যে, আমরা বইটিকে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করার জন্য গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলোর সূত্র সংযোজন করেছি এবং জাল-বানোয়াট ও নবীজীবনের সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ বর্ণনা থেকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটির অনুবাদ শুরু করার পর বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। জীবনের অনেকগুলো সময় অলসতার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, দেরিতে হলেও একসময় অনুবাদের কাজ শেষ হয় এবং মাকতাবাতুল হাসান-এর সুদৃষ্টির ফলে পাঠকের হাতে পৌছে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা প্রকাশনী-সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। গ্রন্থটির অনুবাদ ও তাহকিকের ক্ষেত্রে আরও যারা আমায় সঙ্গ দিয়েছেন, এই মুহূর্তে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে তাদের স্মরণ করছি। কেয়ামতের দিন যেন আল্লাহ নিজেই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

পরিশেষে সুহৃদ পাঠকের কাছে নিবেদন, মানুষ ভুলক্রটির উর্ধ্বে নয়। উপরন্তু সে মানুষটি যদি হয় আমার মতো সর্বদিক থেকেই অপরিপক্ক; তাহলে তো...! তবুও কাঁচা হাতের কিছু উপহার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি প্রিয় ভাই-বোনদের করকমলে। তাই শুধু এতটুকুই নিবেদন; ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, দোয়া করবেন, পরামর্শ দেবেন, শুধরে দিয়ে পাশে থাকবেন।

ওয়াসসালাম।

নিবেদক

শাহাদাত হুসাইন

২৩/০৩/২০২১ খ্রি.

স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদের অকৃত্রিম বন্ধু

হাকিম মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ-এর অভিমত

অনেকের ধারণা, এই গ্রন্থের মূল লেখক কোনো মুসলিম। ব্যবসা কিংবা প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ তো আমাকেই এই গ্রন্থের লেখক বলে অভিহিত করে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বারবার আমার পক্ষে বিষয়টি অস্বীকার করা এবং মূল বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার পরও তারা এই কথা মানতে নারাজ যে, স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদই এই গ্রন্থের লেখক।

সম্ভবত এর বড় একটি কারণ, উর্দু লেখার যোগ্যতা; বিশেষ করে এমন উঁচু মানের উর্দু সাহিত্যসম্পন্ন সিরাতের কিতাব কোনো হিন্দু লিখতে পারে, তা মানুষের কল্পনারও বাইরে। অথচ এর আগেও হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িক অনেক গুণিজনেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতগ্রন্থ লিখে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু মানুষ তাদের লিখিত গ্রন্থের ব্যাপারে এ রকম বিস্ময় প্রকাশ করেনি তো! ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর কেউ যখন অন্য সম্প্রদায়ের কোনো নেতাকে নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তারা সাধারণত যে আঙ্গিকে লেখেন তিনিও ঠিক সেই আঙ্গিকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী লিখেছেন। কিন্তু অন্যান্য অমুসলিম সিরাত লেখকদের বিপরীতে *আরবের চাঁদ* গ্রন্থের লেখক অনেকটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমসাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম চালিয়েছেন। দুনিয়ার সবকিছু থেকে উদাসীন হয়ে সিরাতের ময়দানে অশ্ব হাঁকিয়েছেন। এমনকি সিরাতের কোনো বিষয়ই তিনি বাদ দেননি। অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীও জিহাদ এবং মুজেজার সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে যেখানে অক্ষম এবং সঠিক রাস্তা হারিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা ও কৌশল অবলম্বন করেন, সেখানে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসায় বড় বড় টিলা-খন্দকও নির্দ্বিধায় অতিক্রম করে গিয়েছেন। শুধু পথই অতিক্রম করেননি, বরং যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের নিয়েও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছেন।

মানুষকে লক্ষ্য করে স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ বলেছেন, দুনিয়ার মানুষ! এই যে তোমরা উঁচু উঁচু টিলা ও খানাখন্দক দেখছ, দ্বীনের পথে চলা মুসাফিরদের জন্য এগুলো পরীক্ষার নমুনা। এই সরল-সঠিক পথে যে মুসাফির অটল-

অবিচল থাকতে পারবে, সেই নিজ গন্তব্যে অতি দ্রুত পৌঁছতে পারবে। সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পথে যারা ধীরগতিতে চলে, অনেক সময় তারা ইসলামের শত্রুদের বইপুস্তক ও রচনাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

যাহোক, আমি বলছিলাম, যেসব মাসআলা অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীও ইসলাম সম্পর্কে অনবগতির কারণে মেনে নিতে সংকোচ ও লজ্জাবোধ করেন, স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ নির্দ্বিধায় সেসব মাসআলা যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত বলে স্বীকার করেছেন। উপরন্তু আল্লাহকে তিনি প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও 'রাসুলুল্লাহ' বলে মান্য করেন। এমনকি কয়েক জায়গায় তো এমন বাক্যও লিখেছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আমার বাবা-মা ও আমার প্রাণ হাজারবার উৎসর্গ হোক'। আশ্চর্য ও দুঃখজনক বিষয় হলো, এতকিছুর পরও তিনি বাহ্যিকভাবে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেননি। হিন্দুধর্মাবলম্বী হয়েই জীবনযাপন করেছেন। এটা এই কারণে নয় যে ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ বা সংশয় ছিল, কিংবা হিন্দুধর্মের যৌক্তিকতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। বরং জীবনের দীর্ঘ একটা সময় তিনি ব্যয় করেছেন ইসলামের পক্ষে হিন্দুদের সব আপত্তি ও বিরোধিতার দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে। একজন হিন্দু হয়েও ইসলামের জন্য নিজ ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না।

প্রিয় পাঠক, ভেবে দেখুন তো এর কারণ কী? যদি এটি শুধুই স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদের ব্যক্তিগত বিষয় হতো, তাহলে পাঠকদের আমি এই লাইনগুলো পড়ার কষ্ট দিতাম না এবং এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেও বলতাম না। কিন্তু বিষয়টি আমাদের পুরো জাতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত অতিরঞ্জন না করেই আমি বলতে পারি, লাখ লাখ নয় বরং কোটি কোটি মানুষ অত্যন্ত কঠিন একটি প্রতিবন্ধকতার কারণে আজ ইসলাম গ্রহণ করছে না। যতদিন সেই প্রতিবন্ধকতা দূর না হবে, ততদিন অসংখ্য অমুসলিম বিধর্মীদের চারণভূমিতে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং ইসলামের সবুজ-শ্যামল বাগানে বিচরণ করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, আমাকে যদি আপনারা সত্য বলার অনুমতি দেন, তাহলে আমি সাফ সাফ এ কথা বলে দেবো যে, দূরের মানুষকে কাছে টানা তো দূরের কথা, নিজেদের গুনাহের কারণে লাখ লাখ মুসলিম আজ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কোন প্রতিবন্ধকতা? যা অসংখ্য অমুসলিমকে ইসলামের ছায়াতলে আসতে দিচ্ছে না! কোন সে অপরাধ, যা মুসলিমদের বের করে দিচ্ছে ইসলামের

গণ্ডি থেকে? যদি আমি নিজ কলম দিয়ে আপনার সেই প্রশ্নের উত্তর দিই, তাহলে হয়তো আপনি তা অস্বীকার করবেন। তাই স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদের একটি লেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আশা করি আপনারা এর মাধ্যমে মূল কারণটি বুঝতে সক্ষম হবেন। তিনি তার এক চিঠিতে লিখেছেন,

> যখন আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাই, আমার চলারগতি তখন নিজে নিজেই শ্লথ হয়ে আসে। যেন কেউ আমার জামার আস্তিন টেনে ধরেছে। আমার পা-দুটি সেখানেই থেমে যেতে চায়। হঠাৎ মনে হয়, হৃদয়ের সব প্রশান্তি যেন সেখানেই। আমি তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কে যেন মসজিদের ভেতর থেকে আমার হৃদয়কে মোহগ্রস্ত করছে, আমাকে কাছে টানছে। এক পা দু-পা করে করে মসজিদের ভেতরে আমায় টেনে নিচ্ছে। আহা! আমি যখন মুয়াজজিনের কণ্ঠে আল্লাহু আকবার-এর ধ্বনি শুনি, তখন যেন আমার হৃদয়রাজ্যে তুফান শুরু হয়! মনে হয়, কোনো শান্তশিষ্ট সমুদ্র হঠাৎ যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে! যখন আমি মহিমান্বিত প্রভুর সামনে নামাজিদের সেজদাবনত হতে দেখি, আমার আলস্যের ঘুমে বিভোর দুচোখ তখন সজাগ হয়ে যায়। যেন এক দুঃস্বপ্ন থেকে কেউ আমায় জাগিয়ে দিয়েছে। আমি তখন চঞ্চল হয়ে পড়ি।
>
> কিন্তু যখন মসজিদ থেকে কয়েক পা সামনে যাই, আমার চোখের সামনে মুসলিমদের প্রতিদিনের যাপিত জীবনের করুণ দৃশ্য ফুটে ওঠে। হায়! তাদের রং আজ কতটা ফ্যাকাশে! আহা, তারা আজ কতটা বিপথে! তাদের লেনদেন আজ কতটা অস্বচ্ছ! খাবারের পাত্র কতটা সংকীর্ণ!
>
> আমি তখন ভাবতে থাকি, এই যে মুসলিম সম্প্রদায়, যারা শুধু এই কারণেই মুসলিম যে, তারা মুসলিম মা-বাবার ঘরে জন্ম নিয়েছে। তাদের মুখেই শোনা যায় ইসলামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা। অথচ তাদের কর্মকাণ্ডের কোথাও ইসলামের ছিটেফোঁটাও নেই। এই যে মুসলিম, তারা শুধু আকৃতি ও নামের মুসলিম, কাজের মুসলিম নয়। যাদের দেহটাই শুধু মুসলিম কিন্তু হৃদয়টা প্রাণহীন। মুখে মুখে আল্লাহকে প্রভু বলে বিশ্বাস করে। অথচ প্রবৃত্তিই তাদের আসল প্রভু। কী লাভ হবে, যদি কারও বাহিরটা মুসলিম হয় আর ভেতরটা কাফের হয়?

জেনে রাখুন, ধর্মের সম্পর্ক শুধু জুব্বা-পাগড়ি আর লম্বা দাড়ির সঙ্গে নয়, বরং ধর্মের সম্পর্ক মানুষের হৃদয়-আত্মার সঙ্গেও।

যারা অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করছেন, তাদের উদ্দেশে বলছি, আপনারা আপনাদের দীর্ঘ তেরোশ বছরের ইতিহাসের পরতে পরতে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন যে, জাতির মানমর্যাদা ও শক্তিসামর্থ্য কী সুউচ্চ ঈমানের মধ্যে রয়েছে না সংখ্যার আধিক্যে? পুরো পৃথিবীকে ইসলামের পতাকাতলে দেখার স্বপ্ন যারা বুকে লালন করেন, তারা যদি সব দাওয়াতি কার্যক্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা আপন মুসলিম ভাইদের পেছনেই ব্যয় করতেন, তাহলে তা তাদের স্বপ্নের সর্বোত্তম ও সমুজ্জ্বল বাস্তবতায় রূপ নিত।

একজন অমুসলিমকে মুসলিম বানিয়ে যতটুকু সওয়াব অর্জন করা যায় তারচেয়েও বহুগুণ সওয়াব অর্জিত হবে যদি কোনো নামকাওয়াস্তে মুসলিমকে প্রকৃত মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলা যায়।

আহা, মুসলিমরা যদি আমার হৃদয়ের এই ব্যথাটা বুঝত! আমার এই ভাঙা ভাঙা কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করত! আমার সজল দু-চোখের নোনাজল অনুভব করত!

প্রিয় পাঠক, এই চিঠির প্রতিটি শব্দকেই হৃদয়ের চোখ দিয়ে পড়ুন এবং চিন্তা করুন। ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস, মূলনীতি ও আল্লাহর পবিত্র নাম কীভাবে স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করেছিল। আর কীভাবে মুসলিমদের পচা-দুর্গন্ধময় জীবনাচার দেখে তার দু-হাত শিকলাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

বর্তমান পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যারা সবকিছুকেই বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেন। যার কারণে 'বৃক্ষ তোর নাম কী, ফলে পরিচয়'-এর ন্যায় তারাও মুসলিমদের জীবনাচার দেখে ইসলাম, কুরআন ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃণা করতে শুরু করে।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন। আমরা নিজেদের দুরাচার আর পাপাচারের কারণে কীভাবে ইসলাম, কুরআন ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (নাউজুবিল্লাহ) অপমানিত করছি। তাই দয়া করে আসুন, আমরা অন্তত আল্লাহর জন্য, ইসলামের জন্য, সত্য নবীর জন্য এবং কুরআনের জন্য হলেও নিজেদের পরিশুদ্ধ করে নিই। অন্যথা মনে রাখবেন, কেয়ামতের দিন অসংখ্য অমুসলিম আপনাদের টেনেহিঁচড়ে আল্লাহর সামনে

নিয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলবে, আল্লাহ, আমরা তোমার প্রেমিক ছিলাম। তোমার সত্য ধর্ম, সত্য বিধান ও সত্য নবীর অন্বেষী ছিলাম। কিন্তু এই জালেম পাপিষ্ঠরা আমাদের সেই সত্য পর্যন্ত পৌছতে দেয়নি। বলুন প্রিয় ভাই, সেদিন আমরা কী জবাব দেবো?

ইসলাম তো এসেছে পৃথিবীর বুক থেকে অহংকার, প্রতারণা, মিথ্যা, অন্যের দোষচর্চা, অঙ্গীকার পূরণ না করা, চুরি, জিনা-ব্যভিচার ও জুলুম-নিপীড়নের মতো মানবতাবিরোধী এসব অপরাধ থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করতে, অথচ মুসলিম সম্প্রদায় নিজেরাই আজ এসবে লিপ্ত, তা কি কখনো ইসলাম চেয়েছে?

প্রিয় ভাইয়েরা, একই মুহূর্তে যদি কোনো বস্তু সাদা-কালো দু-রং ধারণ করতে না পারে, দুই দুই-য়ে যদি সবসময় চারই হয়, তিন আর পাঁচ না হয়, সুস্থতা ও অসুস্থতা, ঠান্ডা ও গরম, জুলুম ও ইনসাফ, দয়া ও নির্মমতা এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যদি কখনো একত্র হতে না পারে; তাহলে মুসলিম আর ঘুষখোর, মুসলিম আর সুদখোর, মুসলিম আর চোর, মুসলিম আর ব্যভিচারী, মুসলিম আর মিথ্যাবাদী, মুসলিম আর অত্যাচারী, মুসলিম আর কাপুরুষ, এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

তাই প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আসুন! নিজেরা সুমহান চরিত্রের অধিকারী হই। এতটা সুমহান আর এতটা সুউচ্চ যে, যেখানে গিয়ে পৃথিবীর সব উচ্চতা শেষ হয়ে যায়। কারণ, রহমাতুল লিল আলামিন বলেন, উত্তম চরিত্রকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে দিতেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। আর হ্যাঁ, এই উত্তম চরিত্রের তরবারির আঘাতেই অত্যাচারী ও রক্তপিয়াসি পৃথিবী তাঁর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। তাঁর কাছ থেকে ব্যথার উপশম নিয়েছিল।

প্রিয় ভাই, আপনার উত্তম আচরণই তাকে আপনার কুরআন, আপনার ইসলাম এবং আপনার রাসুলের হেদায়েত সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তুলবে। আপনি তো ইসলামের এক ভ্রাম্যমাণ প্রচারক। আপনার জীবনযাপন আর চলাফেরা অপরের কাছে ইসলামের বার্তা পৌছে দেবে। কুরআনই হবে আপনার আদর্শ। মহান চরিত্রের অধিকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের রঙেই আপনার জীবন রঙিন হবে। পৃথিবীর সামনে আপনিই হবেন ইসলামের সুমহান আদর্শের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হ্যাঁ বন্ধু, আপনিই সে ব্যক্তি, এই দিগ্ভ্রান্ত পৃথিবীকে যে সঠিক পথ দেখাবে। আপনিই পারবেন এই আঁধারে ঢাকা পৃথিবীতে আলো ছড়াতে।

যাহোক, আমি মূলত স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদের পরিচয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। যেন, লেখকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়ে যায়।

১৯২৯ সালের কোনো একদিনের ঘটনা। অপরিচিত কোনো এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি চিঠি এলো। চিঠিতে প্রেরক আমাকে সম্বোধন করে বেশ কিছু কথা বলেন। সেখানে একটি কথা ছিল, 'মুহতারাম, আমি আপনার রচিত বেশ কিছু বই পড়েছি। এখন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই'।

চিন্তা ও কল্পনার অনুভূতির মাধ্যমে আমি এই পত্রপ্রেরকের যোগ্যতা ও আমার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা অনুভব করলাম। তাই আমিও তাকে আমার কাছে আসার জন্য পত্র লিখলাম।

সম্ভবত চিঠি প্রেরণের তৃতীয় দিন। ১৭-১৮ বছরের বেশ হাস্যোজ্জ্বল ও সুন্দর পোশাক পরিহিত এক দীর্ঘদেহী যুবক আমার কাছে এলো এবং নিজ পরিচয় দিয়ে বলল, আমিই লক্ষ্মণ প্রসাদ। আজকাল আমি আমার পরিবেশের ওপর চরম ত্যক্তবিরক্ত। চারপাশটা যেন বিষিয়ে উঠেছে। অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, বর্তমানে আমার নিজ পরিবারের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ নেই। অনেকটাই একা হয়ে পড়েছি। এখন এমন কোনো শিক্ষার পরিবেশ খুঁজছি, যেখানে আমি আমার পড়াশোনা ও জ্ঞানচর্চা করতে পারব। তাই আপনার কাছে এসেছি। এখন আপনিই আমার পিতা, আপনিই আমার ভাই, আপনিই আমার সব। দয়া করে আমাকে আপনার শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করুন।

তার সাদামাটা এই কথাগুলো আমার দুর্বল কাঁধে এমন ভারি বোঝা চাপিয়ে দিলো যে, সে ভার আমি আজও অনুভব করি। হৃদয়ের কোথায় যেন তার জন্য বেশ মায়া লাগে। খুব কাছের কেউ মনে হয়। তাই আমি তার জন্য আমার হৃদয়ে ভালোবাসার দুয়ার খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির দরজাও উন্মুক্ত করে দিলাম। যেখানে সে আমার একান্ত প্রিয় মানুষের মতো অবস্থান করতে লাগল।

সেই দিনগুলোতে তো নানা বিষয়েই তার সঙ্গে কথোপকথন হতো। প্রায় সব ধরনের গ্রন্থই সে অধ্যয়ন করে নিয়েছিল। তবে চিকিৎসাশাস্ত্র ও ইতিহাসপাঠে তার আগ্রহ ছিল বেশি। তার মতে, চিকিৎসার মাধ্যমে অসুস্থ প্রাণীরা সুস্থতা লাভ করে। আর ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে অসুস্থ জাতি নিজেদের রোগ নির্ণয় করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। খুশির কথা হলো, আমার এই প্রিয় মানুষটি চিকিৎসাজগতে রাজকুমার কৃষ্ণ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং কয়েক বছর পর্যন্ত *আবেহায়াত* নামক চিকিৎসা-বিষয়ক একটি পত্রিকা তার

দক্ষ হাতের সম্পাদনায় টোহানা-এর মতো এক অজপাড়াগাঁ থেকে বেশ ভালোভাবেই প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া সিরাত-বিষয়ক *'আরবের চাঁদ'* নামক মহামূল্যবান গ্রন্থটি তো এখন আপনাদের সামনেই।

আফসোস! ১৯৩৯ সালে সে এই টোহানাতেই ইহধাম ত্যাগ করে।

মৃত্যুর আগে সে নিজের মহামূল্যবান দাওয়াখানা, লাইব্রেরি এবং বেশ কিছু নগদ অর্থ আমার নামে লিখে দেওয়ার অসিয়ত করে। তবে পরবর্তী সময়ে যদিও কেউ মৃত ব্যক্তির এই শেষ ইচ্ছা পূরণ করেননি। কিন্তু সাহিত্য ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার লিখিত অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। ইনশাআল্লাহ সময় করে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করব।

স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ অত্যন্ত পরিশ্রমী, সত্যবাদী ও সাহসী মানুষ ছিলেন। তার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য ছিল, তিনি নিজ হৃদয়ের বিপরীতে কখনো কথা বলতেন না। মনে এক কথা মুখে অন্য কথা, এমন নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলেন না।

একবারের ঘটনা, তার এক হিন্দু বন্ধু তাকে অনেক উপহার-উপঢৌকনের লোভ দেখিয়ে বলল, দয়া করে তুমি আমাকে স্বামী দিয়ানন্দের জীবনী লিখে দাও। কিন্তু *আরবের চাঁদ*-এর নন্দিত লেখক এই বলে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমি স্বামী দিয়ানন্দকে এতটা উপযুক্ত মনে করি না যে, আমার কলম দিয়ে তার জীবনী লিখব।

তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী একজন যুবক ছিলেন। প্রায় ২৬ বছর বয়সেই যিনি এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। স্বামী লক্ষ্মণ আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তার সুবাসিত কলমের সৌরভ আজও আমাদের বিমোহিত করে রেখেছে। প্রিয় পাঠক, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসার অতল সমুদ্রে ডুব দিয়ে এক হিন্দু যুবক—যে এ বই লিখেছে, এখন আপনি তা পাঠ করুন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বোত্তম জীবনাদর্শকে সামনে রেখে স্বীয় জীবনের প্রতিটি শাখাতেই তা অনুসরণের চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, এই কাজটিই আপনার ইহকাল ও পরকালের সফলতা এনে দেবে। কারণ, তাঁর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মানবতার সঠিক কল্যাণ ও মুক্তি।

নিবেদক

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআত প্রত্যাশী
বান্দা হাকিম মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (১৯০৪-১৯৭৪ খ্রি.)
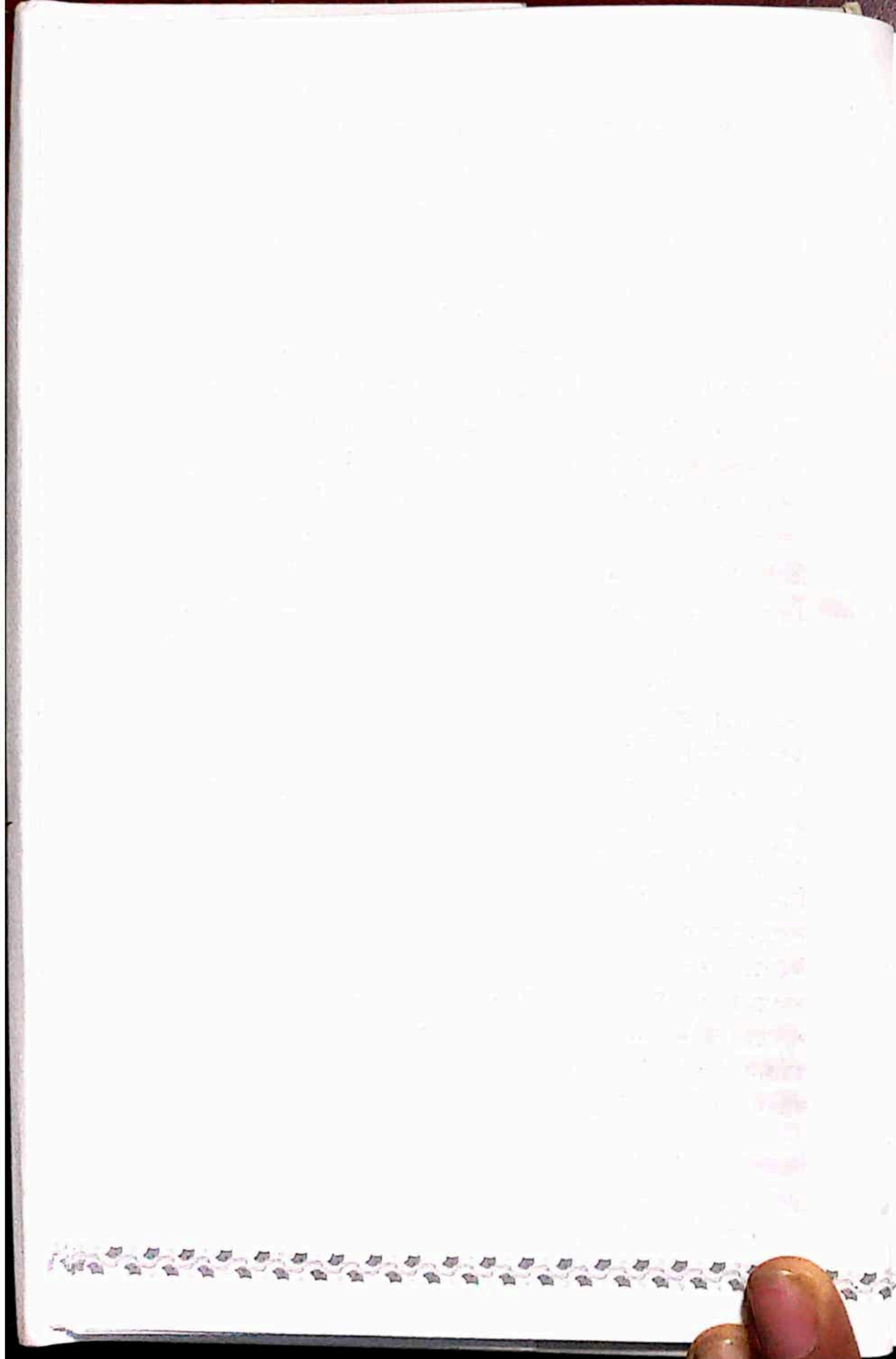
লেখকের কথা

পৃথিবীব্যাপী উন্নতির জোয়ার

পাশ্চাত্যের কথিত সভ্য ও শিক্ষিত মানুষদের জীবনযাপন ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতি লক্ষ করলে এই কথা সবার কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বর্তমান পৃথিবীতে উন্নতি ও অগ্রগতির এক বিস্ময়কর প্রতিযোগিতা চলছে। পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে, প্রতিটি জনপদ থেকে, প্রতিটি ভূখণ্ড থেকে জেগে ওঠার ডাক উঠেছে। উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে মানুষ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখে তো মনে হচ্ছে তারা সৌরজগতের সীমানা পেরিয়ে সপ্ত আকাশ পাড়ি দিয়ে আরশের গোপন রহস্য উন্মোচন করতেও অস্থির হয়ে উঠেছে। যার মাধ্যমে তারা এই আঁধারে ছাওয়া পৃথিবীকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোয় আলোকিত করে তুলবে।

বিশ্বের প্রত্যেক সচেতন ও আলোকিত মানুষের অন্তরেই তার দেশ ও জাতির কল্যাণ এবং সফলতার চিন্তাভাবনা এতটা জায়গা করে নেয় যে, প্রতিক্ষণ, প্রতি মুহূর্তে সে তার জাতির কল্যাণ সাধনেই ব্যস্ত থাকে। শুধু তাই নয়, নিজ কর্মকাণ্ড, আগ্রহ-উদ্দীপনা ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মাধ্যমে নিজ জাতির অনুভূতিহীন নিস্পৃহ নির্জীব মানুষগুলোর হৃদয়ে নয়া জীবনের প্রাণসঞ্চার করে এবং তাদেরকেও জাতির কল্যাণের প্রতিযোগিতায় অংশীদার করতে অস্থির হয়ে ওঠে। মূলত এটাই একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক ও সচেতন নাগরিকের পরিচয়। দেশমাতার কল্যাণে যারা কাজ করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, তারা এই চরিত্রেরই অধিকারী ছিলেন। নিজেদের হৃদয়ের সুপ্ত চেতনার বারুদ দিয়ে যারা প্রাণে প্রাণে আগুন জ্বেলেছেন।

আগামী দিনে হিন্দুস্তানের দৃঢ়প্রত্যয়

শিক্ষা-সভ্যতা ও সমৃদ্ধির এই দৌড় প্রতিযোগিতায় আমাদের হিন্দুস্তানও পিছিয়ে নেই। সেও নিজের যোগ্যতা, সক্ষমতা ও সমৃদ্ধির ঝলক দেখাতে দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করেছে। কারণ, হিন্দুস্তান খুব ভালো করেই জানে যে, চলমান বিশ্বপরিস্থিতির প্রতি লক্ষ রেখে যদি সে নিজেকে সক্ষম করে গড়ে

তুলতে সচেষ্ট না হয়, তাহলে উন্নত ও ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলো তাকে পদপিষ্ট করে সামনে এগিয়ে যাবে।

তখন সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে থেকে নিজের উন্নয়নের আশা করা কিংবা পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন দেখা তার জন্য মরীচিকার মতোই হবে। যা তাকে প্রতিনিয়ত ধোঁকা দিতে থাকবে। মহান আল্লাহও কাউকে এমন আত্মপ্রবঞ্চনায় দেখতে পছন্দ করেন না। তাই অত্যন্ত অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য বিষয়গুলো থেকে কেউ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা তা পালনে অলসতা করে, তাহলে তিনি দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কঠিন শাস্তি ভোগ করান। পদে পদে অপমান আর অপদস্থতাই হয় তার নিত্যসঙ্গী। পৃথিবীর ক্ষমতা ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর দাস হয়েই তাকে বেঁচে থাকতে হয়। বলুন, এমন জীবনের কীই-বা মূল্য আছে?

কুদরতি শাস্তি

মহান কুদরতের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, তিনি নিজের অবাধ্য বান্দাদের ক্ষমা ও ছাড় দেওয়ার জন্য নিজের হৃদয়ে সামান্যতম দয়া-অনুগ্রহও পোষণ করেন না।[১] জুলুম-নিপীড়নের এই রক্তাক্ত ভূমিতে যে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালীর এক আঙুলের ইশারাতেই অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ রক্ত ও মাটিতে গড়াগড়ি খায়; সেও কুদরতের ইনসাফপূর্ণ কঠিন ধরা ও তাঁর অপরিবর্তনীয় বিধানের অগ্নিগোলা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। পৃথিবীর এই ক্ষমতাবানদের হৃদয়েও কখনো কখনো দয়ার উদ্রেক হতে পারে; কিন্তু মহান কুদরতের বিধানকে যারা অস্বীকার করে, অবজ্ঞা করে, তাদের কখনো তিনি ক্ষমা করেন না। তিনি যেন এমন এক কঠিন শিক্ষক, যিনি নিজ ছাত্রদের কখনো সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত দেখে সহ্য করতে পারেন না। তিনি কখনো এটা মেনে নেন না যে, তাঁর অবাধ্য ছাত্ররা তাদের কৃতকর্মের সাজা ভোগ না করেই পার পেয়ে যাবে। আজাব ও শাস্তির ব্যাপারে তিনি নিজের যে নীতিমালা শুনিয়ে দিয়েছেন, তা থেকে কেউ রেহাই পাবে না। চাই সে বৃদ্ধ হোক বা যুবক, আলেম কিংবা জাহেল, রাজা কিংবা প্রজা। সৃষ্টিজীবের প্রতিটি অণুপরমাণু

---

১. যখন আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায় ও বান্দা তওবা না করে, তখনের কথা উদ্দেশ্য। না হয় ইউনুস আলাইহিস সালামের জাতির ওপর শাস্তি আসার পর তওবা করার দ্বারা আল্লাহ শাস্তি তুলে নেন।-সম্পাদক

এমনকি প্রতিটি বিন্দুও তাঁর বিধানের অধীন। কোনো কিছুই তাঁর কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। যতক্ষণ না সে তাঁর বিধানের সামনে মাথানত করে।

যে বীজের ফসল উৎপন্ন হওয়ার শক্তি নেই, কুদরত তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। তেমনই যে জাতির মধ্যে নিজেদের মানমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে টিকিয়ে রাখার সাহস নেই, কুদরত কখনো তাদের নেতৃত্বের আসনে বসান না। প্রদীপ তো সেই সময় পর্যন্তই আলো বিলানোর আশা করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে আগুন জ্বালানোর ক্ষমতা থাকে। একটি বীজ তো তখনই উন্নতির প্রত্যাশা করতে পারে, যখন তার মধ্যে নিজেকে মাটিতে বিলীন করে অসংখ্য বীজ হওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকতে দেখবে।

কোনো দেশ বা জাতি ততক্ষণ পর্যন্তই শিক্ষা ও সভ্যতার স্বর্ণশিখরে পৌছার স্বপ্ন দেখতে পারে, অথবা নিজেদের অর্জিত গৌরবের স্থায়িত্বের আশা করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশ বা জাতির প্রতিটি সদস্য মহান কুদরতের বিধিবিধান ভুলে না গিয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে তা মানার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে।

হিন্দুস্তানের যুবকদের প্রতি

যেকোনো রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিহিত থাকে সেখানকার মানুষের উন্নতি ও সমৃদ্ধির ওপর। একটি জাতির উন্নতি তো তখনই হতে পারে যখন সে জাতির প্রতিটি যুবকই কর্মঠ ও পরিশ্রমী হবে। প্রভুপ্রদত্ত মেধাকে কাজে লাগিয়ে আপন জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেবে। কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! আমার প্রিয় হিন্দুস্তানের অধিকাংশ যুবকই আজ নিজেদের মহামূল্যবান সময়গুলোকে অহেতুক কাজে নষ্ট করছে। জুয়া, তাস, গাঁজা, আফিম, রং-তামাশা ও নাটক-সিনেমাতেই তারা হিরে-জহরত থেকেও দামি সময়গুলোকে ধূলিকণার মতো উড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ তারা চাইলেই পারত ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত এই রিক্ত-নিঃস্ব জাতিকে সুখসমৃদ্ধি ও উন্নয়নের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করতে। নারীর সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও ভালোবাসার রসে টইটম্বুর এমন সহজলভ্য বইপুস্তক পড়ে পড়ে একেকজন এখন 'প্রেমের শাহজাদা' হয়ে গেছে। না জানি কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে গিয়ে কতগুলো রঙিন উপত্যকা প্রেমলীলার রঙিন মঞ্চ ও সবুজ-শ্যামল উদ্যান পাড়ি দিয়ে তারা আজ প্রেয়সীকে খুঁজছে। অলস মস্তিষ্কের উদ্ভাবিত সেসব গল্প-উপন্যাস তাদেরকে নারীর সৌন্দর্য আর প্রেম-ভালোবাসায় আকণ্ঠ

নিমজ্জিত করে রেখেছে। এমন অনর্থক চিন্তাভাবনা, জল্পনাকল্পনা ও চিত্তবিনোদনের রঙিন পৃথিবীকে অন্বেষণ করার পরিণতি হলো, তাদের হৃদয়ে দেশ ও জাতির জন্য ভালো কিছু করার চেতনার প্রদীপ তো থাকবে, কিন্তু তাতে সেই হৃদয়জ্বালা এবং মর্মপীড়া ও প্রেরণার আগুন থাকবে না। যে আগুন অনাকাঙ্ক্ষিত সেসব খড়কুটাকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে, যা তাদের লক্ষ্যে পৌছার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। তা ছাড়া প্রেম-ভালোবাসায় মজে থাকা মানুষদের কর্মস্পৃহা ও শক্তিসামর্থ্য এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, জীবনযুদ্ধে অংশ নেওয়ার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। যদি ভোগবিলাসে মত্ত এই আনন্দ-বিনোদনের গোলামরা নিজেদের হৃদয়ের ওপর জোর খাটিয়ে সাহস করে জীবনযুদ্ধের এই রণক্ষেত্রে এসেও যায়, তবুও তাদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা এতটাই সাময়িক হয় যে, তরবারি কোষমুক্ত হতেই তাদের হৃদয়ে কাঁপন শুরু হয় এবং দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করে।

পাখিদের কলকাকলি আর বিচিত্র ফুলেদের মন মাতানো সৌরভ যুবকদের চিন্তা-চেতনাকে এতটাই চিত্তবিনোদনের আশেক বানিয়ে রেখেছে যে, তাদের ধারণা জীবন মানে ফুলে ফুলে সুশোভিত এক নয়নাভিরাম বাগান, যেখানে কেউ ফুল হয়ে সুবাস ছড়ায় আর কেউ ভ্রমর হয়ে মধু আহরণ করে। ফুল তুলতে গিয়ে যে কত শত কাঁটার আঘাত সইতে হয়, তা যেন তারা বেমালুম ভুলে গেছে। অথচ সে কাঁটাও তো ফুলের শাখে ফুলের পাশে বিদ্যমান থাকে।

বিনীত নিবেদন

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যদি আপনারা মহাক্ষমতাশালীর আইন অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে আমি আপনাদের কাছে এই সতর্কবার্তা পৌছে দিতে চাই যে, বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহগ্রস্ত হয়ে আপনারা চরম ক্ষতিকর এক ভুলের শিকার হয়েছেন। আজ আপনারা যে পথে চলছেন, সাবধান! সে পথের সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হবেন না। কারণ আজকের আলো ঝলমল এই পথ আপনাদের কোনো পুষ্পোদ্যানে নিয়ে যাবে না। বরং ধ্বংস ও বিনাশের এক ভয়ংকর কন্টকাকীর্ণ ভূমিতে নিয়ে যাবে।

খুব ভালোভাবে এই বাস্তবতাকে বুঝতে চেষ্টা করুন। জীবন কোনো রঙিন স্বপ্নের নাম নয়, বরং কঠিন এক পথ। যেখানে প্রতিনিয়ত আপনাকে টিকে থাকার সংগ্রাম করতে হবে। এই জীবন কোনো কাগজের বুকে লেখা প্রিয়তমার সৌন্দর্যবর্ণিত কবিতা নয়, বরং বুলবুলিকে নিয়ে লেখা ভালোবাসার

এক হৃদয়বিদারক শিক্ষণীয় উপাখ্যান। মনে রাখবেন, আপনার এই জীবন কৈশোরের কোনো খেল-তামাশা নয়, বরং কর্মমুখর ব্যস্ত এক ময়দান। যেখানে প্রতিনিয়ত আপনাকে নিজের মেধা ও শ্রম ব্যয় করে কর্মের মাধ্যমে নিজের সক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে এবং পৃথিবীর বুকে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

যদি আপনারা আলস্য ও কাপুরুষতার অভিশপ্ত শিকলে নিজেদের বন্দি করে ফেলেন, তাহলে এই বিশাল রণক্ষেত্র হতে বিজয়ী ও সফল হয়ে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষাকেও নিছক কল্পনা বা স্বপ্নই ভাবতে পারেন। সাবধান! যদি এভাবেই চলতে থাকেন, তাহলে যে ভূমিতে আপনাদের বিজয়ের পতাকা ওড়ার কথা ছিল, সেই ভূমিতেই আপনারা রক্তমাখা লাশ হয়ে পড়ে থাকবেন। সেদিন আপনাদের এমন কাপুরুষোচিত মৃত্যুর জন্য কেউ কান্না করবে না।

সুতরাং সত্যিই যদি আপনারা জীবনকে ভালোবাসেন, নিজ জাতিকে ভালোবাসেন, তাহলে সৎসাহস ও দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে জেগে উঠুন এবং সময়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের সমস্ত শক্তি জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করুন।

কিন্তু আপনারা যদি মহান প্রভুর বিধানের সামনে মাথানত না করেন, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে বুকে ধারণ না করেন, সর্বোপরি তাঁর দেওয়া দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা না করেন, তাহলে মনে রাখবেন, এর পরিণাম এতটা ভয়ংকর হবে যে, আপনারা স্বপ্নেও তা ভাবতে পারবেন না।

মহান মালিকের সব বিধানই সুদৃঢ়। তাঁর বিধানের প্রতি কারও অবজ্ঞা-অবহেলাকে তিনি মোটেই সহ্য করেন না। তাঁর অপরিবর্তনীয় বিধান হলো, যদি তোমরা আমার বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করো, আমার ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করো, তাহলে আমি তোমাদের মাটির এই বিছানা থেকে উঠিয়ে সুমহান আরশে পৌঁছে দেবো। আর যদি আমার বিধান অস্বীকার করো, আমার দেখানো পথে না চলো, তাহলে আমি তোমাদের সুউচ্চ আরশ থেকে জমিনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতেও দ্বিধা করব না।

চিন্তার জাদুকরি প্রভাব

যেকোনো জাতির সফলতা ও ব্যর্থতা সে জাতির সদস্যদের সুদৃঢ় মনোবল, সুমহান চিন্তাভাবনা কিংবা কাপুরুষতার মধ্যেই নিহিত।

আগেকার দার্শনিকরাও এই বাস্তবতাকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন যে, দুনিয়ার সব বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড ও বৈপ্লবিক ঘটনাবলির গূঢ় রহস্য উন্নত হৃদয়ের সমুন্নত চিন্তাভাবনাতেই লুকিয়ে রয়েছে। আবার পৃথিবীর সমস্ত নিকৃষ্ট ও লজ্জাজনক কর্মকাণ্ডের মূল সংঘটকও হলো নিকৃষ্ট ও নির্লজ্জ চিন্তা-চেতনা। যা মানুষকে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জিনিসের দিকে ধাবিত করে। মানুষের সফলতা-ব্যর্থতাও তার চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কোনো মানুষের চিন্তাভাবনা যদি কাপুরুষতা ও দুর্বল মনোবলসম্পন্ন হয়, তাহলে তার পক্ষে যেমন এই জীবনযুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, তেমনই সুদৃঢ় মনোবল ও সাহসের অধিকারী ব্যক্তিকে পরাজয় ও ব্যর্থতার গ্লানি আচ্ছন্ন করাও অসম্ভব। জয় ও ক্ষয়ের এই গুপ্তভেদ, সাহস ও ভয়ের এই গূঢ় রহস্য মানুষের চিন্তা-চেতনার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।

মানবজীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই সেই ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পরিচালিত হয়, আপন হৃদয়ে সে যা লালন করে। আজকের এই আধুনিক সমাজেও যারা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, হতাশা ও ব্যর্থতাকে দু-পায়ে মাড়িয়ে সফলতার রাজমুকুট ছিনিয়ে এনেছেন; তারাও পৃথিবীর সামনে এই চরম সত্যটি তুলে ধরেছেন যে, মানবজীবনের জয়-পরাজয়, সফলতা ও ব্যর্থতা, সচ্ছলতা ও দরিদ্রতা, সম্মান ও অসম্মান, সবকিছুই তার চিন্তাশক্তির প্রভাব ও ফলাফল, ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিকৃতি। তার দৃষ্টিভঙ্গি কখনো তাকে জয়ের হাসি উপহার দেয়, আবার কখনো পরাজয়ের গ্লানি। শুধু চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কারণেই মানবজীবনে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দেয়। মনে রাখবেন, যারা সবসময় হতাশায় ভোগেন, পরাজয়ের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন, তাদের এই ভয় ও হতাশা তাদেরকে আরও বেশি ভীতু, কাপুরুষ ও অলস বানিয়ে দেয়। ফলে তাদের পুরো জীবনটাই ব্যর্থতার কালোমেঘে ছেয়ে যায়। অন্যদিকে যারা সবসময় জয়ের নেশায় মত্ত থাকেন, সফলতা ও সার্থকতার সুউচ্চ শৃঙ্গে আরোহণের স্বপ্ন দেখেন, এই স্বপ্ন ও সাহস তাদের মধ্যে অসম্ভবকে সম্ভব করার দৃঢ়প্রত্যয়, উদার মনোভাব, তীক্ষ্ণ মেধা ও বিচক্ষণতা সৃষ্টি করে। যা পরবর্তী সময়ে তাদের জীবনে সফলতার জ্যোতির্ময় চাঁদ হয়ে উদিত হয়।

প্রতিটি মানুষ আপন হৃদয়ে যে চিন্তা-চেতনা লালন করে, সেই চিন্তা-চেতনাই তাকে সবসময় সেরকম পরিবেশ-পরিস্থিতির দিকে আকর্ষণ করতে থাকে এবং তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি খুঁজে দেয়। এই কারণেই প্রত্যেক

মানুষের জীবনযাপন, চলাফেরা, স্বভাবচরিত্র ও কর্মকাণ্ড দেখেই তার রুচিবোধ ও মানসিকতা সম্পর্কে জানা যায়।

আমাদের জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্যে যে চিন্তাভাবনার কতটা প্রভাব রয়েছে, স্বভাবচরিত্র ও অভ্যাসের আড়াল থাকায় আমরা তা অনুধাবন করি না। আমরা মনে করি, অমুকের এই সফলতা বা ব্যর্থতা তো তার নিজস্ব কর্মকাণ্ড, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও স্বভাবচরিত্রেরই ফসল। অথচ এর পেছনে রয়েছে চিন্তা-চেতনার বেশ প্রভাব।

ইচ্ছাশক্তি

কুদরতিভাবে প্রতিটি মানুষের মন-মস্তিষ্কেই ইচ্ছাশক্তিকে আমানত রাখা হয়েছে। তবে তার আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা আশেপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাব ও স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতারই অনুগামী হয়। তরমুজ যেমন তরমুজের রং গ্রহণ করে, তেমনই একজন মানুষকে দেখেই অপরজন নিজের রুচি-প্রকৃতিকে সাজাতে থাকে।

দুধপানের প্রাথমিক দিনগুলোতে প্রতিটি শিশুরই রংঢংহীন এক কোমল হৃদয় থাকে। সে জানে না তাকে কীভাবে চলতে হবে; কীভাবে বলতে হবে, পরবর্তী সময়ে সে যেমন পরিবেশ-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, সেটার প্রভাবই তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। ঠিক তেমন, যেমন কোনো সাদা কাপড়কে আপনি যে রঙের পানিতেই ধৌত করবেন, তা সেই রঙেই রঙিন হবে। তদ্রূপ মানুষের হৃদয়ে যে চিন্তা-চেতনা বসবাস করে, তার আলোকেই মানুষের স্বভাবচরিত্র গড়ে ওঠে এবং জীবনমঞ্চে সে সেরকম অভিনেতাই হয়ে থাকে।

মানুষের স্বভাবচরিত্রের পরিবর্তন তার চিন্তা-চেতনারই ফসল। এই কারণেই কারও অভ্যাসের পরিবর্তন আনতে চাইলে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিন। দেখবেন, তার অভ্যাসের মধ্যেও পরিবর্তন এসে গেছে। শুধু তাই নয়, এতে করে মানুষের পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও পরিবর্তন আসে। আমি, আপনি, আমরা সবাই যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারি, তাহলে দেখবেন আমাদের সমাজের অবস্থাও পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, খুব সহজে এই পরিবর্তন সাধিত হবে না। কেননা, মানুষের চিন্তা-চেতনা সহজে পালটায় না, যতক্ষণ না তার গায়ে কোনো বিপ্লবের ছোঁয়া লাগে। এর জন্য চাই প্রচুর পরিশ্রম ও সুদৃঢ় মনোবল। সৎসাহস ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ নিজেদের হীন জীবন থেকে বের হয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়।

বইপুস্তক অধ্যয়নের গভীর প্রভাব

মানুষের সমুন্নত চিন্তাভাবনা ও নিচু মানসিকতা তৈরির ক্ষেত্রে যেমন সংশ্রবের প্রভাব থাকে, তেমনই বইপুস্তক অধ্যয়নও মানুষের হৃদয়ে বেশ প্রভাব ফেলে। বন্ধুবান্ধবদের সোহবত-সংশ্রবের মাধ্যমে যেমন মানুষের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে জানা যায়, তেমনই প্রত্যেক মানুষকেই তার গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে চেনা যায়। যে ধরনের বইপুস্তকের বিষয়াদি তার অন্তরে রেখাপাত করে, তার আলোকেই তার মন-মানসিকতা গড়ে ওঠে। তবে হ্যাঁ, বড় কোনো প্রভাববিস্তারকারী কিছু যদি তার হৃদয়ে প্রভাব ফেলে, তাহলে তা ভিন্ন বিষয়। তাই বইপুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া উচিত।

নোংরা ও অশ্লীল বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা বইপুস্তক মানুষের হৃদয়ে শুধু নোংরামি আর অশ্লীলতার বীজই বপন করে। পরবর্তী সময়ে তার মন-মানসিকতায় যতই পরিবর্তন আসুক না কেন, সে যতই সুস্থ, সুন্দর ও পবিত্র চিন্তার অধিকারী হোক না কেন, বাহ্যিকভাবে যদিও তখন পুরোনো সেই বাজে বইপুস্তকের প্রভাব অনুভব হবে না; কিন্তু এটা এক চরম সত্য যে, এই ধরনের বইপুস্তকের প্রভাব কখনো মানুষের মন থেকে মুছে যায় না। বরং সময়ে সময়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে থাকে। অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গির অধিক প্রভাবের কারণে হয়তো তা সাময়িক দমে যায়, কিন্তু চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায় না।

প্রিয় পাঠক, মনে রাখবেন, মানুষের চিন্তা-চেতনা যেমন আগুন আর বিজলি থেকেও ভয়ংকর, তেমনই মানুষের শক্তি-সাহসের জন্যও উপকারী। বিবেক-বোধকে কাজে লাগিয়ে যদি হৃদয়কে ভালো চিন্তাভাবনার ভান্ডার বানানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে তা নিচু থেকে নিচুতর মানুষকেও সম্মানের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেবে। কিন্তু যদি সুস্থ সুন্দর ও পূতপবিত্র চিন্তাভাবনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়, হৃদয়কে সব ধরনের নাপাক ও নোংরা চিন্তাভাবনায় পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তা সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী একজন মানুষের চরিত্রেও দাগ লাগাতে দ্বিধা করবে না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মানুষের জীবনে যেহেতু চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণার জাদুকরি প্রভাব রয়েছে; তাই নিজেদের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে উদাসীন হওয়া যাবে না। আমাদের জীবনের বাঁকে বাঁকে সেই চিন্তা-চেতনাগুলো গভীরভাবে রেখাপাত করে থাকে; যেগুলো আমরা আমাদের

বন্ধুবান্ধব ও বইপুস্তক থেকে গ্রহণ করি। তাই আসুন, বন্ধু ও বই নির্বাচনে আমরা সচেতন হই।

এই কথা যদি সত্য হয় যে, যেকোনো জাতির দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা পরিবর্তনের মধ্যেই তাদের কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত, তাহলে হিন্দুস্তানের যুবকদের প্রতি আমার দরদি আহ্বান, আসুন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অলস মস্তিষ্কের লেখকদের কাল্পনিক গালগল্প, প্রেমকাহিনি ও বাস্তববিরোধী কিচ্ছা-কাহিনি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সেসব বইপুস্তক অধ্যয়ন করি, যেখানে রয়েছে আমাদের পূর্বসূরিদের সাহসিকতার গল্প। হার না মানার গল্প, প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়ের গল্প। যেখানে লেখা রয়েছে জীবনের চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে কীভাবে সামনে যেতে হয় সে কাহিনি। যে বইয়ের পরতে পরতে রয়েছে আলস্যের ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার গল্প। যে বই পাঠে প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্যম সৃষ্টি হয়। মনে রাখবেন, সে লোক প্রকৃত শিক্ষিত নয়, যার পেটে হাজারো বইপুস্তকের লাইব্রেরি রয়েছে কিংবা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বইপুস্তক যার মুখস্থ। প্রকৃত শিক্ষিত তো সে, যে নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করতে পারে। শিক্ষার্জন ও শিক্ষাদানে আপনি আপনার পুরো জীবন ব্যয় করলেন, অথচ নিজের জীবনে সেই শিক্ষার আলো জ্বালাতে পারলেন না, তাহলে তো আপনার দৃষ্টান্ত হবে সেই সম্পদশালীর ন্যায়, যে নিজের ধনসম্পদকে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য ব্যয় করে দেওয়ার স্লোগান দেয়, অথচ সেই সম্পদ ব্যয় করে সে নিজেই উপকৃত হতে পারল না। উলটো অসংখ্য আক্ষেপ আর দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে কবরবাসী হয়ে যায়।

ধরে নিন, সততা ও আমানতদারি বিষয়ে আপনি এমন একটি প্রবন্ধ তৈরি করলেন, দীর্ঘসময় পর্যন্ত দেশের পত্রপত্রিকাগুলো যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকল। কিন্তু আপনার প্রতিদিনের যাপিত জীবনে সততা ও আমানতদারির লেশমাত্রও নেই। বলুন, তাহলে এমন প্রবন্ধ লিখে কী হবে? একটি রাষ্ট্রের কবি-সাহিত্যিক, লেখক-কলামিষ্ট, বুদ্ধিজীবী, অভিনেতা ও গল্পকারের এতটা প্রয়োজন নেই, যতটা প্রয়োজন রয়েছে সেসব মানুষের, যাদের সুদৃঢ় মনোবল, দৃঢ়প্রত্যয় ও কর্মমুখর জীবন মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ হবে।

প্রতিটি মানুষকে প্রথম যে যোগ্যতাটি অর্জন করতে হবে, তা হলো আত্মার পরিশুদ্ধি ও উত্তম চরিত্র। এরপর অন্যান্য যোগ্যতা অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। কিন্তু আফসোস! আজকের এই পৃথিবী সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। নদী এখন ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যকে উপদেশ

দেওয়ার মতো মানুষের তো অভাব নেই। কিন্তু নিজেকে উপদেশ দেওয়ার মানসিকতা কজনের আছে?

ফলাফল হলো, বর্তমানে আমাদের সমাজে সবাই বক্তা, সবাই উপদেশদাতা, অন্যকে উপদেশ দেওয়া ছাড়া যাদের আর কোনো কাজ নেই। এমনকি আজকাল তো অনেকে বাক-পটুতার মাধ্যমেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে। বয়ান-বক্তৃতাকে নিজের অর্থোপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করছে। দেশ ও জাতির অনিবার্য ধ্বংসই হলো যার পরিণাম ফল। বাস্তবেই যারা জীবনের প্রকৃত সুখ পেতে চায়, জীবনের মানেটা বুঝতে চায়, তাদের জন্য ইলমের চেয়েও আমলের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করা বেশি জরুরি।

তাই আসুন, আমরা আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, নিজেদের দিল-দেমাগ ও দেহের সব শক্তি ব্যয় করে একটি আমলি জীবনযাপন করার চেষ্টা করব। এমন জীবন গঠন করব, যেখানে হয়তো শিক্ষার অভাব থাকবে, কিন্তু ভালো কাজের দিক দিয়ে হবে পরিপূর্ণ। যে জীবন সততা ও সত্যবাদিতা থেকে একচুলও পিছু হটবে না। যতদিন বেঁচে থাকব দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে না হোক, আল্লাহর দৃষ্টিতে একজন বীরবাহাদুরের মতোই জীবন অতিবাহিত করব। যেদিন মৃত্যু সামনে আসবে, সেদিনও যেন একজন বীরের ন্যায় মরতে পারি।

উত্তম চরিত্র ও সৎস্বভাব মানবজীবনের এমন এক বিরল মহামূল্যবান সম্পদ, যার অন্বেষণই মানুষের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। পূতপবিত্র মনীষীদের জীবনী পাঠ এবং তাদের শিক্ষা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমেই ভালো কাজের আগ্রহ ও হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জন হয়। তাই আসুন, আমরা পৃথিবীর ভালো মানুষদের জীবনী পাঠ করি। ভালো মানুষদের সংশ্রবে যাই এবং ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি।

পৃথিবীর মহিমান্বিত মনীষীদের জীবনী

আমার এমন চিন্তাভাবনার কারণেই আমি পৃথিবীর সেসব ক্ষণজন্মা মহান মহিরুহের জীবনী লেখার ইচ্ছা করেছি, যারা পৃথিবী থেকে অজ্ঞতার আঁধার দূরীভূত করে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো জ্বালিয়েছেন। আদর্শিক প্রশ্নে জীবনের সব সুখ-আহ্লাদ ও লোভ-লালসাকে নির্দ্বিধ প্রত্যাখ্যান করে বিসর্জন দিয়েছেন।

হাতেগোনা সেই মনীষীদের মধ্যে পুরো বিশ্বজগতের জন্য রহমত, গুনাহগারদের জন্য সুপারিশকারী, নবী-রাসুলদের সর্দার, সর্বশেষ নবী, সমস্ত সৃষ্টিজীবের নেতা ও গৌরব মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। তাই আমি প্রথম এই মহান মনীষীর জীবনী লেখার গৌরব অর্জন করার চেষ্টা করেছি। সম্ভবত আমার নিজ ধর্মেরই অনেক সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণমনা লোক এই কথা বলে নাক সিটকাবে যে, নিজের ধর্মের প্রসিদ্ধ দেবদেবী আর মুনিঋষিদের বাদ দিয়ে কেন আমি মুসলিমদের নবীর জীবনী লেখার ইচ্ছা করলাম? মূলত আমার কাছে এমন প্রশ্নের কোনো যৌক্তিকতাই নেই। আমার মতে এই ধরনের প্রশ্ন চরম সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ মানসিকতার দুঃখজনক বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।

সুমহান মর্যাদার অধিকারী ক্ষণজন্মা মহিরুহরা এই পৃথিবীতে কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা গোত্রের নয়। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্যই তাদের সম্মান করা ফরজ এবং তাদের শিক্ষার আলো গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করা আবশ্যক। এই মনীষীরা নিজেদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আপন আপন শিক্ষার অপার বারিধারায় প্রতিটি মানবহৃদয়কে ঠিক তেমনই সিক্ত করার চেষ্টা করেছেন, অবিরত বারিধারার সজীবতায় শুকনো মরূদ্যান যেমন ফুলে ফুলে ভরে যায়। আমরা এমন সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় কেন দেবো যে, এমন একজন মহান মনীষীকে একটি বিশেষ জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেবো এবং নিজেরা তাঁর সুমহান শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত থাকব? প্রত্যেক মানুষকেই সত্যের অনুসারী হতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের পূজারি নয়। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কথা তো তখনই অনুসরণযোগ্য হবে, যখন তা সত্যের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবে। অনেক মানুষ যেমন নিজেদের মাজহাব বা সম্প্রদায়ের বড় বড় নেতা ও মনীষীদের প্রতি অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাসের দরুন এমন অনেক গুণাবলি যুক্ত করে, যা তাদের কস্মিনকালেও ছিল না, তদ্রুপ আজকাল এমন মানুষও রয়েছে, যারা মনে করে আমাদের মতাদর্শের নেতা বা মনীষীরা যা বলেছেন, তা-ই সঠিক, অন্যসব ভুল।

প্রিয় ভাই, এটা তো সত্যের পূজা হলো না। একে তো ব্যক্তি বা দলপূজা বলে। একটি বিষয় খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখবেন, পূর্বেকার নবীদের গ্রন্থাবলিতে এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, আজকের পৃথিবীতে যা আমলযোগ্য নয়। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো নবীর শিক্ষা ও আদর্শকে আজ ও আগামীর পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন দেখে, তাহলে তা

দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। এতে করে সেই নবীর সত্যতার ওপর কোনো আঘাত আসবে না। কারণ, তার শিক্ষা ও আদর্শ তো তার সময়ের লোকদের জন্য উপযোগী ও আমলযোগ্য ছিল। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, পৃথিবী বদলে গেছে। মানুষের নৈতিক ও মানসিক চিন্তা-চেতনাতেও বড় ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। তাই আজ কী করে পূর্বেকার সেই নবীদের শিক্ষা ও আদর্শ মানুষের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে প্রশান্তি দিতে পারে? এমন মহান ব্যক্তিদের শিক্ষা ও আদর্শকে রাবারের মতো টেনে টেনে আজকের এই পৃথিবীর চলমান শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুগামী করার চেষ্টা করা সততা বিক্রির নামান্তর। সেই পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে প্রায় সব জাতি ও ধর্মেরই নবী-রাসুলগণ রয়েছেন। যাদের অনেক শিক্ষাদীক্ষাই বর্তমান পৃথিবীর উপযোগী নয়।

বর্তমান যুগের হিন্দুস্তান বনাম জাহেলি যুগের আরব

প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, পছন্দ-অপছন্দ থাকে। এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে আমার দৃষ্টিতে বর্তমান সময়ে আমাদের প্রিয় হিন্দুস্তানের সামনে যে মহান মনীষীর আদর্শ ও জীবনীকে পেশ করা যেতে পারে, তিনি হলেন নবী-রাসুলদের সর্দার মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আজকের এই শিক্ষিত ও সভ্য হিন্দুস্তানের সঙ্গে যে জাহেলি যুগের আরবের কতটা গভীর সম্পর্ক ও মিল রয়েছে, তা আমাদের হিন্দুস্তানিদের জীবনব্যবস্থার দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বলুন, আজকের এই হিন্দুস্তানে কি সভ্যতা, ভদ্রতা ও শালীনতার আইনকানুনকে ধনদৌলত ও অর্থোপার্জনের কামনা-বাসনার কসাইখানায় নির্দ্বিধায় জবাই করা হচ্ছে না? প্রকাশ্যে মদ্যপান করাকে কি শিক্ষিত ও সভ্য মানুষদের আনন্দ-বিনোদন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না? কুপ্রবৃত্তির কামনা ও পাশবিক চাহিদার নির্লজ্জ ঘটনাগুলোকে কি বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় উপস্থাপন করাকে গর্বের ও কৃতিত্বের বিষয় বলে ভাবা হচ্ছে না?

যুবতী নারীদের ফুলে ফুলে সুশোভিত যৌবনের বাগান, যেখানে নিষ্পাপ শিশুরা ফুল হয়ে ফোটে ও পাখি হয়ে খেলা করে। সিকান্দার বাদশার রাজত্ব আর কারুনের অঢেল সম্পদও যার মূল্য হতে পারে না। একমাত্র পবিত্র ভালোবাসা ও মায়া-স্নেহই হতে পারে যার সমমূল্য। যে নারীর সতীত্ব ও ভালোবাসা পেতে হলে সম্পদ নয়, চাই ভালোবাসা, ভালোবাসা এবং

ভালোবাসা। প্রেম ভালোবাসা দিয়েই এই বাগান থেকে ফুল তুলে নিতে হয়। আহা! আজ কি সেই মহামূল্যবান বাগানকে সোনারুপার দু-একটি টুকরার বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে না? এমন অমূল্য রতন মেয়েদের কি পিতারা ঘটা করে মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে এমনভাবে বিক্রি করছে না, যেভাবে পশুর হাটে গরু-ছাগল বিক্রি হয়? একজন সুন্দরী রমণী কি কয়েকজন পুরুষের কামনা-বাসনার শিকার হচ্ছে না? দুঃখজনক হলো, তাদের মধ্যে এমন অনেক ধর্ষিতাও রয়েছে, ধর্ষক যাদের পূর্বপরিচিত, আত্মীয় বা সম্মানিত কেউ। যে বন্ধুরা আমার এই কথাকে অতিরঞ্জন মনে করছেন, তারা পাঞ্জাবের পল্লিবাসীদের নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। শতকরা ২৫টি ঘটনা যদি এমন না হয়, তাহলে বুঝে নেবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি বাড়িয়ে বলছি। শহরের অবস্থা তো আরও খারাপ। বড় বড় জমিদারদের মধ্যে তো এই কথার প্রচলন আছে যে, পরিবারের একজন ছেলের বিয়ে হওয়া মানে ঘরের সব ছেলের বিয়ে হওয়া।[২]

---

২. স্বামীজির এমন কথায় আমিও চমকে গিয়েছিলাম। আমার চমকে যাওয়ার কারণ হলো, তিনি এখানে যে সময়ের অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন, তা আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর পূর্বের সময়কার অবস্থা, ভাবছি তখনও কি আমাদের এই হিন্দুস্তানের এমন করুণ চিত্র ছিল? আজকের এই আধুনিক ভারতে নারীদের অবস্থা যে কতটা শোচনীয়, সে বিষয়ে আমরা কমবেশি সবাই অবগত। তবুও সুহৃদ পাঠকদের কাছে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য আমি এখানে কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি। বিভিন্ন সময়ে দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদনে উঠে আসা সেসব তথ্য যেকোনো বিবেকবান মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে।

এখানে যে বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন, সেই বিষয়ে গত ২০১৫ সালের শেষের দিকে দৈনিক *নয়াদিগন্ত* পত্রিকা একটি প্রতিবেদন ছেপেছে। সেখানে তারা লিখেছে, ভারতজুড়ে ২০১৫ সালে ৩৪ হাজার ৬৫১টি ধর্ষণমামলা দায়ের হয়েছে। ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। তারা জানিয়েছে যে, ধর্ষণের শিকার নারীদের বয়স ৬-৬০ এর মধ্যে। তবে ১৮-৩০ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে এই হার বেশি। ১৭ হাজারই এই বয়সসীমার মধ্যে। তারা আরও জানায়, নথিবদ্ধ ৩৪ হাজার ৬৫১টির মধ্যে ৩৩ হাজার ৯৮টির ক্ষেত্রেই ধর্ষক সেই নারীর পূর্বপরিচিত, আত্মীয় বা কাছের কেউ। শতকরা হিসাবে বিষয়টি দাঁড়ায় ৯৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, প্রতি বছরই ভারতে ধর্ষণের শিকার নারীদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিন্দুস্তান টাইমসের বরাতে দৈনিক *নয়াদিগন্ত* পত্রিকা এরপরের বছরও এই ধরনের আরেকটি খবর ছেপেছে। ২৪/১২/১৬ খ্রি. তারিখের সেই প্রতিবেদনে তারা লিখেছে, এই বছর ২০১৬ তে শুধু দিল্লিতেই ২ হাজার গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, সারা ভারতের অবস্থা যে কতটা খারাপ, তা এই প্রতিবেদন থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

গবেষকদের মতে সারা পৃথিবীতে নারীদের জন্য সবচেয়ে অনিরাপদ দেশ হলো ভারত। জাহেলি যুগের আরবের সঙ্গে আজকের এই আধুনিক ভারতের যে কতটা মিল রয়েছে, তা আমার সুহৃদ পাঠকের কাছে আরও সুস্পষ্ট করার জন্য কিছু তথ্য আমি তুলে ধরছি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, বলুন, নীতি-নৈতিকতাহীন এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করলেও কি মানবতার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে না? স্বয়ং লজ্জা শরমও বোধ হয় লজ্জায় মাথানত করে ফেলে। বিশ্বাস করুন, এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে বারবার আমার কলম কেঁপে উঠছে। দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছে। আহা আমার হিন্দুস্তান! প্রিয় হিন্দুস্তান! তোমার গর্ভে তুমি এ কেমন দুশ্চরিত্র ও পাপিষ্ঠ সন্তানদের জন্ম দিয়েছ?

চৌদ্দশ বছর পূর্বের ইয়াসরিবের[৩] চাঁদ

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে জুলুম-নিপীড়ন ও নিকৃষ্ট কাজের এমনই এক ঘুটঘুটে অন্ধকার ইয়াসরিবের আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। কোথাও কোনো আলো ছিল না। ছিল না কোনো জোনাকি। ইয়াসরিবের দিগন্ত আলোকিত করে হঠাৎ একদিন উদিত হলো এক মায়াবী চাঁদ। যে চাঁদ নিজের অত্যুজ্জ্বল আলো দিয়ে আরব-উপদ্বীপের প্রতিটি বালুকণাকে জ্যোতির্ময় করে দিলো।

গত ৭/৪/২০১২ খ্রি. তারিখে দৈনিক *আমার দেশ* পত্রিকা অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি খবর ছেপেছিল। রিপোর্টারের নাম ছিল ইলিয়াছ হোসেন। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল এ রকম, ভারতে নীরব গণহত্যার শিকার কন্যাশিশুরা। এক দশকে ১ কোটি মেয়ে পরিত্যক্ত, দুই দশকে ২০ লাখকে পিটিয়ে হত্যা।

নিজের এই প্রতিবেদনে তিনি লিখেছেন, ভারতে কন্যাশিশুকে বিবেচনা করা হয় অবাঞ্ছিত শিশু (আনওয়ান্টেড গার্ল) হিসাবে। গত এক দশকে অন্তত ৮০ লাখ কন্যাশিশুর ভ্রূণ (গর্ভের শিশু) হত্যা করা হয়েছে ভারতে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর অন্তত ৫ কোটি কন্যাসন্তানের ভ্রূণ হত্যা করা হয়। গবেষকরা বলেছেন, বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধ, ক্ষুধা, মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যত লোক মারা যায়, তারচেয়ে অনেক বেশি কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয় ভারতে। একে গবেষকরা 'সাইলেন্ট জেনোসাইড' বা নীরব গণহত্যা বলে মন্তব্য করেছেন।

কোনো কন্যাশিশু যদি সৌভাগ্যবশত পৃথিবীর আলো দেখতে পায়, তার জন্য অপেক্ষা করে আরও নির্মমতা, অনেক সময় তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। যদি পিতামাতা সহৃদয়বান হয়ে থাকে তাহলে মেয়েটার অবস্থান হয় রাস্তা কিংবা ডাস্টবিনের পাশে। মা-বাবা তাকে নিজ হাতে হত্যা করে না। এই কারণেই গবেষকরা বলেছেন, কন্যাশিশুর জন্য ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক রাষ্ট্র।

ভারতের টিভিচ্যানেল এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ভারতে এক বছর থেকে পাঁচ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছেলে শিশুদের চেয়ে অন্তত ৭০% কম। ভারতের মধ্যেপ্রদেশ ও রাজস্থানের মতো দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে হরহামেশাই ঘটছে এমন হত্যার ঘটনা।

প্রিয় পাঠক, বলুন, একে আপনি কী বলে অভিহিত করবেন? জাহেলিয়াতের ঘরে ফেরা না অন্য কিছু?-অনুবাদক।

৩. **ইয়াসরিব :** বর্তমান নাম মদিনা মুনাওয়ারা। ইসলাম আগমনের পূর্বে এই শহরটির নাম ছিল ইয়াসরিব (يثرب)।-সম্পাদক

আহা! আমার প্রিয় মাতৃভূমি হিন্দুস্তানও আজ প্রায় সেই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। সেই সময় ব্যাপকভাবে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল, আজকাল তো মূর্তি ও ব্যক্তি, দুটিরই পূজা-অর্চনা হচ্ছে। সেই সময় হিংস্র পশুর ন্যায় একজন মানুষ অন্য মানুষের ওপর আক্রমণ করত। অন্যের রক্তপিপাসায় কাতর থাকত। এখন তো মানুষ নিজের মিষ্টি মিষ্টি কথা, বাহ্যিক মায়া-মহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসার ছুরি দিয়েই অন্যকে জবাই করার চেষ্টা করছে।

সেই সময় কারও অন্যায়-অপরাধ ও দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে বলা হলে পরস্পরের মনোমালিন্য হতো, মান-অভিমান হতো, কখনো বা মারামারি-হানাহানি হতো। আর আজ? আজ তো অন্যের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে মুখ খোলা দূরের কথা, ভালো মানুষদের নেক কাজ, দুনিয়াবিমুখতা, তাকওয়া-পরহেজগারি ও সভ্যতা-ভদ্রতার ওপরই হামলা হচ্ছে। মানুষের সচ্চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে। এখন তো মানুষের ভালো মানুষিটাই তার সবচেয়ে বড় অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেই সময় মূর্তির নাম বিক্রি করে পুরোহিতরা নিজেদের পেট চালাত। আর এখন? এখন তো আল্লাহ-রাসুল, দেবদেবী, দ্বীনধর্ম, দল, মত, রাজনৈতিক পার্টি, সামাজিক সংগঠন, এতিমখানা, মিশনারি বা তাবলিগি কর্মকাণ্ড, মসজিদ-মন্দির ও সভাসমাবেশ প্রভৃতি কতক চতুর লোক নিজেদের কামাই-রোজগারের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে।

আহা! আল্লাহর ইবাদত করার মতো লোক তখনও ছিল না, তাঁর বিশ্বাসের আঙিনায় অবনত হওয়ার মতো মাথা আজও নেই। তাঁকে ভালোবাসার লোক তখনও ছিল না, তাঁর ভালোবাসার গান গাওয়ার লোক এখনো নেই।

বর্তমানকালে হিন্দুস্তানের নীতি-নৈতিকতাহীন অবস্থা জাহেলি যুগের আরব জাতির শিক্ষা-সভ্যতা ও শালীনতাহীন অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণেই সেই মহান সংস্কারকের পবিত্র জীবন নিয়ে আলোচনা করা একান্ত জরুরি। আজ থেকে তেরোশ বছর পূর্বে জাহেলি যুগের আরবে নুর ও ঈমানের যে আলো তিনি ছড়িয়ে দিতে বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছিলেন; তাঁর সেই পবিত্র আলো আজ আমাদের হিন্দুস্তানেরও বড় প্রয়োজন!

এই গ্রন্থে আমি শুধু প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন নিয়েই আলোচনা করব। সম্ভব হলে আগামী দিনে এমন কোনো রচনা লিখব, যেখানে তাঁর সেসব বুদ্ধিদীপ্ত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষা-উপদেশ নিয়ে আলোচনা থাকবে, যার প্রতিটি শব্দই একেকটি প্রোজ্জ্বল মণি-মুক্তা সমতুল্য। যার আলোক-রশ্মি কেয়ামত পর্যন্ত জ্বললেও এতটুকু হ্রাস পাবে না। আজকের

এই সময়ে তাঁর সেই মহামূল্যবান শিক্ষা ও উপদেশগুলোর প্রচার-প্রসার খুব বেশি জরুরি।

আমার ব্যথা বোঝে যারা

আমার মনের দুশ্চিন্তা ও হৃদয়ের ব্যথা যারা বোঝেন, বোঝার চেষ্টা করেন, তারা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন যে, এই যে কিতাবটি আমি লিখেছি, তা আমি কোনো মুসলিম বন্ধুর সন্তুষ্টি কিংবা পার্থিব লোভ-লালসাকে সামনে রেখে যেমন লিখিনি, তেমনই দোজাহানের সর্দার, সৃষ্টিজগতের গৌরব, সকল নবীদের নেতা, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাঁর ওপর আমার মাতাপিতা উৎসর্গ হোক)-এর ন্যায় এমন ক্ষণজন্মা মহামনীষীর উত্তম গুণাবলি বর্ণনা, তাঁর পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা ও তাঁর জীবনের বৈপ্লবিক ঘটনাগুলোর পর্যালোচনা করার দুঃসাহস দেখিয়ে সেসব সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক লোকদের উত্তপ্ত আগুনে তেল ঢালাও উদ্দেশ্য নয়, যাদের হৃদয়ে হিংসা, শত্রুতা, সংকীর্ণ মানসিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার আগুন ইরানের অগ্নিশিখায়[৪] রূপ নিয়েছে।

এমন নিচু কাজে জড়িয়ে পড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের হৃদয়ের আওয়াজকে, হৃদয়ের প্রতিটি শব্দকে আমি এমন বিরল মণি-মুক্তা মনে করি, যা কোনো মূল্যেই আমি বিক্রি করতে প্রস্তুত নই। বন্ধুবান্ধবদের ভালোবাসা ও মায়া-মহব্বত আমার জীবনের এক রাজকীয় অধ্যায়, তা আমি অকপটেই স্বীকার করি। কিন্তু নিজের আদর্শ, নিজের বিশ্বাস ও বোধকে কোনো মানুষের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় না কখনো বিক্রি করেছি, আর না আগামী দিনে কখনো করব।

আমার এক দয়ার্দ্র বন্ধু

এই গ্রন্থ রচনার দৃঢ়সংকল্প করার পর এমন এক মুসলিম বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, যার ধারাবাহিক তাগিদে খুব অল্প সময়েই গ্রন্থটি প্রকাশের মুখ দেখছে এবং এখন সুহৃদ পাঠকের হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে।

১৯২৯ সালের মে মাসের শুরুরদিকের কথা। যখন আমি দুনিয়ার বড় বড় নবী-রাসুলদের জীবনী লেখার সংকল্প করেছিলাম। সেদিনগুলোতেই অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসা-বিষয়ক বহুগ্রন্থ প্রণেতা, খ্যাতিমান চিকিৎসক, গোল্ডমেডেলিস্ট, জনাব হাকিম মৌলভি

---

৪. ইরানের বিখ্যাত অগ্নিশিখা যা হাজার বছর ধরে প্রজ্বলিত ছিল।-সম্পাদক

মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি। কৃষি মন্ত্রী স্যার যোগিন্দর সিং-এর একটি কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন,

> মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে এমন কোনো শক্তি রয়েছে, যিনি এমন এক বেড়ি বা শৃঙ্খল তৈরি করেছেন, যা ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও মতাদর্শের আবদ্ধদেরকেও বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও সম্প্রীতির এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে, আজীবন যা অটুট থাকে। এমনকি তাদের অস্তিত্বও একে অন্যের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে।

সাক্ষাতের পর আমার আর মাওলানা সাহেবের হৃদয়েরও এমন অবস্থা হলো। যতই আমরা একে অন্যের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত হচ্ছিলাম, ততই আমাদের হৃদয়-আত্মা পরস্পরের আরও কাছে চলে আসছিল। দেখাসাক্ষাতের ধারাবাহিকতায় আমাদের সম্পর্ক এই পর্যায়ে পৌঁছল যে, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার বিচ্ছেদের যে যাতনা মানুষের হৃদয়কে পুড়ে পুড়ে কয়লা করে, সেই যাতনা থেকে আমরা যেন সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেলাম। একে অন্যের কাছ থেকে দূরে থাকলেও পরস্পরে ঠিক ততটাই কাছাকাছি থাকতাম, যতটা কাছে এই পৃথিবীতে খুব ভালো দুজন বন্ধু হতে পারে। দূরে থেকেও কাছে থাকার এই অম্লমধুর অনুভূতি আমাদের দুজনেরই হতো।

কোনো এক সাক্ষাতে আমি মাওলানা সাহেবের কাছে নিজের হৃদয়ের গোপন ইচ্ছার কথা জানাতে গিয়ে বললাম, খুব শীঘ্রই আমি পৃথিবীর বড় বড় নবী-রাসুলদের জীবনী লিখতে শুরু করব। আমার দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রে প্রথম আপনাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের ঈর্ষণীয় ঘটনাগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করাই বেশি উপযোগী মনে হচ্ছে। আমার কথা শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানালেন। বিশেষ করে একজন অমুসলিম হয়েও মুসলিমদের নবীর পবিত্র খেদমতে নিজের ভালোবাসা ও বিশ্বাসের হাদিয়া পেশ করব বলে।

স্বাভাবিকভাবেই নিজ ধর্ম সব মানুষের কাছেই প্রিয় হয়ে থাকে। নিজের ধর্ম বা মতাদর্শের কোনো মহান মনীষীর জীবনের বাস্তব ও সত্য ঘটনাবলি নিয়ে নিজ ধর্মেরই কেউ যদি কোনো গ্রন্থ লিখে, তাতে মানুষ যতটা আনন্দিত হয়, তারচেয়েও বেশি খুশি হয় যখন অন্য ধর্মাবলম্বী কেউ এমন কাজ করে। এ কারণেই আমি আমার বন্ধুকে এই মানবিক স্বভাবমুক্ত মনে করছি না। তবে হ্যাঁ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ছাড়াও আমার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসাও এই

আনন্দ প্রকাশের কারণ ছিল। বন্ধুর কোনো সফলতা বা প্রাপ্তিতে অপর বন্ধু যেমন আনন্দ প্রকাশ করে থাকে।

এই ঘটনা ঘটেছে আজ প্রায় চার বছর হতে চলল। সময় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। কত জল গড়িয়ে গেল। নদীতে কত জোয়ারভাটা এলো গেল। অথচ সেই যে চার বছর পূর্বে সিরাতগ্রন্থ লেখার সংকল্প করেছিলাম তখন মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা লিখেছিলাম। আজও সেই কয়েক পৃষ্ঠাই রয়ে গেছে। কারণ, মাঝখানের এই সময়টাতে আমি এমন এমন বিরূপ পরিস্থিতি ও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছি; পৃথিবীর কোনো মানুষ যার থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারে না। এই সংকট ও মুসিবতগুলো আমার জীবনটাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার হৃদয়ে প্রিয় মুহাম্মাদের জীবনী লেখার যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ধিকি ধিকি জ্বলছিল, আমার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিপদাপদের দমকা হাওয়ায় তা হয়তো কবেই নিভে যেত। কিন্তু আমার হৃদয়ের ছোট্ট কুটিরের সেই নিভুনিভু প্রদীপের সামান্য আলোটুকু অবশিষ্ট থাকার কারণ হলো সেই বন্ধুর হৃদ্যতা ও ভালোবাসাপূর্ণ চিঠি। কিছুদিন পরপরই যিনি চিঠি লিখে আমাকে আমার ইচ্ছা ও সংকল্পকে কাজে পরিণত করার তাগিদ দিতেন। প্রিয়জনের তাগাদা না থাকলে হয়তো প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে লেখা এই প্রিয় গ্রন্থটি আজ পাঠকদের হাতে পৌঁছত না।

তার বন্ধুত্বপূর্ণ তাগিদ আর ভালোবাসার তাড়না চরম সংকটময় পরিস্থিতি ও প্রতিকূল অবস্থাতেও সব বাধাবিপত্তি ও সংকট কাটিয়ে উঠে আমাকে গ্রন্থটি রচনায় শক্তি জুগিয়েছে। কয়েক মাস আগের কথা, আমি আমার পূর্ণ ইচ্ছাশক্তিকে ব্যয় করে অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা ও একাগ্রতার সঙ্গে কাজটির পূর্ণতা দানের চেষ্টা শুরু করি। যাতে কিছুটা সফলতাও পেয়েছি। জানি না কতটুকু কী লিখেছি? তবে যা-ই হোক না কেন, তার ফলাফল এখন আপনাদের সামনেই রয়েছে।

আমি এই কথা অকপটে স্বীকার করছি যে, এই গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে আমার এক মুসলিম বন্ধুর এতটুকু হস্তক্ষেপ তো অবশ্যই আছে যে, তিনি আমার দৃঢ়সংকল্পের প্রদীপকে যখন প্রতিকূল আবহাওয়ায় নিভে যেতে দেখেছিলেন, তখন চুপচাপ বসে থেকে তামাশা দেখেননি, বরং অবিরত চেষ্টা করেছেন যেন আমার প্রদীপটি আলোহীন না হয়ে যায়।

বইটির মূল বিষয়বস্তু লেখার ক্ষেত্রে না আমি কারও কাছ থেকে ধার নিয়েছি। আর না কেউ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে, বরং এই বইয়ে আমি যা-কিছুই লিখেছি, নিজের অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও হৃদয়ের বিশ্বাসের আলোকেই

লিখেছি। এ ক্ষেত্রে আমি কারও কথা না শুনে হৃদয়ের কথা শুনেছি। হৃদয়কে জিজ্ঞেস করে লিখেছি। পুরো বিষয়টি হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করেছি। তবে হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের ন্যায় আমিও একজন মানুষ। আমারও হতে পারে ভুলভ্রান্তি আর স্খলন। হতে পারে কোনো ঘটনার ব্যাপারে নিজের রায় ব্যক্ত করতে গিয়ে সত্যতার বিচারে আমি বড় ধরনের কোনো ভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছি। ভবিষ্যতে নতুন কোনো জ্ঞানের আলোকে হয়তো আমার পূর্বের সেই রায় পরিবর্তন করারও প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যাহোক, আপাতত আমি এজন্য আনন্দিত, এই গ্রন্থে আমি যা-কিছুই লিখেছি, নিজের হৃদয়ের বিশ্বাসের আলোকেই লিখেছি। এই ক্ষেত্রে কোনো মানুষের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি আমায় ধোঁকা দিতে পারেনি। তাই আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও যদি কোনো ঘটনার ব্যাপারে আমার রায় পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দেয়; তাহলে সেই পরিবর্তনও আমার হৃদয়ের কথা শুনবে এবং হৃদয়ের আদেশের সামনে মাথানত করে নেবে।

আমার অপরিপূর্ণ চেষ্টা

আজ আমি আপনাদের হাতে যে বইটি তুলে দিচ্ছি, তা ইতিহাস ও সাহিত্যের সুতোয় নতুন কোনো চিত্তাকর্ষক সংযোজন নয়। আশা করি সুহৃদ পাঠকরা আমার এই কথাকে বিনয় কিংবা শিষ্টতা মনে করবেন না। আসলেই বিষয়টি এমন। বলতে লজ্জা কী? কল্পনার আল্পনায় হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রিয় মুহাম্মাদের জীবনের যে চিত্তাকর্ষক চিত্র আমি এঁকেছি, কাগজের পাতায় কলমের কালি দিয়ে তা ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। একদিকে সময়ের স্বল্পতা, অন্যদিকে জ্ঞানের দীনতা, এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা, সব মিলিয়েই বলা যায় গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

অত্যন্ত লজ্জার অনুভূতি নিয়েই আমি এই বাস্তবতা স্বীকার করছি যে, বিদ্যমান আকৃতিতে এই বইটি না সাহিত্যের বাগানের মনোহারী কোনো ফুল হয়েছে, আর না ইতিহাসের কোনো অনবদ্য সংকলন। তাই আমি আমার সামান্য কিতাবকে জ্ঞানবিজ্ঞান বা সাহিত্যের কোনো রত্নভান্ডার দাবি করে আজকের এই শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক পৃথিবীর সামনে পেশ করার দুঃসাহস দেখাতে পারব না। বরং নিজের ভুলত্রুটি, অক্ষমতা ও মানসিক পেরেশানির কথা স্বীকার করেই সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি প্রিয় মুহাম্মাদের পবিত্র কদমে আমি আমার ভালোবাসার হৃদয়বিদারক গল্পের কিছু 'ছেঁড়াপাতা' উপহারস্বরূপ পেশ

করলাম। যার ভালোবাসার অনলে আশেক হৃদয়গুলো পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়।

সঙ্গে সঙ্গে এই আশাও করছি যে, দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা ও আমার সাহিত্যিক ভাইয়েরা এই গ্রন্থের ভুলত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ, এর বাক্যগত ভুল ও সাহিত্যের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে লেখক নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

সাহিত্যের দিকগুলো বাদ দিয়ে মূল বিষয়বস্তু ও রাসুলের শানে যদি আমার কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, তাহলে আমি সেই ব্যক্তিকে আমার পরমবন্ধু মনে করব, যিনি চিঠির মাধ্যমে আমাকে সেই ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে অবগত করবেন।

তবে হ্যাঁ, অযথা যারা দোষ বের করার চেষ্টা করবেন, সমালোচনার তির নিক্ষেপের চেষ্টা করবেন, তাদেরকে আমি আমার প্রভুর হাতে সোপর্দ করলাম।

—স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ

প্রথম পর্ব

পৃথিবীর আকাশে অজ্ঞতার কালো মেঘের ঘনঘটা

পৃথিবীর পথহারা মানুষকে পথের দিশা দিয়ে, কুফর ও মিথ্যার অমানিশায় আচ্ছন্ন মানবতাকে মহাসত্যের আলো দেখিয়ে যেদিন ঈসা আ. উর্ধ্বলোকে গমন করেন, তারও অনেক পরের কথা। সূর্যের চারপাশে পৃথিবী তখন ৫৭১তম চক্কর দিচ্ছিল। পুরো পৃথিবীর সভ্যতা-ভব্যতা যেদিন মাটিচাপা পড়েছিল, নীতি-নৈতিকতার সমস্ত আইনকানুন যখন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল, ভালোবাসার শক্তিতে নয়, ক্ষমতা আর পেশিশক্তিতেই যখন মানুষ বিশ্বাসী ছিল। ন্যায়-ইনসাফ নয়, অত্যাচার আর উৎপীড়ন যখন ক্ষমতায়, যে হৃদয়ে নুরে ইলাহির বসত হওয়ার কথা ছিল, তা ছিল গোমরাহি আর অজ্ঞতার আস্তানা। আল্লাহকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি অবাধ্য বান্দারা একে একে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছিল। আমি সেই সময়ের কথা বলছি, সেই কালো দিনগুলোর কথা বলছি, যখন এই পৃথিবী ঘোর আঁধারে ছেয়ে গিয়েছিল।

সেদিন এমন কোনো মাথা ছিল না, যে মাথা প্রভু মহীয়ানের ক্ষমতা ও প্রভাবের আঙিনায়, দয়া ও দানের দরজায় নত হবে। এমন একজন লোকও সেদিন ছিল না, যে তার প্রভুকে প্রভু বলে স্বীকার করবে। যে কপাল শুধু এবং শুধুই আল্লাহর দরবারে নত হওয়ার ছিল, কত-না জালিমের দরগাহে তা অপমান আর অপদস্থতার সেজদায় পড়েছিল।

হিন্দুস্তান, এ তো সেই হিন্দুস্তান, যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বজাধারী হওয়ার দাবিদার ছিল। কত মুনিঋষির জননী হওয়ার গৌরব যার ছিল। তার উত্তর হতে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, পুরোটা এক মূর্তিশালায় পরিণত হয়েছিল। তার মূর্খ বাসিন্দারা পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-তরু, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বকরি-গাভি, নদ-নদী, সাপ-বিচ্ছু, এমন নাম না জানা কত-না কিছুকে নিজেদের উপাস্য ভেবে মিথ্যা পূজার লানতে ডুবে ছিল।

শ্রীকৃষ্ণের তপজপকারী আর ধ্বজাধারীরা সেদিন দুনিয়া অন্বেষণের গোলকধাঁধায় পড়ে মৌলিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

বাবেল তো সেই শহর, যেখানে একদা এক স্বতন্ত্র সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সেটাও তারকা আর নক্ষত্রপূজার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়! তার সেই মহান সভ্যতা-সংস্কৃতি মনগড়া কাল্পনিক ধ্যানধারণার চোরাবালিতে হারিয়ে গিয়েছিল। রোম এবং গ্রিকের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তিও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যা-কিছু সুন্দর ও স্নিগ্ধ ছিল, অসুন্দর এবং অশুভের আঁধারে তা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বিশাল রোম সাম্রাজ্যের শিক্ষা ও সভ্যতার সব আইনকানুন ক্ষমতা ও আধিপত্যের নেশায় মাতাল গথ[৫] ও গল[৬]-এর ন্যায় নিকৃষ্ট জাতিদের দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পুরো ইউরোপে ধ্বংস ও তাণ্ডবের এক ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল। জালেম ও দাম্ভিক শাসকদের এক ভ্রুকুঞ্চনেই যখন হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ মানুষের দেহ থেকে মাথা আলাদা হয়ে যেত।

বেহায়াপনা ও আত্মপূজার নির্লজ্জ প্রদর্শনী দেখে স্বয়ং লজ্জাও বোধহয় কোনো অতল সমুদ্রে গিয়ে ডুবে মরত। অত্যাচারী শাসকরা তাদের প্রজাদেরকে জুলুম-নিপীড়নের শৃঙ্খলে বন্দি করে রেখেছিল। তাদের ধারালো তরবারি প্রজাদের রক্তচোষার জন্য সারাক্ষণ কোষমুক্ত থাকত। কারও এমন দুঃসাহস ছিল না যে, গোলামির এই অভিশপ্ত শৃঙ্খলকে গলা থেকে খুলে ঘৃণাভরে নিক্ষেপ করবে এবং রাজাদের অবর্ণনীয় অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলবে। তা ছাড়া তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া

---

৫. **গথ** : গথরা ইউরোপের একটি নৃগোষ্ঠী। জর্দানেস নামে ষষ্ঠ শতকে একজন গথিক ঐতিহাসিক ছিলেন। তার মতে, গথরা সুইডেন থেকে বের হয়ে বাল্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে ভিসতুলা নদীর উপত্যকা অবধি পৌঁছেছিল। ৩য় শতকে তারা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে দানিয়ুব নদীর পাড় অবধি পৌঁছায়। কৃষ্ণসাগরের আশপাশেও চলে যায় তারা। ওই শতকেই গথ সৈন্যরা পূর্ব গ্রিসের থ্রাস ও দাসিয়া অঞ্চল তছনছ করে। তারা এজিয়ান সমুদ্রের পাড়ের এশিয়া মাইনরের অনেক নগরও ধ্বংস করে। ২৬৭ থকে ২৬৮ এথেন্স আক্রমণ করে নগরটি ধ্বংস করে। তারপর তারা ইতালির দিকে চোখ দেয়। প্রায় এক শতক ধরে রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ চলে। বলকান অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরের উত্তরপূর্ব অঞ্চল রক্তে সয়লাব হয়ে যায়। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অন্যান্য গোত্রগুলি গথদের সাহায্য করে। ৪র্থ শতকে গথদের রাজা ছিল আরমানারিক। তার রাজ্যটি বালটিক থেকে কৃষ্ণসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল।
৩৭০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ গথরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১. অসট্রোগথ। ২. ভিসিগথ।-সম্পাদক

৬. **গল** : গল প্রাচীনকালে পশ্চিম ইউরোপে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলকে বোঝায়। যেটি পূর্বে রাইন নদী ও আল্পস পর্বতমালা, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও পিরেনিজ পর্বতমালা এবং পশ্চিমে ও উত্তরে আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে বেষ্টিত ছিল। বর্তমানকালে এর বেশির ভাগ অংশ নিয়ে ফ্রান্স রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে।-সম্পাদক

দীর্ঘদিনের এই গোলামি সইতে সইতে বলা যায়, তাদের চিন্তা-চেতনাও গোলামে পরিণত হয়েছিল। এমন লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার জীবনকেই তারা তাদের ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছিল। হৃদয়ের গহিনে দীর্ঘশ্বাস ও সীমাহীন আক্ষেপ নিয়ে এভাবেই কেটে যেত তাদের অপদস্থের জীবন। কারও হৃদয়ে যদি কখনো আজাদির চেতনা জেগেও উঠত, তাহলে শাসকদের শক্ত থাবা গলা টিপে ধরে তাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিতে সদা প্রস্তুত থাকত।

শয়তানের দোসরদের কারগুজারি

সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের দাবিদারদের অবস্থাই যখন এতটা লজ্জাজনক ছিল। তখন অপরাপর অসভ্য ও বর্বর জাতিগুলোর অবস্থা যে কতটা করুণ ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

সুবিশাল এই পৃথিবীর বুকে মানুষ রাজাধিরাজ সেই মহান প্রতাপশালী আল্লাহর আইনেরই বিরোধিতা শুরু করল এবং তাঁর রাজত্বে তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করল। দয়াময় প্রভুর ভালোবাসার আঙিনাকে ছেড়ে শয়তানের আস্তানাকেই নিজেদের উপাসনালয় বানিয়ে নিয়েছিল। ক্ষমতাবানরা তাদের দয়া ও সহমর্মিতার হাত প্রজাদের মাথার ওপর থেকে উঠিয়ে নিয়েছিল। আইনকানুন? সেতো ধনী ও প্রভাবশালীদের পৈতৃক সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। জুলুম ও স্বৈরতন্ত্রের সামনে ইনসাফ ও নীতি-নৈতিকতার পাহাড় ধসে পড়েছিল। সমাজ ও দেশের নেতৃবৃন্দ যখন যেভাবে চাইত, আইনের খাতাটা ওলটপালট করে নিত। সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের অপরাধ, তা যত বড়ই হোক না কেন, যেন কিছুই নয়। কিন্তু বেচারা গরিব-অসহায়দের অবস্থা ছিল বড় সঙ্গিন। সামান্য থেকে সামান্যতর অপরাধেই তাদের ওপর নেমে আসত কঠিন শাস্তি। কখনো লেলিয়ে দেওয়া হতো কোনো ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুকে, কখনো-বা পশু থেকেও হিংস্র কোনো মানুষকে। আসমানের নিচে জমিনের ওপরে মানুষের সামনেই মানবতাকে ছিঁড়ে-ফেড়ে খেত পশুত্ব। প্রজাদের ভালো-খারাপের চারিত্রিক সনদ কর্তাদের হাতে ছিল। অধিকাংশ সময় এমন হতো যে, কোনো গোলাম, অধীনস্থ বা গরিব যুবকের নববধূর বিয়ের প্রথম রাতের ফুলশয্যা তার মনিব, সর্দার বা নেতার বিছানায় হতো। অন্যদিকে সেই বিবাহিত অসহায় যুবক? তার যৌবনের সব স্বাদ-আহলাদ তো কর্তাদের ধ্বংসাত্মক লালসা জোঁক হয়ে চুষে নিয়েছে।

নারী ও দাসদের অপমান

সেই সময় মানুষের ভেতরে লুকিয়ে থাকা পশুত্ব পূর্ণ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গোলাম-অধীনস্থদের সঙ্গে চতুষ্পদ জন্তুর মতো আচরণ করা হতো। মহিলাদের মনে করা হতো কামুক পুরুষসম্প্রদায়ের লালসা ও আনন্দ-ফুর্তির পণ্য। যেন তাদের জন্মই হয়েছে পুরুষের কামনা মেটাতে। মানবের এই দুনিয়ায় মানবসৃষ্টির এমন পবিত্র ও মহোত্তম মাধ্যমের এরচেয়ে বেশি মূল্য ছিল না। এই দুনিয়ার বাঁকা চোখে তারা যতসব ষড়যন্ত্র ও সমস্যার কারণ হিসাবে চিহ্নিত ছিল। ভালো কিছু করার যোগ্যতাই যেন নারীর মধ্যে নেই।

অজ্ঞতার প্রাণকেন্দ্র

একদিকে যেমন পুরো পৃথিবী থেকে মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার নামনিশানা মিটে গিয়েছিল, অন্যদিকে পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে গোমরাহি, বেহায়াপনা, মূর্খতা, অশ্লীলতা, জুলুম-নিপীড়ন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত আরবভূমি এসব অসভ্যতা, অশ্লীলতা, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও শয়তানের প্রতি পূর্ণ আস্থা, কুফর ও জুলুম-নিপীড়নের প্রাণকেন্দ্রে রূপ নিয়েছিল। যেখানে পুরোদমে শয়তান তার রাজত্ব কায়েম করেছিল। বলা যায়, পৃথিবীর অপরাপর মূর্খ ও নিকৃষ্ট জনগোষ্ঠীগুলো আরবের এই অসভ্য ও বর্বর জাতির হাতে বাইয়াত হয়েছিল।

মায়াবীনীর নৃত্যে পাগল

সেখানকার পশুতুল্য বাসিন্দারা বিবেক-বোধ ও আখলাক-চরিত্রের সব নীতিকেই মদের উপচানো রঙিন পেয়ালায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। লজ্জাশরম? তা তো কবেই সাগরের ঢেউয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। এখানকার মরুপ্রান্তরের প্রতিটি স্থানেই কুফর-শিরক আর নাফরমানির ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবহমান ছিল। যেন এখানকার আকাশে কখনো সভ্যতার আলো ছড়ায়নি। আকাশজুড়ে শুধু এবং শুধুই অজ্ঞতা আর গোমরাহির কালো মেঘ ছেয়ে ছিল। গোমরাহির কালো আঁধারে ছাওয়া এখানকার আঁকাবাঁকা পথগুলোতে যেন কেউ কখনো হেদায়েতের আলো বিলায়নি। এখানকার বিজন রাতের ভয়াল নিরালায় কেউ কখনো আশার আলো নিয়ে এগিয়ে আসেনি। দূর দিগন্তের ওই সীমারেখায় ছড়িয়ে পড়েছিল শুধু কালো আর কালো, আঁধার আর আঁধার।

আত্মপূজার নির্লজ্জ প্রদর্শনী

খোলামেলা সৌন্দর্য আর নির্লজ্জ প্রেম; কীই-বা বাকি ছিল? আত্মপূজা যেন তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। জিনা-ব্যভিচার আর ধর্ষণ করে অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, উলটো গর্ব আর অহংকার করত। ভরা মজলিশে সবার সামনেই নিজের পুরুষত্বের দাবি করত। শত শত নারীকে বিয়ে করা এবং নিরপরাধ কোনো নারীর বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করে তার জীবনটাকে অভিশপ্ত করে তোলা যেন কিছুই নয়।

অশ্লীল কবিতার আসর

কবি আর কাব্য তো তাদের মন-মস্তিষ্কে জেঁকে বসেছিল। উচ্ছ্বাস আর উচ্ছৃলতায় টইটম্বুর স্বভাব ছিল তাদের। প্রকাশ্যে সৌন্দর্য প্রদর্শনী, মদ্যপান, ধর্ষণ আর ব্যভিচার, কী বাদ ছিল? নিজের ভেতরের সুপ্ত কামনাকে জাগিয়ে তোলার সব আয়োজনই তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল। কাব্য তো যেন আকাশের চন্দ্র-সূর্যের স্থান দখল করে বসেছিল। সেই সময় কবিতা আবৃত্তি করতে পারাই ব্যক্তির যোগ্যতার বড় প্রমাণ ছিল। সুন্দরী রমণীদের নামে কবিতা রচনা করে তা জনসম্মুখে গাওয়া হতো। নারীর রূপ-যৌবনের বর্ণনা এবং যৌন সুড়সুড়িমূলক সেসব কবিতা আবৃত্তি করে নির্লজ্জ কবিরা যেমন 'বাহ বাহ' কুড়াত, তেমনই যুবসমাজেরও চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটত।

সতীত্ব বিকিয়ে অর্থোপার্জন

সুন্দরী দাসীদের নাচ আর ছলনা শিখিয়ে আবেদনময়ী করে তোলা হতো। অতঃপর তাদেরকে বাজারের বিভিন্ন অলিগলি আর নিষিদ্ধ পল্লিতে বসিয়ে দিয়ে তাদের সতীত্ব বিকিয়ে অর্থোপার্জন করা হতো। আর সেই অর্থ নির্লজ্জ মনিবের ভোগবিলাস ও বিনোদনের কাজে ব্যয় হতো।

বেহায়াপনার বিবস্ত্র প্রদর্শনী

কল্পকাহিনিপ্রিয় এই মানুষগুলো সেসব আসর-অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী ছিল, যেখানে উপস্থিত হয়ে তারা প্রাণ খুলে নিজেদের হৃদয়ের সব কথা প্রকাশ করতে পারত। ধুমধাম করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানগুলোতে একদিকে যেমন নিজের বাহাদুরি ও কাব্য প্রতিভা প্রকাশ করা হতো, অন্যদিকে বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার এমন দৃশ্যও সেখানে উপস্থিত জনতা প্রত্যক্ষ

করত, যা কল্পনা করলেও প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। বুকটা ব্যথায় মুচড়ে ওঠে। আত্মমর্যাদার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায়।

অহংকারের জবাইখানায় নিষ্পাপ কন্যাশিশু

নিজেদের বাহাদুরি আর আভিজাত্যের ওপর তাদের এতটাই গর্ব ছিল যে, তাদের অহংকারী স্বভাব অন্য কোনো মানুষের সামনে অত্যাবশ্যকীয় কোনো প্রয়োজনে নত হওয়াকেও চরম অপমানজনক বলে মনে করত। সম্মান ও আভিজাত্যের এই ভুল ধ্যানধারণা তাদের হৃদয়ে এতটাই বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল যে, সেই নারীই তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ হয়ে পড়ল, যার যৌবনকে তারা নিজেদের কামনা-বাসনা চরিতার্থের মাধ্যম বানিয়েছিল। যে কোমলপ্রাণ বালিকার নূপুরের রুনুঝুনু আওয়াজে তাদের হৃদয় উদ্‌বেলিত হয়ে উঠত, তার একেকটি হৃদয়গ্রাহী হাসিও যেন তাদের বুকে শত্রুর ছোড়া বিষাক্ত তির মনে হতো।

অজ্ঞতা ও জাহালত তাদের হৃদয়ে বীরত্ব ও সাহসিকতার যে ভুল ও অবাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিল, তার কারণে সদ্য জন্ম নেওয়া নিষ্পাপ কন্যাশিশুটিকে গলা টিপে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করত না। পাঁচ-সাত বছরের ফুলের মত মেয়েটাকে খেলার ছুতোয় নতুন জামা পরিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে মরুভূমির কোনো অচেনা গর্তে তাকে পাথরচাপা দিয়ে জীবন্ত পুঁতে ফেলা তো তাদের জুলুম-নিপীড়ন ও বর্বরতার সামান্য চিত্র। এ আর তেমন কী? বুক চিতিয়ে গর্বভরে সমাজের কাছ থেকে তো এই বলে সুনাম কুড়ানো যাবে যে, 'আমার ঘরে মেয়ে সন্তান নেই।'[৭]

---

৭. আরবের সব গোত্র ব্যাপকভাবে কন্যাশিশুদের হত্যা করত না। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি গোত্র এগিয়ে ছিল। যেমন : রাবিয়া, কিন্দা ও তামিম গোত্র। (*বুলুগুল আরব ফি মারিফাতি আহওয়ালিল আরব*, ৩/৪২) আবার অনেক গোত্রে অভিজাত নারীরা অনেক স্বাধীনতা ভোগ করতেন। পুরুষদের ওপর অনেক ক্ষেত্রে তাদের কর্তৃত্ব ছিল। তারা পুরুষদেরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করতেন আবার শান্তিতে একত্রিত করতেন। (*আর রাহিকুল মাখতুম*, ৪৩, ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশশুউনিল ইসলামিয়্যা, কাতার) সে যুগেও এমন কিছু ভালো লোক ছিল যারা কোনো কন্যাশিশুকে হত্যা চেষ্টার খবর পেলে বাবার কাছে গিয়ে শিশুটিকে ক্রয় করে নিয়ে মুক্ত করে দিতেন। যেমন প্রখ্যাত আরব কবি ফারাযদাকের পিতামহ সা'সাআ ইবনে নাজিয়া আল মুজাশিই রা. জাহেলি যুগে প্রায় ৩৬০ জন কন্যাশিশুকে হত্যা করা থেকে উদ্ধার করেন। প্রতিটি শিশুর জন্য তাকে ২টি করে উট দিতে হয়। এমন আরেকজন ছিলেন যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল। (*সীরাত বিশ্বকোষ*, ৪/৭৩-৭৪, ই.ফা.বা.)-সম্পাদক

ডাকাতির ভয়াবহ চিত্র

পথচলা কোনো একাকী মুসাফিরের কাপড় খুলে নিয়ে তাকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা ছিল তাদের জন্য ছেলেখেলা। নিরস্ত্র মানুষকে রক্ত আর ধুলোবালিতে একাকার করে তার রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করা ছিল তাদের অত্যন্ত প্রিয় কাজ। নিরপরাধ মানুষের রক্তাক্ত লাশের ওপর দাঁড়িয়ে পৈশাচিক উল্লাস করে তারা চরম সুখ অনুভব করত। কোনো অসহায়ের 'আহ' ধ্বনি কিংবা কোনো মজলুমের করুণ চাহনি কী তাদের হৃদয়কে বিগলিত করত না! কী করে তা হবে? তারা তো ছিল অত্যাচারী নেকড়ে, মানুষখেকো হিংস্র পশু। যে হৃদয়ে হেমন্ত আঘাত হেনেছে, সে হৃদয়ে কী করে ভালোবাসার ফুল ফুটবে?

রক্তের স্রোত

যুদ্ধবিগ্রহ আর দাঙ্গাহাঙ্গামা তো ছিল তাদের দৈনন্দিনের রুটিন। সামান্য থেকে সামান্যতর বিষয়েও তরবারি কোষমুক্ত হতো। মরুভূমির শুকনো বালুপ্রান্তরে বয়ে যেত রক্তের স্রোত। এই দাঙ্গাহাঙ্গামা শুধু গুটিকয়েক মানুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত না; বরং কোথাও যদি প্রতিশোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হতো, তাহলে বসতির পর বসতি ভস্ম হয়ে যেত। ক্ষেতের ফসলের ন্যায় মানুষ কেটে পাড়াগাঁ বিরান করে ফেলা হতো। চাঁদ আর পৃথিবী তাদের আপন আপন কক্ষপথে অবিরাম পরিভ্রমণ করে যেত। কিন্তু আরবদের এই গোত্রীয় লড়াইয়ের কোনো বিরাম ছিল না। আরব ইতিহাসের পরতে পরতে এমন অনেক দীর্ঘ যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা পুরুষানুক্রমে বহাল থাকত। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রায়শ এমন হতো যে, যোদ্ধারা জানত না ঠিক কী কারণে তাদের পূর্বপুরুষরা এই শত্রুতা সৃষ্টি করেছিল? কেন এই রক্ত খেলায় মেতে উঠেছিল? কারণ অজানা থাকলেও তাদের এটা খুব ভালোভাবেই জানা ছিল যে, বংশের মর্যাদা রক্ষায় অবশ্যই এই যুদ্ধ করতে হবে। এই লড়াই জিততে হবে। অস্তিত্ব রক্ষার এই লড়াইয়ে যেন কে অপরাধী তা মুখ্য নয়, বিজয় ছিনিয়ে আনাই মুখ্য।

সুদি কারবার

পৃথিবীজুড়ে চলছিল অভিশপ্ত সুদি কারবারের রমরমা ব্যবসা। এটাকে মানুষ অত্যন্ত সম্মানের কারবার মনে করত। অসহায় দুস্থ মানুষদের গলায় ছুরি চালিয়ে মহাজনরা দিন দিন আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছিল। বহমান এই

সময়ে[৮] আমাদের হিন্দুস্তানে প্রচলিত 'জমিদারিপ্রথা' জাহেলিয়াতের সেই কালো অধ্যায়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

জুয়া

জুয়াখেলা ছিল সমাজের আমির, ওমারা ও উচ্চবিত্ত মানুষদের সময় কাটানোর এক অতিউত্তম মাধ্যম। সমাজের যেখানে-সেখানে জুয়াখানা তৈরি করা হতো। সেখানে ধনবানরা নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে এসে কখনো বড় জায়গির নিয়ে ফিরে যেত, আবার কখনো ফিরত নিঃস্ব হয়ে।

মূর্তিপূজা

এককথায় তারা শয়তানের পূজা করত। তাদের নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম ছিল না। রাতদিন ঈমান বিক্রি করাই ছিল তাদের অভ্যাস। মূর্তিপূজা ছিল তাদের দ্বীন-ঈমান। প্রত্যেক গোত্র এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একটা মূর্তি থাকত, যাকে সে বা তারা প্রভু ভেবে পূজা করত। নিজেদের সব চাওয়া তার কাছেই চাইত এবং সেই মূক আর বধির মূর্তির মাঝেই নিজেদের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ খুঁজত। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের একটি আশ্চর্যকর দিক ছিল, কোনো একটা মূর্তির পূজা করতে করতে যখন কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে যেত, তখন তারা তাকে 'পুরোনো' ভেবে নতুন কোনো উপাস্যের খোঁজ করত এবং দ্বিতীয় কোনো সুন্দর মূর্তির সন্ধান পেলে পুরোনোটাকে ঘর থেকে বের করে দিত। পুরো আরবদ্বীপের প্রতিটি ঘরই ছিল একেকটি মূর্তিশালা। এতসব মূর্তির মাঝে হোবল, আবআব, উযযা, আসাফ, নায়েলা, লাত ও মানাত নামক মূর্তিগুলোকে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর উপাস্য মনে করা হতো। এই মূর্তিগুলোর পূজাকেই তারা নিজেদের ধর্ম এবং সফলতার উপায় মনে করত। ক্ষমতার এসব মূর্তি ছাড়াও আরও অনেক অনেক প্রসিদ্ধ মূর্তি ছিল যেগুলোর সামনে আরবদের মাথা অবনত থাকত।

এই মূর্তিগুলোর ইবাদতের পদ্ধতিও ছিল খুবই লজ্জাজনক। তাদের বিশ্বাস ছিল, গুনাহ ও পাপাচারের কারণে মানুষের পোশাক অপবিত্র হয়ে যায়। তাই তারা যখন কোনো মূর্তিশালায় যেত, নিজেদের বস্ত্র খুলে প্রবেশ করত। বিবস্ত্র

---

৮. ১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে ভারত ও তৎকালীন পাকিস্তান থেকে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়। যা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ১৯৪৮ সালের ১০ এপ্রিলে শুরু হয়। আর বক্ষ্যমাণ বইটি দেশ বিভাগের পূর্বে রচিত। (বাংলা পিডিয়া, পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০, ভূমি সংস্কার বোর্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)।-সম্পাদক

অবস্থার এই উপাসনা প্রায় পুরো আরবেই প্রচলিত ছিল। যদি কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ বা উপাসনা করতে না চাইত, তবে সে নিজের পোশাক খুলে মন্দিরের সেবকদের পোশাক পরে নিত। কারণ, মন্দিরের সেবকরা মানুষকে বোকা বানাতে নিজেদের এবং নিজেদের পোশাককে পূতপবিত্র ঘোষণা দিয়েছিল। ফলে মানুষের মনে তাদের প্রতি বিশেষ এক শ্রদ্ধা যেমন তৈরি হতো, তেমনই ধনবানদের কাছে তাওয়াফের জন্য পোশাক ভাড়া দিয়েও তারা কাড়ি কাড়ি টাকা উপার্জন করতে পারত।

তাওহিদের ভিতে গড়ে ওঠা কাবা হয়ে গেল মূর্তিশালা

নাফরমানি, গোমরাহি আর কুফর-শিরকের কালো ছায়ায় আচ্ছাদিত আরব জনগণ মহান আল্লাহর দেওয়া অঙ্গীকারকে ভুলে তাঁর ঘরকেই মূর্তির ঘর বানিয়ে ফেলেছিল। আফসোস! কাবা প্রাঙ্গণে গিয়ে যে কপালগুলো একমাত্র মহান আল্লাহর সামনেই সেজদাবনত হওয়ার কথা ছিল, সেই কপালগুলোই নির্জীব, নিস্পৃহ কিছু মূর্তির সামনে অবনত হয়ে সৃষ্টির সেরা মানুষকে সর্বনিকৃষ্ট জীবে পরিণত করেছিল। মূর্তির পদতলে লুটিয়ে পড়ার মতো ভ্রান্তিকর্মে তাদের চিত্ত ব্যাকুল ছিল। ইবরাহিম খলিলুল্লাহ ও ইসমাইল জবিহুল্লাহর প্রাণ কী তখন ছটফট করত না! হে প্রভু, সেই সৌভাগ্যবান পিতা-পুত্রের কাছ থেকে তুমি তোমার যে ঘরের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকার নিয়েছিলে, আজ সে ঘরে ৩৬০টি মূর্তি! কেউ কী তখন শুনেছে সেই পিতা-পুত্রের হাহাকার! প্রভু, তুমিও তো ছিলে তখন নির্বিকার। তাওহিদের ভিতে গড়ে ওঠা তোমার সেই কাবা আজ মূর্তিশালা হয়ে গেল! হায় মানুষ! হায় আরব!

মানবতার পুনর্জন্ম

গোমরাহির ভয়ংকর আঁধারে ছেয়ে যাওয়া বিশ্বব্যাপী কোথাও যখন কোনো সভ্যতার আলো ছিল না, শালীনতা আর ভদ্রতা ছিল নিশ্চিহ্ন, মানুষের প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য এবং সততার প্রদীপ যখন কুফরের দমকা হাওয়ায় নিভে গিয়েছিল, বর্বরতা ও অসভ্যতার কালো নাগিন যখন মানবতার ঘাড়ে ফণা তুলে রেখেছিল, মানবদিল যখন প্রভু মহীয়ানের মাহাত্ম্য ভুলে নিথর নিস্পৃহ দেবদেবীর দাসত্বের শৃঙ্খল নিজের গলায় পরে নিয়েছিল; তখন হঠাৎ একদিন মানবতার পুনর্জন্ম হলো। আঁধারে ছেয়ে যাওয়া পৃথিবীতে যেন আলোর বন্যা বয়ে গেল। শুভ ও সুন্দরের আগমনে অশুভ এবং অসুন্দর যেন অচেনা কোনো চোরাবালিতে হারিয়ে গেল।

ফারানের চূড়ায় নুরের চমক

এশিয়া উপমহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'আরব উপদ্বীপ'[১] নামে বিশাল একটি দ্বীপ অবস্থিত। যার উত্তরে শামের মরুসাহারা, বাইতুল মুকাদ্দাস, মৃত সাগর ও আকাবাহ, দক্ষিণে রয়েছে আদন (অ্যাডেন) উপসাগর ও হাজরামাউত (ইয়ামেন) উপত্যকা, পূর্বে আরব সাগর, পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর, আর পশ্চিমে লোহিতসাগর।

অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার কেন্দ্র এই আরব-উপদ্বীপের ফারান পর্বতের চূড়ায় একবার এক নুরের ঝলক দেখা দিলো। যে নুর পুরো পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন করে দিলো। প্রতিটি অমানিশাকে পূর্ণিমার আলোয় উজ্জ্বল করে তুলল। প্রতিটি বিন্দুকে সৌন্দর্যের আলোয় প্রোজ্জ্বল সূর্যের রূপ দিলো। আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে এই পথভ্রষ্ট ভূমির এক প্রসিদ্ধ শহর মক্কার অলিগলিতে এমন এক বিপ্লবের বজ্রধ্বনি শোনো গেল, যা কুফর, শিরক আর অন্যায়ের বসতঘরে মহাআতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই মাটি থেকেই এমন এক ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়েছিল, যা হৃদয় পাঁজরের মৃত ক্ষেতগুলোকে সবুজ-সতেজ করে তুলেছিল। এই মরূদ্যানে এমন এক আধ্যাত্মিক ফুল ফুটেছিল, যার মন মাতানো সুবাস অবিশ্বাসে অবিশ্বাসে পোড়া মস্তিষ্কের দুর্গন্ধে অবরুদ্ধ মানবাত্মাকে সুরভিত করে তুলেছিল।

এই পাতাপল্লবহীন মরুভূমির অন্ধকার দিগন্তে অজ্ঞতা ও গোমরাহির কালোরাতে সত্যের এমন দীপ্তমান চাঁদ উদিত হয়েছিল, যা মিথ্যার সব আঁধার দূরীভূত করে প্রতিটি ইঞ্চি ইঞ্চি ভূমিকে নিজের ঈমানের আলোয় শত শত অত্যুজ্জ্বল বাতির ন্যায় আলোকিত করে দিয়েছে। পৃথিবীর মৃতদেহে যেন প্রাণসঞ্চার হলো। দুর্ভাগ্যের হেমন্ত শেষে আবারও যেন সৌভাগ্যের বসন্ত শুরু হলো। পুনরায় মিথ্যার রাজ্যে সত্যের শাসন কায়েম হলো। শয়তানের আস্তানা রূপ নিলো রহমানের আঙিনায়। হক-বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বে আবারও সত্যের বিজয় হলো। আবারও বাতিলের ললাটে পরাজয়ের কালিমা লেপন হলো।

মুসলিমদের আকিদা হলো; যখন এই পৃথিবীর নামনিশানাও ছিল না, লওহ-কলম ও আরশ-কুরসিও অস্তিত্বে আসেনি তখনও সর্বশেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী,

---

১. **আরব উপদ্বীপ** : আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আরব উপদ্বীপ সাতটি রাষ্ট্রে বিভক্ত—সৌদি আরব, ইয়ামেন, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন।-সম্পাদক

রহমাতুল লিল আলামিন, সৃষ্টিকুলের সর্দার ও গৌরব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুহের নুর মুবারক বিদ্যমান ছিল।[১০] যা মানব সৃষ্টির শুরুলগ্নে প্রথম মানব আদম আ.-এর মাঝে দ্যুতি ছড়িয়েছে। অতঃপর শিস, ইদরিস, নুহ ও ইবরাহিম আ.-সহ অন্যান্য নবীদের পরম্পরায় এসে আবদুল্লাহর (নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাবা) কপালে এক প্রোজ্জ্বল তারকার ন্যায় ঝলমল করেছিল। তার কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সেই নুর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত মাতা আমেনার মাঝে এসে শেষ নবীর আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে স্বীয় প্রভায় আলো ঝলমল করে তুলেছে।

যে আসমানি নুরের কারণে পুরো সৃষ্টিজগৎকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যখনই তা সেই মহাসৌভাগ্যবান ব্যক্তির ঔরসে স্থানান্তরিত হলো, তাঁর কাছ থেকে অনেক চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশ পেতে লাগল। এই বরকতময় নুর মানবীয় দেহে এসে নিজের আলোর বিচ্ছুরণ হতে এতটুকু বঞ্চিত হয়নি এবং প্রতিনিয়ত নিজের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করতে লাগল। সৃষ্টিকুলের সর্দার, মানবতার গৌরব, সর্বশেষ নবী রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ পরম্পরার উনিশতম দাদার নাম ছিল মুজর। যার মাঝে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নুর পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল। ইসলামি ইতিহাসের পাতায় পাতায় এই মহান মনীষীর অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর প্রখর দৃষ্টিশক্তি, দূরদর্শিতা ও অসাধারণ জ্ঞানের কথা লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল।

'কুরাইশ' নামকরণের কারণ

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ষষ্ঠতম পুরুষের নাম ছিল কুসাই। যিনি অনেক বড় আল্লাহর অলি এবং কাশফ-কারামাতের অধিকারী ছিলেন। তার নেতৃত্ব বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল। তিনিই নিজের পুরো বংশকে একত্র করে তার নাম 'কুরাইশ' রেখেছেন। আর

---

১০. প্রথম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নুর সৃষ্টি করা হয়েছে, এই ধরনের অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে সবগুলো জাল ও বানোয়াট। বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের মতে এই সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর কোনোটিই নির্ভরযোগ্য নয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব হাফিজাহুল্লাহর এর তত্ত্বাবধান ও দিক-নির্দেশনায় রচিত 'এসব হাদিস নয়-১' গ্রন্থটির ১৭৩-২১৪নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এই বিষয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।-অনুবাদক।

তখন থেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ 'কুরাইশ' নামে পরিচিত হয়ে উঠে।[১১]

রক্তপাতের ভবিষ্যদ্‌বাণী

প্রিয় মুহাম্মাদের চতুর্থ পূর্বপুরুষের নাম ছিল আবদে মানাফ। মহান আল্লাহর কুদরতে তার ঔরসে দুইজন যমজ বাচ্চার জন্ম হয়। তন্মধ্যে একজনের আঙুল অপরজনের কপালের সঙ্গে লাগানো ছিল। তাই তরবারির মাধ্যমে আঙুল কেটে এই দুই বাচ্চাকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তখনই প্রখর দূরদর্শিতার অধিকারী গুণিজনরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, 'যেহেতু এই শিশুদের জন্মের পরপরই তাদের জন্য তরবারি কোষমুক্ত করতে হয়েছে। তাই হয়তো কুদরতের ফয়সালাও এই যে, কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মাঝে কখনো সন্ধি হবে না। পৃথিবীতে সর্বদা এই দুইজনের বংশধরের মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানি-রক্তপাত লেগেই থাকবে।'[১২]

আশ্চর্য! পরবর্তী সময়ে তাদের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই দুই শিশুর একজনের নাম ছিল হাশেম, যার বংশ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দ্বারা আলোকিত হয়েছে। অপরজনের নাম ছিল আবদুশ শামস। যারা বনি হাশেমের বিরুদ্ধে শত্রুতার কোনো দিকই বাকি রাখেনি।

হাশেমের নেতৃত্বের পরিধি

হাশেম যেহেতু পবিত্র কাবাগৃহের মোতাওয়াল্লি ছিলেন এবং দূরদূরান্ত থেকে আগত বাইতুল্লাহর জিয়ারতকারীদের সব ধরনের প্রয়োজন পূরণ করতেন। তাই জনসাধারণের মাঝে তার বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। পুরো আরবে তার সম্মান ও মর্যাদা ছিল সর্বজন স্বীকৃত। বিশাল এলাকাজুড়ে তার নেতৃত্ব বিস্তৃত ছিল। তিনি বিয়ে করেছিলেন মদিনা মুনাওয়ারায়। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বাগানে 'আবদুল মুত্তালিব' নামে এক ফুল ফুটল। যুবক বয়সেই হাশেম ইন্তেকাল করেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে সফররত অবস্থায় 'গাজা' নামক স্থানে তিনি ২৫ বছর বয়সে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। এতিম আবদুল মুত্তালিব মদিনায় নিজের নানার কাছে বেড়ে ওঠেন।

---

[১১]. *ফাতহুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি*, ৬/৬৬২ (মাকতাবাতুল আশরাফিয়া দেওবন্দ)

[১২]. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/২৩৬; *তারিখুত তবারি*, ২/১৩

আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্ব

আবদুল মুত্তালিবও অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকটেও তিনি সমাদৃত ছিলেন। এর দুটি কারণ ছিল।

প্রথমত: স্বীয় পিতার অল্পবয়সে মৃত্যুর কারণে তিনিই পিতার আসনে সমাসীন হন এবং কাবাগৃহের মোতাওয়াল্লির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তা ছাড়া জনসেবামূলক কাজেও তার বেশ আগ্রহ ছিল। যে জমজম কূপের এক ফোঁটা পানিও হাজিদের জন্য বেহেশতের কাউসার ও তাসনিম কূপের পানি সমতুল্য, সেই জমজম কূপও আবদুল মুত্তালিব পরিষ্কার করেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ ও কালের পরিক্রমায় সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত: তিনি একজন দুনিয়াত্যাগী রাতজাগা আবেদ ছিলেন। তাঁর আদরের নাতি মুহাম্মাদের মুবারক কদম স্পর্শে যে হেরাগুহা ধন্য হয়েছে, শত-সহস্র অলি-আউলিয়া ও সুফি-সাধকদের ইবাদতখানায় পরিণত হয়েছে, সেই হেরা গুহায় আবদুল মুত্তালিব ৪০ দিনের সাধনায় ব্রত হতেন।

আসমানি নুরের চমক

যে আসমানি নুরের কারণে এতকিছুর আয়োজন, এতকিছু সৃষ্টির উৎসব, যার প্রভায় পূর্ব-পশ্চিম প্রভাময়, তা এবার আবদুল মুত্তালিবের ঔরসে স্থানান্তরিত হলো। ইসলামি ইতিহাসের সোনালি পাতায় তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন বিস্ময়কর ও বিরল ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা অচিরেই তার বংশে সেই মহান প্রদীপের আলো ছড়ানোর জানান দিচ্ছিল। যার আলো কুফর ও শিরকের অন্ধকারকে ঠিক তেমনই তাড়িয়ে দেবে, প্রবল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বায়ু যেমন কালো মেঘমালাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সুহৃদ পাঠকের জ্ঞাতার্থে কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনা উল্লেখ করছি।

বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের যুদ্ধ

এমন অনেক বিজ্ঞানমনস্ক লোক রয়েছেন, বিজ্ঞানের আলোকধাঁধায় যাদের চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে। তারা এই সমস্ত চিত্তাকর্ষক ঘটনার কোনো বাস্তবতাই উপলব্ধি করেন না। উলটো এই সমস্ত ঘটনাকে মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পকাহিনি ও বানোয়াট কিচ্ছাকাহিনি বলে অভিহিত করেন। এই বিজ্ঞান পূজারি ভাইদের সমীপে আমার আবেদন, তারা আমার বর্ণিত এইসব ঘটনার

সত্যতা বিশ্বাস করুক বা না করুক, আমাদের যাপিত জীবনের বহু অভিজ্ঞতা এবং ঘটনা এই নির্ভেজাল বাস্তবতার সাক্ষ্য দেয় যে, মাঝে মাঝে এমন অনেক আজব ঘটনা প্রকাশ পায়, আমাদের চরম উৎকর্ষসাধিত বিজ্ঞান যার যথার্থ কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা করতে পারে না। অথচ আমাদের তথাকথিত এই বিজ্ঞানপূজারিদের কাছে সেসব ঘটনা তেমন আশ্চর্যকরও ঠেকে না। পত্রিকার পাতায় বড় বড় বিজ্ঞানী ও কথিত সুশীলদের সাক্ষ্যও যখন এসে যায়, তখন কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই তারা এই ঘটনাগুলোর বাস্তবতা মেনে নেয়। আফসোস বন্ধু! পশ্চিমাদের আকাশ থেকে নাজিল হওয়া যেকোনো কিছুই আজ তোমার কাছে 'ঈমান তুল্য' হয়ে গেল, চাই তার যথার্থ কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা থাকুক অথবা না থাকুক!

মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তি

এমন অপ্রীতিকর বিষয়ের অবতারণা ঘটানোয় দুঃখ প্রকাশ করেই আমি আমার সেসব আধুনিক বন্ধুদের কাছে বিনীত নিবেদন করছি; প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সমস্ত মুজেজা বা অলৌকিক ঘটনা আপনাদের কাছে নিতান্তই কল্পকাহিনি বলে মনে হলেও তাঁর পূতপবিত্র কর্মমুখর জীবনের অবদানকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অলৌকিকতায় বিশ্বাসীদের ধারণাকে আপনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য আর হেয় প্রতিপন্ন করতে পারেন। কিন্তু এই কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি একজন ঐতিহাসিক মহান ব্যক্তি, সুতরাং অপরাপর ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনকে যতটা সম্মানের চোখে দেখা হয়, অন্তত তাঁর জীবনকেও সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী লিখতে গিয়ে আমি সেসব ঘটনাকে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি, যেগুলো উল্লেখ না করলে ইসলামবিরোধীরা রাসুলের শান ও পবিত্র গুণাবলি নিয়ে হাসিতামাশা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে পারত।

কাশফ ও কারামত

এটা খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কোনো মহান মনীষীর জীবনী নিয়ে আলোচনা করতে হলে তাঁর জীবনের সেসব বিষয়ের প্রতিই আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, যা বিশ্বমানবতার জন্য শিক্ষণীয়, আদর্শ ও অনুসরণীয় হতে পারে। বিস্ময়কর ঘটনাবলি বা অস্বাভাবিক কিছুর প্রকাশ, এটা কমবেশি দুনিয়ার বড় বড় প্রতিটি ধর্মের গুরুজনদের জীবনীতেই পাওয়া

যায়। তবে হ্যাঁ, এই কথা সত্য যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুসারীদের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে তার সত্যতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। অনেক সময় এই ধরনের ঘটনাবলি কোনো কোনো ধর্মাবলম্বীর হৃদয়ে তার ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং মহান সৃষ্টিকর্তার বড়ত্ব ও ক্ষমতার কথা বদ্ধমূল করে দেয়। কিন্তু তথাকথিত আধুনিক প্রগতিশীলদের হৃদয়ে এই সমস্ত ঘটনা পাঠে চরম বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়। তাদের কাছে এসব নিতান্তই হাস্যকর ও আজগুবি কল্পকাহিনি ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাহোক, একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমি তথাকথিত বাস্তবতায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তা হলো, মুহাম্মাদ ও তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকে যে-সমস্ত চিত্তাকর্ষক ও অস্বাভাবিক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে—সেগুলোতে আমাদের কোনো উপকারিতা যেমন নেই, তেমনই সেগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বিধানও নেই। এগুলো তো তাঁর জন্য মহান প্রভুর পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। যা তিনি নিজ শ্রম, সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। যার স্বাদ তিনি নিজেও গ্রহণ করেছেন এবং পৃথিবীর মানুষকেও আস্বাদন করিয়েছেন।

আলোর মিনার

আমাদের জন্য জরুরি হলো, মহান পূর্বপুরুষরা যা-কিছু রেখে গিয়েছেন, তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। তাদের কাশফ বা কারামত আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের কর্মপদ্ধতি, নিয়মনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, এককথায় তাদের রেখে যাওয়া ধর্মই আমাদের জীবন চলার পথে আলোর মিনার হতে পারে। তাদের রেখে যাওয়া আদর্শই আমাদেরকে মানমর্যাদার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারবে। তাদের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে পৃথিবীর কোনো প্রান্তেই কল্যাণ ও সফলতার আশা করা যায় না।

সচ্চরিত্র এক বিরল মুক্তা

সচ্চরিত্র, শিষ্টাচার ও সভ্যতাই আমাদের মূল সম্পদ, যার সামনে কারুনের অগাধ ধনসম্পদও চরম হাস্যকর ও অবহেলিত। সচ্চরিত্র ও শিষ্টাচারের এই মহান সম্পদ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকেই হোক না কেন, যেকোনো ধর্মের যেকোনো ব্যক্তির নিকট থেকেই হোক না কেন, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবার কাছ থেকেই গ্রহণে দ্বিধা করা উচিত নয়। এই নশ্বর পৃথিবীর যেকোনো মূল্যবান সম্পদই উত্তম আখলাক ও শিষ্টাচারের বিনিময়ে উৎসর্গ করা উচিত।

যিনি নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করেন

মানুষের জীবন ঠিক ততটাই সফল ও সার্থক হয়, যতটা আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সে সত্যের অনুসন্ধান করে এবং সত্যের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করে। স্বভাবচরিত্রের এক সুমহান বাস্তবভিত্তিক মূলনীতি যে ব্যক্তি মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারবেন, বাস্তবেই তিনি মহান। কিন্তু সেই ব্যক্তির মর্যাদা আরও বেশি, যিনি পৃথিবীর সামনে কোনো মূলনীতি বা আদর্শ উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি, বরং নিজের জীবনেও তা প্রয়োগ করেছেন। হৃদয়প্রাসাদের সঞ্চয়কক্ষে সচ্চরিত্র ও শিষ্টাচারের অগণিত সম্পদ জমা করেছেন।

একজন আমলদার মহান আলেম

যে মহান মনীষীর পূতপবিত্র জীবনের বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলি এই গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতার চোরাবালিতে হারিয়ে যাওয়া এবং ভালো-মন্দের দোলাচলে দিশেহারা মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি, তিনি এমন এক মহান মর্যাদার অধিকারী, যিনি নিজের হৃদয়কে মানবিক শিষ্টাচার ও আভিজাত্যের সুমহান ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন। এরপর সেই সভ্যতা ও শিষ্টাচারের প্রসারে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন। সর্বোপরি কুফর ও শিরকের আঁধারে দিগ্‌ভ্রান্ত পৃথিবীকে ঈমান ও মহাসত্যের প্রদীপ দ্বারা এমন আলোয় আলোকিত করেছেন, দীর্ঘ তেরোশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজও এই অন্ধশালায় সে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছে।

অদৃশ্যের আড়ালে এ কোন রূপের বাহার?

যখন আকাশের সেই নুর আবদুল মুত্তালিবের বুকে স্থানান্তরিত হলো, তখন তিনি হারাম শরিফের চার দেয়ালের ভেতরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। জাগ্রত হওয়ার পর তিনি অত্যন্ত অবাক হলেন—তার মাথার চুলগুলো বেশ সুসজ্জিত ও পরিপাটি হয়ে আছে। সুঘ্রাণ আশপাশকে সুরভিত করে তুলেছে। দুচোখে সুরমার দাগ লেগে আছে। গায়ে সুন্দর নতুন জামা, যেন নতুন বরের সাজ। এমন বিস্ময়কর ঘটনায় উপস্থিত লোকেরা হতবাক হয়ে গেল। বিষয়টি ছিল সবার বোধগম্যের বাইরে। আবদুল মুত্তালিবের সম্মানিত চাচা তাকে কুরাইশের গণকদের কাছে নিয়ে যান এবং পুরো ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললেন। এমন অভূতপূর্ব ঘটনা শুনে গণকরা বলল, 'তোমরা তাকে বিবাহ করিয়ে দাও।' গণকদের কথায় চাচা বিবাহের আয়োজন করলেন।

রহমতের বৃষ্টির জন্য দোয়া

আরবে যখন দুর্ভিক্ষ শুরু হতো, মরুভূমির শুকনো ভূমি তখন যেন ইরানের অগ্নিশালায় পরিণত হতো। এক ফোঁটা পানির জন্য পশুপাখি ব্যাকুল হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাওয়ার মতো উপক্রম হতো। এমন কঠিন সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কুরাইশের লোকেরা একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করত। আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে তারা 'সুবাইর' নামক পাহাড়ে গিয়ে একসঙ্গে মহান প্রভুর দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে থাকত। তিনি সকলের মধ্যমণি হয়ে মহান প্রভুর দরবারে সেজদাবনত হয়ে হৃদয়ের গহিন থেকে দোয়া করতে থাকতেন। আবদুল মুত্তালিবের হৃদয়ের গহিনে অবস্থিত সেই মহান নুরের বরকতে দয়াময় আল্লাহর করুণার বারিধারা বর্ষিত হতে শুরু করত। ফলে পুনরায় শুষ্ক মরুভূমি সবুজ-সতেজ হয়ে যেত। মানুষ দুর্ভিক্ষের কষ্ট ভুলে নিজেদের দোয়া কবুল হওয়ার আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠত। তাদের মুখে তখন হাসি ফুটে উঠত। এ হাসি ফসলের হাসি, প্রাপ্তির হাসি।

আবরাহার প্রত্যাশা

আরব উপদ্বীপের অন্যান্য অঞ্চলগুলোর তুলনায় ইয়ামেন[১৩] অঞ্চল বেশি সবুজ-সতেজ ছিল। আবদুল মুত্তালিবের সময় এই অঞ্চল হাবাশার অধীনে ছিল। হাবাশার পক্ষ থেকে আবরাহা নামক এক ব্যক্তিকে ইয়ামেনের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। সেখানে আবরাহা তার রাজত্ব পাকাপোক্ত করার পর একটা উপাসনালয় তৈরি করল এবং মক্কায় অবস্থিত কাবাগৃহের জিয়ারতকারীদের উদ্বুদ্ধ করল, তারা যেন কাবাগৃহকে বাদ দিয়ে তার তৈরিকৃত উপাসনালয়ের জিয়ারত করে। কিন্তু তার আশার গুড়ে বালি পড়ে। হুমকি-ধমকি, লোভলালসা সব অপচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। উলটো এক দুঃসাহসী ব্যক্তি সেই উপাসনালয়কে অপমান করার জন্য রাতের আঁধারে চুপিচুপি প্রবেশ করে নকল 'বাইতুল্লাহ'-কে 'বাইতুল খলা' (শৌচাগার) বানিয়ে দিলো। এই ঘটনা শুনে আবরাহা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সে প্রতিজ্ঞা করল, বিশাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কা মুকাররমায় হামলা করে কাবাঘর নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এর মাধ্যমে তার উপাসনালয়ের অপমানের প্রতিশোধ যেমন নেওয়া হবে, তেমনই হয়তো কাবাঘরের অনুপস্থিতিতে তার নকল 'বাইতুল্লাহ'-এর মহিমা

---

১৩. **ইয়ামেন :** আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশ।-সম্পাদক

গাওয়ার গানেরপাখি বেড়ে যাবে। মানুষ তার বানানো ঘরের তাওয়াফ করবে। তাকে প্রভু হিসাবে মান্য করবে। উপরন্তু পুরো আরব উপদ্বীপ থেকে যখন মানুষ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তার নকল 'বাইতুল্লাহ'-এর দিকে ছুটবে তখন তার দেশ ইয়ামেনও বেশ উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে।

কাবাঘরের উদ্দেশে আবরাহা বাহিনী

চরম অহংকারী ও ক্ষমতার নেশায় মত্ত এই পাপিষ্ঠ মহাপ্রতাপশালী প্রভুর ক্রোধ ও ক্ষমতার কথা ভুলে গিয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কায় হামলা করল। এই বিশাল বাহিনীতে অনেক হাতি ছিল। তাই আরব ইতিহাসে এই বাহিনীকে 'আসহাবুল ফিল' (হাতিবাহিনী) এবং এই বছরকে 'আমুল ফিল' (হাতির বছর) বলা হয়।

শয়তানের এই বাহিনী এসে মক্কা থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান নিলো এবং কুরাইশদের অনেক বকরি, ভেড়া ও উট লুট করে নিয়ে গেল। যেখানে শুধু আবদুল মুত্তালিবেরই চারশ উট ছিল।

আসমানি নুরের চমক

কুরাইশরা এই সংবাদ শুনে খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। নিজেদের বড় বড় সর্দারদের একত্র করে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে সুবাইর পাহাড়ে গিয়ে কঠিন এই সংকট হতে মুক্তির জন্য মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করতে লাগল। আবদুল মুত্তালিবের কপালে যে আসমানি নুর সর্বদা তারকার ন্যায় জ্বলজ্বল করত, হঠাৎ তা পূর্ণিমার চাঁদের মতো বিকশিত হয়ে উঠল। যার আলোকচ্ছটায় কাবাঘরের দেয়াল পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গেল। এই অবস্থা দেখে আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, এখন তোমরা নিশ্চিত থাকো, দুশমন তোমাদের কিছুই করতে পারবে না। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তারাই পলায়ন করবে। তোমরা প্রভুর পক্ষ হতে সাহায্য ও বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে। কারণ, এই আলোকচ্ছটা আমাদের বিজয়ের পয়গামই বহন করছে।

আবরাহার দূত

কুরাইশের নেতারা সুবাইর পর্বত থেকে মক্কায় এসে পৌছতেই আবরাহার দূত এসে আবদুল মুত্তালিবের নিকট উপস্থিত হলো। কিন্তু কুরাইশের এই মহান সর্দারের প্রভাব ও নুরানি চেহারার তেজ সইতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে

মাটিতে পড়ে গেল। জ্ঞান ফেরার পর আবদুল মুত্তালিবের পায়ের সামনে নত হয়ে দূত বলল, সত্যিই আপনি কুরাইশের মহান নেতা। এই ঘটনার পর আবদুল মুত্তালিব নিজেই আবরাহার সঙ্গে দেখা করতে যান।

আল্লাহর ঘরের হেফাজত স্বয়ং তিনিই করেন

আবদুল মুত্তালিবের আভিজাত্য ও চেহারার নুরের চমকে আবরাহাও বেশ প্রভাবিত হলো। তার সঙ্গে বেশ ভদ্র ও শালীন আচরণ করল এবং নিজের আগমনের উদ্দেশ্য খুলে বলল। আবদুল মুত্তালিব বললেন, তোমার লোকেরা আমার ৪০০ উট ধরে নিয়ে এসেছে। আমি সেগুলো নিতে এসেছি।

এমন কথা শুনে আবরাহার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অত্যন্ত অস্থিরচিত্তে সে বলল, আমি তো তোমাকে বেশ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, আমার ধারণা ভুল। ইবাদতের স্থান কাবাঘর নিশ্চিহ্ন করতে এসেছি জেনেও তুমি স্বীয় গোত্র ও তার সম্মানের কথা চিন্তা না করে আমার কাছে এসেছ উট ফিরিয়ে নিতে? নিজের উট রক্ষার জন্য তো ভালোই চেষ্টা করছ কিন্তু কাবাঘর রক্ষার জন্য কি তোমার একটুও চিন্তা হয়নি?

আবদুল মুত্তালিব অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমি তো শুধু আমার উটের মালিক আর মুহাফিজ। কাবাঘরের মালিক আর মুহাফিজ তো স্বয়ং আল্লাহ। তাঁর ঘর তিনি নিজেই রক্ষা করবেন।

এ কথা শুনে আবরাহা মনে মনে বিদ্রুপের হাসি হাসল। অবজ্ঞার সুরে আবদুল মুত্তালিবকে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখব তোমাদের রব কীভাবে তাঁর ঘরকে রক্ষা করেন।

কুরাইশরা তার নিকট থেকে ফিরে আসতেই বিশাল হাতিবাহিনীর ওপর ধ্বংসযজ্ঞ আরম্ভ হলো। আল্লাহর গজবে আবরাহা তার বাহিনীসহ ধ্বংস হয়ে গেল।

ইয়ামেনের রাজা কর্তৃক সুসংবাদ

হাতিবাহিনী বিস্ময়করভাবে ধ্বংস হওয়ার পর ইয়ামেন অঞ্চল হাবাশার[১৪] রাজার হাতছাড়া হয়ে যায়। সাইফ ইবনে যি ইয়াজন নামক এক ব্যক্তি

---

১৪. **হাবাশা :** আরব উপদ্বীপ হতে সরাসরি দক্ষিণে অবস্থিত একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল হাবাশা বা আবিসিনিয়া। বর্তমান ইরিত্রিয়া, উত্তর ইথিওপিয়া, সোমালিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ, জিবুতি, মিশরের দক্ষিণাঞ্চল, সুদানের পূর্বাঞ্চল ও ইয়ামেনজুড়ে এর বিস্তৃতি ছিল।-সম্পাদক

সেখানকার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবদুল মুত্তালিব যখন কুরাইশের বড় বড় নেতৃবর্গকে সঙ্গে নিয়ে সাইফকে মুবারকবাদ জানাতে ইয়ামেন আসেন, তখন তিনি নিজ জ্ঞান, মেধা ও দূরদর্শিতার আলোকে আবদুল মুত্তালিবকে এই সুসংবাদ শোনান যে, পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি ভূমি ও আকাশের প্রতিটি মাখলুক যে শেষ নবীর আগমনের প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে, তিনি আপনার বংশেই জন্মগ্রহণ করবেন।

আবদুল মুত্তালিব এই কথা শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, সেই সুসংবাদই তো আমার এই কপালে আলো হয়ে জ্বলছে।[১৫]

আরব-উপদ্বীপে ইহুদি এবং খ্রিষ্টানরাও বসবাস করত। তাদের আলেমরা নিজেদের ধর্মীয়গ্রন্থ তাওরাত ও ইনজিলে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ পড়েছিল। তাই তারা মানুষকে এই সুসংবাদ দিত যে, অচিরেই এই ভূমিতে এক মহান নবীর আবির্ভাব ঘটবে। যার ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয়ী হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত নিজ সর্বজনীনতা ও অসাধারণ বিস্তৃতির কারণে সর্বস্তরের মানুষের নিকট সমাদৃত হবে।

বাদশাহ ও নবী

আবদুল মুত্তালিব একবার তার পুত্র আব্বাস রা.-কে বলেন, এক শীতকালে আমরা ইয়ামেনের উদ্দেশে সফর করেছিলাম। সেখানে আমরা একজন ইহুদি আলেমকে জবুর কিতাব পাঠরত অবস্থায় দেখলাম। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল 'তুমি কে?' প্রত্যুত্তরে বললাম, আমি কুরাইশ বংশের লোক।

ইহুদি : কুরাইশের কোন গোত্রের?

আমি : বনি হাশেমের।

ইহুদি : যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি আপনার শরীরের কিছু অংশ দেখতে চাই।

আমি : যে অঙ্গগুলো দেখাতে লজ্জাবোধ হয়, সেগুলো ছাড়া যেকোনো অঙ্গ আপনি দেখতে পারেন।

সেই ইহুদি আলেম প্রথমে আমার নাকের একটি ছিদ্র দেখলেন। এরপর আরেকটি ছিদ্র দেখে প্রশান্তচিত্তে বললেন, তোমার এক হাতে রয়েছে রাজত্ব এবং অপর হাতে রয়েছে নবুয়ত।

---

[১৫]. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/২৩: দারুল হাদিস

ইতিহাস সাক্ষী, এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যপূর্ণ হয়েছিল। তার নাতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন বাদশাহ ছিলেন, তেমনই নবীও ছিলেন।[১৬]

নুরানি বৃক্ষ

সর্বশেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, রহমাতুল লিল আলামিন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচা আবু তালেব বলেন, আমার পিতা আবদুল মুত্তালিব আমাকে বলেছেন, একবার আমি কাবাঘরে নিদ্রামগ্ন ছিলাম। স্বপ্নে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও বিরল এক রঙিন আলো দেখলাম। আমি দেখি, পৃথিবীর জমিন ফেটে এক নুরানি বৃক্ষ জন্ম নিলো। যার ডালপালা সুদূর আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো পৃথিবীকে তার ছায়ায় ঢেকে নিলো। ক্রমশ তার বিস্তৃতি বাড়ছিল। সে গাছের প্রতিটি পাতা ঝলমল করছিল। প্রতিটি শাখা ঝলমল করছিল। সেই গাছের আলো এতটাই উজ্জ্বল ছিল যে, আমার চোখ ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছিল। আমার পক্ষে আলো আর রঙের এই তুফানের দিকে তাকানো অসম্ভব ছিল। তার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও ৭০ গুণ[১৭] বেশি তেজস্বী ছিল। এই বিস্ময়কর নুরানি বৃক্ষটি কখনো আমার দৃষ্টি থেকে আড়াল হচ্ছিল, আবার কখনো সামনে এসে চোখ ঝলসে দিচ্ছিল। তার আলোর বন্যায় পুরো পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। আলো ও রঙের এই লুকোচুরি খেলায় আমি বারবার বিস্মিত হচ্ছিলাম।

আমি দেখলাম, সেই গাছের ডালে ডালে কুরাইশের একদল মানুষ ঝুলে রয়েছে। আরেকদল কুড়াল দিয়ে তার গোড়া কাটতে ব্যস্ত আছে। পুরো শরীরে কাঁপন ধরানো এমন অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখে জাগ্রত হওয়ার পর কুরাইশের এক গণকের কাছে তা বর্ণনা করে ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম।

স্বপ্নের কথা শুনেই গণকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বলল, যদি এই স্বপ্ন সত্যি হয় তাহলে তোমার বংশে এমন এক মহান নবীর আবির্ভাব হবে, যার প্রজ্বলিত দৃষ্টি ও আলোকিত পয়গাম কুফর ও বাতিলের অন্ধকারকে

---

১৬. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১৫৬-১৫৭; *খাসায়িসুল কুবরা*, ১/৭৭-৭৮ (বাংলা); *তাবাকাতে ইবেনে সাদ*, ১/৯৬; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/৪৬৪ (দারুল হাদিস)

১৭. আরবদের পরিভাষায় কোনো বিষয়ের আধিক্য বোঝাতে কখনো কখনো ৭০ দিয়ে বিষয়টি প্রকাশ করা হয়।-সম্পাদক

এমনভাবে দূরীভূত করে দেবে, প্রতিদিন সকালে পুবাকাশে উদিত সূর্য যেমন রাতের অমানিশাকে কাটিয়ে দেয়। তাঁর নুরানি ধর্মের আলোয় পুরো পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত হয়ে যাবে। পৃথিবীর বড় বড় ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালীরা তাঁর সামনে মাথানত করবে।[১৮]

প্রিয় মুহাম্মাদের সম্মানিত আব্বাজান

কুরাইশের মহান নেতা আবদুল মুত্তালিব ফাতেমা নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। দুজনের কোল আলোকিত করে একে একে জন্ম নিলো কয়েকজন সন্তান। তাদের একজনের নাম ছিল আবদুল্লাহ। এতদিন আবদুল মুত্তালিবের হৃদয়ের বসতঘরে যে আসমানি নুরের বসবাস ছিল। তা এবার আবদুল্লাহর হৃদয়রাজ্যকে আলোকিত করে তুলল। আত্মিক ও দৈহিক সৌন্দর্যে যিনি অতুলনীয় ছিলেন। কুদরত যেন আবদুল্লাহর জন্য তার সৌন্দর্যের ভান্ডারের মুখ খুলে দিয়েছিল। তার দুচোখের মায়াবী চাহনি যে-কাউকে কাছে টানত। দুঠোঁটের মিষ্টি হাসি সবাইকে মুগ্ধ করত। সৌন্দর্যের জাদুময় আকর্ষণ এমন এক স্বীকৃত বিষয়, যা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই।

আবদুল্লাহর সৌন্দর্য, আকর্ষণীয় বাগ্‌ভঙ্গি ইস্পাতকঠিন হৃদয়ের মানুষকেও কাছে টেনে নিত। আরবের সবচেয়ে সুন্দরী রমণীরা তার সৌন্দর্যে মন্ত্রমুগ্ধ ছিল। তার জীবনসঙ্গিনী হতে পারাকে নিজের জন্য সম্মান ও গৌরবের মনে করত। বনি জাহরা গোত্রের সর্দার ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফের কলিজার টুকরা, চোখের মণি ও আদরের দুলালি আমেনার সঙ্গে যখন তার বিয়ে হলো, তখন নাম না জানা বহু রমণী আবদুল্লাহকে না পাওয়ার আঘাত সইতে না পেরে নিজেকে নিজে শেষ করে দিয়েছিল!

নুরে মুহাম্মাদির চমক

আবদুল্লাহ একবার তাঁর সম্মানিত পিতাকে বলেছিলেন, 'যখন আমি কোনো জঙ্গল বা মরুভূমিতে চলি, তখন আমার পিঠ থেকে চোখ ধাঁধানো একটি নুর বের হয়। যা দুইভাগে ভাগ হয়ে পূর্বে ও পশ্চিমে চলে যায়। অতঃপর আবার এই নুর দুই দিক থেকে এসে একস্থানে মিলিত হয়ে আকাশের দিকে উঠতে শুরু করে। আকাশে উঠে বিশাল একটি মেঘখণ্ডের রূপ ধারণ করে আমাকে ছায়া দিতে থাকে। যখন আমি কোনো শুকনো বা মৃত গাছের নিচে বসি, তা

---

১৮. *খাসায়িসুল কুবরা*, ১/৭৭ (বাংলা)

হঠাৎ সবুজ-সতেজ হয়ে যায়, তার নিবিড় ডালপালা আমায় ছায়া দিতে থাকে। সবুজ-সতেজ হওয়া এই গাছের নিচ থেকে যখন আমি উঠে চলতে শুরু করি, তখন গাছটি আবার পূর্বের মতোই শুকনো বা মৃত হয়ে যায়।

পুত্রের এ কথা শুনে পিতা আবদুল মুত্তালিব বললেন, যে নুরের আগমনের প্রতীক্ষায় সারা পৃথিবী ব্যাকুল, সেই নুর এখন তোমার পিঠে স্থানান্তরিত হয়েছে। শোনো বাবা! আমি তোমাকে এক মহাসুসংবাদ শোনাচ্ছি। তা হলো, সেই নুর তোমার মাধ্যমেই এই পৃথিবীতে আগমন করবে।

এক ইহুদি গণিকা

একদিন কোথাও যাওয়ার সময় এক ইহুদি গণিকার সঙ্গে আবদুল্লাহর সাক্ষাৎ হলো। এই নারী শেষ নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত অনেক কিতাব পড়েছিল। সে যখন আবদুল্লাহর কপালে নুরে মুহাম্মাদির চমক দেখতে পেল, তখন অত্যন্ত আগ্রহ, উচ্ছ্বাস ও সীমাহীন ভালোবাসা প্রকাশ করতে করতে আবদুল্লাহর নিকটে এলো এবং তাকে ১০০ উট উপহার দিয়ে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইল। তার উদ্দেশ্য ছিল, নুরে মুহাম্মাদি যেন তার মাঝে স্থানান্তরিত হয় এবং সে যেন শেষ নবীর সম্মানিতা মাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

আবদুল্লাহ তার আবেদন ফিরিয়ে দিয়ে সাফ সাফ বলে দিলেন, একজন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হয়ে আমার দ্বারা এমন কোনো কাজ করা শোভা পায় না, যা আমার সম্মানে কালিমা লেপন করবে। সর্বোপরি যা আমার ধর্মেরও বিরোধী। এই কথা শুনে সেই ইহুদি মহিলা নিরাশ হয়ে চলে গেল। পরবর্তী সময়ে যখন আবদুল্লাহ আমেনাকে বিয়ে করলেন এবং আম্মাজান আমেনা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নুরের আমানত গ্রহণ করলেন, তখন হঠাৎ একদিন পুনরায় সেই ইহুদি গণিকার সঙ্গে আবদুল্লাহর দেখা হলো। সে সীমাহীন ক্রূর দৃষ্টিতে আবদুল্লাহর কপালের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ একটা ঠান্ডা নিশ্বাস ছেড়ে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আবদুল্লাহ মুচকি হেসে তাকে বললেন, কী ব্যাপার, যে রঙিন ফাঁদে তুমি আমায় ফাঁসাতে চেয়েছিলে, আজ তা কোথায়?

প্রত্যুত্তরে সে বলল, সে প্রেমের ছলনার কাচের দেয়াল আজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। শোনো হে যুবক! আমি তো তোমার প্রতি আসক্ত ছিলাম না। আমি তো সেই নুরের প্রেমিক ছিলাম, যা তোমার কপালে আকাশের ঝিলিমিলি তারকার ন্যায় ঝলমল করছিল। অচিরেই যে আলোয় পুরো পূর্ব-

পশ্চিম আলোকিত হয়ে যাবে। এখন তো তোমার কপাল সেই পবিত্র নুর থেকে বঞ্চিত। তাই আমার দিওয়ানা মনও সেই ভালোবাসার পাগল সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে।[১৯]

আবদুল্লাহর বিয়ে

আবদুল্লাহর বিয়ের ব্যাপারেও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। *রওজাতুল আহবাব* নামক গ্রন্থে রয়েছে, ইয়াহইয়া আ.-কে যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় শহিদ করা হয়েছিল, তা আহলে কিতাবদের নিকট বিদ্যমান ছিল। আসমানি কিতাবসমূহ পড়ার মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছিল যে, সত্যের এ মহান শহিদের রক্তাক্ত এই কাপড়ের দাগ যেদিন পুনরায় তাজা হয়ে উঠবে, সেদিন শেষ নবীর বাবার জন্ম হবে। যে নবীর ধর্মের পর অন্যসব ধর্ম রহিত হয়ে যাবে। এই নির্বোধ লোকগুলো নিজেদের ধর্ম রক্ষার বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে এই সংকল্প করে বসল যে, শেষ নবীর সম্মানিত পিতাকে তারা দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে। ফলে না থাকবে বাঁশ আর না বাজবে বাঁশি। শেষ নবীরও জন্ম হবে না, তাদের ধর্মও রহিত হবে না। হায়! এই বোকাদের কে বোঝাবে যে, কুদরতের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি কারও নেই! তাদের এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও বোকামি যে কখনো সফলতার মুখ দেখবে না! আহা! তারা কী এ কথা জানত না যে, দুশমন শক্তিশালী হলেও রক্ষাকারী আল্লাহ মহাশক্তিশালী?

একদিন আবদুল্লাহ জঙ্গলে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। শত্রুরা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল। তরবারি কোষমুক্ত করে একদল রক্তপিপাসু আবদুল্লাহকে হত্যা করার জন্য একত্র হলো। সেসময় বনি জাহরা গোত্রের সর্দার ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফও জঙ্গলে শিকার খুঁজছিলেন। বিদ্যুদ্‌গতিতে তার মস্তিষ্কে এই চিন্তা এলো যে, যেকোনোভাবেই হোক আবদুল্লাহকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। তিনি দ্রুত আবদুল্লাহর দিকে আসতে লাগলেন। যেন আহলে কিতাবদের নিকটে সুপারিশ করে আবদুল্লাহকে হত্যা থেকে তাদের বিরত রাখতে পারেন। কিন্তু তার আগেই দুশমন খোলা তরবারি হাতে আবদুল্লাহর মাথার কাছে এসে উপস্থিত হলো। ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফও বিদ্যুদ্‌চমকের ন্যায় নিজের নাঙ্গা তরবারি নিয়ে তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন। এমন সময় কোথা থেকে যেন কিছু

---

[১৯]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১১৯; (দারুল হাদিস) *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/২৬৩ (দারুল হাদিস)

মানুষ ঝলমলে তরবারি হাতে ছুটে এলো। যাদের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের কোনো মিল নেই! তারা আবদুল্লাহকে দুশমনের কবল থেকে রক্ষা করলেন। তিনি সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরে গেলেন।

এমন অবাক করা কাণ্ড দেখে ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, তার চোখের মণি আদরের দুলালি আমেনাকে আবদুল্লাহর হাতেই তুলে দেবেন।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। দ্রুত তিনি বাড়িতে পৌছে আমেনাকে পূর্ণ ঘটনা শুনিয়ে তার মতামত জানতে চাইলেন। তিনিও নিজ আগ্রহের কথা প্রকাশ করলেন। হবু শ্বশুর দ্রুত হবু জামাইয়ের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। আবদুল্লাহও তার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তিনি তাকে নিজের ঘরে ডেকে এনে কলিজার টুকরা আমেনাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আর হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক, এই স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বাগানেই সেই ফুল ফুটেছিল, যার সুবাসে পুরো পৃথিবী মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিল।

আমেনার গর্ভে আসমানি নুর

বিয়ের কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পরে আবদুল্লাহ নিজের পূতপবিত্র বিবির নিকট তিনদিন অবস্থান করলেন। এই দিনগুলোতেই আমেনা নুরে মুহাম্মাদির আমানত গ্রহণ করেন। এই সময়েই আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে তারকার ন্যায় উজ্জ্বল সেই বৃক্ষ দেখেছিলেন, যা জমিনের তলদেশ থেকে বেরিয়ে আকাশের নীল সীমানার মহা উঁচুতে পৌছে গিয়েছিল। যার অত্যুজ্জ্বল আলো সমস্ত আলোকিত তারকারাজি ও চন্দ্র-সূর্যের আলোকে ম্লান করে দিয়েছিল। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু যে আলোয় আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ তা চতুর্দিকে ব্যাপৃত হচ্ছিল এবং পূর্ব-পশ্চিম আলোর বন্যায় ভাসছিল।

কোনো এক ব্যাখ্যাকারের নিকটে এই স্বপ্নের কথা বলা হলে তিনি বলেছিলেন, এই উজ্জ্বল তারকা তো সেই মহান নবী; আবদুল্লাহর ঔরসে যার জন্ম হয়েছে। যার হেদায়েতের প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র পৃথিবীর সব ধর্মকে আপন আলোয় ঢেকে নেবে এবং পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বজনীন সৌন্দর্যের দরুন পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সবখানেই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করবে।[২০]

---

২০. *আর-রওজুল উনুফ*, ১/২৮০; *আবু নুআইম দালায়িলুন নবুওয়াত*, ১/১৩৬-১৩৭

নুরে মুহাম্মাদির বরকত

প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের কারণে আরব অধিবাসীদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। একের পর এক বিপদে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। কিন্তু মা আমেনার মাঝে নুরে মুহাম্মাদির আগমন হতেই আরব-উপদ্বীপের মানুষের যাপিত জীবনে এক মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়। নীলাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দেয়। এমন মুষলধারায় বারিবর্ষণ হয় যে, চারদিক পানিতে থইথই করতে থাকে। গাছে ফল ফলল। বাগানে ফুল ফুটল। কৃষকের মুখে দেখা দিলো ফসলের হাসি। তাই তো আরব জনগণ এই বছরের নাম দিয়েছিল 'সানাতুল ফাতহি ওয়াল-ইবতিহাজ' তথা আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয় ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বছর।

ফেরেশতাদের সুসংবাদ

যে আসমানি নুরে একদিন পুরো পৃথিবীতে আলোর বন্যা বয়ে যাবে, পূর্ব-পশ্চিম যে আলোয় আলোকিত হবে, সেই নুর যখন আমেনার গর্ভে অবস্থান করলেন, তখন থেকেই তিনি যেখানেই যেতেন, যে পথেই চলতেন, অদৃশ্য কারও সালামের আওয়াজ শুনতে পেতেন। সিরাতের গ্রন্থসমূহে তো এই কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, মা আমেনার গর্ভের সেই গর্বের ধনকে রাস্তার দু-ধারের সারি সারি বৃক্ষ, তরুলতা আর পশুপাখিরাও সালাম দিত। আমেনা নিজে তা শুনতে পেতেন। বহুবার তিনি দেখেছেন, ঘুমের চাদরে মুড়ি দিয়ে তিনি যখন স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করেন, তখন তার ভেতর হতে হঠাৎ একটি ঝলমলে আলো বের হয়ে আকাশের দিকে উঠতে থাকে। এরপর পূর্ব-পশ্চিমের পুরো দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিন্দু থেকে সিন্ধু, প্রতিটি সৃষ্টিই সে আলোয় চমকে ওঠে। সন্তান গর্ভকালীন অন্য ১০ জন মহিলার যেমন কষ্ট হয়, যন্ত্রণা হয়, আম্মাজান আমেনার তা কখনো হয়নি; বরং তাঁর সে দিনগুলো অত্যন্ত আরামে-অনায়াসে কেটে গিয়েছিল।

একবার স্বপ্নে এক ফেরেশতা তাকে সুসংবাদ দিলেন যে, তোমার চোখের মণি অনেক মহান একজন হবেন। পৃথিবীর বড় বড় প্রতাপশালীরা যার সামনে মাথানত করবে। জন্মের পরে তাঁর নাম 'আহমাদ' রেখো। প্রতিনিয়ত এমন সুসংবাদ শুনতে শুনতে মা আমেনার দিনগুলো যেন চোখের পলকেই শেষ হয়ে গেল। অবশেষে এসে গেল সেই শুভসময়।

সুপ্রভাত পৃথিবী

উজ্জ্বল আলো নিয়ে উদিত হলো সেই সোনালি সূর্য। এসে গেল সেই শুভক্ষণ। আসমান-জমিনের প্রতিটি বস্তুই যার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ছিল। সবে তো বসন্ত শুরু হলো, অথচ বাগানে বাগানে যেন ফুলের মিছিল। দৃষ্টিসীমার প্রতি ইঞ্চি ভূমি যেন একেকটি ফুলশয্যা। ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় দোল খাওয়া ফুলেদের ঘ্রাণে যখন পৃথিবী সুরভিত; তখন আবদুল্লাহর ঘর আলোকিত করে উদিত হলো সেই সোনালি সূর্য। যার আলোয় অমাবস্যার ঘোর আঁধার যেন কর্পূরের ন্যায় উবে গেল। পরবর্তী সময়ে তাঁর ইলমের নুরে যেমন অজ্ঞতার আঁধার দূরীভূত হয়েছিল।[২১]

তখন সুবহে সাদিক। পুবাকাশে তখনও সূর্যের উদয় হয়নি। আবু লাহাবের বাঁদি সুআইবা এসে তার কাছে মহাবরকতময় সৌভাগ্যবান নবজাতকের জন্মের সুসংবাদ দিলেন। ভাতিজার জন্মের সুসংবাদ শুনে আবু লাহাব যেন খুশিতে ফেটে পড়লেন। আনন্দের আতিশয্যে নিজের বাঁদিকে আজাদ করে দিলেন। নাতির জন্মের সংবাদ শুনে দাদা আবদুল মুত্তালিবের যেন খুশির অন্ত নেই। নিজের প্রয়াতপুত্র আবদুল্লাহর স্মৃতিচিহ্নকে দেখার আগ্রহ যেন তাকে অস্থির করে তুলল। ছোট্ট শিশু মুহাম্মাদকে একটি পবিত্র চাদরে জড়িয়ে দাদার কাছে নিয়ে আসা হলো। আবদুল মুত্তালিব ভবিষ্যতের এই মূর্তিহন্তারককে কোলে নিয়ে মূর্তিদের তাওয়াফ[২২] করার জন্য কাবাঘরে চলে গেলেন। আহা! আবদুল মুত্তালিব কি তখন জানতেন যে, এই যে ছোট্ট শিশুটিকে কোলে নিয়ে তিনি আজ মূর্তিদের আঙিনায় হাজির হয়েছেন, তাঁর দীর্ঘ হায়াত, সুস্থতা ও কল্যাণের দোয়া করছেন, সেই শিশুই বড় হয়ে এই মূর্তিদের উপাসনার বিরুদ্ধে এমন এক বিপ্লবের ডাক দেবেন, যে ডাক শুনে **এই মূর্তিরাই মুখ থুবড়ে পড়ে 'আল্লাহ এক আল্লাহ এক' বলতে শুরু করবে?**

মহান বিপ্লবের সূচনা

সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু যখন এই নবজাতকের আগমনের আনন্দে মাতোয়ারা, আকাশের ফেরেশতারাও যখন আনন্দে আত্মহারা, আসমানের

---

[২১]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১২০; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/২৭৮, ভলিয়ম-১; *আত-তবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সাদ*, ১/৯৮-৯৯; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৫/২৬২

[২২]. মূর্তি তাওয়াফের কোনো প্রমাণ নেই। *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১/৩৯ বা. ই. সে.।-সম্পাদক

বাসিন্দারা যখন জমিনবাসীদের মুবারকবাদ জানিয়ে সুবাসিত ফুল বর্ষণ করছিল; তখন কিসরার প্রাসাদে এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প আঘাত হানল। প্রাসাদের ১৪টি গম্বুজ ধসে পড়ল। শত শত বছর ধরে প্রজ্বলিত পারস্যের অগ্নিশিখা হঠাৎ নিভে গেল। এটা তো সেই মহান বিপ্লবের সূচনা ছিল, যা এই মহান মানুষটির পবিত্র জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।[২৩]

বিস্ময়কর ঘটনাবলির প্রকাশ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন সকালে জন্মগ্রহণ করেন, সে রাতে এত অধিক পরিমাণে তারকা খসে পড়ছিল যে, মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো। কুরাইশরা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরাকে জিজ্ঞেস করল এসব কী হচ্ছে? জবাবে সে বলল, যখন নক্ষত্ররাজি এভাবে খসে পড়তে থাকে, তখন পৃথিবীতে বড় ধরনের কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়। নিশ্চয় আজ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। বিশিষ্ট ইহুদি পণ্ডিত ইউসুফ বলল, আসমানি কিতাবসমূহে যে শেষ নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে, আজ তিনি পৃথিবীতে তাশরিফ আনবেন। লোকেরা পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। এ কী হচ্ছে পৃথিবীতে! এমন অনেক আশ্চর্য ঘটনাই তখন ঘটতে লাগল। বর্ণিত আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের গর্ভ থেকে খতনা করা অবস্থায় জন্মলাভ করেছিলেন। কোনো ধরনের নাপাকি তাঁর শরীরে ছিল না।[২৪]

আকিকার দাওয়াত

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সপ্তম দিন তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে প্রিয় নাতির জন্মের আনন্দে আকিকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। সেই অনুষ্ঠানেই দাদা তাঁর নাতির নাম 'মুহাম্মাদ' রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত এক মেহমান যখন এই বৃদ্ধ সর্দারকে প্রশ্ন করলেন, বংশের প্রচলিত নামগুলো বাদ দিয়ে আপনি এমন অপরিচিত নাম কেন রাখলেন? তখন জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমার স্বপ্ন হলো, আমার নাতি প্রশংসনীয় কর্ম ও গুণাবলির অধিকারী হবে। পুরো পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে।[২৫]

---

[২৩]. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/২৮২, ভলিয়ম-১; *ইবনে কাসির*, ২/২৬৮

[২৪]. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/২৭৯, ভলিয়ম-১; *জাদুল মাআদ*; ১/৬১

[২৫]. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/২৮০

হে দাদা আবদুল মুত্তালিব! আপনি তো নিজের স্বপ্ন পূরণ হতে দেখেননি। কিন্তু ওই আকাশ সাক্ষী, আকাশের ওই তারা সাক্ষী, ইতিহাস সাক্ষী, এই পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি ভূমি সাক্ষী, আপনার হৃদয়ের স্বপ্নগুলো আপনার কল্পনার চেয়েও বেশি ডালপালা ছড়িয়েছিল। হে প্রিয় আবদুল মুত্তালিব! আপনার এই পূতপবিত্র সৌভাগ্যবান নাতি তাঁর উত্তম চরিত্র ও শিক্ষার আলোয় পৃথিবীর মানুষের শুধু প্রশংসাই অর্জন করেননি; বরং আস্থা ও বিশ্বাসও অর্জন করেছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মা ফেরেশতাদের সুসংবাদের ভিত্তিতে ছেলের নাম 'আহমাদ' রেখেছিলেন। এভাবে 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমাদ' দুটোই নবীজির নাম হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

দুধপানের প্রাথমিক দিনগুলো

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পর দুই-তিনদিন পর্যন্ত তাঁর মা আমেনা তাকে দুধ পান করিয়েছিলেন। এরপর এই সৌভাগ্য আবু লাহাবের আজাদকৃত বাঁদি সুআইবার কপালে জোটে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হামজা রা.-ও সুআইবার দুধ পান করেছিলেন। তাই তো তিনি আমেনার বুকের মানিকের দুধভাই ছিলেন।

হালিমার ঘরে হেদায়েতের চেরাগ

ইতিমধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকিকা সম্পন্ন হয়ে গেছে। এবার তিনি আলোকিত করবেন, হাওয়াজেন সম্প্রদায়ের বনি সাদ গোত্রের এক সৌভাগ্যবান মহিলা বিবি হালিমার ঘর।

আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে জাহেলি যুগের আরবরা তাদের সন্তানদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি যতটা যত্নবান ছিল, বর্তমানের আধুনিক ও সভ্য সমাজের হিন্দুস্তানিরাও তাদের সন্তানদের ব্যাপারে ততটা যত্নবান নয়। যুগ যুগ ধরে আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর প্রথা ছিল, তারা সন্তানের জন্মের কিছুদিন পরেই কোনো গ্রাম্য মহিলার হাতে তাকে সোপর্দ করত। যাতে শিশুরা গ্রামের নির্মল বায়ুতে বেড়ে উঠতে পারে। এ ছাড়াও শিশুদের বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিক্ষাও একটি কারণ ছিল। শহর বিভিন্ন ভাষা ও জনপদের মানুষদের মিলনমেলা হওয়ার কারণে মাতৃভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষারও মিশ্রণ ঘটত। যদ্দরুন শহরে থেকে শিশুদের পক্ষে নির্ভেজাল মাতৃভাষা শেখা সম্ভব ছিল না। ভাবতেই অবাক লাগে, তৎকালীন আরবরা তাদের শিশুদেরকে মাতৃভাষা শেখানোর প্রতি

কতটা সচেতন ছিল! নিজের স্নেহের ছোট্ট শিশুটিকে গ্রামে পাঠাতেও তারা দ্বিধাবোধ করত না।

সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত গ্রাম্য লোকেরা শহরের লোকদের তুলনায় বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারদর্শী ছিল। তাই আরবের সম্ভ্রান্ত লোকদের এটাও উদ্দেশ্য থাকত যে, শিশুরা যেন সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ ভাষারও অধিকারী হয়। গ্রাম্য মায়ের কোলে লালিতপালিত হয়েই যেন সন্তানের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কের শক্তিও বৃদ্ধি হয়। পূর্বপ্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও হালিমার হাতে সোপর্দ করা হয়।

হালিমা সাদিয়া রা.

নবজাতক শিশুদেরকে পালক নেওয়ার জন্য গ্রাম্যবধূরা প্রায়ই শহরে আসা-যাওয়া করতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের কিছুদিন পর এমনই কয়েকজন মহিলা মক্কায় আগমন করলেন। এতিম শিশু মুহাম্মাদ তাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল। আহা! অর্থের মোহ যখন মানুষের চোখে কালো পর্দা ফেলে দেয়, চাঁদনি রাতও তার কাছে অমাবস্যা মনে হয়। তারা ভেবেছিল একজন এতিমের লালনপালনের দায়িত্ব নিলে বিনিময়ে কীই-বা মিলবে? হায়রে পোড়াকপালিরা! হায়রে অভাগিনীরা! যদি জানতে এই এতিম অবুঝ শিশুর পদতলেই রয়েছে দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা ও কামিয়াবি! আহা! যদি জানতে এই ফুটফুটে শিশুটির হাতেই রয়েছে সারাজাহানের বাদশাহি! আহা! যদি জানতে এই ঝলমলে চাঁদমুখটার অবহেলাতেই রয়েছে উভয় জাহানের বরবাদি! এই অবুঝ শিশুটির কান্নার প্রতি ফোঁটা জলের সঙ্গেই যে প্রভুর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়, সেই পল্লিবধূরা কি তা জানত? অবশেষে হালিমাই নবীজির লালনপালনের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন। কুদরতের খেলা বোঝার সাধ্যই বা কার আছে? যে কোলাহলমুখর ব্যস্ত শহর মক্কায় হালিমার কাঁধে কোনো ধনীর দুলালের দেখভালের ভার মিলল না। কাফেলার মহিলাদের দৃষ্টিতে যে ছিল 'বেচারি হালিমা'। অথচ কাবার রবের দৃষ্টিতে সে-ই 'হালিমা সাদিয়া' বা 'সৌভাগ্যবতী হালিমা'।

হালিমার ভাষায়, আমি যখন এই মুবারক শিশুটিকে দেখি, তখন সে একটি চাদরে জড়ানো অবস্থায় ঘুমাচ্ছিল। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে তো আমার তখন কোনো ধারণাই ছিল না। আমি যখন তাঁর বুকের ওপর আমার হাত রাখলাম তখন সে নিজের ছোট ছোট মায়াবী দুচোখ খুলে আমার দিকে তাকাল। জানি না কী জাদু ছিল তার সে দুচোখে! দুঠোঁটে ছিল মন মাতানো মুচকি

হাসি। এমন টানা টানা দুটি চোখ ও মন মাতানো মুচকি হাসি দেখে আমার হৃদয়-আকাশে অভূতপূর্ব শিহরন বইতে শুরু করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কপালে মানুষের সফলতা ও আত্মিক শক্তি দীপ্তিমান তারকার ন্যায় জ্বলজ্বল করছিল, সে কপালে আমি আমার ভালোবাসার চুমু এঁকে দিলাম। দুহাতে তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিলাম। আহা! কীভাবে যে বোঝাই? অমন চাঁদ-ঝলমলে মুখটি যেন আমার মন কেড়ে নিয়েছিল। এমন অজানা-অচেনা শিশুটির লালনপালনকেই আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় খুশি ভাবতে লাগলাম।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত দাদা আবদুল মুত্তালিব তার কলিজার টুকরা সন্তান আবদুল্লাহর নয়নমণি মুহাম্মাদকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে হালিমা সাদিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কাবাঘরে উপস্থিত হলেন। কাবাঘর তখন কুরাইশদের হরেক রকমের মূর্তির আস্তানা। দাদা আবদুল মুত্তালিব প্রথমে নাতির দীর্ঘ হায়াতের জন্য মূর্তিদের কাছে প্রার্থনা করলেন। নির্জীব এই পাথরের মূর্তিগুলোকেই সাক্ষী বানিয়ে হালিমার নিকট হতে প্রিয় নাতির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অঙ্গীকার নিলেন। এরপর সৌভাগ্যবতী এই পল্লিবধূর হাতে সুমহান মর্যাদার অধিকারী এই ফুটফুটে শিশুটিকে তুলে দিলেন।

মানুষ ভবিষ্যতের বিষয়ে অজ্ঞ। আবদুল মুত্তালিবও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেননি যে, যে শিশুটির দীর্ঘ হায়াত ও নিরাপত্তার জন্য মূর্তিদের নিকটে দোয়া করছেন, তাদেরকে সাক্ষী রেখে হালিমার নিকট হতে অঙ্গীকার নিচ্ছেন, কোনো একদিন এই শিশুটিই মূর্তিপূজাকে মানবতার নির্লজ্জ বোকামির বহিঃপ্রকাশ বলে ঘোষণা করবেন। সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা এই মূর্তিগুলোই যার আঙুল হেলনে মুখ থুবড়ে পড়বে।

আল্লাহর রহমতের প্রথম ঝলক

মা আমেনা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হালিমা সাদিয়ার কোলে দিয়ে বলেন, আমার বুকের মানিকটা একদিন অনেক বড় হবে। তুমি খুব ভালোভাবে তাঁর দেখাশোনা করো। আল্লাহ তাআলা তাঁর গায়েবি খাজানা থেকে তোমাকে অকল্পনীয় বরকত দান করবেন। আম্মাজান আমেনার এই কথাগুলো হয়তো তখন হালিমা সাদিয়ার নিকটে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। তিনি হয়তো বুঝতে পারছিলেন না যে, এই ছোট্ট শিশুর মাঝে

কী এমন বরকত রয়েছে?! কিন্তু যখন তিনি শিশু মুহাম্মাদকে কোলে নিয়ে বাহনের পিঠে সওয়ার হয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে একের পর এক আল্লাহর রহমতের ঝলক দেখতে পেয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ তো কোনো সাধারণ শিশু নয়। এমন চাঁদমুখটাই তো একদিন পৃথিবীর আকাশে সর্বোচ্চ যশ, খ্যাতি ও সম্মানের আলোকিত চাঁদ হয়ে উদিত হবে।

হালিমা সাদিয়ার ভাষায়, আমার বাহনজন্তুটি খুবই দুর্বল ছিল। অন্য মহিলাদের বাহনজন্তু হতে সবসময় পেছনে থাকত। কিন্তু যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলে নিয়ে আমি বাহনে চেপে বসলাম, জানি না। কোত্থেকে সে এতটা শক্তি পেল? সে এতটাই দ্রুত ছুটতে লাগল যে, অন্য মহিলাদের বাহনজন্তুগুলো তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারল না। এমন আজব ঘটনা দেখে আমি বুঝতে পারলাম আমেনা সত্যিই বলেছে।[২৬]

রহমতের দ্বিতীয় ঝলক

নবীজির আগমনে হালিমার অন্ধকার ঘর আলোকিত হওয়ার কিছুদিন যেতে না যেতেই তার সংসারে বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। এতদিন হালিমা ও তার স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থোপার্জন করেও সীমাহীন দুঃখদুর্দশা ও অসচ্ছলতায় দিন পার করছিলেন। আর এখন? যেন মাটিতে হাত লাগলেও তা স্বর্ণে পরিণত হচ্ছে। সবদিক থেকেই সুখ, সচ্ছলতা ও হাসি-আনন্দে তাদের দিন কাটতে লাগল। তাদের বকরিগুলো এই পরিমাণ দুধ দিতে লাগল যে, পরিবারের সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে পান করতে পারছিলেন। এই অবস্থা দেখে গোত্রের অন্যান্য লোকেরা তাদের রাখালদের বলেছিলেন, হালিমার বকরিগুলো যে চারণভূমিতে চরে, তোমরাও তোমাদের বকরিগুলোকে সেখানে চরাতে নিয়ে যাবে।

কী আর বলব! প্রিয় মুহাম্মাদের চাঁদমুখটাই তো এতটা আকর্ষণীয় ছিল যে, ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় অমন সুন্দর মুখখানা দেখে কার দিলে ভালোবাসার ঢেউ উঠবে না? একদিকে শারীরিক সৌন্দর্য, অন্যদিকে তাঁর আগমনে হালিমার ঘরের চিত্রই পালটে গিয়েছিল। তাই হালিমার ঘরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরযত্নের কমতি ছিল না। যেন শিশু মুহাম্মাদ এখন এ ঘরের রাজা, অন্যরা তাঁর সেবক।

---

২৬. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১২১-১২৫ (দারুল হাদিস)

মুবারক মুখে তাওহিদের বাণী

শিশুরা যখন একটু একটু করে বলতে শেখে, কে না জানে তখন মা-বাবার হৃদয় কতটা আনন্দে উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে? শিশু মুহাম্মাদও যখন এই বয়সে উপনীত হলেন, তখন তাঁর কচিমুখে 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'-এর ধ্বনি উচ্চারিত হলো। যখন কিছুটা বুঝতে শিখলেন, তখন খাবার খাওয়ার শুরুতে কিংবা কোনো কাজের সূচনায় অবশ্যই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পড়তেন। যে মুখ থেকে সদা সত্য ও ন্যায়ের বাণী উচ্চারিত হয়েছে, সে মুখ দিয়েই এমন অল্পবয়সে এই ধরনের বাক্য উচ্চারিত হওয়া তাঁর মহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।[২৭]

পরিবারের প্রতি ভালোবাসা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুধমা হালিমা সাদিয়াকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এমনকি নবুয়তপ্রাপ্তির পর একবার যখন হালিমা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তখন তিনি এতটাই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, দুধমায়ের আগমনের সংবাদ পেয়েই দ্রুত তাকে এগিয়ে আনতে গেলেন এবং নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে হালিমাকে বসতে দিলেন। কিছুদিন বাদে এক যুদ্ধে বনি সাদের কিছু লোক মুসলিমদের হাতে বন্দি হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুধমা হালিমার সুপারিশে তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিলেন। শিশুকালে তিনি যখন হালিমার ঘরে বেড়ে উঠছিলেন, কখনো দুধমা বা পরিবারের কাউকে নিজের ওপর অভিযোগের আঙুল তোলার সুযোগ দেননি। উলটো নিজের সুন্দর ব্যবহার ও উত্তম চরিত্রের কারণে পুরো বংশেই তিনি এতটা প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, ক্ষণিকের জন্যও তাঁর বিচ্ছেদ কারও সহ্য হতো না। শিশু মুহাম্মাদ তাঁর কচিমুখে সত্য ও সততার কথাগুলো এতটা সুন্দর করে বলতেন যে, কচিমুখের সরলতামাখা অমন মিষ্টি মিষ্টি কথায় সবাই কাবু হয়ে যেত। নিজের দুধ-ভাইবোনের প্রতিও তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। তিনি কখনো তাদের হৃদয় মলিন করেননি।

হালিমা সাদিয়া রা. বছরে দুবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় নিয়ে যেতেন। এর মাধ্যমে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

২৭. *খাসায়িসুল কুবরা*, ১/১০৩ (বাংলা)

সাল্লামের সম্মানিত মাতা আমেনার বিচ্ছেদের উত্তাপে শীতলতার পরশ বুলিয়ে দিতেন।

রহমতের মেঘের ছায়া

যেদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালিমা রা.-এর ঘর আলোকিত করেছিলেন, সেদিন থেকেই তাঁর সঙ্গে এমন সব অদ্ভুত এবং স্বভাববহির্ভূত ঘটনা ঘটতে লাগল যে, মানুষ তা দেখে হতবাক হয়ে আঙুল কামড়ে বসে থাকত।

একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুধবোন শাইমার সঙ্গে বের হয়ে কোথাও গেলেন। হালিমা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপস্থিতি টের পেয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর দুধবোনের সঙ্গে ঘরে ফিরতে দেখলেন। হালিমার কলিজায় যেন পানি এলো। তিনি শাইমাকে আচ্ছামতো বকুনি দিয়ে বললেন যে, এই ফুলের মতো শিশুকে কেন রোদের মধ্যে ঘুরিয়ে আনলে? শাইমা বলল, আম্মাজান, আমাদের গায়ে তো একটুও রোদ লাগেনি। যে পথ ধরে আমরা হাঁটছিলাম, একটি মেঘখণ্ড আমাদের ওপর ছায়া দিতে দিতে চলছিল। এমন কথা শুনে হালিমা তেমন আশ্চর্য হলেন না। কারণ, ইতিপূর্বে তিনি নিজেই এই ধরনের অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। ফলে তার বিশ্বাস ছিল, এই ছোট্ট শিশুটিই একদিন কোনো মহান মানুষে পরিণত হবে এবং মহান আল্লাহর দয়া ও রহমত সর্বদা তাঁর পাশে থাকবে।[২৮]

বক্ষ বিদীর্ণের আশ্চর্যজনক ঘটনা

হালিমা সাদিয়ার ঘরে থাকাকালীন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনাটি ঘটে। যা হালিমার ন্যায় সাহসী ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত একজন মহিলাকেও ভীষণ চিন্তিত করে ফেলে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কিছুটা বুঝতে শিখেছেন, তখন তিনি নিজের দুধভাইয়ের সঙ্গে বকরি চরাতে যেতেন। হালিমা যেতে খুব নিষেধ করতেন। কিন্তু তার লক্ষ্মী ছেলেটি বায়না ধরত, আম্মাজান! আমাকেও কিছু খেদমত করার সুযোগ দিন। কিছুটা ঘুরে

---

২৮. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/২৮৮; *আত-তবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সাদ*, ১/১৫২

বেড়ানোও হবে, বকরি চরানোও হবে। তখন তাঁর বয়স চার বা পাঁচ বছরের বেশি ছিল না।

মাঝখানে কিছু কথা

সুহৃদ পাঠক, এত অল্পবয়সেই এই মহান মনীষীর এমন সুউচ্চ মনোবলকে সন্দেহের চোখে দেখবেন না। আমার নিজের অতীত জীবনের দিকে তাকালেও এমন কিছু ঘটনার কথা স্মরণ হয়, যেগুলো আমার তিন-চার বছর বয়সের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যখন আমি আমার মা-বাবার সঙ্গে অনেক বড় বড় কাজে সহযোগিতা করার চেষ্টা করতাম। এটা তো আমাদের মতো বুজদিলদের কথা। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো এমন একজন মহান মনীষী যদি তাঁর শৈশবে মানুষের সাধ্যের বাইরে এমন কোনো কাজও করে দেখান, তাহলেও তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

প্রসিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিত শংকর আচার্য তার আট বছর বয়সেই চারটি বেদ পড়ে সেগুলোর দর্শনেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তার যখন দশ বছর বয়স, তখন পুরো হিন্দুস্তানে এমন কোনো হিন্দু পণ্ডিত ছিল না, যে এই নয়-দশ বছর বয়সের শিশুর সঙ্গে তর্ক করে বিজয়ী হবে। আসল কথা হলো, এই ক্ষণজন্মা মনীষী তার জন্ম থেকেই অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন।

দুজন সবুজ পোশাকধারী

একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুধভাইয়ের সঙ্গে পাহাড়ের পাদদেশে বকরি চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ দুজন সবুজ পোশাকধারী ব্যক্তি এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেল। সঙ্গে ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধভাই। সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটল। বাড়িতে এসে জানাল যে, দুজন সবুজ পোশাক পরিহিত লোক এসে আমাদের মক্কি ভাইকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে নিয়ে যায়। হালিমার পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গেল। পাগলের মতো ছুটতে থাকলেন পাহাড়ের দিকে। তার স্বামী হারেস ইবনে আবদুল্লাহ ও বনি সাদের আরও কিছু লোক এমন ঘটনা শুনে ভীষণ পেরেশান হয়ে হালিমার পিছু পিছু দৌড়াতে লাগলেন। পাহাড়ের নিকটে এসে তারা দেখলেন শিশু মুহাম্মাদ একটি টিলার ওপরে সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছে। হালিমা ও অন্যান্য লোকেরা যখন তার নিকটে এসে পৌঁছল, তখন অত্যন্ত চমৎকার এক সুঘ্রাণ তাদের নাকে অনুভব হলো। হালিমা দৌড়ে গিয়ে চাঁদের টুকরোকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। 'বাবা তোমার কী

হয়েছে' জানতে চাইলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, দুজন সবুজ পোশাকধারী ব্যক্তি আমাকে এখানে উঠিয়ে নিয়ে এসে আমার বুক চিরে ফেললেন। কিন্তু আমি একটুও ব্যথা পাইনি। তারা আমার বুক থেকে আমার হৃদপিণ্ড বের করে একটা স্বর্ণের পাত্রে রেখে জমজমের পানি দিয়ে তা ধুয়ে আবার আগের জায়গায় রেখে দিলেন। এরপর আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে উঠে গেলেন। হালিমা সাদিয়া শিশু মুহাম্মাদের জামা উঠিয়ে দেখলেন বুকে কোনো জখমের চিহ্ন নেই।[২৯]

বর্তমানে হিন্দুস্তানের গ্রাম্যলোকদের মতো জাহেলি যুগের আরবরাও বিভিন্ন ধরনের উদ্ভট রূপকথা ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। সন্দেহপূজারি এই সমস্ত মানুষ যখন এই ঘটনা শুনল, তখন তারা হালিমার হৃদয়ে এই কথা বদ্ধমূল করে দিলো যে, নিশ্চয় এটা কোনো জিন-ভূতের কাজ। অথবা কোনো জাদুকরের ভেলকি। তাই যত দ্রুত সম্ভব বাচ্চাকে কোনো গণকের কাছে নিয়ে যাও।

স্বভাবতই মহিলারা কিছুটা সন্দেহপূজারি হয়। তা ছাড়া জাহেলি যুগের একজন আরব গ্রাম্যবধূ আর কতক্ষণ মানুষের কথায় কান না দিয়ে বসে থাকতে পারেন? তিনিও ভাবলেন, যাই, কোনো গণকের কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দেখি তার মাধ্যমে এই ভূত বা প্রেতাত্মাটাকে দমন করতে পারি কি না।

গণকের নির্বুদ্ধিতা

সন্দেহের শিকার হয়ে হালিমা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলে নিয়ে একজন প্রসিদ্ধ গণকের কাছে গেলেন। বক্ষ বিদীর্ণের পুরো ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেন। গণক যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কপালে রুহানি নুরের ঝলক দেখল, মনে মনে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বুনল। মূলত সে পূর্বেকার অনেক কিতাবে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ, তাঁর গঠনাকৃতি ও নবুয়তের মহরের কথা পড়েছিল। যে কারণে শিশু মুহাম্মাদকে দেখেই সে বুঝতে পারল, এই শিশুটিই আগামী দিনের মহান বিপ্লবের জন্মদাতা। অন্তর্দৃষ্টিহীন এই সাম্প্রদায়িক গণক তার কল্পনার চোখে দেখতে পেল, পৃথিবীর খোলা আকাশের নিচে তাদের পরম পূজনীয় মূর্তিগুলো চরম অপদস্থ আর অপমানিত অবস্থায় ধূলিকণার ন্যায় উড়ছে।

---

২৯. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/২৮৮-২৮৯; *সহিহ মুসলিম* (বাবুল ইসরা) তবে *ইবনে হিশামে* 'সাদা পোশাকধারী' শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

মূর্খতার ওপর গড়ে ওঠা আরবের সব ধর্মই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। হতভাগা গণক যেন আর ভাবতে পারল না। পৃথিবীর বুকে এত বড় বিপ্লব ঘটবে সে মেনে নিতে পারছিল না। আসলে যারা সবসময় গোলামির মানসিকতা পোষণ করে, আজাদির পরিবর্তে সর্বদা গোলামিকেই তারা প্রাধান্য দেয়।

গণক যখন তার কল্পনার চোখে মূর্তিপূজার ধর্মের প্রতিটি ইটকে খসে খসে পড়তে দেখল, সীমাহীন পেরেশান ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক হাত শক্ত করে ধরে চিৎকার করতে শুরু করল, লোকেরা! কে কোথায় আছ? তাড়াতাড়ি এসে এই বাচ্চাকে হত্যা করো। একে কোনো সাধারণ শিশু মনে করো না। বড় হয়ে এই শিশু আমাদের দ্বীনধর্মের ভিত্তিই উপড়ে ফেলবে। এই ছোট্ট শিশুটিই এমন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে যে, পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাঁর মোকাবিলা করার সাহস পাবে না। তাই উত্তম হবে এখনই তরবারি দিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেলো।

হালিমা যখন তার এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য শুনলেন, রাগে ফেটে পড়লেন। তার চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরোতে লাগল। মেঘের মতো গর্জন দিয়ে তিনি বললেন, ছেড়ে দে জালেম! আমার ছেলের হাত ছেড়ে দে। জানি না তুই আমাদের থেকে কবেকার শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিস। আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুক।

হালিমার সাদিয়া রা. গণককে আচ্ছামতো বকাঝকা করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলে নিয়ে সীমাহীন আদর ও ভালোবাসায় তাঁর চেহারায় চুমু দিতে দিতে বাড়িতে ফিরে এলেন। চিরদিনের জন্য তিনি অন্তর থেকে এই সন্দেহ দূর করে দিলেন যে, আল্লাহ না করুন কোনো ভূতপ্রেত হয়তো তার ছেলের ওপর ভর করেছে।[৩০]

যে সত্তা মহামারিবিনাশী

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন চার বছর, তখন হালিমা রা.-এর এলাকায় মহামারি দেখা দিলো। ক্রমশ তা আশেপাশের এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ল। সবাই হালিমা রা.-কে পরামর্শ দিলো, এমন অবস্থায় মুহাম্মাদকে এখানে রাখা ঠিক হবে না। তুমি তাকে তাঁর মায়ের কাছে দিয়ে এসো।

হালিমা সবার কথামতো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় নিয়ে এলেন। আমেনার হাতে তার শিশুপুত্রকে দিয়ে বললেন, পল্লি

---

৩০. *খাসায়িসুল কুবরা*, (বাংলা) ১/১০৫; (অধ্যায় : দুগ্ধপানকালে প্রকাশিত মুজেজা)।

এলাকাগুলোতে মহামারি দেখা দিয়েছে। তাই আপনার কলিজার টুকরাকে আপনার কাছে রেখে যেতে এসেছি। এ কথা বলতে গিয়ে তার দুচোখ অশ্রুতে ভরে গেল। আমেনা তাকে বললেন, হালিমা, তুমি আমার এই ছেলেকে চেনো না। তাঁর অস্তিত্বটাই স্বয়ং মহামারিবিনাশী। কোনো ধরনের প্লেগ বা মহামারি তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বুকের মানিককে বুকের কাছে রাখার যে ব্যাকুলতা, তা আমারও আছে। কিন্তু তাই বলে সন্তানের শিক্ষা ও শারীরিক সুস্থতার ব্যাপারে আমি উদাসীন নই। যাও, তুমি তাকে গ্রামের মুক্ত বাতাসে নিয়ে গিয়ে লালনপালন করতে থাকো।

হালিমা রা. পুনরায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গ্রামে নিয়ে এলেন এবং আরও এক বছর তাঁর লালনপালন করলেন। এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের বুকে ফিরে এলেন।[৩১]

মাতৃক্রোড়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র জীবনের প্রথম পাঁচ বছর হালিমা সাদিয়া রা.-এর ভালোবাসার ছায়ায় গ্রামের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় কাটিয়ে দেন। এরপর নিজের মায়ের কাছে ফিরে আসেন। আমেনার স্বামী আবদুল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পূর্বে ইন্তেকাল করেন। বুকের মানিকের অমন মায়াবী মুখ আর মিষ্টি হাসিটাকেই স্বামীর স্মৃতি হিসাবে বুকে আগলে রেখে আমেনা জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। মাঝেমধ্যে মনে হতো, আহা! এ মায়ার বাঁধন বুঝি কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধান, মৃত্যু যে কারও পিছু ছাড়ে না।

প্রিয়তম স্বামীর বিরহের আগুন আমেনার পূতপবিত্র হৃদয়ে যেন দাউদাউ করে জ্বলছিল। ক্ষণে ক্ষণে প্রিয়তমের সেই মুখচ্ছবি আমেনার চোখের সামনে প্রজাপতির ন্যায় ওড়াউড়ি করত। স্বামীর যে স্মৃতি সদা তার দুচোখে ভাস্বর ছিল, প্রিয়পুত্রকে কাছে পেয়ে তা যেন হৃদয়ের আরও গভীর হতে কাছে ডাকছিল। এতদিন হৃদয়ের গহিন কোণে বিরহের যে আগুন নীরবে নিভৃতে থেমে থেমে জ্বলছিল, আজ যেন তা পূর্ণোদ্যমে প্রজ্বলিত হলো।

প্রিয়তমের শিয়রে

প্রিয়তমের বিরহজ্বালা আর না পাওয়ার ব্যাকুলতায় আরও একটি বছর অতিবাহিত হলো। আমেনা অনুভব করলেন, বুকের গহিনে এই বিরহজ্বালা

[৩১]. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/২৮৮

পোষা আর সম্ভব নয়। তাই প্রিয়তমের কবরে নিজের ভালোবাসার দুফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দিতে তিনি মক্কা হতে মদিনায় যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। কে জানে, হয়তো এতে করে হৃদয়ের ব্যাকুলতা কিছুটা হলেও কমবে! শিশু মুহাম্মাদ এই সফরে তাঁর মায়ের সঙ্গী হলেন।

বিচ্ছেদের অশ্রু

সামান্য সময়ের ব্যবধানে যে আমেনা তার প্রিয়তমের আদর-সোহাগ হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন, মৃত্যুর কালো ঠোকর যার বিশ্বস্ত যৌবনের পবিত্র ভালোবাসার স্বাপ্নিক ভুবনটাতে বিচ্ছেদের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল, সেই বিরহিনী আমেনা তার বুকে সীমাহীন দুঃখ-যাতনাকে দাফন করে ব্যথার পাহাড় বুকে নিয়ে নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে সঙ্গে করে স্বামীর কবরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আহা! সেই মুহূর্তে আমেনার হৃদয়ে যে শোকের মাতম উঠেছিল, খুব কাছের মানুষটির কবরের সামনে দাঁড়ানোর পর তার হৃদয়টা যে কীভাবে হুহু করে কেঁদে উঠেছিল, তার করুণ দুটি চোখের সেই বিলাপের ভাষা আমার এই অবুঝ কলমের দ্বারা কী করে লেখা সম্ভব! আমেনার দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে শুরু করল। ব্যাকুল হৃদয় যেন তখনই দেহত্যাগ করে এই কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়ার জন্য ছটফট শুরু করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অশ্রুসজল চোখে অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে দীর্ঘক্ষণ বাবার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হে দুনিয়াবাসী, দেখো, একদিন যিনি অসহায় আর এতিমদের একান্ত ভরসাস্থল হবেন, আজ তিনি পিতা হারিয়ে কতটা দুঃখভারাক্রান্ত! একদিন যে হৃদয় হবে হাজারো পেরেশান হৃদয়ের একমাত্র প্রশান্তিস্থল, ব্যথার পাহাড় ধারণ করে তা আজ কতটা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত! দেখো দুনিয়াবাসী দেখো! এটাই যে তাঁর জীবনের প্রথম মুহূর্ত ছিল, যখন তাঁর সেই দুটি চোখ দিয়েই শ্রাবণের অবিরত স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছিল। যে দুটি চোখের তারায় তারায় লুকিয়েছিল আগামী দিনের পৃথিবীকে সুখশান্তির বেহেশত বানিয়ে দেওয়ার দৃঢ়সংকল্প।

আমেনা চলে গেলেন প্রিয়তমের কাছে

আমেনা একমাস মদিনায় অবস্থান করেন। প্রতিদিন শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়তম স্বামীর কবর জিয়ারত করতে যেতেন। প্রিয়তমের শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজলে ভালোবাসার নাজরানা দিতেন। অতঃপর তিনি মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু হায়! ওপরওয়ালা যে ভিন্ন কিছু

চান। এতদিন যে মমতাময়ী মায়ের ভালোবাসার কোলকেই দোলনা বানিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেড়ে উঠছিলেন, আজ সেই দোলনাটাই যে হারিয়ে গেল? কীই-বা করবেন তিনি। কুদরত যে একদিন তাকে সব হারিয়ে নিঃস্ব করে ফেলবে। মক্কার পথে আবওয়া নামক স্থানে প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে আমেনাও পৌঁছে গেলেন প্রিয়তম স্বামীর সান্নিধ্যে। হ্যাঁ প্রিয় পাঠক, দুদিনের এই জীবনটাই তো প্রেমপিয়াসি আত্মাকে তার প্রেমিক হৃদয়ের আলিঙ্গন হতে দূরে রেখেছিল। কিন্তু না, আজ আর কোনো বাধা নেই, নেই কোনো দূরত্বের দেয়াল। মৃত্যু সব বাধা মুছে দিয়েছে।

দাদার কাছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

প্রিয় বন্ধু, প্রিয় পাঠক, একটু ভাবুন তো সেই ফুটফুটে শিশুটির কথা, জন্মের পরে দুচোখ মেলে যে তাঁর বাবাকে দেখেনি। একটু মিষ্টি স্বরে আব্বু বলে ডাকার সৌভাগ্য যার হয়নি। জন্মের পর দীর্ঘ পাঁচটি বছর যে তাঁর মায়ের কাছ থেকে দূরে ছিল। আজ মায়ের কোলে ফিরে আসতে না আসতেই আবারও সেই বিদায়ের ঘণ্টা। বিরহের সুর। সামান্য সময়ের জন্য দুচোখ বন্ধ করে একটু ভাবুন তো সেই শিশুটির কথা, মরুভূমির পথে যে তাঁর মমতাময়ী মাকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। কল্পনার ডানায় ভর করে আমি যেন চলে গেছি সেই তেরোশ বছর আগে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, মরুভূমির মরুপথের ধারে সদ্য তৈরি হওয়া এক কবর। যার এক কোণে বসে হুহু করে কাঁদছে এক ছোট্ট শিশু। মায়ের কবরের বালিতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে যে বলছে, মাগো! আব্বুকে তো দেখিইনি। তোমাকে যখন মনভরে একটু দেখার সুযোগ হলো, সেই তুমিও আমায় একা করে চলে গেলে মা!

মা-বাবা হারিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লেন, তখন সঙ্গ দিতে এগিয়ে এলেন দাদা আবদুল মুত্তালিব। নাতির সবকিছুর দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজের উত্তম আচরণ ও ভদ্রতার কারণে দাদার এতটাই প্রিয় ও বিশ্বস্ত হয়েছিলেন যে, আবদুল মুত্তালিবের যে আসনে তার পুত্রদেরও বসার অনুমতি ছিল না; নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি সেই আসনে বসাতেন। নাতির সুখশান্তি ও হাসি-আনন্দের প্রতি খেয়াল রাখতেন।[৩২]

---

[৩২]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১২৭; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২৯৭

এই দিনগুলোতেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এমন কিছু আশ্চর্যকর ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল, যার কারণে বংশের লোকদের হৃদয়ে তাঁর বড়ত্ব ও সম্মানের বিষয়টি আরও বেশি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের একটি আশ্চর্য ঘটনা নিচে উল্লেখ করছি।

আবদুল মুত্তালিবের কাছে থাকা অবস্থায় একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ ওঠা অসুখ হয়েছিল। লোকেরা দাদা আবদুল মুত্তালিবকে পরামর্শ দিলো, ওকাজ বাজারে একজন পাদরি বসবাস করেন। তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও ইবাদতগুজার ব্যক্তি। তুমি তার কাছে তোমার নাতিকে নিয়ে যাও।

তাদের কথামতো আবদুল মুত্তালিব প্রিয় নাতিকে কোলে নিয়ে ওকাজ বাজারের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সেখানে এসে পৌছলেন সন্ধ্যাবেলায়। পাদরির ব্যাপারে মানুষকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, এই পাদরি বছরের পর বছর নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ইবাদত করতে থাকেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব নাতিকে কোলে নিয়ে যখন পাদরির ঘরের সামনে পৌছলেন, দেখলেন সত্যিই তার ঘরের দরজা বন্ধ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ঘরের দরজা খুলে পাদরি ভীষণ আতঙ্কিত অবস্থায় হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। আবদুল মুত্তালিবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার কোলের ফুটফুটে শিশুটির চেহারার দিকে কিছুক্ষণ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, ছেলেটি কার? জবাবে আবদুল মুত্তালিব বললেন, ও আমার নাতি। তাঁর চোখ ওঠা অসুখ। তাই চিকিৎসার জন্য আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।

জবাবে পাদরি বললেন, আপনি আপনার আদরের নাতিকে এমন এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে এসেছেন, যার নিজেরই চিকিৎসার প্রয়োজন। হায়! আপনি তো তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বেখবর। তাঁর মুখের একটু থুথু নিয়ে তাঁর চোখে লাগিয়ে দিন। এরপর দেখুন কী হয়? আপনি কতই-না ভাগ্যবান যে, আপনার বংশে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, পুরো পূর্ব-পশ্চিমে যার প্রশংসা ও মহিমার আওয়াজ গুঞ্জরিত হবে। তাঁর পদতলেই দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণ লুটোপুটি খাবে।

আপনি যখন এসেছিলেন, তখন আমি ইবাদতে মশগুল ছিলাম। হঠাৎ ঘরের ভেতরে এমন ভূমিকম্প আরম্ভ হলো যে, যদি আমি বের না হতাম, তাহলে হয়তো এতক্ষণে ছাদের নিচে চাপা পড়ে মারা যেতাম।

অতঃপর দাদা আবদুল মুত্তালিব পাদরির নিকট হতে বিদায় নিলেন। পাদরির পরামর্শ অনুযায়ী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে থুথু নিয়ে চোখে লাগিয়ে দিলেন। ফলে সে রাতেই তিনি সুস্থ হয়ে যান।

প্রিয় পাঠক, এ তো ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান বুজুর্গির সামান্য নমুনা। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা আপনারা সিরাতের গ্রন্থগুলোতে খুঁজে পাবেন।

দাদার ইন্তেকাল

কুদরতের খাতায় এই মা-বাবাহারা ছেলেটির আরও কিছু অশ্রু বিসর্জন দেওয়ার বাকি ছিল। তাই তো নাতির দেখাশোনার দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার দুবছর পর আবদুল মুত্তালিবও পরপারে পাড়ি জমালেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাদার জানাজার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলেন আর তাঁর দুচোখ বেয়ে অবিরত অশ্রু ঝরছিল। হৃদয়টা যেন বিরহের আগুনে বেদনার অগ্নিশিখায় পরিণত হয়েছিল। এতটুকুন এক ছোট্ট শিশু কী করে এতটা কষ্টের ভার বইবে? জন্মের পর থেকেই কান্নারা যার পিছু ছাড়ছে না।

চাচার কোলে

মৃত্যুশয্যায় শায়িত আবদুল মুত্তালিব যখন দুনিয়ার জীবন থেকে নিরাশ হয়ে পড়লেন, তখন ছেলে আবু তালেবকে কাছে ডাকলেন এবং তার হাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তুলে দিলেন। সেইসঙ্গে জরুরি দিক-নির্দেশনা দিয়ে নাতির সমস্ত দায়িত্বের ভার ছেলে আবু তালেবের কাঁধেই অর্পণ করলেন।

আবদুল মুত্তালিবের অনেক ছেলে ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন, মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক তার আপনজনদের সঙ্গেই বেশি থাকে। তাই তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর আপন চাচার হাতে সোপর্দ করাকেই বেশি সমীচীন মনে করলেন। আবদুল মুত্তালিবের ঘরে কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ ও আবু তালেব একই মায়ের সন্তান ছিলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আবু তালেবের ভালোবাসা ও মায়া-স্নেহ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইসলামি ইতিহাসের পরতে পরতে যা সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কখনো ভাতিজার হৃদয়ে তিনি এতটুকু দুঃখের আঁচও লাগতে দেননি। মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতার সঙ্গে তিনি যে

অঙ্গীকার করেছিলেন, ক্ষণিকের জন্যও তা ভুলে যাননি। নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করে তিনি তা রক্ষা করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লালনপালনকে তিনি নিজের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। পৃথিবী সাক্ষী, চাচা আবু তালেব তাঁর দায়িত্বকে সর্বোত্তমরূপে আদায় করেছিলেন।

শামের সফর

শৈশবের সারল্য ও স্নিগ্ধতার বাগান থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার মহাসড়কে পা বাড়াতে শুরু করেছিলেন, তখন তিনি চাচা আবু তালেবের সঙ্গে ব্যবসার কাজে শামে[৩৩] সফর করেন। ব্যবসার কাজে আবু তালেব প্রায়ই শামে সফর করতেন। কারণ, শামের লোকদের সঙ্গেই মক্কাবাসীর ব্যবসায়িক সম্পর্ক ভালো ছিল।

আবু তালেব এত অল্পবয়সেই ভাতিজাকে সফরসঙ্গী করার কারণ ছিল। তিনি যখন শামের সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তার এই জনমদুখি ভাতিজা চাচার অল্প কদিনের এই বিচ্ছেদকেও যেন সইতে পারছিলেন না। জন্মের পর বেশ কয়েক বছর যাবৎ আপন মায়ের কোল থেকে দূরে ছিলেন। মায়ের ছেলে যখন মায়ের কোলে ফিরে এলো, মায়ের আদর-স্নেহ আর মমতায় যখন একটু বুকভরে শ্বাস নেওয়ার সময় হলো, তখন তিনিও তাঁকে একা করে চলে গেলেন। পরম নির্ভরতায় যে দাদার কোলে চেপে বসে ছিলেন, কিছুদিন না যেতেই তিনিও ওপারে পাড়ি জমালেন। ছোট্ট এই শিশুটির পৃথিবীটা যখন সন্ধ্যার কালো আঁধারে ছেয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই এগিয়ে এলেন চাচা আবু তালেব। পরম স্নেহ আর ভালোবাসায় যিনি কখনো ভাতিজাকে বুঝতে দেননি মা-বাবার অভাব। আজ তিনিও তাকে মক্কায় একা ফেলে চলে যাচ্ছেন সুদূর শামে। অবুঝ শিশুটি এই ব্যথা কী করে সইবে? তাই চাচা যখন সফরে রওয়ানা হওয়ার জন্য সওয়ারিতে আরোহণ করলেন, তখন ছোট্ট শিশু মুহাম্মাদ চাচার কাছে এসে কাঁদতে শুরু করলেন। চাচাকে ছেড়ে একা থাকতে না পারার কষ্টে তিনি

---

৩৩. **শাম :** রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ ও সমৃদ্ধ অংশ ছিল শাম। বর্তমানে যদিও আধুনিক সিরিয়াও শাম নামে পরিচিত; কিন্তু প্রাচীন শাম একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম, যার বিস্তৃতি ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর হতে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল পর্যন্ত। বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন (ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চলসহ পশ্চিম তীর ও গাজা) এবং আধুনিক সউদি আরবের আল-জাওফ প্রদেশ ও উত্তর সীমান্ত অঞ্চল শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল।-সম্পাদক

সীমাহীন ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। আবু তালেব তার প্রিয় ভাতিজার এমন মায়াবী দুচোখে অশ্রুর প্লাবন দেখে নিজেকে সংযত করতে পারলেন না। তাই দুহাতে ভাতিজাকে টেনে তুলে বুকের কাছে বসিয়ে দিলেন, সঙ্গী করে নিলেন দীর্ঘ সফরের। এভাবেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের প্রথম সফর শুরু করলেন। নতুন নতুন ভূমি আর মানুষদের দেখার শিশুমনের অদম্য কৌতূহল নিয়ে রওয়ানা হলেন আবাদ শহর ছেড়ে বিস্তৃত মরুভূমির পথে।[৩৪]

এই সময় নবীজির বয়স সম্ভবত বারো বছর ছিল। এর আগে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর আম্মাজানের সঙ্গে মদিনায় সফর করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছয় বছর ছিল।

পাদরি বাহিরা

পল্লির নির্ভেজাল আবহাওয়া আর সকাল-সন্ধ্যার মিষ্টি বাতাসে কাফেলা এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে। চাচার কোলে বসে বসে রাস্তার দুধারের মরুপ্রান্তর, পল্লি এলাকা আর বিচিত্র মানুষদের দেখতে দেখতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এগিয়ে চললেন শামের পথে। আবু তালেবের ভাতিজা শিশু মুহাম্মাদের প্রশংসনীয় গুণাবলি আর উত্তম চরিত্রে কাফেলার সকলে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে চললেন।

কাফেলা শামের বুছরা নামক এক এলাকায় যাত্রাবিরতি করল। সেখানে বাহিরা[৩৫] নামে এক দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী পাদরি ছিলেন। পূর্বেকার আসমানি গ্রন্থসমূহে যিনি শেষ নবীর নিদর্শনগুলো পড়েছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই পাদরি চমকে উঠলেন। ফুটফুটে এই শিশুটির চেহারায় তিনি দেখতে পেলেন আগামী দিনের নবুয়ত ও রেসালাতের ঝলক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত চাচা আবু তালেবকে তিনি নিজের কুটিরে দাওয়াত দিলেন। এই সুযোগে আবু তালেবের নিকট নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা ও বড়ত্বের কথা উল্লেখ করে পাদরি তাকে নিষেধ করলেন, যেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আর সামনের দিকে সফর না করেন। কারণ, প্রবল

---

৩৪. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১৩৬-১৩৭; (দারুল হাদিস, কায়রো)

৩৫. পাদরি বাহিরা : বুছরা (بصرى) বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক নগরীর জনৈক খ্রিষ্টান পাদরির নাম বাহিরা।-সম্পাদক

আশঙ্কা রয়েছে যে, সাম্প্রদায়িক ও কট্টর ইহুদিরা হয়তো তাকে চিনতে পেরে তাঁর কোনো ক্ষতি করে ফেলবে।

কোনো কোনো বর্ণনামতে আবু তালেব পাদরির এই পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে বুছরার বাজারেই ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রি করে ভাতিজাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। অন্য এক বর্ণনামতে, এক ব্যক্তির মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন এবং তিনি পণ্য নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। আমার জানামতে প্রথম বর্ণনাটিই বেশি নির্ভরযোগ্য। যাহোক, মোটকথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুছরা থেকে আর সামনে সফর করেননি।[৩৬]

একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ

যৌবনের সূচনালগ্নেই এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাকে দেখতে হলো কীভাবে মাতৃভূমির সন্তানেরা একে অন্যের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করে। এই যুদ্ধটি শুরু হয়েছিল মহররম মাসে। যেহেতু আরবদের রীতিতে এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহকে হারাম মনে করা হতো, তাই এই যুদ্ধটি 'ফিজার যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধি পায়। পৃথিবীর আর দশটা যুদ্ধের ন্যায় এই যুদ্ধটিও শুরু হয়েছিল খুবই সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না, বরং তা গোত্র-গোত্রের যুদ্ধে রূপ নিলো। কুরাইশের লোকদেরকেও এই যুদ্ধে অংশ নিতে হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও গোত্রের একজন নওজোয়ান যোদ্ধা হিসাবে রণসাজে সজ্জিত হয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল মানবের জন্য ভালোবাসায় টইটম্বুর। তাই তিনি নিজে কোনো শত্রুর গায়ে তরবারি চালনা হতে বিরত রইলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল শুধু চাচা আবু তালেবকে তির উঠিয়ে দেওয়া।[৩৭]

নবীজির অভ্যন্তরীণ গুণাবলি

বালকবয়সের সেই দুঃখ-যাতনার দিনগুলোতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে অসাধারণ মহত্ত্ব ও মর্যাদার কিছু নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছিল। যা শেষ বয়সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশ্বব্যাপী একক সুনাম-সুখ্যাতি বয়ে এনেছিল। খেলাধুলার বয়সেই তাঁর

---

৩৬. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১৩৬

৩৭. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১৩৯-১৪০

নুরানি চেহারায় পূর্ণতা ও যোগ্যতার এমন দ্যুতি চমকাচ্ছিল, যা বছরের পর বছর সাধনা ও ইবাদতের পরও মুনিঋষিদের অর্জিত হয় না। শৈশবের দিনগুলোর কথা আর কী বলব? এই সময়টা তো মানুষের অবুঝ ও সরলতামাখা সময়। যখন শিশুদেরকে কোনো ভুলের কারণে আইনি বা নৈতিকভাবেও কোনো শাস্তির মুখোমুখি হতে হয় না। আর মানুষের যৌবনের মোহময় দিনগুলো তো বাহ্যিক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা ও কামনার আঁধারে-অমানিশায় রূপ নেয়। সেই বয়সে অধিকাংশ যুবকই দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, দিবালোকের ন্যায় এ কথা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শৈশবের সেই অবুঝ দিনগুলোতেও এমন কোনো 'শিশুমনের ভুল' করেননি, যা এই বয়সে সাধারণ মানুষ অহরহ করে থাকে। সেই অবুঝ দিনগুলোতেও তাঁর বুঝ ও চিন্তাশক্তি এতটাই প্রখর ও উজ্জ্বল ছিল, আকাশের ওই দূর দিগন্তে মেঘের কোলে চোখ ধাঁধানো সূর্য যেমন প্রোজ্জ্বল। অবুঝ বয়সের সেই ছোট্ট মুহাম্মাদের কাছে যারা আসত, এক অপার্থিব প্রশান্তি ও হৃদয়ের আলো নিয়ে ফিরে যেত। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যৌবন? তা তো সেই স্থির ও প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় ছিল, যার কূলে কোনো উত্তাল তরঙ্গ আছড়ে পড়ে সবকিছু তছনছ করে দেয় না। যে সমুদ্রের স্রোত বাঁকা পথে গিয়ে নিজের দিক হারিয়ে বসে না। কামনা-বাসনার ঢেউ তোলা এই অবাধ্য দিনগুলোতেও তিনি সর্বোত্তম চরিত্রে নিজেকে আগলে রেখেছেন। তাই তো শিক্ষা ও সভ্যতার আলো বঞ্চিত সেই মুক্তমনা দুশ্চরিত্র ও মদ্যপায়ী মানুষগুলোর মধ্যে বসবাস করেও তাঁর ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রের কথা লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল। কোনো ধরনের অন্যায় বা ত্রুটিবিচ্যুতির কালো দাগ তিনি নিজের গায়ে লাগতে দেননি। বর্তমান সময়ের সামাজিক অবস্থা ও জাহেলি যুগের সেই বর্বর সামাজিক অবস্থাকে সামনে রেখে যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম আখলাক ও ভদ্রতার চিত্রগুলো দেখা হয়, তাহলে তাঁর সুমহান উদ্যম, সুদৃঢ় হিম্মত, ভালো কাজ ও স্বভাবজাত সরলতার বর্ণনা দিতে কলম অক্ষম হয়ে যাবে।

তাঁর পবিত্র আত্মা তো ছিল মুনিঋষি আর গণকদের সুউচ্চ ধ্যানধারণার চেয়েও মহান। এমন অসভ্য ও বর্বর সমাজে বসবাস করেও তার বিষক্রিয়া হতে তিনি নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন। ঠিক যেমন চন্দনবৃক্ষ তার ডালে ডালে অসংখ্য বিষধর সাপ পুষেও নিজেকে তাদের বিষক্রিয়া হতে মুক্ত রাখে।

হালিমার সাক্ষ্য

অন্যের প্রতি অপবাদ ও অহেতুক কথাবার্তায় জাহেলি যুগের আরবদের জুড়ি ছিল না। বড় বড় ব্যক্তিবর্গও এমন নিকৃষ্ট কাজ হতে বিরত থাকত না। ঠিক বর্তমান সময়ে আমাদের হিন্দুস্তানের সেই মূর্খ লোকদের ন্যায়, বিশ্রী গালমন্দ ছাড়া যারা কথাই বলতে পারে না। দুঃখজনক হলো, কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষের মুখ থেকেও আমরা এসব বিশ্রী গালাগাল শুনে অভ্যস্ত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা স্বভাবতই একটু অনুকরণপ্রিয় হয়। বড়দের কাছ থেকে দেখে দেখে শুনে শুনে তারা সবকিছু অনুকরণ করার চেষ্টা করে। যে কারণে তারা তাদের আশেপাশের বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হয়ে অবচেতন মনে সেটাকে তাদের আগামী জীবনের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে। তাই তো সন্তানদের সংশোধনের পূর্বে বাবা-মায়ের সংশোধন জরুরি।

আমার দৃষ্টিতে এই পৃথিবীর কোনো জাতি যদি জাতিগত উন্নতি, পূর্ণ সফলতা, সমৃদ্ধি ও নৈতিকতার স্বর্ণশিখরে পৌছতে চায়, তাহলে তাদেরকে এই মূলনীতি সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, ততদিন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির বৈবাহিক জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার অধিকার নেই, যতদিন না সে নিজের সন্তানদের লালনপালনের রীতিনীতি ও তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ অবগত ও উন্নত চরিত্রের অধিকারীর গুণ অর্জন করবে। অন্যথা অসংখ্য গুণিজনের নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করে হয়তো কেউ নিজের তরি সামলাতে পারবে কিন্তু অনেকেই গোমরাহির অথই সমুদ্রে হাবুডুবু খাবে।

ছেলেবেলায় হৃদয়ের গভীরে নাড়া দেওয়া বিভিন্ন ঘটনার প্রভাব বড় হওয়ার পর অনেক বিদ্যাবুদ্ধি অর্জনের পরও বাকি রয়ে যায়। কারণ, তখন নিজের বিবেকও সেসবের অনুসরণ করতে শুরু করে। মোটকথা, ছেলেবেলায় সঠিক শিক্ষাদীক্ষার অভাবে অধিকাংশ মানুষের জীবনই এতটা ক্ষতির সম্মুখীন হয় যে, কোনোভাবেই তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না।

এই দীর্ঘ আলোচনার পরে এবার আমার প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহাত্মার প্রশংসা করতে হবে। কারণ, সভ্যতা-ভব্যতাহীন এমন কলুষিত সমাজে বসবাস করার পরও তাঁর জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, যেটাকে সেই বিষাক্ত সমাজের প্রভাব বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর মুহূর্তগুলো তথা জীবনের প্রাথমিক দিনগুলো বনি সাদ গোত্রের এক মহিলা

হালিমার নিকটে অতিবাহিত করেছেন। নবীজির ব্যাপারে তাঁর এই দুধমায়ের সাক্ষ্য হলো, তিনি আরব্য মরুভূমির গ্রাম্য বেদুইনদের ঘরে জন্ম নেওয়া কোনো বালকের ন্যায় ছিলেন না। বরং নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি সবার চেয়ে আলাদা ছিলেন। তিনি বাচাল ও ভবঘুরে ছেলেপিলে থেকে সব সময় দূরে থাকতেন। তাঁর মুখ থেকে কেউ কখনো কোনো অশোভন বা মন্দ কথা শোনেনি। অতিরঞ্জিত খেলাধুলায় কখনো তিনি লিপ্ত হতেন না, যা অধিকাংশ শিশুদেরই অভ্যাস। সবসময় কোনো না কোনো ভালো বা উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকতেন। নিজের সঙ্গীসাথি ও পরিবার-পরিজনের সাধ্যমতো সহযোগিতা করতেন।[৩৮]

সুদৃঢ় সাহসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

দুধমায়ের নিকট থেকে তিনি যখন নিজের মমতাময়ী মায়ের কাছে ফিরে আসেন, তখন তাঁর বয়স পাঁচ বছরের বেশি ছিল না। এই অল্পবয়সেই তিনি উত্তম গুণাবলি ও সচ্চরিত্রের দ্বারা সবার হৃদয়রাজ্য জয় করে নিয়েছিলেন। ছয় বছর বয়সে তিনি যখন আপন মায়ের সঙ্গে মরহুম আব্বাজানের কবর জিয়ারত করতে যান, তখন সেখানে যে ঘরে অবস্থান করেছিলেন, তার সামনে একটি স্বচ্ছ পানির বড় পুকুর ছিল। মরুভূমিতে বেড়ে ওঠা শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই পুকুরে সাঁতার শিখেছিলেন।[৩৯] এত অল্পবয়সে এভাবে পুকুরে নেমে সাঁতার শেখার আগ্রহ সত্যিই সুদৃঢ় সাহসের বহিঃপ্রকাশ।

আমাদের এই দেশে যেসব মানুষ নদী অঞ্চলে বসবাস করে, তাদের কাছে হয়তো এটা তেমন কোনো বিষয় নয়। কিন্তু মরুভূমিতে বেড়ে ওঠা ছয় বছর বয়সী একটি ছোট্ট শিশুর ক্ষেত্রে এটা সত্যিই অসাধারণ। এই বয়সেই ভালো কিছু অর্জনের এমন মহৎ প্রেরণা তাঁর সুদৃঢ় সাহসের স্বীকৃতি দেয়।

একমাস সেখানে অবস্থান করার পর তিনি মায়ের সঙ্গে মাতৃভূমি মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন। স্মৃতির পাতায় এই দিনগুলোর কথা তিনি এতটাই সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন যে, হিজরতের পর (এই ঘটনার প্রায় ৪৭/৪৮ বছর পর) যখন তিনি মদিনায় আগমন করেন, তখন সাহাবিদের নিকট সেই পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একে একে সব ঘটনা বর্ণনা করতে থাকেন। সেই সময় যে বাড়িতে তিনি থাকতেন, তার নাম, এমনকি

---

৩৮. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/২৮৮

৩৯. *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*, ২/১২০

ছেলেবেলার খেলার সাথি একজন মেয়ের নামও তাঁর মনে ছিল। এর দ্বারাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসাধারণ স্মরণশক্তি সম্পর্কে অনুমান করা যায়।[৪০]

আবু তালেবের দাসীর সাক্ষ্য

আবু তালেবের এক দাসীর সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় আজও সংরক্ষিত হয়ে আছে। তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঘরেও কখনো কোনোকিছু দাবি করে খেতেন না। যে ধরনের খাবারই তাঁর সামনে রাখা হতো, দামি হোক বা সাদামাটা, তিনি তা হাসিমুখে গ্রহণ করতেন। নাক সিটকানো বা দোষ ধরার ঘৃণ্য প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। এর মাধ্যমেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গাম্ভীর্য, আত্মনিয়ন্ত্রণ, লজ্জা ও ধৈর্যশীলতার পরিচয়টা জানা যায়। জীবনব্যাপী তিনি এসব গুণের কারণে অনন্য ছিলেন।

আবু তালেবের ভূয়সীপ্রশংসা

আবু তালেব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দীর্ঘ সময় যাবৎ খুব কাছ থেকে দেখেছেন। আট বছর বয়সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে আসেন। পঁচিশ বছর বয়সে বিবাহের পর থেকে পৃথক থাকা শুরু করেন। তাঁর পুরো জীবনটি আবু তালেবের সামনে আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ছিল। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূয়সীপ্রশংসা করতেন। তার বক্তব্য হলো, মুহাম্মাদ ছেলেবেলায়ও কখনো কোনো [illegible] বা অযৌক্তিক কথা বলেনি। কোনো প্রকারের শিরকি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেনি। চাই নিজে সেখানে উপস্থিতির মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনোভাবে। তাঁর মুখ থেকে কেউ কখনো কোনো অসভ্য কথা শোনেনি। অসৎ চরিত্রের মানুষদের সঙ্গ হতে সে সবসময় দূরে থাকত।

নবীজি ছিলেন লজ্জাশীলতার মূর্তপ্রতীক

একবার অতিবৃষ্টির কারণে কাবাঘর কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই লোকেরা তা মেরামতের সিদ্ধান্ত নিলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় সামাজিক যেকোনো ভালো কাজে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার

---

৪০. *আল-জাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ*, ১/১৬৭-১৬৮ *খাসায়িসুল কুবরা*, (অধ্যায় : [illegible] থাকাকালীন মুজেজা)

সঙ্গে শরিক হতেন। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল সাত-দশ বছরের মাঝামাঝি। অন্যান্য লোকদের সঙ্গে তিনিও ইটের বোঝা বইতে লাগলেন। তিনি তখন লুঙ্গি পরিহিত ছিলেন। তাঁর চাচা আব্বাস রা. লুঙ্গির এক কোণে টান দিয়ে তা খুলে ফেললেন এবং সেটা ভাঁজ করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধে রাখতে চাইলেন, যাতে ইটের ঘর্ষণে কাঁধের চামড়া ছিলে না যায়। যখন শিশুদের উলঙ্গ হওয়াকে দোষের কিছু মনে করা হয় না। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে লজ্জাশীলতা এতটাই প্রবল ছিল যে, লুঙ্গি খুলতেই তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে আব্বাস রা. পুনরায় ভাতিজাকে লুঙ্গি পরিয়ে দিলেন।

হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক, তিনিই তো সেই মহান পুরুষ, পরবর্তী সময়ে যিনি লজ্জাকে ঈমানের অংশ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভাষ্যমতে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি কুমারী রমণীর মতো লাজুক ছিলেন।

সুহৃদ পাঠক, আপনিই বলুন। এত অল্পবয়সে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করা এবং সে কারণে নিজের শারীরিক কষ্টকেও পরোয়া না করা কি তাঁর সুদৃঢ় সাহস ও মহাত্মার পরিচয় দেয় না? এই বয়সটা তো আমাদের কাছে খেলাধুলার বয়স। জীবনের কঠিন দিকগুলো নিয়ে ভাবার সময় নয়।[৪১]

বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী উপাধি লাভ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম আখলাক, হৃদয়ের পবিত্রতা, সুদৃঢ় হিম্মত ও ভালো কাজের অসংখ্য ঘটনা ইতিহাস ও সিরাতের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় একাধিক ঘটনা উল্লেখ না করে শুধু এতটুকু বলে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করছি যে, তাঁর সততা ও আমানতদারির কথা এতটাই প্রসিদ্ধি পেয়েছিল যে, মক্কার লোকেরা তাদের দামি দামি স্বর্ণালংকার, দিনার-দিরহাম ও মূল্যবান বস্ত্রাদি তাঁর কাছে আমানত রেখে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হতো যে, আমরা আমাদের সম্পদ সবচেয়ে সংরক্ষিত স্থানে আমানত রেখেছি। ব্যবসার ক্ষেত্রে তো তাঁর সততা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা শহরের মানুষের মুখে মুখে ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উত্তম গুণাবলি ও সচ্চরিত্রের কারণে মক্কার

---

৪১. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৪ (কাবা নির্মাণ)

অহংকারী মানুষগুলো, যারা কখনো কারও নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারত না; তারাই তাকে আল-আমিন (পরম বিশ্বস্ত) ও আস-সাদিক (সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত করতে বাধ্য হয়েছিল।

বিয়ে মুবারক

সেদিনের সেই শিশু মুহাম্মাদ তাঁর শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে আজ টগবগে যুবক। বয়সটা বিবাহের। কিন্তু লাজুক এই মানুষটি তাঁর লজ্জার কারণে জীবন-সঙ্গিনীর কথা কখনো কাউকে বলেননি। ওপরওয়ালা তো সবই দেখেন এবং বুঝেন। তাই কুদরত তাঁর ব্যবস্থা করে দিলো। তাও আবার যেকোনো মহিলা নয়, মক্কানগরীর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও পুণ্যবতী এক নারীর সঙ্গে।

খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রা.। পবিত্র মক্কা নগরীর এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। সোনারুপা ছিল তার হাতের ময়লা। নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে জানা যায়, পুরো কুরাইশের ব্যবসায়িক সম্পদ যে পরিমাণ ছিল, খাদিজা রা.-এর একারই ছিল তার সমপরিমাণ ব্যবসায়িক সম্পদ।

বাহ্যিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আত্মিকভাবেও সচ্ছল ছিলেন। নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা, সততা, উত্তম আচরণ, আল্লাহপ্রেম ও আল্লাহভীতির ন্যায় উত্তম গুণাবলির কারণে মানুষের নিকটে তিনি 'তাহেরা' (পবিত্র নারী)-এর ন্যায় সম্মানজনক উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রথমে আহালা নাব্বাশ ইবনে জারারাহ তামিমি নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সংসারে হালা ও হিন্দ নামক দুই ছেলে খাদিজার কোল আলোকিত করেন। এরপরে মৃত্যুর ভয়াল থাবা আহালা নাব্বাশকে খাদিজার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। এরপর আতিক ইবনে আয়েদ মাখজুমি নামক অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিচ্ছেদের কালো থাবা তাকেও ছিনিয়ে নিলো। শোকাতুর খাদিজার নিকটে দুনিয়া ও তার ভোগসামগ্রী অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে পড়ল। সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি ইবাদত-বন্দেগিতে দিন কাটাতে শুরু করলেন। নিজের বাবার ব্যবসার দিকটি ছাড়া দুনিয়ার অন্যান্য কারবার হতে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। মক্কার প্রসিদ্ধ ধনীর দুলালরা ও মর্যাদাবান নেতৃবর্গ অর্থ ও আত্মার ধনী এই পবিত্র নারীকে বিয়ে করতে উদগ্রীব হয়ে ছিল। অনেক নেতা ও আমির বিয়ের আবেদন করল। কিন্তু খাদিজা সব প্রত্যাখ্যান করলেন।

আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হওয়ার কারণে তিনি অধিকাংশ সময় দুনিয়াত্যাগী, দরবেশ ও আবেদ লোকদের শিক্ষা ও বরকত লাভের চেষ্টা করতেন। একদিনের ঘটনা। তিনি নিজের বালাখানায় বসে মনোযোগ দিয়ে এক পাদরির কথা শুনছিলেন। এমন সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। পাদরি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ইঙ্গিত করে খাদিজাকে বললেন, এই পবিত্র যুবক একদিন মানমর্যাদা ও আভিজাত্যের আকাশে ঝলমলে সূর্য হয়ে উদিত হবে। পুরো পূর্ব-পশ্চিম তাঁর আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে। খাদিজা রা. অত্যন্ত কৌতূহল ও উৎসাহ নিয়ে এই সুদর্শন ও ঋজুভঙ্গিমায় হেঁটে চলা যুবকটির দিকে তাকালেন। যুবকের প্রতিটি ভঙ্গিই যেন তাঁর হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়ে গেল। এভাবেই কেটে যায় বেশ কিছুদিন। একরাতে তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন। যার ব্যাখ্যায় এমন অভূতপূর্ব আনন্দ ও খুশি লুকিয়ে ছিল যে, কলমের ভাষায় তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি দেখেন, পূর্ণিমার চাঁদ তার কোলে এসে বসেছে। যার আলোকচ্ছটায় পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি ভূমি যেন একেকটি আলো ঝলমল পর্বতে পরিণত হয়েছে। খাদিজা রা. এই স্বপ্ন পাদরির কাছে বর্ণনা করলেন। পাদরি ব্যাখ্যা করলেন, অচিরেই খাতামুল আম্বিয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

এভাবেই কেটে যায় দিনগুলো। সেদিনের সেই সুদর্শন যুবকটির প্রতি কৌতূহল ও আগ্রহ ধীরে ধীরে খাদিজার হৃদয়ে ভালোবাসার টইটম্বুর সাগরে পরিণত হলো। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিনিয়ত তিনি কল্পনার চোখে সেই সুদর্শন যুবকটির চেহারা দেখতে লাগলেন। যার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অভ্যন্তরীণ যোগ্যতার কাছে একদিন পুরো পৃথিবী মাথানত করবে।

খাদিজার মনোনয়ন

খাদিজা কুরাইশদের ব্যবসায়িক কাফেলার সঙ্গে নিজের ব্যবসার সম্পদও শামে পাঠাতেন। ব্যবসার যাবতীয় কাজ দেখাশোনার জন্য তিনি এমন একজন ধার্মিক ও বিশ্বস্ত লোক খুঁজছিলেন, যিনি তার সম্পদে ইচ্ছামাফিক খরচ করবেন, তবে অপচয় বা খেয়ানত করবেন না।

ততদিনে প্রিয় মুহাম্মাদের ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততার খবর শহরে-বন্দরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালেব ও আব্বাস রা. যখন খাদিজার নিকটে তাদের ভাতিজাকে ব্যবসায় অংশীদার করার প্রস্তাব রাখলেন, তখন তার খুশির অন্ত ছিল না। তিনি আনন্দচিত্তে এই

প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যবসার সম্পদ নিয়ে কুরাইশদের কাফেলার সঙ্গে শামের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।

এই সফরে খাদিজা রা.-এর দুই গোলাম মাইসারা ও নাসেহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলেন। খাদিজা তাদেরকে কঠোরভাবে বলে দিলেন, যেন কোনোভাবেই সফরে তাঁর কষ্ট না হয়। সেই সঙ্গে এটাও বলে দিলেন, তোমরা তাঁর প্রতিটি ওঠাবসা, চলাফেরা ও রুচি-প্রকৃতি ইত্যাদি গভীরভাবে জানার এবং বোঝার চেষ্টা করবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সফরে সর্বোত্তমভাবে নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করলেন। তাঁর খাদেমদ্বয়ও নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে সদা সচেতন ছিলেন।

কিছুদিন পর শামে বেচাকেনা শেষ করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ফিরে এলেন। এই সফরে তিনি এত বেশি লাভবান হয়েছিলেন যে, কেউ তা ধারণাও করতে পারেনি। খাদিজা রা. সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পণ্যবোঝাই দুটি উট, একশ আশরাফি ও একশ রৌপ্যমুদ্রা উপহার দিলেন।

আকাঙ্ক্ষার পাগলা ঘোড়ায় আরও একটি চাবুকের আঘাত

খাদিজা রা. মাইসারা ও নাসেহকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা আদায়ে তারা কোনোপ্রকার ত্রুটি করেনি। ফিরে আসার পর তিনি তাদেরকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাবচরিত্র ও চলাফেরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। প্রত্যুত্তরে তারা তাঁর পবিত্র আখলাক, সচ্চরিত্র, সত্যবাদিতা ও উত্তম গুণাবলির এমন বিবরণ দিলো যে, খাদিজার ভালোবাসার ছাইচাপা আগুনে যেন কেউ নাড়া দিতে শুরু করল। আনন্দের আতিশয্যে তিনি গোলাম মাইসারাকে বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন দিয়ে আজাদ করে দিলেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। খাদিজা রা.-এর প্রস্তাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তা করে দেখলেন, কোথায় মক্কার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধনী খাদিজা, আর কোথায় আমার ন্যায় এক দীনদরিদ্র, অসহায়-এতিম? তাকে দেওয়ার মতো আমার কীই-বা আছে? এসব চিন্তা করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজাকে বললেন, খাদিজা! আজকের এই দিনে তুমি একজন রানির চেয়ে কম কীসে? আর আমি? এক অসহায়ের কোলে বেড়ে ওঠা নওজোয়ান। যার মা শুকনো গোশত খেয়ে জীবনটা পার করে দিয়েছেন। বলো, কী করে সম্ভব আমাদের এই মিলন?

হায়! এ তুমি কী শোনালে? চাই না আমি এই তুচ্ছ সম্পদ, ধনদৌলত, যে ধনে হবে না আমার প্রিয়জনের মিলন। যে সম্পদে পূর্ণ হবে না আমার সাধন, সে ধন তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ, চাই না আমি এমন ধন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খাদিজার এমন গভীর ভালোবাসা অনুভব করলেন, বিয়ের প্রস্তাব কবুল করে খাদিজার ভালোবাসার বাগানে বসন্তের ফুল ফোটালেন। বর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচারা কনে খাদিজার রা.-এর পিতার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বরের চাচা আবু তালেব বিবাহের খুতবা পাঠ করলেন। খাদিজা নিজের সম্পদ হতেই মহর নির্ধারণ করলেন।[৪২]

ফুলে ফুলে ভরা দাম্পত্যজীবন

শুভবিবাহের শুভকাজ সমাপ্ত হলো। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা শেষে মিলনের শুভক্ষণ এসে গেল। ভালোবাসার বাঁধনে দুটি প্রাণ একীভূত হয়ে গেল। যেন দুটি দেহে একই প্রাণ। দুটি ফুলের একই ঘ্রাণ।

বৈবাহিক জীবনের রঙিন উদ্যানে প্রবেশ করা তো সহজ। কিন্তু একজন মালি তার সমস্ত দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করে বাগানটিকে ফুলে-ফলে ভরিয়ে দিয়ে জান্নাতি বাগানে পরিণত করা কোনো সহজ কাজ নয়।

মানুষ বলে শুরু করাটা কঠিন।

সত্য তো হলো, শুরুটাকে একটি সুন্দর সমাপ্তি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াটাই বড় কঠিন।

ইতিহাস সাক্ষী, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা.-এর দাম্পত্যজীবনের বসন্ত-উদ্যান পরস্পরের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও সম্প্রীতির পুষ্পসৌরভে সুরভিত ছিল। এ তো ছিল সেই আত্মিক ভালোবাসার বাগান, যেখানে কোনো দৈহিক চাহিদার ঘ্রাণ পাওয়া যেত না। বয়সের পার্থক্যের তো তখনই কোনো মূল্য থাকে, পরস্পর যখন দৈহিক আনন্দের আকাঙ্ক্ষী হয়। বৈবাহিক জীবনকে যখন ভোগবিলাসিতার জীবন নয়, বরং অসংখ্য গুরুদায়িত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ এক জীবন মনে করা হবে, তখন স্বামী-স্ত্রীর হৃদয় একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও

---

৪২. কোনো কোনো বর্ণনা বোঝা যায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত চাচা আবু তালেব নিজ সম্পদ হতে মহর আদায় করেছিলেন এবং মহর হিসাবে ২০টি উট প্রদানের কথা পাওয়া যায়। দেখুন, *সিরাতে ইবনে হিশাম* ১/১৪২

কল্যাণকামিতায় টইটম্বুর হয়ে যাবে। যে ভালোবাসা কখনো নিঃশেষ হওয়ার নয়। এমন পূতপবিত্র ভালোবাসার মায়াজালে আবদ্ধ ছিল প্রিয় মুহাম্মাদ ও খাদিজার দাম্পত্যজীবন।

৬৫ বছর বয়সে খাদিজা রা. নিজের প্রিয়তম স্বামীকে চিরবিদায় জানিয়ে এক টুকরো জমিনে নীরবে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আশেক স্বামীর হৃদয়ের গভীরে তিনি যে ভালোবাসার অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিলেন, তা যে তাঁর সঙ্গে দাফন হয়নি? কত-না ভালো হতো যদি তিনি নিজের ওই সাদা কাফনের সঙ্গে ভালোবাসার এই সুখময় স্মৃতিগুলোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন! কিন্তু না, তিনি তা করেননি। নিজে তো চলে গিয়েছিলেন, অথচ রেখে যান সেই স্মৃতিগুলো। প্রিয়তম স্বামীর বুকে বিরহের যে আগুন তিনি জ্বেলেছিলেন, সারাটি জীবন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুকের ভেতরে তা অনুভব করেছেন। থেমে থেমে জ্বলে ওঠা সেই আগুনের উষ্ণতায় তাঁর সজল দুচোখ খুঁজে বেড়াত ফেলে আসা সেই সোনালি দিনগুলো, সেই আলোকিত মানুষটিকে। কত-না ঝড়তুফান, যুদ্ধবিগ্রহ এই বুকের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে, অথচ কেউ পারেনি সেই ধোঁয়া ওঠা আগুন নেভাতে। বদর, উহুদ আর খন্দকের ন্যায় পৃথিবী উলটে দেওয়া কতগুলো ঝড়তুফান এলো গেল! অথচ হৃদয়ের গহিন কোণে যে পোষা পাখিটি বাসা বেঁধেছিল, তার বাসাটি কখনো এতটুকু হেলে যায়নি।

এরপর কত কী হয়ে গেল! নদীতে কত জল বয়ে গেল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে পরমা সুন্দরী কুমারী রমণীগণ এলেন। যার সৌন্দর্যে আকাশের চন্দ্র-সূর্যও বুঝি লজ্জা পায়। কিন্তু তখনো নবীজির সরল হৃদয়ে ভালোবাসার প্রথম রানির মধুময় স্মৃতিগুলো যেন রিনিঝিনি শব্দ করত। তিনি যখন খাদিজার কথা স্মরণ করতেন, যেন কল্পনার ডানায় ভর করে অনেক দূরের কোনো রঙিন স্বপ্নের দেশে হারিয়ে যেতেন। প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মরণে যখন তার কোমল হৃদয়ে ভালোবাসার ঢেউ উঠত, নিজের অজান্তেই দুচোখে বিরহের অশ্রুরা দানা বাঁধত।

ব্যথাভরা হৃদয় আর চোখভরা নোনাজল,
প্রভু জানে কার কথা ভাবি আমি সারাক্ষণ।

একবার পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রী আয়েশা রা.-এর (যাকে বিবাহ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ ছিল) একজন প্রবীণের প্রতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন সীমাহীন ভালোবাসা ও স্মৃতিচারণ দেখে বেশ রাগ হয়েছিল। চরম বিরক্তি নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে

তাঁর চেয়েও উত্তম কোনো স্ত্রী দেননি? এরপরও কেন আপনি একজন বুড়িকে এতটা স্মরণ করেন?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিয়েছিলেন, অসম্ভব, আমি যখন চরম দারিদ্র্যের ধু-ধু মরুভূমিতে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছিলাম তখন খাদিজা আমাকে বিয়ে করে ধনসম্পদের এক রঙিন উদ্যানে নিয়ে বসিয়েছিল। পুরো পৃথিবী যখন আমাকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী বলে গালি দিচ্ছিল, একমাত্র আমার খাদিজাই আমাকে সত্যায়ন করেছে। মানুষ যখন আমার সত্য ও ন্যায়ের দাওয়াতকে চরম লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে, আমার খাদিজা আমার পয়গামের সামনে মাথানত করে দিয়েছে।[৪৩]

প্রিয় পাঠক, দেখুন, যে ভালোবাসা দেহের সীমা অতিক্রম করে আত্মার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, মৃত্যুর পরও যুগ যুগ ধরে কীভাবে তা প্রেমাস্পদের হৃদয়বন্দরে ক্ষণে ক্ষণে নোঙর ফেলতে থাকে। এই ধরনের ভালোবাসা মানুষকে পৃথিবীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে না, বরং মানুষের আত্মিক উন্নয়নের জন্যও এক সোনালি সিঁড়ির ভূমিকা রাখে।

Learn, by a mortal yearning, to ascend—
Seeking a higher object. Love was given,
Encouraged, sanctioned, chiefly for that end;
For this the passion to excess was driven—
That self might be annulled: her bondage prove
The fetters of a dream opposed to love.—

কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ[৪৪] নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোতে এই বাস্তবতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন!

ধ্বংসের আবেগ থেকে একটি উন্নতির পথের দীক্ষা,
ভালোবাসার ইচ্ছাগুলোর মধ্যে লুকিয়ে ছিল এই গোপন রহস্যের চাবিকাঠি।
ভালোবাসার জন্ম, প্রতিপালন ও তার বেড়ে ওঠা
সেগুলো বাস্তবায়নে সৃষ্টিকর্তার মর্জি হলো আত্মবিসর্জন।
হৃদয়ের দাসত্ব তো ছিল একটা স্বপ্নের শৃঙ্খল,
ভালোবাসার উদ্দেশ্য হাতছাড়া হওয়ার এটা ছিল একটা বিশ্লেষণ।

---

৪৩. *মিশকাতুল মাসাবিহ*, ৬১৮৬

৪৪. উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (ইংরেজি : William Wordsworth; ৭ এপ্রিল ১৭৭০-২৩ এপ্রিল ১৮৫০) ছিলেন একজন অন্যতম ইংরেজ রোমান্টিক কবি।

উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা.-এর তুলনাহীন ভালোবাসা

ভালোবাসার পাগলামি একবার যাকে পেয়ে বসে, পুরো পৃথিবীর সবকিছুই তার কাছে প্রেমাস্পদের তুলনায় অতি তুচ্ছ মনে হতে থাকে। প্রিয়জন চোখের আড়াল হলেই যেন হৃদয়ের ভেতরটা বিরহের অনলে খই ফুটতে শুরু করে। প্রতিক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত কেটে যায় হা-হুতাশ, জ্বালা-যাতনা আর বিমর্ষ নিঃসঙ্গতায়।

সেই ভালোবাসাতেই তো রয়েছে হৃদয়ের প্রশান্তি ও আত্মার পরিতৃপ্তি; যে ভালোবাসায় দুজন দুজনকে কাছে পেতে চায়। দুটি হৃদয়ই যেখানে একই দেহে বাসা বাঁধতে চায়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর ভালোবাসা এমন অসাধারণ ও তুলনাহীন ছিল যে, তা প্রেম-ভালোবাসার ইতিহাসে সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে। নবীজির হৃদয়ে যদি প্রিয়তমা বধূর ভালোবাসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হতো, তাহলে খাদিজার হৃদয়ও কোনো বরফের টুকরো ছিল না। তাঁর হৃদয়কোণেও প্রতিনিয়ত অসংখ্য বিজলি চমকাত।

প্রিয় পাঠক, আমার এই কথাগুলো কোনো কাব্যের অতিরঞ্জন নয়। নয় কোনো ভক্ত হৃদয়ের বাড়াবাড়ি। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে খাদিজার ভালোবাসা নিতান্ত কোনো সম্পর্ক বা দুটি হৃদয়ের ভালোবাসার ওপরই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সেই ভালোবাসা ছিল সীমাহীন ব্যাকুলতা, দুজন-দুজনার অকৃত্রিম ভালো লাগার ও ভালোবাসার। কাছের মানুষটিকে আরও কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা, প্রিয়জনের পদতলে ধন-মন সঁপে দেওয়ার আকুলতা। খাদিজা রা. নিজের সমস্ত ধনদৌলত ও স্বর্ণালংকার প্রিয়তমের পদতলে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার এই বিখ্যাত ব্যবসায়ী মহিলার সমস্ত সম্পদ পানির ন্যায় অকাতরে গরিব, দুঃখী ও অসহায় মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ তিল তিল করে গড়ে তোলা এই বিপুল সম্পদ এভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া দেখেও খাদিজা রা. টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি। স্বামীর সুখই তার একমাত্র চাওয়া ছিল। প্রিয়তম যে কাজে খুশি হন, সে কাজেই তার পরিতৃপ্তি।

মহিলারা সবকিছুই নীরবে সহ্য করে নিতে পারে। কিন্তু সতিনের জ্বালাতন কখনো সহ্য করতে পারে না। স্বামীর ভিটামাটি ভাগাভাগি করতে তারা

প্রস্তুত, কিন্তু স্বামীর ভালোবাসার ভাগ কাউকে দিতে রাজি নয়। অথচ খাদিজা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসায় এতটাই মজে ছিলেন যে, প্রিয়তমের ভালোবাসার বিনিময়ে তিনি সতিনের কষ্ট সহ্য করতে শুধু প্রস্তুতই ছিলেন না; বরং এতে উৎফুল্ল ছিলেন!

একদিনের ঘটনা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, জান্নাতে তুমিসহ আমার অন্যান্য স্ত্রী আমার সঙ্গে থাকবে। এই কথা শুনেই তিনি মুচকি হেসে জবাব দিলেন, বারে, এতে আশ্চর্যের কী আছে? রাজাবাদশাহদের তো অনেক বেগম সাহেবা থাকে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি আদেশ পালনকেই তিনি নিজের দুনিয়া-আখেরাতের সর্বোচ্চ সম্মান মনে করতেন। প্রতিক্ষণ, প্রতিনিয়ত এই ভেবে তার বুকটা গর্বে ফুলে উঠত যে, এমন একজন মানুষকে তিনি জীবনসঙ্গী হিসাবে পেয়েছেন, যার পবিত্র পদতলে দ্বীন-দুনিয়ার সমস্ত বরকত ও কল্যাণ বিদ্যমান। যার অস্তিত্বই পুরো সৃষ্টিজীবের জন্য গৌরবের।

কুফরের আঁধারে ঈমানের আলো

আকিদা, বিশ্বাস, ইবাদত, লেনদেন, সামাজিক জীবনযাপন, শিষ্টাচার ও আত্মার পরিশুদ্ধির সহিহ ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার আলোকে এই বিশ্বমানবতাকে যিনি পথ দেখিয়েছেন, সেই মহান মানবের জন্মের সময় আরব উপদ্বীপ মূর্তিপূজার আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। সভ্যতা ও শিষ্টাচারের এমন কোনো প্রদীপ সেখানে ছিল না, যা আঁধারে ছেয়ে যাওয়া এই জনপদে আলোর ফেরি করবে। এমন কোনো রাহবার ছিলেন না, জীবনের এই ক্লান্তিহীন চলার পথে দিগ্‌ভ্রান্ত মুসাফিরকে যিনি সঠিক পথের দিশা দেবেন। সততা ও বাস্তবতার অমিয় সুধা পান করে পরিতৃপ্ত হওয়ার মতো কোনো তৃষ্ণার্ত হৃদয় ছিল না। কুফর, শিরক, গোমরাহি, অজ্ঞতা ও মিথ্যার পচা পানিতে সবাই বুঁদ হয়ে পড়েছিল। এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অপ্রতিরোধ্য তুফানে এই মহান হেদায়েতের কান্ডারি এমন এক অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন যে, পুরো আরবজাতিকে তিনি পরিবর্তন করে দিয়েছেন। সভ্যতা ও নৈতিকতাহীন এই কালো সময়ে তিনি সচ্চরিত্র ও উত্তম গুণাবলির এক অত্যুজ্জ্বল সূর্য হয়ে আরবের আকাশে দ্যুতি ছড়িয়েছেন। মিথ্যার রঙিন চশমা পরিহিত লোকদের চর্মচক্ষু তাঁর উত্তম গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের চোখ ধাঁধানো তীব্র আলোকচ্ছটায় অন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি যখন শৈশবের ফুলে ফুলে সুরভিত বাগানের ফুটন্ত গোলাপ ছিলেন, তখনও তিনি উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচারের যে অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

স্থাপন করেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর পবিত্র বুকে ভদ্রতা ও শালীনতার এমন অতি মূল্যবান হিরে, জহরত ও মণি-মুক্তার ভান্ডার ছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেলেও যার চোখ ধাঁধানো আলো এতটুকুও হ্রাস পায়নি। মানবতার প্রতিমূর্তি হয়ে তিনি বিস্তৃত আরব মরুভূমির কুফরের আঁধার কুঠরিতে আলো হয়ে এসেছিলেন। তাঁর দৈহিক এবং আত্মিক সৌন্দর্য এমন মনোহারিণী ফুল ছিল, যার হৃদয়কাড়া সুবাসে পৃথিবীর প্রতিটি হৃদয় সুশোভিত হয়েছে। তাঁর অস্তিত্বই এমন এক প্রোজ্জ্বল সূর্য ছিল, যা কুফর ও মিথ্যার তিমিরাচ্ছন্ন রাতকে আলোয় আলোয় ভরে দিয়ে শুধু আরবভূমিই নয়, পুরো দুনিয়াকেই আলোকিত করেছে। তখনও তাঁর হৃদয়-আকাশে রেসালাতের সূর্য তার পূর্ণ আলো নিয়ে বিকশিত হয়নি। তখনও তিনি জানতেন না যে, তিনি নতুন কী বিপ্লব সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন! অথচ তখনও তাঁর পবিত্র হৃদয়ে আল্লাহর নুর এবং আসমানি তাজাল্লির বসত ছিল। যে নুরে চারদিক আলোকিত হয়ে যেত। ফলে মিথ্যার তিমির রাতে পথ চলেও তিনি দিগ্‌ভ্রান্ত হননি। ভ্রষ্টতার পৃথিবীতে বসবাস করেও তিনি নিজের পবিত্র রুহের স্বচ্ছ চাদরে কোনো ধরনের কুফর, শিরক ও গোমরাহির কাদা লাগতে দেননি।

এটা এমন এক মহাসত্য, যে ব্যাপারে ইসলামবিরোধীরাও একমত। সাম্প্রদায়িকতার বিষের নীল স্রোত যাদের শরীরের রক্তে প্রবাহিত হয়, তারাও তাঁর আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান ও সভ্যতা-সততার চাদরে মোড়া জীবনের ব্যাপারে প্রশংসা ও স্বীকারোক্তির ফুল বিছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পবিত্র পদতলে বিশ্বাস ও ভালোবাসার উপঢৌকনে ভরিয়ে দিয়েছেন। সাতসমুদ্রের ওপারে বসবাসকারী এক সাম্প্রদায়িক ইংরেজ লেখক, ইসলাম বিরোধিতায় যিনি আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিলেন, তিনিও নবীজির নির্লোভ-নির্মোহ পবিত্র জীবনের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি না দিয়ে থাকতে পারেননি। স্যার উইলিয়াম ম্যুর তার বই *লাইফ অব মুহাম্মাদ*-এ লিখেন,

> All authorities agree in ascribing to the youth of Muhammad a modesty of depertment and purity of manners rare among the people of Mecca.

যৌবনকালে মুহাম্মাদের উত্তম চরিত্র ও পবিত্র চালচলনের ব্যাপারে সবাই একমত। অথচ তখন এই গুণগুলো মক্কার লোকদের মাঝে বিরল ছিল।

ভুলগুলো কি আসলেই ভুল?

সভ্যতা, ভদ্রতা ও উন্নত চরিত্রমাধুর্যের স্বর্ণশিখরে যদিও তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন, তারপরও তিনি আল্লাহর একজন বান্দাই ছিলেন।

নবুয়ত লাভের পূর্বে মানুষের সমাজে বসবাস করে মানবিক ভুলক্রটি থেকে একেবারেই পূতপবিত্র হওয়ার ধারণা করা পাগলামো ছাড়া কিছু নয়।

নবুয়তের সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে যখন তাঁর হৃদয় নুরে ইলাহির আলো ঝলমল মণিমাণিক্যের পরিপূর্ণ ভান্ডারে পরিণত হয়নি; সে সময়ে তিনি মাত্র দুবার দুটি ভুলক্রটির শিকার হয়েছিলেন, (বাস্তবিকই যদি সেগুলোকে ভুল ধরা হয়) তবে এই ভুলটাও তাঁর ভাবনাকেন্দ্রিক ভুল ছিল। কোনো কার্যকরী ভুল ছিল না।

যে-সময়ের কথা এখন আলোচনা হচ্ছে, সেই সময়ে আরবদের মাঝে গালগল্পের আসরের বেশ প্রচলন ছিল। দিনের ব্যস্ততা শেষে সন্ধ্যার উঠোনে গল্পের আসর বসত। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে মানুষ এইসব গল্পের আসরে একটু সুখ খুঁজে পেতে চাইত। একটু আনন্দ-বিনোদনের আশায় নিজেদের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করত। সমবয়সী ছেলেপিলে ও বড়দের আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখে একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও এই ধরনের এক গল্পের আসরে যাওয়ার কৌতূহল হলো। ভাবলেন, যাই, দেখি না ওরা সেখানে কী করে! কিন্তু সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান মহান আল্লাহ ছিলেন তাঁর তত্ত্বাবধায়ক। জীবনের আর মাত্র কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করলেই নবুয়তের গুরুদায়িত্ব যার কাঁধে আসবে, তাঁর এমন অনর্থক কাজে অংশগ্রহণ করাটা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেননি। তাই তিনি যখন গল্পের আসরে যোগদান করার জন্য রওয়ানা হলেন, পথিমধ্যে এক বিয়ের অনুষ্ঠান দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শিশুমনের কৌতূহল নিয়ে নববধূ আর নতুন দুলার বিয়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে একসময় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন চোখ খোলেন, তখন চারদিকে প্রভাতের ফকফকে আলো।

আরও একবার তাঁর হৃদয়ে এমন ভাবনা জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু তখনও মহান আল্লাহ তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে সুখময় স্বপ্নে বিভোর করে রেখেছিলেন। এবারও মহান আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হলো। নবীজির শিশুমনের কৌতূহল মনেই দাফন হলো।[৪৫]

---

৪৫. *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৭৬১৯; *তারিখুত তবারি*, ১/৫২০; *খাসায়িসুল কুবরা*, (অধ্যায়, মূর্খতার যুগের আচার)।

এই দুটি ঘটনা ছাড়া নবীজির পুরো জীবনে আর কখনো এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, যার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হবে যে, দুনিয়ার রং-তামাশা ও ঢাক-ঢোলের প্রতি তাঁর হৃদয়ে সামান্য আকর্ষণ ছিল। অনর্থক ও সময়ের অপচয় হয় এমন কাজ থেকে তিনি সর্বদা দূরে থাকতেন।

অঙ্গীকার পূরণের বিরল দৃষ্টান্ত

অজ্ঞতার এই বিক্ষুব্ধ সময়ে যখন অঙ্গীকার বা চুক্তি ভঙ্গ করা খুবই সাধারণ বিষয় ছিল, তখনও তাঁর হৃদয়ে ওয়াদা পূরণের সৎসাহস পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। 'কথা দিয়ে কথা রাখা'—তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

ইবনুল হামাসা রা. বলেন, একবার বাজারে নবীজির সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার একটি বেচাকেনার চুক্তি হয়। আমি তাকে বললাম, আপনি যদি কিছুক্ষণের জন্য এখানে অপেক্ষা করেন, তাহলে আমি বাড়িতে গিয়ে একটি জরুরি কাজ সেরে এসে ব্যবসার বিষয়ে আপনার সঙ্গে জরুরি পরামর্শ করব। জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, আপনি আসার আগ পর্যন্ত আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

ইবনুল হামাসা তার বাড়িতে চলে গেলেন। মানবতার সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই বসে রইলেন। বাড়িতে গিয়ে ইবনুল হামাসা তার জরুরি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং বাজারে অপেক্ষারত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন।

দিন শেষে রাতের আগমন ঘটল। প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনো সেখানেই বসে আছেন। ইবনুল হামাসা এখনো আসেননি। একসময় রাতও তার সমস্ত অন্ধকারকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমের পাহাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পূর্বাচলে নতুন সূর্যোদয় হলো। প্রভাতের ফকফকে আলোয় চারদিকে আলোকিত হয়ে গেল। সৃষ্টিজীবের প্রতিটি সদস্যই সজাগ হয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজ করতে শুরু করল। কিন্তু গতকালের অঙ্গীকারের কথা এখনো ইবনুল হামাসার স্মরণ হয়নি। সকালের মৃদুমন্দ বাতাস ও মিষ্টি আলো দূরীভূত হয়ে ক্রমশ রোদের প্রখরতা বাড়তে লাগল। অর্ধদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। অঙ্গীকার পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও আপন কথায় সত্যবাদী মুহাম্মাদ এখনো ইবনুল হামাসার পথ চেয়ে বসে আছেন!

হঠাৎ ইবনুল হামাসার হৃদয়ে গতকালের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ হয়ে গেল। দ্রুত তিনি বাজারের দিকে ছুটে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি যখন মক্কার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অবাক চরিত্রের অধিকারী এই মানুষটিকে গতকালের সেই স্থানে বসে থাকতে দেখলেন, তখন তার লজ্জা ও পেরেশানির সীমা রইল না। তাকে দেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। চাঁদের চেয়েও সুন্দর সেই চেহারায় কোনো রাগ বা বিরক্তির ছাপ নেই। শুধু স্বাভাবিক গলায় ইবনুল হামাসাকে বললেন, ভাই! তুমি তো আমাকে বেশ কষ্ট দিয়ে ফেললে। ইবনুল হামাসা নিজের এমন আচরণে বেশ লজ্জিত হলেন এবং বারবার নবীজির কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। (কেউ কেউ তিনদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা উল্লেখ করেছেন।)[৪৬]

সততা

সেই যুগে সততা ও আমানতদারির কোনো পরোয়া করা হতো না। মিথ্যা কথা বলা, আমানতের খেয়ানত করা, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা আরবদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততা ও আমানতদারির কথা মক্কার মানুষের মুখে মুখে ছিল। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাইছি। যার মাধ্যমে এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, হেরা উপত্যকার কোল ঘেঁষে নবুয়তের সূর্য উদিত হওয়ার আগেও প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয় এমন প্রশংসনীয় গুণাবলি ও উত্তম বৈশিষ্ট্যের নুরে আলোকিত ছিল, যা যেকোনো মহান মানুষের জন্যই গৌরবের কারণ হতে পারে।

ব্যবসাবাণিজ্য নবীজির প্রিয় পেশা ছিল। জীবনের শুরুলগ্ন থেকেই তিনি এই পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, একবার কায়েস ইবনে সায়েবের সঙ্গে তিনি কোনো এক ব্যবসায় অংশীদার হলেন এবং চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসার মালামাল বিক্রির জন্য ইয়ামেনে সফর করলেন। এই সফরে তিনি অকল্পনীয় মুনাফার অধিকারী হলেন। ফিরে আসার পর তিনি পুরো মুনাফাকে সমান দুইভাগে ভাগ করে অর্ধেক কায়েস ইবনে সায়েবকে দিয়ে দিলেন।

---

৪৬. অন্য বর্ণনায় 'ইবনুল হামাসা'-এর পরিবর্তে 'আবদুল্লাহ ইবনে আবিল হাম্মাদ'-এর নাম উল্লেখ রয়েছে। দেখুন, আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবুল ইদাহ। *খাসায়িসুল কুবরা*, ১/১৬০ (বাংলা)।-অনুবাদক

দ্বিতীয়বার কায়েস ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়ামেন সফর করলেন। ফিরে এসে তিনিও মুনাফাকে দুই ভাগ করে অর্ধেক নবীজিকে দিয়ে দিলেন। পরবর্তী সময়ে নবীজি জানতে পারলেন যে, কায়েস ইবনে সায়েব হিসাবে ভুল করেছেন এবং নবীজির ভাগে কিছু অর্থ বেশি এসে গেছে। এটা বুঝতে পেরেই তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। ব্যবসার অংশীদারকে ডেকে এনে যতক্ষণ না সেই অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিয়েছেন, শান্ত হতে পারেননি।

পরিবারের প্রতি ভালোবাসা

একবার মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। বড় বড় অর্থশালী ও বিত্তবান পরিবারগুলোও কষ্টে দিন কাটাতে লাগল। নবীজির চাচা আবু তালেব যদিও মক্কার প্রভাবশালী নেতা ছিলেন, কিন্তু পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে তিনিও নিজের পরিবারকে নিয়ে এই দুর্ভিক্ষে চরম কষ্টের মুখোমুখি হলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই বিষয়ে অবগত হলেন, তখন তিনি নিজের অপর এক চাচা আব্বাস রা.-কে পরামর্শ দিয়ে বললেন, যেহেতু আবু তালেব চাচার অনেক সন্তানসন্ততি, তাই এই দুর্ভিক্ষে আমাদের উচিত তার বোঝা হালকা করার চেষ্টা করা। পরামর্শমতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি ইবনে আবু তালেব, আব্বাস ও জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গেলেন। এতে করে আবু তালেবের বোঝা অনেকটা হালকা হয়ে গেল।[৪৭] সেই সময়ের আরবভূমিতে এমন ভালোবাসা ও সহমর্মিতা ছিল চরম দুষ্প্রাপ্য। মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত।

আল্লাহর ঘরে আগুন!

হতভাগা কিষানের ফসলি ভূমি যেমন বজ্রপাতের আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে যায়, তেমনই মহান প্রভুর প্রকৃত প্রেমিকরা প্রতিনিয়ত যেখানে সেজদাবনত হয়, সেই কাবাঘরেও একবার অসতর্কতাবশত আগুন লেগে সেটার লেলিহান শিখায় মক্কার আকাশ কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। কাবাঘরের প্রতিটি দেয়াল আগুনে নষ্ট হয়ে যায়। ইবরাহিম আ. নিজের মুবারক হাতে যে ঘর নির্মাণ করেছিলেন, হেদায়েতের চাঁদ-সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরে আরবের অজ্ঞ ও মিথ্যার পূজারিরা যে ঘরকে পূজামণ্ডপ বানিয়ে রেখেছিল, লেলিহান আগুনের

---

৪৭. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/৬৯, (ভলিয়ম-২); *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১৭৮

ভয়াবহতায় তার দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ধরে গিয়েছিল। তাই কুরাইশের নেতারা পুরোনো ঘরটি ভেঙে নতুনভাবে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু কাবাঘরের সম্মান, বড়ত্ব ও প্রভাবের কারণে কারও আগে বেড়ে দেয়াল ভাঙার সাহস হচ্ছিল না। কুরাইশের নেতারা অত্যন্ত চিন্তিত ও দ্বিধান্বিত হয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা এই কথা বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে দেয়াল ভাঙতে শুরু করলেন যে, আমাদের মনের কথা তো এই ঘরের মালিক জানেন। যেহেতু আমরা নেক উদ্দেশ্যেই এই কাজ করতে যাচ্ছি, সেহেতু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তার দেখাদেখি অন্য লোকেরাও দেয়াল ভাঙতে শুরু করল এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে সমস্ত দেয়াল ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলা হলো।[৪৮]

এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশঙ্কা

মসজিদুল হারামকে ভেঙে ফেলার পর অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু হলো। কুরাইশের প্রতিটি সদস্য নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে কাজে শরিক হলো। কিন্তু যখন 'হাজরে আসওয়াদ' নামক কালো পাথরটি আপন স্থানে রাখার সময় হলো, তখন কোন গোত্র এই মহামূল্যবান পাথরটি তার আপন স্থানে রাখবে এই নিয়ে ঝগড়াবিবাদ সৃষ্টি হয়ে শুধু নির্মাণকাজই বন্ধ হয়নি; বরং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলো।

হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরটি ইবরাহিম আ. নিজে পবিত্র হাতে কাবাঘরে স্থাপন করেছিলেন। তাই এই পাথরটি আরবের প্রতিটি গোত্রের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও মর্যাদাবান ছিল। আজও মুসলিমরা এই পাথরটিকে অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবেসে চুমু দেয়। আরবের প্রত্যেক গোত্রের সর্দার এই পাথরটিকে নিজ হাতে আপন স্থানে রাখতে পারাকে নিজের জন্য সবচেয়ে গৌরব ও সম্মানের মনে করত। এমতাবস্থায় এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, যেকোনো একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই এই মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করতে পারবে। কিন্তু কুরাইশের কোনো সর্দারই নিজেকে এই গৌরব থেকে বঞ্চিত করতে রাজি নয়। প্রয়োজনে রক্তের নদী বয়ে যাবে। অগণিত মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। কাবার আঙিনা লালে লাল হয়ে যাবে। কিন্তু নিজের সম্মান ও গৌরব থেকে পিছু হটা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

---

৪৮. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/৩১৮; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১৪৫

জরুরি পরামর্শসভা

ওই ওপরওয়ালাই জানেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কত অসংখ্য মায়ের বুক খালি হয়ে যেত। আপন ভাইদের রক্তে কত মানুষের হাত রঞ্জিত হতো! কিন্তু তার নিজের এই পবিত্র ঘরের নির্মাণকে কেন্দ্র করে কোনো রক্তপাত বা হতাহতের ঘটনা ঘটুক তা তিনি চাননি। তাই কুদরত নিজেই এই সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান বের করে দিলেন।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা একটি জরুরি পরামর্শসভার আয়োজন করলেন। যেখানে কুরাইশ বংশের সমস্ত সর্দার উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রত্যেকেই নিজেদের মহামূল্যবান রায় পেশ করলেন। সর্বশেষ ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার মতামতকে সবাই গ্রহণ করে নিলো। তার সুচিন্তিত রায় ছিল, আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, তাকেই সালিশ মানা হবে। তিনি যে সিদ্ধান্ত শুনাবেন, তা সবাইকে কোনোরূপ আপত্তি ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই মেনে নিতে হবে।

সালিশ হলেন প্রিয় মুহাম্মাদ

কুরাইশ সর্দারদের সৌভাগ্যবশত পরের দিন সকালে সর্বাগ্রে এমন একজন ব্যক্তিকেই মহান প্রভু মসজিদুল হারামে পাঠালেন, আগে থেকেই যার উত্তম চরিত্র মানুষের হৃদয়কে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে নিজের অনুরাগী করে রেখেছিল। একত্ববাদের প্রতি আহ্বানকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও মূর্তিপূজার কঠোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু আত্মিক সম্পর্ক থাকার কারণে কাবাঘরের প্রতি তাঁর হৃদয়ের প্রবল আকর্ষণ ছিল। যে কারণে কাফেররা যখন মসজিদুল হারামে থাকত না, তখন তিনি চুপিসারে সেখানে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিতে যেতেন। প্রতিদিনের মতো আজও তিনি নিজের নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। গতকাল সন্ধ্যায় মসজিদের ভেতরে যে সর্দাররা পরামর্শসভায় অংশ নিয়েছিলেন, তারা তখন থেকেই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সালিশ নির্ধারণের জন্য মসজিদের ভেতরেই অবস্থান করছিলেন। সর্বাগ্রে যে মানুষটি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় সবাই অধীর আগ্রহে বসে ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ধীরপায়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তাকে দেখেই পুরো মসজিদ 'আল-আমিন আল-আমিন' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

এক বিরল ফয়সালা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সালিশ নিযুক্ত হয়েছেন তাই এখন তাঁর সিদ্ধান্ত শোনানোর সময়। তিনি যা-ই বলবেন, সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবাইকে তা কোনো আপত্তি ছাড়াই মেনে নিতে হবে। রাসুলের হৃদয়ে যদি জাগতিক সম্মান, প্রতিপত্তি ও প্রশংসা লাভের এতটুকু আগ্রহও থাকত, তাহলে আজ তা প্রকাশ করতে পারতেন। তিনি পারতেন এই কালো পাথরটি নিজ হাতে নিয়ে স্বস্থানে রেখে দিতে এবং একাই এই মহান সম্মানের অধিকারী হতে। কিন্তু না, তিনি তা করেননি; বরং নিজের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার আলোকে এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, পুরো মসজিদে 'বাহ বাহ' ধ্বনির গুঞ্জন শুরু হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের চাদর মুবারক মাটিতে বিছিয়ে দিলেন এবং হাজরে আসওয়াদকে উঠিয়ে চাদরের ওপর রাখলেন। অতঃপর কুরাইশের সর্দারদের বললেন, আপনারা প্রত্যেকেই চাদরকে উঠিয়ে দেয়ালের নিকটে নিয়ে যান। তারা যখন চাদরটি উঠিয়ে দেয়ালের কাছে নিয়ে গেলেন, তখন তিনি চাদরের মাঝখান থেকে পাথরকে উঠিয়ে স্বস্থানে রেখে দিলেন। এতে করে কুরাইশের প্রতিটি গোত্রই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের সৌভাগ্য অর্জন করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অসাধারণ সিদ্ধান্তে পুরো মক্কাভূমি এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে মুক্তি পেল। খোলামেলা দৃষ্টিতে তাকালে এটাকে কোনো সাধারণ ফয়সালা মনে হতে পারে, কিন্তু ফলাফলের দিকে তাকালে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এখানে আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে যে ঘটনাবলি উল্লেখ করেছি, তা সেই সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যখন নবীজির হৃদয় আল্লাহর নুর ও তাজাল্লিতে পরিপূর্ণ আলোকিত হয়নি। নবুয়তের সূর্য তখনও তাঁর হৃদয়-আকাশে উদিত হয়নি। নবুয়তপ্রাপ্তির পর তাঁর পবিত্র জীবনের সবচেয়ে সফল ও আলোকিত যুগের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই তিনি যা করে দেখিয়েছেন, তা সত্যিই অবাক করার মতো।

বিপ্লবের সূচনা

এসে গেল সেই মুবারক মুহূর্ত, যার জন্য আকাশের তারকারাজি আর জমিনের ফুল-পাখিরা পথ চেয়ে বসে ছিল। তাঁর অস্তিত্বের যে মহান বিপ্লবের

ফলে পরবর্তী সময়ে পুরো পৃথিবীতে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, সকল শক্তি-পরাশক্তি পরাজিত হয়েছিল, সেই বিপ্লবের সময় সন্নিকট হলো।

একাকিত্বের আগ্রহ

এই মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? কার ইশারায় আঁধারের চাদরে আলো হারিয়ে যায়? ভোরের মিষ্টি হাওয়া কার নামের গুঞ্জন তোলে? পানির কলকল ধ্বনি আর বাতাসের রিনিঝিনি শব্দ, এসব কার দান? এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর জানতে তিনি ব্যাকুল ছিলেন। হৃদয়সমুদ্রে জানার আগ্রহ ও চেতনারা বারবার ঢেউ তুলছিল। হৃদয়ের আগ্রহ ও চোখের কৌতূহল মেটাতে গিয়ে, চাওয়াটাকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করতে কত রাত যে নির্ঘুম কাটিয়েছেন, কত দিন যে না খেয়ে থেকেছেন, কত কষ্ট যে সয়েছেন, তার বিস্তারিত আলোচনাসংবলিত *আবেদে শবে জিন্দাদার* নামক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে তার দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নয়। তবুও আশেক হৃদয়ের যাতনা বাড়াতে প্রেম-ভালোবাসার এই রঙিন উপাখ্যানকে খুবই সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করছি।

আগুন-পানির এই পৃথিবীর পূর্বদিগন্তে রক্তিম সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে যেরকমভাবে সুবহে সাদিক বিকশিত হয়ে পৃথিবীর প্রতিটি বিন্দুকে জেগে ওঠার বার্তা দিতে থাকে, আবারও দুনিয়াটা আলোয় আলোয় ভরে যাওয়ার সুসংবাদ শোনাতে থাকে, ঠিক সেরকমভাবেই রেসালাতের সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়রাজ্যের প্রতিটি অলিগলি আলোকোজ্জ্বল হতে শুরু করল। তাঁর পবিত্র অন্তরে আসমানি জ্যোতি এবং আধ্যাত্মিক দ্যুতির গূঢ় রহস্য যেন বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতে শুরু করল।

সে হৃদয়ে এমন এক অস্থির আলো ছিল, এমন এক জ্যোতির্ময় পর্বত ছিল, যা তাঁর জানার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। সে অন্তরে এমন এক জ্বালা ছিল, যা তাঁর আত্মার গভীর থেকে গভীরে সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ভাষায় প্রকাশে অসম্ভব এমন এক ব্যথাতুর হৃদয় ছিল, যা তাঁর দিল ও দেমাগের অন্দরঘরে তির ও বর্শার ধারালো ফলার ন্যায় বিদ্ধ হচ্ছিল। কিন্তু নবীজির হৃদয়ের গভীরে যে তীব্র দরদ ও ব্যথা অবিরত আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করছিল, তা যে কতটা আনন্দদায়ক ছিল, কতটা প্রশান্তিদায়ক ছিল, মনপ্রাণকে কতটা সজীব আর সতেজ করে তুলত, হৃদয়ে কতটা স্বাদ অনুভব হতো, তা তো তিনিই জানতেন, যার কাছে

দুনিয়ার সমস্ত তন্ত্রমন্ত্র আর জাদুর আকর্ষণ থেকে জানার আকর্ষণই বেশি ছিল।

আহা! এতে যে স্বাদ রয়েছে,

পাবে না তুমি তা ফুলের সৌন্দর্যে,

সুরের মূর্ছনায় কিংবা শরাবের পেয়ালায়।

বিচক্ষণ অন্তর ও দূরদর্শী চোখ

যতই দিন যাচ্ছিল, ততই এই নশ্বর পৃথিবী ও তার সমস্ত সাজসরঞ্জামের অস্থায়িত্ব, দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতা আলোকিত দিনের ন্যায় নবীজির কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে দুনিয়ার এই মনোলোভা বস্তুসামগ্রীর প্রতি ঘৃণা তৈরি হতে লাগল। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের খেল-তামাশা আর দুদিনের হাসি-আনন্দের পর্দাকে সরিয়ে দিয়ে তিনি চিরস্থায়ী শান্তি ও সফলতার অবিনশ্বর পৃথিবীকে দেখার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। চাঁদ-সূর্যের জ্যোতির্ময় আলোর চমক, গোলাপ আর মালতির সৌরভ, মনোহারিণী সুন্দরীদের কমনীয় ভঙ্গি, এসব তাঁর চর্মচক্ষুর জন্য কীভাবে মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় হতো? অথচ তিনি নিজের দূরদৃষ্টি দিয়ে এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন-নির্গমনের গোপন রহস্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন জন্মের আনন্দ আর বিচ্ছেদের হাহাকারের মানে কী। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, রং-বেরঙের ফুলেদের এই সাজানো-গোছানো বাগান, ফুলে ফুলে সুশোভিত এই কানন, দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী এই পারদ একদিন বিজন প্রান্তরে পরিণত হবে।

ফুলের প্রতিটি পাপড়িতে লুকিয়ে আমি দেখেছি হেমন্তের পরিণাম। তাই দুদিনেই বিরান হওয়া বসন্তের এই রংঢঙে আমার কী আসে যায়?

সত্য ও সুন্দরের অবিনশ্বর পৃথিবী

প্রতিদিনের বিবর্তিত এই পৃথিবীতে, বস্তুবাদে বিশ্বাসী ও ক্ষমতার পূজারি এই সমাজে, অন্যায় ও অত্যাচারে জর্জরিত এই জীবনব্যবস্থায় তাঁর সত্যান্বেষী হৃদয় কী করে প্রশান্তি খুঁজে পাবে? একজন বিচক্ষণ ও সুস্থ বিবেক-বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য ক্ষণস্থায়ী ও কৃত্রিম এই সাজসরঞ্জাম কীভাবে স্থায়ী প্রশান্তি ও সুখের মোহময় মাধ্যম হতে পারে?

দুনিয়ার সাজসরঞ্জামের এই বাহারি আয়োজন ও আনন্দ-বিনোদনের রঙিন ফানুস দেখে তিনি অভিভূত হতে চাননি; বরং তিনি ফুলে ফুলে সুরভিত এমন বসন্তের আশায় ছিলেন, হেমন্তের অশুভ ছায়ায় কখনো যার সৌন্দর্য নষ্ট হবে না। তিনি এমন এক চিরন্তন জগতের অনুসন্ধানী ছিলেন, যেখানে সত্য ও সুন্দরের শাসন হবে।

নবীজির সাধনালয়

আরব জাহেলিয়াতের যুগে কুফরি ও মিথ্যার বেড়াজাল ছিন্ন করে, অজ্ঞতা ও গোমরাহির পরিবেশ এবং মূর্তিপূজার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র থেকে দূরে নির্জন-নিরালায় হেরা পর্বতের এক গুহায় তিনি অবস্থান শুরু করলেন। সেই নির্জন গুহার নিঃসঙ্গতায় তিনি নিজের সুউচ্চ ধ্যান ও কল্পনাশক্তির মাধ্যমে সপ্তাকাশের বিশালতা অতিক্রম করে এই দুনিয়ার মায়াজাল ছিন্ন করতে এবং আগুন-পানির এই তেলেসমাতির রহস্য জানতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কার্লাইলের[৪৯] মতামত

পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্লাইল নিজের *On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেজার কথা লিখতে গিয়ে সেসময় রাসুলের হৃদয়ের অবস্থা কেমন ছিল তার বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'বাড়িতে বা সফরে, যেকোনো জায়গায় মুহাম্মাদের হৃদয়ে হাজারো প্রশ্ন উঁকি দিতে থাকত, আমি কে? এই নশ্বর পৃথিবীই-বা কী? নবুয়ত কী জিনিস? আমি কীসে বিশ্বাস করব?'

হেরা পাহাড়ের উপত্যকা, তুর পর্বতের আকাশছোঁয়া শৃঙ্গ, মানুষের বসতবাড়ি কিংবা বিস্তৃত প্রান্তর, কোনোকিছুই কি সেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে? কখনোই না, রাত-দিনের এই আবর্তন, ঝলমলে তারকারাজি, বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘখণ্ড, কিছুই তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি।

এই পথের শেষ কোথায়?

আজও আকাশের নিচের বিশাল শূন্যতায় উড়ে বেড়ানো পাখিদের ডানা ঝাপটানো বন্ধ হয়নি। আজও হেমন্তের শেষে চিরায়ত নিয়মে বসন্তের ফুল

---

৪৯. **কার্লাইল :** টমাস কার্লাইল (ডিসেম্বর ৪, ১৭৯৫-ফেব্রুয়ারি ৫, ১৮৮১) একজন স্কটিশ দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, ব্যঙ্গাত্মক লেখক ও ঐতিহাসিক ছিলেন।-সম্পাদক

ফোটে। ফুলে ফুলে ভরে যায় এই বাগান। মানুষ তা দেখে পুলক অনুভব করে। তনুমন প্রশান্ত হয়। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এই পালাবদল হলেও সৃষ্টিজীবের সামনে কাফেরদের মিথ্যার তিলক আঁকা কপালের মাথা নোয়ানো বন্ধ হয়নি। আজও শাসকদের জুলুম-নিপীড়নের বলি হচ্ছে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ। অত্যাচারীর পদতলে রক্তের মাঝে গড়াগড়ি খায় অসহায় মানবতা। আজও শক্তিশালী ও ক্ষমতাবানরা তাদের অধীনস্থদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিশৃঙ্খলার বিষাক্ত তিরের নিশানা বানায়। আরবদের যৌবনের বিক্ষুব্ধ তুফান ও মাতাল হাওয়া একদিকে যেমন মহিলাদের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল, অন্যদিকে কুদরতের এই সাজানো বাগান মহিলাদের সৌন্দর্যকে নিজেদের ভোগের সামগ্রী বানিয়ে রেখেছিল। কিন্তু...

কিন্তু আশ্চর্য এক মহামানব! মুহাম্মাদ যার নাম। পুরো বিশ্বমানবতাকে সরল-সঠিক পথের দিশা দিতে যার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। যৌবনের টইটম্বুর মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত ভোগবিলাস আর আনন্দ-বিনোদনকে দু-পায়ে মাড়িয়ে তিনি হেরা গুহার নিঃসঙ্গতাকে বেছে নিলেন এবং দুঃখী-অসহায় মানুষের হৃদয়ের ব্যথা উপশমের জন্য কোনো অলৌকিক ওষুধ সম্পর্কে জানতে ধ্যানমগ্ন হলেন।

দ্বিতীয় পর্ব

নবুয়তের বর্ণিল সূচনা

সেসব সফল ও সার্থক মহাপুরুষ, যারা প্রসিদ্ধি, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং হেদায়েতের আকাশে উজ্জ্বল তারা হয়ে আলো বিলিয়েছেন। আভিজাত্যের পাহাড়ে যারা মজবুত ও সুদৃঢ় পাথরের ন্যায় অবিচলতার মালিক ছিলেন। তারা কখনো সক্ষমতা ও অবিচলতা, সাহস ও নির্ভীকতা, পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করা এবং প্রবৃত্তিকে দমন করে ইবাদতে নিমগ্ন হওয়া ইত্যাদি গুণাবলি অর্জনের চেষ্টায় উদাসীনতা করেননি। মূলত এই গুণগুলো একটি সফল ও সার্থক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব গুণ অর্জনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে সর্বোত্তম গুণাবলির মালিক হয়েছিলেন।

নবীজির সাধনা, ধ্যানমগ্নতা, ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবশেষে পথ খুঁজে পেল। তাঁর পবিত্র হৃদয় আসমানি নুরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে শুরু করল এবং তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। হেরা গুহার অন্ধকারে তাঁর দুচোখ স্বপ্নে যা-ই দেখত বাস্তবে তা-ই পৃথিবীতে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হতে লাগল। নবুয়তের মহান দায়িত্বের মুকুট পরিধানের পূর্বে এটা তাঁর জন্য এক বর্ণিল সূচনা ছিল। কিছুদিন এভাবেই প্রিয় প্রভুর সঙ্গে তাঁর প্রিয় বান্দার প্রেম-ভালোবাসার আদান-প্রদান চলতে লাগল।

পবিত্র মাথায় নবুয়তের সোনালি মুকুট

অবশেষে তাঁর বয়স যখন ৪০-এর ঘরে গিয়ে পৌঁছল, দিবারাত্রির ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনায় তাঁর পবিত্র হৃদয় আল্লাহর নুর গ্রহণে প্রস্তুত হলো, তখন এক বরকতময় মুহূর্তে হেরার অন্ধকার গুহায় আসমানি নুরের চমক দেখা গেল। যে নুরে এই ছোট্ট অন্ধকার গুহাটি যেন বিশাল আলোর পর্বতে পরিণত হলো। এই চোখ ধাঁধানো আলোর তেজ সইতে না পেরে তাঁর বন্ধ দুচোখ

খুলে গেল। চোখ খুলেই তিনি এক মহান ফেরেশতাকে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। সেই ফেরেশতা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, মহান আল্লাহ আপনার মাধ্যমেই তাঁর বান্দাদের সামনে সর্বশেষ দলিল উপস্থাপন করেছেন। আপনিই হলেন খাতামুল আম্বিয়া বা সর্বশেষ নবী। আমি আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল আপনার কাছে ওহি নিয়ে এসেছি।

এরপর জিবরাইল আ. পাঠ করলেন অবতীর্ণ কুরআনের প্রথম আয়াতগুলো।

> পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা। পড়ো, তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।
>
> [সুরা আলাক : ১-৫]

এটা এক মহাসত্য যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেননি। কোনো শিক্ষকের সামনেও হাঁটু গেড়ে বসেননি। যে কারণে তিনি পড়াশোনার বিষয়ে একেবারেই অনবগত ছিলেন। এইজন্যই জিবরাইল আ. যখন তাকে পড়তে বললেন, তখন তিনি পরিষ্কার ভাষায় তাকে বলে দিলেন, 'আমি তো পড়তে পারি না।' এ কথা শুনে ফেরেশতা তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে খুব জোরে চাপ দিলেন। অতঃপর আবারও পড়তে বললেন। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও একই জবাব দিলেন। জিবরাইল আ. পুনরায় তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন এবং আবারও পড়তে বললেন। কিন্তু তিনি এবারও সেই একই জবাব দিলেন।

রুহুল আমিন তথা জিবরাইল আ. আবারও একবার তাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন। এবার জ্ঞানের আলো গ্রহণের জন্য বক্ষ প্রশস্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি জিবরাইলের সঙ্গে সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন।[৫০] এরপর ফেরেশতা জিবরাইল আ. তাকে হেরা গুহার বাইরে নিয়ে এলেন এবং পাহাড়ের এক স্থানে চাদর বিছিয়ে দিয়ে সেখানে নবীজিকে বসতে অনুরোধ করলেন। এবার ফেরেশতা তাঁর পা দিয়ে খুব জোরে পাহাড়ি ভূমিতে আঘাত করলেন। তাঁর পদাঘাতে পাহাড় হতে একটি মিষ্টি পানির ঝরনা প্রবাহিত হতে লাগল। জিবরাইল আ. সেই পানি দিয়ে নিজে অজু করলেন এবং নবীজিকেও অজু

---

৫০. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১৭১-১৭৩; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/৪৮; *ফাতহুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি*, ৮/৫৮৮-৫৮৯; *তারিখুত তবারি*, ১/৫৩২

শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি নবীজিকে সঙ্গে নিয়ে দুরাকাত নামাজ পড়লেন এবং নামাজ শেষে আকাশের দিকে পুনর্গমন করেন।

আল্লাহর বড়ত্বের প্রভাব

এতদিনে তো প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয় আল্লাহর নুর গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তবুও তো তিনি একজন মানুষ ছিলেন। মানবিক স্বভাবের কারণেই তাঁর হৃদয় মহান আল্লাহর প্রভাব ও দাপটে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। পুরো শরীর ভয়ে কাঁপতে শুরু করল।

কাঁপতে কাঁপতে বাড়িতে ফিরে এসে প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রা.-কে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে দাও, আমাকে ঢেকে দাও। প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রা. স্বামীর এমন কাঁপুনি দেখে ভড়কে গেলেন। তিনি দ্রুত রাসুলকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং মূল ঘটনা জানতে চাইলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয়তমার কাছে ঘটনার আদ্যোপান্ত খুলে বললেন। আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে এই কথাও বলে ফেললেন যে, আমার তো নিজের প্রাণ নিয়েই আশঙ্কা হচ্ছে।

প্রিয়তমার সান্ত্বনা

প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রা. পুরো ঘটনা মন দিয়ে শুনে স্বামীকে লক্ষ করে বললেন, আপনি ভয় পাবেন না। আপনার প্রভু আপনার সঙ্গেই আছেন। তিনি যা-কিছু করবেন, ভালোর জন্যই করবেন। কারণ, আপনি মেহমানদের সেবা করেন। সদা সত্য কথা বলেন। বিপদাপদে মানুষকে সাহায্য করেন। আপনি তো এতিমদের বন্ধু ও অসহায়ের সহায়। সর্বোপরি আল্লাহর সৃষ্টিজীবের প্রতি সদাচরণ করেন। এ রকম মানুষকে আল্লাহ কখনো লাঞ্ছিত করবেন না।

ওয়ারাকার সাক্ষ্য

খাদিজা রা.-এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফল হিব্রু ভাষার একজন যোগ্য পণ্ডিত ছিলেন। তাওরাত ও ইনজিলের সমস্ত বিষয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এই কারণে আম্মাজান খাদিজা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নিকট নিয়ে গেলেন। পুরো ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

ওয়ারাকা ইবনে নওফল পুরো ঘটনা শুনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। অবাক বিস্ময়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তাকিয়ে

রইলেন। হঠাৎ অবচেতন মনেই চিৎকার দিয়ে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!! ওই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবনমরণ। খাদিজা! যদি তোমার কথা সঠিক হয়, তাহলে তাঁর কাছে সেই মহান ফেরেশতাই আগমন করেছিলেন, যিনি মুসা আ.-এর নিকট আগমন করতেন। জেনে রাখো, তোমার এই পবিত্র স্বামীই হলেন এই উম্মতের নবী।

ওয়ারাকা বললেন, হে খাদিজা! যে কথা তুমি আমায় শুনিয়েছ, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি জেনে রাখো, আহমাদ হলো আল্লাহর রাসুল, জিবরাইল ও মিকাইল নামক দুজন মহান ফেরেশতাই তাঁর কাছে ওহি নিয়ে আসবেন। যে ব্যক্তি তাঁর দ্বীনকে গ্রহণ করবে, সে সফলতা অর্জন করবে। তাঁর কারণে অনেক হতভাগা ও পথহারা মানুষ সৌভাগ্যবান ও ভালো মানুষে পরিণত হবে। লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল আল্লাহর জান্নাতের মালিক হবে। অন্যদল জাহান্নামের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে।

ওয়ারাকা ইবনে নওফল তার প্রিয় বোন খাদিজাকে সান্ত্বনা দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আদবের সঙ্গে বললেন, যিনি আপনার কাছে এসেছেন, তিনি সেই মহান ফেরেশতা, যিনি মুসা আ.-এর কাছেও আগমন করতেন। আহা! যদি আমি এখন যুবক হতাম এবং সেই মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম, যখন আপনার গোত্রের লোকেরা আপনাকে এই শহর থেকে বের করে দেবে। তাহলে আমি তখন আপনার পাশে থেকে আপনার সাহায্য করতাম।

খ্রিষ্টান পণ্ডিত ওয়ারাকার শেষ কথাটি শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত পেরেশান ও অবাক হয়ে গেলেন। অস্থিরচিত্তে ওয়ারাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি আমার গোত্রের লোকেরা আমার এই প্রিয় মাতৃভূমি থেকে আমাকে বের করে দেবে?

ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আপনার গোত্রের লোকেরা আপনাকে বের করে দেবে! অচিরেই আপনি মানুষের মাঝে যে শিক্ষার প্রচার-প্রসার শুরু করবেন, ইতিপূর্বে যারাই পৃথিবীতে সেই শিক্ষার প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন, তাদের সঙ্গেও এমন আচরণ করা হয়েছে। যেদিন আপনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হবেন, সেদিন যদি আমি জীবিত থাকি, তাহলে আমি আপনার সহযোগিতা করব।[৫১]

---

৫১. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১৭২; *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩

তাওরাত ও ইনজিলের পণ্ডিত ওয়ারাকার মুখে নিজের নবী হওয়ার সুসংবাদ শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ফিরে এলেন। প্রথম যে সৌভাগ্যবান মানুষটির হৃদয়ে ইসলামের চিরন্তন নুরের ঝলক লেগেছিল, তিনি আর কেউ নন, নবীজির প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রা.। যার সত্যান্বেষণ ও ব্যাকুল হৃদয়ের আত্মিক তৃষ্ণা তাকে আজ থেকে ১৫ বছর পূর্বেই চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে এই রহমত ও বরকতের ঝরনাধারার কাছে নিয়ে এসেছিল।

রাসুলের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ

মানুষ নিজের সমস্ত ধ্যানধারণা, চিন্তা-চেতনা ও রুচি-প্রকৃতি দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু স্ত্রীকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানো এত সহজ নয়। মিয়াঁ-বিবি দুজনেই দুজনকে বেশ ভালোভাবেই চেনে। স্বামীর গোপন রহস্য সম্পর্কে স্ত্রীর চেয়েও বেশি আর কেই-বা জানে?

খাদিজা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সমস্ত গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন। নবীজি যখন তাকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করলেন, তখন তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে তা মেনে নিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই তাঁর রেসালাতের ওপর ঈমান আনলেন। খাদিজা রা. তার স্বামীকে লক্ষ করে বলেছিলেন, নিশ্চয় আপনিই সেই নবী, সত্যান্বেষী মানুষ বহুকাল যাবৎ যার অপেক্ষায় ছিল। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করছি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অজু করা শেখালেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে দুরাকাত নামাজ পড়লেন। সেইসময় পর্যন্ত মুসলিমদের ওপরে শুধু দুরাকাত নামাজই ফরজ ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজে গমন করলেন, তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হলো।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাদিজা রা.-এর ঈমান আনয়ন করা এবং দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণের আনন্দে আত্মহারা হওয়ার দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়তের সূর্যোদয়ের পূর্বেও নবীজির জীবন দ্বিমুখী আচরণ বা সময়ে সময়ে রং বদলানোর ন্যায় নিকৃষ্ট দোষ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। দ্বিমুখী আচরণ বা ক্ষণে ক্ষণে রং বদলানো তো মিথ্যুক এবং প্রতারকদের কাজ।

পৃথিবীর মানুষ তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা, সত্যকথন ও ভালো কাজের জন্য তাকে 'আল-আমিন, আস-সাদিক' তথা 'বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। খাদিজা তার ১৫ বছরের দাম্পত্যজীবনে কখনো একটিবারের জন্যও মানুষের সুধারণাকে ভুল প্রমাণিত হতে দেখেননি। একজন সত্যবাদী মানুষের সততার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো, মানুষ যতই তার নিকটবর্তী হবে, ততই তিনি নিজের সুন্দর চরিত্র ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের জাদুময় আকর্ষণে মানুষের হৃদয়কে নিজের দিকে টানতে থাকবেন। কাছের মানুষগুলো দিন দিন আরও কাছের হতে থাকবে। কারণ, দূরের মানুষদের তুলনায় কাছের মানুষেরাই তো তাঁর সম্পর্কে বেশি অবগত হতে পারে।

আবু বকর রা.-এর ইসলামগ্রহণ

আবু বকর রা. ছিলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাল্যকালের সঙ্গী ও বিশ্বস্ত বন্ধু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবনটাই স্বচ্ছ আয়নার ন্যায় তার সামনে ছিল। তিনি যখন রাসুলের রেসালাতের দাবির কথা শুনলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় বন্ধুর ঘরে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষ আপনার ব্যাপারে যা-কিছু বলছে তা কি সত্যি? জবাবে নবীজি বললেন, মানুষ যদি আমার রেসালাতের দাবির বিষয়ে বলাবলি করে, তবে হ্যাঁ, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ কথা শুনেই আবু বকর রা. বললেন, ঠিক আছে, তাহলে হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বাইয়াত হব। আবু বকর রা. একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, বিবেক-বোধ, দূরদর্শিতা ও অত্যন্ত বিচক্ষণতার অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন, কোনো বিষয়েই তড়িঘড়ি করার অভ্যাস তার একেবারেই ছিল না। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেই বিষয়ের প্রতিটি দিক নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করতেন। আগ-পর ভেবে সিদ্ধান্ত নিতেন। তার আচার-ব্যবহারও অত্যন্ত পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় ছিল। শুধু তাই নয়। তার মনোমুগ্ধকর ভাষণও মানুষের হৃদয়কে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করত। যে কারণে মক্কার গণমানুষের হৃদয়ে তার জন্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসন ছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তার মতামতের ওপরই পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখত। এমন একজন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করাটাই ইসলামের নবীর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ইসলামের চুম্বকীয় আকর্ষণ আবু বকরের ন্যায় এ রকম আরও অনেক সৌভাগ্যবান মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নিয়েছিল। যাদের মাঝে

শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পুরুষ-মহিলাসহ সব ধরনের মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবেই তাওহিদের পতাকাবাহী এক মুষ্টিমেয় জামাত আরবের জাহেলিয়াতের যুগে এক আল্লাহর ইবাদতের স্বীকারোক্তি দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসা রা., যাকে তিনি আজাদ করেছিলেন এবং নিজের ছেলের মতোই আদর-স্নেহ করতেন। তিনিও প্রথম দিনেই প্রিয় মনিবের ওপর ঈমান এনে হৃদয়কে ইসলামের নুরে আলোকিত করেছিলেন।

রাসুলের সত্যতার আরও একটি উজ্জ্বল প্রমাণ

এতদিন ইসলামের নুরে শুধু সত্য নবী মুহাম্মাদের নিকটাত্মীয় লোকেরা, বন্ধুবান্ধব ও তাদের অধীনস্থ লোকেরা নিজেদের হৃদয়রাজ্যকে আলোকিত করেছিলেন। এই সময়গুলোতে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কার্যক্রম অত্যন্ত সংগোপনে চলছিল। কারণ, এটাই তখন সময়োপযোগী ছিল। যখন আজানের সময় হতো, মহান আল্লাহর গুটি কতক বান্দার যখন তাদের মাবুদের সামনে পরম ভালোবাসায় সেজদাবনত হওয়ার সময় হতো, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিয়ে পাহাড়ের কোনো নিরাপদ স্থানে চলে যেতেন। মুসলিমরা সেখানেই তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করত।

এমনই এক সুখময় মুহূর্তে, মুমিন-মুসলিমরা যখন তাদের রবের সামনে সেজদাবনত, ঠিক সেই সময়েই ঘটনাক্রমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় চাচা আবু তালেব সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের নিয়ে নামাজ শেষ করলেন, তখন আবু তালেব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ করে বললেন, হে আমার ভাইয়ের চোখের মণি, তোমরা এ কোন ধর্মের অনুসরণ করছ?

প্রত্যুত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা সেই আলোকিত দ্বীনের অনুসরণ করি, আল্লাহর কাছে যা গ্রহণযোগ্য। আকাশের ফেরেশতারা যে ধর্মের অনুসরণ করে। পূর্বেকার সমস্ত নবী-রাসুল যার দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আপনি যদি এই সরল-সঠিক ধর্মের অনুসরণ করেন, তবে তা আপনার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ ও সফলতার মাধ্যম হবে।

আবু তালেব অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ভাতিজার কথাগুলো শুনলেন। অতঃপর তাকে লক্ষ করে বললেন, ভাতিজা, আমার বাপদাদা আর পূর্বপুরুষরা যে ধর্মের অনুসরণ করেছেন, তা ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করা আমার জন্য লজ্জার কারণ হবে। সারা মক্কায় এই খবর রটে যাবে যে, আবু তালেব তার পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে ভাতিজার ধর্ম গ্রহণ করেছে! মানুষ ছি ছি করবে। তাই আমার পক্ষে তোমার ধর্মকে কবুল করা সম্ভব নয়।

আবু তালেব তার কলিজার টুকরা সন্তান আলিকে বললেন, বাবা, তুমি তোমার নিজের জন্য কোন ধর্ম বেছে নিয়েছ? প্রত্যুত্তরে আলি বললেন, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছি। আমার ধর্ম ইসলাম। এমন উত্তর শুনে আবু তালেব কিছুক্ষণ অত্যন্ত প্রশান্ত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, বাবা! যত বড় বাধাই আসুক না কেন, মুহাম্মাদকে ছেড়ে কখনো যেয়ো না। সে তোমাকে যে পথেই পরিচালিত করুক না কেন, তা অবশ্যই তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।[৫২]

প্রিয় পাঠক, আবু তালেবের এই কথাগুলো কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূতপবিত্র, মর্যাদাবান ও কলুষমুক্ত জীবনের প্রশংসাবাক্য নয়? এই কথাগুলো কি তাঁর রেসালাতের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয়? চাচা আবু তালেব যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের কোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ত্রুটিবিচ্যুতি বা দোষের কথাও জানতেন, তাহলে কখনোই নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে তাঁর হাতে তুলে দিতেন না এবং এত সহজেই ছেলেকে ভাতিজার ধর্মের অনুসরণ করতে বলতেন না। এর মূল কারণ ছিল প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম আচরণ ও প্রশংসনীয় গুণাবলি, যা মানুষের হৃদয়কে তাঁর দিকে চুম্বকের ন্যায় টেনে নিয়ে আসত। তাঁর ফেলে আসা জীবনে সততা, বিশ্বস্ততা ও নেককাজের যে অসাধারণ বিকাশ ঘটেছে, সেই কারণেই তাঁর আশেপাশের মানুষগুলো, যারা দিনের কর্মব্যস্ততায় আর রাতের নিশুতি নিদ্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন, যাদের কাছে তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক ছিল আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ, তারা সর্বদা তাঁর বাহ্যিক ও আত্মিক গুণাবলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

তাওহিদের প্রকাশ্য দাওয়াত

কুফর ও শিরকের আঁধারে মক্কার অন্ধ মুশরিকদের ভয়ে পাহাড়ের ঘাঁটিতে গোপনে নামাজ পড়তে হতো। শিক্ষা, সভ্যতা ও শালীনতার আলো ধীরে

৫২. *আস-সিরাতুন নাববিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১৭৮; *আসাহহুস সিয়ার*, পৃষ্ঠা ২৭

ধীরে সংগোপনে অসভ্যতা ও অজ্ঞতার আঁধার ভেদ করতে শুরু করেছিল। মূর্তিপূজার দেশে এক আল্লাহর সামনে সেজদাবনত হওয়া মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। অত্যন্ত গোপন বিষয়গুলোও প্রকাশিত হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। তাওহিদের যে দাওয়াত এতদিন অতি সংগোপনে চলে এসেছে, এখন তা প্রকাশ্যে দেওয়ার সময় এসেছে। আর তাই সত্য ও ন্যায়ের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজিল হলো, 'আপনি আপনার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান এবং মহান আল্লাহর নিকট থেকে আপনি যা-কিছু পেয়েছেন, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষের সামনে তুলে ধরুন।' আল্লাহর নির্দেশমতো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। যার সূচনা হয়েছিল এভাবে...

আরবেরই গৌরব তিনি নবী মুহাম্মাদ,
মক্কাবাসী মানত যাকে করত মহব্বত।

তাদের নিয়ে একদিন তিনি গেলেন সাফা পাহাড়,
বললেন, ওহে বীরের জাতি সালাম নাও আমার।
তোমরা সবাই চেনো আমায় বলো আমার ভাই!
মিথ্যুক নাকি সাদিক আমি—বলো নির্দ্বিধায়।

বলল সবাই—কী যে বলো প্রিয় মুহাম্মাদ!
তুমি সদা সত্যবাদী ছিলে সদা সৎ।

বললেন তিনি আমায় যদি ভাবো এমনই,
মানতে কি তোমরা পারবে তবে এখনো যা বলিনি?
এই পাহাড়ের পিছে আছে এমন সৈন্যদল।
আছে যাদের শক্তিসাহস দৃঢ় মনোবল।
খুঁজছে তারা একটু সুযোগ করতে আক্রমণ
আমার কথা তোমরা সবাই করছ সত্যায়ন?

বলল সবাই সত্যবাদী বন্ধু তুমি মোদের,
বিশ্বাস ও সততায় তুমি পূর্ণ সর্বকালের।

বললেন, যদি আমার কথায় অবাক হও ভাই!
তবে শুনে নাও এতে তেমন বিপরীত কিছু নাই।
দুনিয়ার এই সরাইখানায় এসেছে যারা যবে,
চলে গেছেন সবাই দেখো কেউ রয় না ভবে।
মৃত্যু নামক শত্রু যখন দাঁড়িয়ে আছে পিছে,
মানুষ তখন মালিক ভুলে ব্যস্ত আমোদ নিয়ে।
মিথ্যার সেই কালো পানিতে পৃথিবী ছিল ডুবে,
কতকাল সে মাহরুম ছিল হকের পানীয় হতে।

তাওহিদের সেই রঙিন পেয়ালা ছিল না কারও কাছে,
মারেফাতের গভীর জ্ঞান ছিল না কারও মাঝে।
বিচার-হাশর কাকে বলে জানত না কেউ তখন,
শুরু-শেষের গল্পই-বা জানবে তারা কখন?
গাইরুল্লাহর সঙ্গে ছিল সবার ভালোবাসা,
চিনত না কেউ এক আল্লাহ, করত না তাঁর আশা।

শোনো আমার জাতি সবে শোনো দিয়ে মন,
আমাদের প্রভু যিনি আছেন একজন।
করতে হলে করব শুধু তাঁরই ইবাদত,
দিল-জবানে সবাই তাহার দাও শাহাদাত।
মানতে হলে তাঁরই আদেশ মানব মোরা সবে,
তাঁর দুয়ারেই ভিখ মাঙব চাইব তাঁর সনে।
বাসতে হলে তাকেই তোমরা সবাই ভালোবাসো,
ঝুঁকতে হলে তাঁর সামনেই সবাই মিলে ঝোঁকো।
তাঁর ওপরেই তোমরা সবে ভরসা করে নাও,
তাঁর প্রেমেরই গীত তোমরা সবাই মিলে গাও।
একমাত্র তাঁর রাগকেই করো তোমরা ভয়,
করতে হলে তাঁর তালাশেই করো জীবন ক্ষয়।

দুনিয়ার এই পান্থশালায় কেউ নেই তাঁর শরিক,
সবাই তাঁর ফকির আর তিনি সবার মালিক।

সবার সেরা জ্ঞানী তিনি মাবুদ লা শারিক,
চাঁদ-সূর্য গ্রহ-তারা সবাই তাঁর শ্রমিক।
নবী-রাসুল গাউস-কুতুব তাঁর সামনে নত,
রাজাবাদশা যত আছে সবাই পরাভূত।
তাঁর রাজ্যে পাদরি-পুরুতের পূজা চলে না যেমন,
সুফি-সাধকের পরোয়া তিনি করেন না ঠিক তেমন।

এসব শুনেই উঠল ক্ষেপে আরব জনগণ,
বকল তাকে, মারল তাকে, করল নির্যাতন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই আহ্বান যথার্থ ছিল। তাঁর প্রতিটি কথা ছিল সত্য ও বাস্তব আশ্রিত। কিন্তু শ্রোতাদের হৃদয় হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা হারিয়েছিল। সত্যের রঙে হৃদয় তো তখনই রঙিন হতে পারে, যখন সেখান থেকে মিথ্যা দূরীভূত হয়ে যায়। যুগ যুগ ধরে আরবের কাফেররা মিথ্যার পূজা করে এসেছে। তাদের হৃদয়ে ছিল শয়তানি কুমন্ত্রণা ও অবাস্তব ধ্যানধারণার রাজত্ব। নিজেদের পিতৃপুরুষদের সময় থেকেই তারা যে ভুলের গোলকধাঁধায় চক্কর দিচ্ছিল, কালপরিক্রমায় সেটাকেই মহান বাস্তবতা বলে ভাবতে শুরু করল। অবান্তর বিশ্বাস ও কুসংস্কার তাদের হৃদয়ে সুদৃঢ় পাথুরে ভূমির ন্যায় মজবুত হয়ে বসে গিয়েছিল। তাই এখন সেসব বিশ্বাসকে ত্যাগ করে নতুন কিছু গ্রহণ করাকে তারা অসম্ভব মনে করছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হকের দাওয়াতকে নিয়ে তারা হাসিতামাশা করতে লাগল। নাক সিটকাতে লাগল। চরম হতভাগা আবু লাহাব তো অত্যন্ত কটুভাষায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিতে দিতে চলে গেল। অন্যান্য লোকেরাও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অশালীন ভাষায় গালাগাল ও ধিক্কার দিতে দিতে আপন আপন কাজে চলে গেল।

সত্যের প্রথম আহ্বান মানুষের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও হাসিতামাশায় পরিণত হলো। কুরাইশদের হৃদয়ের গভীরে দীর্ঘদিন যাবৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জমা ছিল, তা নিমেষে উবে

গেল। যে মানুষগুলো একদিন তাকে আল-আমিন, আস-সাদিক বলে সম্বোধন করত, আজ তাদের মুখ থেকেই বের হচ্ছে অশ্রাব্য গালিগালাজ। যাদের হৃদয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসনীয় গুণাবলি ও সর্বোত্তম চরিত্রের সিল বসানো ছিল, আজ তাদের মুখ থেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য জাদুকর, পাগল ও বিকারগ্রস্ত-এর মতো অপমানকর শব্দ বের হচ্ছে। আহ পৃথিবী! আহ শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহণকারী পৃথিবী! চিরকাল এভাবেই তুমি তোমার আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আওয়াজ তুলেছ। হায়! এভাবেই তুমি তোমার কপাল পুড়িয়েছ!!

তুলনাহীন দাওয়াতি প্রেরণা

পৃথিবী অবাক চোখে তাকিয়ে রয় এই মহান সংস্কারকের অসাধারণ ও তুলনাহীন দাওয়াতি প্রেরণা দেখে। গোত্রের প্রতিটি মানুষ অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার পরও যার দাওয়াতি প্রেরণা ও উদ্যম এতটুকু হ্রাস পায়নি। সততা ও আদর্শের যে ভূমির ওপর তিনি নিজের সুদৃঢ় কদম মুবারক রেখেছেন, তা থেকে এক পাও পিছু হটেননি। কারণ তিনি জানতেন যে, এই ধরনের ব্যর্থতা কাজের গতি ও উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া পৃথিবীর সফল মানুষ তো ব্যর্থতার কাদামাটি থেকে উঠেই সফলতার সুউচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছে। ব্যর্থতার কষ্ট যে অনুভব করেনি, সফলতার স্বাদ সে কীভাবে বুঝবে?

কুরাইশদেরকে খাবারের দাওয়াত

পাহাড়ের পাদদেশের সেই হতাশা কাটিয়ে ওঠার আগেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে কুরাইশদের জন্য ভোজের আয়োজন করতে বললেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামতো আলি রা. ভোজের আয়োজন করে কুরাইশদের দাওয়াত দিলেন। কুরাইশের প্রসিদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই ভোজে অংশ নিয়েছিলেন।

সবার খাওয়া শেষ হলে চতুর আবু লাহাব সবাইকে এই সেই কথায় ব্যস্ত করে তুলল এবং যে উদ্দেশ্যে এই ভোজের আয়োজন করা হয়েছে তা মাটি হয়ে গেল। তাই দ্বিতীয় দিন পুনরায় ভোজের আয়োজন করা হলো।[৫৩]

---

৫৩. কোনো কোনো বর্ণনায় তিনদিন খাবারের দাওয়াতের কথা রয়েছে। দেখুন, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/৮২; *খাসায়িসুল কুবরা*, ১/২২৭ (বাংলা); *আত-তবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সাদ*, ১/১৮৭

ইসলামের দাওয়াত

কুরাইশসর্দাররা যখন খাবার খেয়ে অবসর হলো, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ করে বললেন, হে লোকসকল, তোমাদের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন সফলতার জন্য আমি যা নিয়ে এসেছি, তারচেয়ে উত্তম কিছু কেউ কখনো তোমাদের দেয়নি। আমি তোমাদের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিয়ে এসেছি। মহান আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাদের তাঁর সুমহান দরবারে সেজদাবনত হতে বলি।

তাই তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পূজা ও উপাসনার ভ্রান্ত ধারণা মন থেকে মুছে দাও। মূর্তিপূজা ও শিরক থেকে ফিরে এসো। এক আল্লাহর ধ্যান ও উপাসনাকেই জীবনের পরম লক্ষ্য মনে করো। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও কর্মের সংশোধন করো। তোমাদের মাঝে এমন কেউ কি আছে যে আমার এই হকের আহ্বানে সাড়া দেবে, আমাকে এই দ্বীনের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করবে?

প্রিয় মুহাম্মাদের কথা শেষ হতেই পুরো সভা নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। চারদিকে পিনপতন নীরবতা। কারও মুখে কোনো রা নেই। হঠাৎ ১৬-১৭ বছরের এক তরুণ লাফ দিয়ে উঠে সিংহের ন্যায় গর্জন করে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, যদিও আমি এই উপস্থিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ও অনভিজ্ঞ, তবুও আমি যতদিন বেঁচে থাকব, আপনার দ্বীনের প্রচার-প্রসারে নিজেকে উৎসর্গ করে দেবো। প্রয়োজন হলে আপনার জন্য আমি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করব না।

অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার অধিকারী এই তরুণ হলেন আবু তালেবের আদরের দুলাল আলি রা.। কম বয়সী এই তরুণ যদিও ইসলামের নবীকে সাহায্য করার ঘোষণা দিয়ে উপস্থিত কুরাইশ নেতাদের হাসির পাত্র হলেন, কিন্তু পরবর্তী দিনগুলো এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ইসলামের সুমহান সৌধ নির্মাণে তিনি কতটা সুদৃঢ় স্তম্ভের ন্যায় কাজ করেছেন। সেইসঙ্গে কুরাইশের লোকেরাও এই কথা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে যে, একজন সত্যিকার পুরুষ কীভাবে তার ওয়াদা পূরণ করেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দ্বিতীয় চেষ্টাও বিফল হলো। সভার নেতৃবৃন্দ বিদ্রুপ আর অট্টহাসি দিতে দিতে স্থান ত্যাগ করল।

বাইতুল্লাহর ছায়ায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এই ব্যর্থতা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিলো। তিনি কাবাঘরে গিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষ ইবরাহিম আ.-এর স্থাপন করা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সুউচ্চ কণ্ঠে তাওহিদের স্লোগান দিতে লাগলেন। আল্লাহর ঘরকে যারা মূর্তির ঘর বানিয়ে রেখেছে, তাদের এবং তাদের মূর্তিদের বাস্তবতা তুলে ধরে জোরালো বক্তব্য দিলেন। সবাইকে সিরাতে মুসতাকিমের প্রতি আহ্বান করলেন। এভাবে প্রকাশ্যে মূর্তির বিরোধিতা করা কাফেররা সহ্য করতে পারল না, তাই তাদের ক্রোধ ও প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। মুহূর্তেই বেধে গেল হট্টগোল।

ঈমান ও কুফরের সংঘাতে রক্তের প্রথম ফোঁটা

তাওহিদের চেতনায় উজ্জীবিত জানবাজরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তেড়ে আসা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জীবন বাজি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই হাঙ্গামায় হারেস ইবনে ইহালা নামে রাসুলের এক প্রিয় সাহাবি শহিদ হন। ইসলামের পথে এটাই ছিল রক্তের প্রথম ফোঁটা, যে রক্তের ফোঁটায় বাইতুল্লাহর আঙিনা রক্তাক্ত হয়েছে।[৫৪] যে সাম্প্রদায়িক লোকেরা ইসলামের ওপর এই অপবাদ আরোপ করে যে, তরবারির শক্তিতেই ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে, তারা কি এই ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা নিয়ে আদৌ চিন্তা করে না? তারা কি দেখে না যে, ইসলামের শত্রুরা একজন নিরপরাধ মানুষের রক্ত কীভাবে পানির ন্যায় বইয়ে দিয়েছে? আমি স্বীকার করছি যে, শহিদদের রক্তেই ইসলামের স্বাধীনতার রঙিন গল্প লেখা হয়েছিল। কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কোনো যুদ্ধই আক্রমণাত্মক ছিল না, ছিল আত্মরক্ষামূলক।[৫৫] ঈমান ও কুফরের সংঘাতে প্রথম রক্তলোলুপ যে তরবারি কোষমুক্ত হয়েছে, তা ছিল কাফেরদের তরবারি। আর যে রক্তের ফোঁটায় জমিন রক্তাক্ত হয়েছিল, তা ছিল এক নিরপরাধ মুসলিমের পবিত্র রক্তের ফোঁটা। যা তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য নয়, বরং ইসলামের শত্রুদের প্রতিহত করতে গিয়ে প্রবাহিত করছেন। সুতরাং রক্তপাত করে মুসলিমরা পৃথিবীর বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে, এমন উদ্ভট কথা যারা বলে, তাদের ইতিহাসজ্ঞান নিয়ে সত্যিই করুণা হয়।

---

৫৪. *আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা*, ২/৪০৬

৫৫. লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত। ইসলামে প্রয়োজন অনুযায়ী উভয় ধরনের যুদ্ধেরই অনুমতি আছে।-সম্পাদক

কাফেরদের প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড

ইসলাম ও মুসলিমদের ক্রমশ উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে কাফেরদের হৃদয়ে ঘৃণা, ক্রোধ ও প্রতিশোধের উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ল। হিংসা ও শত্রুতার আগুনে ইসলামের এই চারাগাছকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। সারাক্ষণ তাওহিদের অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ঘৃণ্য কৌশল উদ্ভাবনেই তাদের সময় ব্যয় হতে লাগল। তাদের হৃদয় ছিল পঙ্কিলতায় ছাওয়া। হক-বাতিলের পার্থক্য করার যোগ্যতা যাদের ছিল না। নিজেদের পিতৃপুরুষদের কাল্পনিক বিশ্বাস ও মনগড়া বিধিবিধানকেই তারা তাদের প্রকৃত দ্বীন মনে করত। আর সেই বানোয়াট ধর্মের সত্যতার ওপর তাদের এতটাই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এর বিপরীতে তাদের উদ্ধত ও জেদি স্বভাব অন্য কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুতই ছিল না। তারা কোনোভাবেই এটা মেনে নিতে পারছিল না যে, কেউ তাদের উপাস্যদের মিথ্যা ও বানোয়াট বলুক, তাদের মূর্তিপূজাকে অজ্ঞতা ও মূর্খতার মতো শব্দে অভিহিত করুক।

আহা! নির্জীব পাথরের নির্বাক মূর্তিদের প্রতি তাদের আসক্তি এতটাই প্রবল ছিল, এদের হেফাজতে প্রয়োজনে তারা নাঙ্গা তরবারি হাতে জীবন-মৃত্যুর রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যেত, একে অন্যের দেহ থেকে মাথা আলাদা করতেও তারা দ্বিধা করত না।

আবু তালেবের নিকট অভিযোগ

তাওহিদের প্রতি আহ্বানকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতি কাজ কাফেরদের ঘুম হারাম করে দিলো। তাই তাদের বেশ কজন নেতা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা এবং অভিভাবক আবু তালেবের নিকট নালিশ করতে এলো। তারা আবু তালেবকে লক্ষ করে বলল,

> তুমি তোমার ভাতিজাকে সামলাচ্ছ না কেন? সে আমাদের আকিদা-বিশ্বাসকে মূর্খতা আর আমাদের উপাস্যদেরকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করছে। শুধু তাই নয়, যেখানে-সেখানে প্রকাশ্যে সে তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। মনে রেখো, আমরা আমাদের উপাস্যদের অসম্মান কখনো সহ্য করব না। তোমার সম্মানের কথা ভেবেই আমরা এখনো তাকে কিছু করছি না।

জ্ঞান ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে আবু তালেব কাফের নেতাদের সান্ত্বনা দিয়ে তাদের রাগ প্রশমিত করলেন। তাদেরকে বিদায় দিয়ে তিনি ভাতিজার কাছে গেলেন, সবকিছু খুলে বললেন।

কাফেরদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত

কাফেরদের এইসব হুমকি-ধমকি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিমালয়সম প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি। তিনি পুরোদমে নিজের দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এবার আর কাফেররা বসে থাকল না। বৈধ বা অবৈধ, যেকোনো উপায়ে তারা হকের আওয়াজকে নিস্তব্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। শেষবারের মতো তাদের বড় বড় নেতারা আবু তালেবের কাছে গিয়ে শুনিয়ে দিলো তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত,

> হয়তো তুমি তোমার ভাতিজাকে সামলাবে, যাতে সে আমাদের উপাসনা-আরাধনা ও আকিদা-বিশ্বাসের বিরোধিতা থেকে ফিরে আসে, নয়তো তুমি মাঝখান থেকে সরে যাও, আমরা নিজেরাই তাকে সামলাব।

আবু তালেব কাফের নেতৃবৃন্দকে বিদায় দিয়ে সত্যের পতাকাবাহী তার ভাতিজার কাছে আবারও এলেন। তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা ভাতিজাকে শুনিয়ে বললেন, ভাতিজা! মানুষের ক্রোধের আগুন এখন পুরোপুরি প্রজ্বলিত হয়ে গেছে। তারা তোমাকে নিঃশেষ করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে। এই মুহূর্তে আকিদা-বিশ্বাসের তাবলিগ ও মূর্তিপূজার বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকাই তোমার জন্য ভালো হবে। ভাতিজা, আমার ওপর এতটা ভার চাপিয়ে দিয়ো না, যা আমি বইতে পারব না।

ইসলামের নবীর নির্ভীক জবাব

আবু তালেবের কথা শুনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবেই এ কথা বুঝতে পারলেন যে, এখন প্রিয় চাচাও তাঁর মাথার ওপর থেকে অভিভাবকত্বের হাত উঠিয়ে নিতে চাচ্ছেন। চাচার মুখ থেকে এমন হৃদয়বিদারক কথা শুনেও তিনি ভেঙে পড়েননি, বরং তাঁর হৃদয়ের অন্দরে যেন আদর্শের দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞার অবিচলতা বজ্রাঘাত হানল। আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন তিনি। দুচোখ ভিজে উঠল তাঁর। অত্যন্ত হৃদয়নিংড়ানো ভাষায় তিনি চাচাকে বলতে লাগলেন,

আমার লালনপালনের গুরুদায়িত্ব বহনকারী প্রিয় চাচা!
হে আমার প্রিয় অভিভাবক!
বক্ষে আমার ব্যাকুল হৃদয়, জ্বলছে আগুন তাতে।
ভালোবাসার শান্তি পেতে আকুল দিনে-রাতে।

কোনো নবীকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং কুফরের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়গুলোকে আঁধার থেকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করার চেষ্টা করা কি আপনাদের সংবিধানে অপরাধ? যদি সেটা অপরাধ হয় তবে শুনুন,

ভালোবাসি, এতেই যদি হই আমরা গুনাহগার,
মাফ করে দিন, অন্য সবার আমিই নেব পাপের ভার।

পুরো বিশ্বমানবতাকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার মতো ভালো উদ্যোগ এবং পথহারা মানুষকে পথের দিশা দেওয়া যদি পথভ্রষ্ট লোকদের দৃষ্টিতে অপরাধ হয়, তাহলে এই পৃথিবীর যেকোনো মহাশক্তি-পরাশক্তি আমার বিরোধিতা করলেও আমি এই অপরাধ থেকে বিরত হব না। সর্বদা সত্যের সামনে মাথানত করার যে নিরন্তর প্রেরণা আমার হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে, তা আমাকে এই কথা বলতে বাধ্য করছে যে, ততদিন পর্যন্ত আমি এই অপরাধ করেই যাব, যতদিন আমার এই দেহে এক ফোঁটা রক্তও বাকি থাকবে। হয়তো এই সরল-সঠিক দ্বীনের প্রোজ্জ্বল প্রদীপের আলোতে পূর্ব-পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত করতে থাকব, নয়তো কুফরের আঁধারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে নিজের জীবনকে হকের জন্য উৎসর্গ করে দেবো। আমার প্রতিজ্ঞা মজবুত পাথুরে প্রান্তরের মতো সুদৃঢ়। তাই এই নশ্বর পৃথিবীর যত বড় শক্তিই আমার বিরোধিতা করুক না কেন, যতদিন আমার দেহে একটি নিশ্বাসও বাকি থাকবে, ততদিন আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা থেকে ফেরাতে পারবে না। যতদিন আমার এই ধড়ের সঙ্গে মাথা লেগে আছে, ততদিন পর্যন্ত কেউ আমার সেই পা-কে একচুলও পিছু হটাতে পারবে না, যে পা দিয়ে আমি হকের পথে চলতে শুরু করেছি।[৫৬]

হৃদয় হৃদয়ের কথা শোনে

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাকুল হৃদয়ের আবেগাপ্লুত কথাগুলো যেন আবু তালেবের হৃদয়েও দৃঢ়তা ও অবিচলতার এক অগ্নিশিখা দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিলো। ভাতিজার এমন নির্ভীক জবাব শুনে নিজের অজান্তেই তার দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

স্বপ্নের আঙিনায় বসে আছে সে আমার হৃদয় দখল করে,
জানি না কী ছিল তার আহাজারি ধ্বনিতে।

---

৫৬. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/১৮৬; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/৯০ (ভলিয়ম-২, দারুল হাদিস)

আবু তালেব অশ্রুসিক্ত চোখে আদর্শে অনড় ভাতিজার দিকে তাকালেন। অত্যন্ত সাহসদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, ভাতিজা! যাও, যা মনে চায় তা-ই করো, যা ইচ্ছা তা-ই বলো। যা করতে চাও করতে থাকো। আল্লাহর কসম! আমি কখনো তোমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দেবো না।

সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না

এতভাবে বলে-কয়েও যখন কোনো লাভ হলো না; বরং কুফরের অন্ধকার ভেদ করে ঈমানের আলো প্রতিনিয়ত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন আর কাফেররা চুপ করে বসে থাকল না। সত্যের পতাকাবাহী পয়গম্বরের সঙ্গে তারা পাষাণ হৃদয়ে অন্যায় আচরণ করা শুরু করে দিলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের দুই কন্যা তখন আবু লাহাবের দুই ছেলের স্ত্রী। আবু লাহাব তার ছেলেদের বাধ্য করল তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে। এর মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ এই হতভাগা শুধু আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গেই বেয়াদবি করেনি; বরং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় কন্যাদের আলোতে তার ছেলেদের যে ঘর আলোকিত ছিল, তা-ও বিরান করে দিলো।

এই চরম হতভাগার কুচক্রী স্ত্রী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চলার পথে (যে পথের মাটি চোখের সুরমা হওয়ার উপযুক্ত) কাঁটা বিছিয়ে দিত। ফলে যে পবিত্র কদম মুবারকের সৌন্দর্যে আকাশের চাঁদ-তারারাও লজ্জিত হয়ে পড়ে, সেই পা মুবারক বিষাক্ত কাঁটার আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে যেত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে পিঠে চুমু দেওয়ার ভাগ্য শুধু কোনো মহাসৌভাগ্যবানের কপালেই জুটত, আবু লাহাব সেই পিঠে পাথর মারতে থাকত। দুর্ভাগা মূর্তিপূজারিদের পাথরের আঘাতে আঘাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু-হাঁটু বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ত। জুতা মুবারক রক্তে একাকার হয়ে যেত।

প্রিয় পাঠক, একটু ভেবে দেখুন, যখন নিকটাত্মীয়রাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়েছে, তাঁর পবিত্র শরীর থেকে এতটা রক্ত ঝরিয়েছে, তখন অন্যরা যা-কিছু করত, তা তো সামান্যই ছিল।

বন্ধু যখন মারতে তোমায় সুযোগ খুঁজে বারেবারে,
ভাবতে পারো, শত্রু তোমার কী থেকে কী করতে পারে!

একদিনের ঘটনা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম শরিফে নামাজ পড়ছিলেন। তিনি যখন মহান আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হলেন, ইসলামের কট্টর দুশমন ওকবা ইবনে আবু মুইত তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদরকে রশির মতো পেঁচিয়ে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধে ফাঁস দিয়ে হেঁচকা টান দিলো। এতটাই জোরে টান দিয়েছিল যে, দম বন্ধ হয়ে তাঁর দুচোখ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় বন্ধু আবু বকর রা.। ইতিমধ্যেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। নিজের একান্ত বন্ধু ও আদর্শপুরুষটির সঙ্গে এমন নিকৃষ্ট আচরণ দেখে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। দ্রুত ওকবা ইবনে আবু মুইতকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে কাফের-মুশরিকদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা কি এই মানুষটিকে শুধু এই কারণেই হত্যা করবে যে, সে শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলে, একত্ববাদের ঘোষণা করে? অথচ, তিনি তোমাদের কাছে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন, তা তাঁর প্রভুর একত্ববাদের বিষয়ে হাতের তালুর চেয়েও স্বচ্ছ ও আলোকিত সূর্যের চেয়েও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত।

সততার মূল্য

কাফেররা যখন একজন একত্ববাদে বিশ্বাসীর মুখ থেকে এমন কথা শুনল, তখন তাদের ক্রোধের পাহাড় যেন আকাশ স্পর্শ করে ফেলল। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারা আবু বকর রা.-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে মারতে মারতে বেহুঁশ করে ফেলল।

আহ সততা! দেখো তোমার জন্য কত চরম মূল্য দিতে হয়।

পবিত্র পিঠের ওপর নাপাক নাড়িভুঁড়ি

আরেকদিনের ঘটনা, সেদিনও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরের সামনে নামাজ আদায় করছিলেন। তিনি যখন সেজদাবনত হলেন, আবু জাহলের আদেশে ওকবা ইবনে আবু মুইত তখন পচা দুর্গন্ধযুক্ত নাপাক নাড়িভুঁড়ি তুলে এনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিঠের ওপর রেখে দিলো। এই অবস্থাতেই তিনি সেজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'-এর তাসবিহ পাঠ করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের ছোট মেয়ে ফাতেমা রা. এই খবর

শুনে ছুটে এলেন। বাবার পিঠের ওপর থেকে পচা নাড়িভুঁড়ি সরিয়ে পিঠ ও কাঁধ পরিষ্কার করে দিলেন।

মিথ্যার পূজারিদের শিকারের ফাঁদ

এই পৃথিবীর যেখানেই মানুষের বসবাস রয়েছে, সেখানেই ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির পূজা চলে এসেছে। তেরোশ বছর আগে যেমন অর্থসম্পদ ও ক্ষমতার জাদুকরি আকর্ষণে মানুষ নিজেদের দ্বীনধর্ম ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতেও পিছপা হতো না, তেমনই আজও মানুষ টাকাপয়সা ও ক্ষমতার জন্য নিচু থেকে নিচুতর হতে দ্বিধা করে না।

মক্কার কাফেররা ভাবল, এত জ্বালা-যন্ত্রণা, এত লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, এত জুলুম-নিপীড়নের পরও মুহাম্মাদ তাঁর অবস্থান থেকে একটুও নড়ছে না। সে আসলে কী চায়? ক্ষমতা? টাকাপয়সা? না প্রভাব-প্রতিপত্তি? যদি তা-ই হয়, তবে ঠিক আছে, আমরা তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দেবো। সোনা-রুপায় তাঁর ঘর ভরে দেবো। তাঁর ক্ষমতা ও নেতৃত্বের কথা পুরো মক্কার মানুষকে জানিয়ে দেবো। তবুও সে আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধাচরণ বন্ধ করুক। আমাদের বাপদাদারা যে ধর্ম পালন করে গিয়েছেন তার কোনো ক্ষতি না হোক।

কাফেরদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মক্কার প্রসিদ্ধ নেতা উতবা ইবনে রবিআ এলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে, তাদের লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে বলল,

> মুহাম্মাদ! এসব যদি তুমি সম্পদের মোহে করে থাকো, তবে শোনো, আমরা তোমাকে এই পরিমাণ সম্পদ এনে দেবো যে, পুরো আরবের কেউ এত সম্পদের মালিক হবে না। তুমি যদি সম্মান ও ক্ষমতার প্রত্যাশী হও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে মেনে নেব। যদি তোমার পার্থিব ভোগবিলাসের প্রয়োজন হয়, তাহলে তোমার বিনোদনের জন্য আরবের সবচেয়ে সুন্দরী রমণীদের দিয়ে তোমার হেরেম ভরিয়ে দেবো। আর এই সবকিছুর বিনিময়ে আমরা শুধু তোমার কাছে চাই, তুমি আমাদের মূর্তিদের বিরুদ্ধাচরণ বন্ধ করো। আমাদের ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকো। ব্যস! তোমার কাছে আমাদের শুধু এতটুকুই চাওয়া। আমাদের চাওয়াটা তুমি পূরণ করো, দেখবে আমরা সবাই তোমার

গোলাম হয়ে গেছি। যেকোনো পরিস্থিতিতে, যেকোনো মুহূর্তে তোমার আদেশ পালন আমাদের জন্য শিরোধার্য হবে।[৫৭]

পরীক্ষার কষ্টিপাথর

প্রিয় পাঠক, আপনি তো কাফেরদের প্রস্তাবিত বিষয়গুলো পড়লেন। এবার ইসলামের নবীর জবাব শোনার আগে সামান্য সময়ের জন্য আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে একটু চিন্তা করুন! একটু ভাবুন! যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রকৃত নবী-রাসুল নয়, ঈমানের আলোয় যার হৃদয় উদ্ভাসিত নয়, কাফেরদের লোভনীয় তিনটি শর্তের যেকোনো একটিই তাকে সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে যথেষ্ট। ভোগবিলাসের লোভনীয় আকর্ষণ থেকে সে কীভাবে নিজেকে দূরে রাখবে? এই পৃথিবী খুব ভালোভাবেই জানে যে, সোনা-রুপার চমকে কত অসংখ্য মানুষ তাদের আদর্শকে বিকিয়ে দিয়েছে। কত দেশপ্রেমিক যোদ্ধার চোখে গাদ্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতার আবরণ পড়ে গেছে। শুধু সম্মান ও ক্ষমতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাই যে কত বুজুর্গকে নিজের আত্মসম্মান বিক্রি করতে বাধ্য করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

আর নারী? তার কথা আর কীই-বা বলব। তার চলা আর বলার ভঙ্গি, আকর্ষণীয় চাহনি এবং মিষ্টি লাজুক হাসি যে কত বড় বড় বীরবাহাদুরকে কুপোকাত করেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নারীদের কমনীয় সৌন্দর্য ও লাজুক হাসির ভেতর যে কত অসংখ্য রাতজাগা আবেদ ও দুনিয়াত্যাগী মানুষের আল্লাহভীতি এবং পবিত্রতার পোশাক ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েছে তা কে না জানে? সেসব ঘটনার আলোকে যখন আমরা ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখি, তখন হক ও ইনসাফ এ কথা বলতে বাধ্য করে যে, সত্যিই তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ছিলেন। মহান আল্লাহই তাঁর জীবনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন এবং নিজের মতো করে তাঁকে চালাতেন। তাঁর হৃদয় তো নুরে ইলাহির কারণে সমস্ত আলোর উদয়স্থল ছিল। মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও অনুভূতির সর্বোচ্চ শক্তি দিয়েও যার ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না। সেই মহান সত্তাই তো তাকে মানুষের কাছে নিজের বার্তা পৌঁছে দিতে প্রেরণ করেছিলেন। নবুয়তের সুমহান দায়িত্ব তো তিনিই তাঁকে দিয়েছিলেন। আর

---

৫৭. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/২০৬

সেজন্য তিনিই তাঁর হৃদয়কে সব ধরনের কুপ্রবৃত্তি ও আত্মপূজার নাপাকি থেকে পবিত্র রেখেছেন।

নবীজির জবাব

সততা ও ইনসাফের ধারকবাহক, বিশ্বমানবতার গৌরব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উতবা ইবনে রবিআর কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমি তো মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করি। মিথ্যার পূজারি এই পৃথিবীকে আল্লাহর দিকে ডাকি। আমার হৃদয়ে অন্য কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। পার্থিব কোনো লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য আমি এসব করছি না। ক্ষমতা, অর্থ-বিত্ত এসবে আমার আগ্রহ নেই। তোমাদের নেতা বা রাজা হওয়ার বাসনাও আমার নেই। এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উতবাকে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত পড়ে শোনালেন।

উতবাও জাদুগ্রস্ত হয়ে গেল!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত করছিলেন। উতবা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। এক অজানা আকর্ষণ তাকে ধীরে ধীরে কাছে টানছিল। সে দ্রুত সেখান থেকে উঠে কাফেরদের কাছে ছুটে এলো। তাদের কাছে এসেই যেন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। নিজেকে কিছুটা সংযত করে সে উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বলল, আমি এমন অলংকারপূর্ণ কথা শুনেছি, যা কোনো জাদুকরের জাদুমন্ত্র নয়, নয় কোনো গণক-জ্যোতিষীর কথা। মুহাম্মাদ জাদুকরও নয়, পাগলও নয় এবং সে কোনো কবিও নয়। তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দাও, কারণ সে তাঁর দাবিতে সত্যবাদী। এমন কথা শুনে কাফেররা হা হা রব করে উঠল। তারা নিজেদের মাঝে বলাবলি করতে লাগল, হায়! মুহাম্মাদ শেষ পর্যন্ত উতবাকেও জাদু দিয়ে বশ করে নিলো!

জুলুমের কাঠগড়ায় একত্ববাদের অনুসারীরা

কাফেরদের এমন লোভনীয় প্রস্তাবেও যখন কাজ হলো না, তখন তারা রক্তেই সমাধানের পথ খুঁজতে লাগল। তাদের ক্রোধ, প্রতিশোধ ও ফেতনা-ফাসাদের আগুন এমন তীব্রভাবে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল যে, ইরানের প্রসিদ্ধ অগ্নিশিখাও যেন তার কাছে হার মানল। তারা সবাই হাতে হাত রেখে মূর্তির নামে শপথ করে বলল, চরম দুঃখকষ্ট ও জুলুম-নিপীড়নের মাধ্যমে আমরা

মুসলিমদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলব। আমাদের উপাস্যদের বিরোধিতা করার পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, এবার তারা তা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

হাবাশায় হিজরত, ভালো থেকো স্বদেশ

কাফের-মুশরিকদের এবারের জুলুম-নির্যাতন অতীতের সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। মাতৃভূমি মক্কায় নিজেদের ঈমান-আমল নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল মুসলিমদের জন্য। আবু বকর রা.-এর ন্যায় এমন মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও উঁচু আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন না। একদিন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হারাম শরিফে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। কাফেররা তাকে নিষেধ করল। কিন্তু তিনি তাদের নিষেধের তোয়াক্কা না করে কুরআন তেলাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। এমন আচরণে কাফেররা ক্রোধে ফেটে পড়ল। কুরআন তেলাওয়াতের কারণে তাকে এত জোরে চড় মারল যে, তার গালে তাদের নাপাক আঙুলের দাগ বসে গেল। মুসলিমরা সব ধরনের কষ্ট সইতে পারত, কিন্তু নিজেদের ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে কারও নাক গলানো সহ্য করতে পারত না। মুশরিকদের এমন ঔদ্ধত্য ও জুলুম-নিপীড়ন দেখে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হিজরত করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের অনুমতি দিয়ে দিলেন। কারণ, তিনিও মজলুম মুসলিমদেরকে কাফেরদের জুলুমের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার উপায় খুঁজছিলেন। তাই এখন মুসলিমদের পক্ষ থেকে যৌক্তিক ও সময়োপযোগী প্রস্তাব শুনে তিনি 'না' করলেন না।

তিনি তাদেরকে হাবাশার বাদশাহ নাজাশির দয়া-অনুগ্রহ ও ইনসাফের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি দিলেন। প্রথমে ১৫ জন মজলুম মুসলিম নিজেদের ঈমান-আমল নিয়ে একটু স্বস্তিতে দিনাতিপাত করার উদ্দেশ্যে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে হাবাশার উদ্দেশে রওয়ানা হন। ইসলামের এই প্রথম মুসাফির দল পায়ে হেঁটে উপকূল পর্যন্ত গেলেন। সেখান থেকে নৌকায় আরোহণ করে হাবাশায় পৌছলেন। হাবাশায় খ্রিষ্টানদের রাজত্ব ছিল। সেখানকার বাদশাহ নাজাশি ন্যায়পরায়ণতা, দান-অনুগ্রহ ও ভালো কাজের জন্য সুখ্যাত ছিলেন। তিনি মুসলিম মুহাজিরদের এই দলের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করলেন। সেখানে তাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখার নির্দেশ দিলেন। আর এভাবেই ১৫ জন মুহাজির শত্রুদের কবল

থেকে বেরিয়ে নাজাশির দেশে নিরাপদে বসবাস করতে লাগলেন। এখন আর তাদের ধর্মীয় অনুশাসন পালন করতে সমস্যা হয় না। এই ১৫ জন মুহাজির হলেন—

১। উসমান রা. ২। আবু হুজাইফা ইবনে উতবা রা. ৩। উসমান ইবনে মাজউন রা. ৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ৫। জুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. ৬। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. ৭। মুসআব ইবনে উমায়ের রা. ৮। আমের ইবনে রবিআ রা. ৯। সুহাইল ইবনে বাইজা রা. ১০। জাফর ইবনে আবু তালেব রা. ১১। হাতেব ইবনে উমর রা. ১২। উম্মে সালামা রা. ১৩। সাহলা রা. ১৪। ইয়ালা আমেরা রা. ১৫। রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি উসমান ইবনে আফফান রা.-এর স্ত্রী ছিলেন।

কাফেররা যখন জানতে পারল যে, কয়েকজন মুসলিম গোপনে দেশত্যাগ করে হাবাশায় হিজরত করেছে এবং সেখানে অত্যন্ত নিরাপদে ধর্মপালন করছে, সুখশান্তিতে বসবাস করছে, দিনাতিপাত করছে, তখন তাদের বুকে যেন কোনো বিষাক্ত সাপ ছোবল মারল। রাগে-ক্ষোভে তারা ফেটে পড়ল। মক্কায় কাফেরদের জরুরি সভা বসল। কীভাবে মুসলিমদেরকে হাবাশা থেকে বের করে দেওয়া যায় সেই কৌশল খুঁজতে লাগল। অবশেষে সভায় সিদ্ধান্ত হলো যে, হাবাশার বাদশাহ নাজাশির[৫৮] নিকটে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হবে। যারা নাজাশিকে এই কথা বলে বোঝাবে যে, আপনি যাদের আশ্রয় দিয়েছেন, তারা মারাত্মক অপরাধী ও দেশদ্রোহী। তাই আপনি তাদেরকে আপনার দেশ থেকে বের করে দিন।

নাজাশির রাজদরবারে কাফেরদের প্রতিনিধিদল

আবদুল্লাহ ইবনে রবিআ ও আমর ইবনুল আস রা. তখনও মুসলিম হননি। এই ঘটনার কিছুদিন পরই তারা মুসলিম হন। পরবর্তী সময়ে আমর ইবনুল আস মিশর জয় করেন। কাফেররা তাকে এবং আবদুল্লাহ ইবনে রবিআকে

---

৫৮. **নাজাশি :** নাজাশি কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম নয়; বরং তৎকালীন আবিসিনিয়া সম্রাজ্যের প্রত্যেক অধিপতিকেই সম্মানসূচক সম্বোধন হিসাবে নাজাশি বলা হতো। যেমন রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতিকে কায়সার, পারস্য সম্রাজ্যের অধিপতিকে কিসরা, মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসককে মুকাওকিস এবং তুর্কি সাম্রাজ্যের অধিপতিকে খাকান বলা হতো। আলোচ্য নাজাশি বা হাবাশা-রাজার নাম ছিল আসহামা ইবনে আবজার। তিনি সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যার জন্য নবীজি গায়েবি জানাজা আদায় করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।-সম্পাদক

দূত হিসাবে নাজাশির কাছে পাঠাল। তারা হাবাশায় পৌঁছেই প্রথমে রাজার কাছের লোকদের এবং পাদরিদের উপহার-উপঢৌকন দিয়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে নিলো। এরপর নাজাশির সামনে উপস্থিত হয়ে বাদশাহর জন্য আনা হাদিয়া পেশ করল। উপহার প্রদান শেষে তারা বাদশাহকে নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলল,

> মহামান্য বাদশাহ! আমরা মক্কার অধিবাসী। সেখানকার বড় বড় নেতাদের প্রতিনিধি হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমাদের শহরের কিছু নিকৃষ্ট লোক নতুন এক ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছে। তারা যেমন মূর্তিপূজার বিরোধিতা করে, তেমনই খ্রিষ্টানদের নিয়েও যা-তা বলে। আমরা তাদেরকে বোঝানোর সব ধরনের চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা তাদের সীমালঙ্ঘনে অটল-অবিচল। কয়েকদিন আগে তাদের কিছু লোক আপনার শহরে এসেছে, আপনার দয়া-অনুগ্রহের সুযোগ নিয়ে এখানে শান্তিতে বসবাস করছে। আমাদের আবেদন হলো, আপনার দেশে এই পাপিষ্ঠদের অবস্থানের সুযোগ না দিয়ে আপনি এদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন।

নাজাশি তাদের কথা শুনে মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। তারা রাজদরবারে আসার পরে বাদশাহ তাদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা নাকি নতুন এক ধর্ম আবিষ্কার করেছ, যা মূর্তিপূজা ও খ্রিষ্টধর্মের বিরোধিতা করে? তোমরা কি সত্যিই নিজেদের দেশে বিদ্রোহ করে এখানে পালিয়ে এসেছ?

মুসলিমগণ জাফর ইবনে আবু তালেব রা.-কে কথা বলার জন্য আগে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে সহজ-সরল ভাষায় নিম্নোক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। যেখানে ইসলামের নবীর প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষার সারসংক্ষেপও আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

নাজাশির সামনে একজন মুসলিমের বক্তব্য

হে হাবাশার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, আমাদের দেশে শিক্ষার প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। আমরা সরল-সঠিক পথ হারিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। মূর্তিপূজাই ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে প্রিয়। মৃত প্রাণী ভক্ষণে আমাদের কোনো ঘৃণা ছিল না, সব ধরনের মন্দকাজে সিদ্ধহস্ত ছিলাম। প্রতিবেশীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার ছিল আমাদের কাছে খুবই সাধারণ বিষয়। পুরো মক্কায় জোর যার মুল্লুক তার অবস্থা বিরাজ করছিল। এই পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ আমাদের কাছে আমাদেরই গোত্র থেকে একজন

রাসুল প্রেরণ করেছেন। যার বংশপরিচয়, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, আমানত ও দ্বীনদারি এবং পাপাচারহীন পূতপবিত্র জীবন সম্পর্কে আমরা খুব ভালোভাবেই অবগত। তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এই কথার ঘোষণা দিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, শিরক অত্যন্ত মারাত্মক একটি গুনাহ। মূর্তিপূজা চরম অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। তিনি আমাদের রোজা, নামাজ, হজ ও জাকাতের আদেশ দিয়েছেন। চরিত্রমাধুর্য ও প্রশংসনীয় গুণাবলিই মানবজীবনের সর্বোত্তম কল্যাণ ও সৌন্দর্য। আমরা যেন চরিত্রমাধুর্য, সততা, আমানতদারি, তাকওয়া-পরহেজগারি ও পূতপবিত্রতার সঙ্গে জীবনযাপন করি। সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকি। এমনইভাবে যেন এতিম-অসহায় মানুষের সম্পদ গ্রাস না করি এবং বিধবাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করি। খুনখারাবি থেকে বিরত থাকি।

প্রিয় বাদশাহ! এখন আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করি না। আল্লাহর বিধিবিধান পালন এবং রাসুলের আদর্শের অনুসরণই আমাদের ঈমানের মূলভিত্তি। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে-সমস্ত বস্তুকে হারাম করেছেন, সেগুলোকে হারাম বলে বিশ্বাস করি। যেগুলো হালাল সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে হালাল বলে বিশ্বাস করি। নিজেদের অধীনে থাকা লোকদের ওপর অত্যাচার করি না। ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে আল্লাহর এই জমিনকে রক্তাক্ত করি না। ভদ্রতা ও উত্তম চরিত্রকেই আমরা জীবনের মহামূল্যবান অলংকার মনে করি। মহামান্য বাদশাহ! এই হলো আমাদের ধর্ম, যার বিধিবিধান পালন করার অপরাধে আমাদের গোত্রের লোকেরাই আমাদের চরম জুলুম-নিপীড়নের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে। তাদের অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন বাধ্য হয়ে আমরা নিজেদের প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে আপনার আশ্রয়ে এসেছি। আমাদের গোত্রের লোকেরা তো ছায়ার মতো আমাদের পেছনে লেগে আছে। তারা আমাদের কোথাও একটু শান্তিতে বসবাস করতে দেবে না। এখানে আপনার আশ্রয়ে আমরা নিরাপদে বসবাস করছি শুনেই তারা সুদূর মক্কা থেকে এখানে এসে হাজির হয়েছে। অন্যান্য রাজাবাদশাদের বাদ দিয়ে আপনার ইনসাফ ও দয়া-অনুগ্রহের আশ্রয়ে বসবাস করাটাকেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। আশা করছি আপনার রাজত্বে কেউ আমাদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন করতে পারবে না।[৫৯]

---

৫৯. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ১/২৩৫; *দালায়িলুন নুবুওয়া লিল বাইহাকি*, ২/৩০৩

মন্ত্রমুগ্ধ নাজাশি

সত্যাশ্রিত এই বক্তব্য নাজাশির সত্যান্বেষী হৃদয়ে খুব রেখাপাত করল। বক্তব্য শেষ হলে তিনি জাফর ইবনে আবু তালেব রা.-কে লক্ষ করে বললেন, 'তোমাদের রাসুলের ওপর যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, সেখান থেকে কিছু অংশ পড়ে আমাদের শোনাও।'

নাজাশির কথামতো জাফর ইবনে আবু তালেব রা. সুরা মারইয়াম-এর কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে শোনালেন। আল্লাহর কালামের এমন হৃদয়গ্রাহী তেলাওয়াতের প্রভাবে নাজাশি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল আবেগের অশ্রুধারা। অবচেতন মনেই তিনি বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কসম! এই সাহিত্যপূর্ণ কালাম এবং ঈসা মসিহের ওপর অবতীর্ণ ইনজিল, দুটো একই সুতোয় গাঁথা। অবশ্যই মুহাম্মাদ সেই মহান মর্যাদার অধিকারী নবী, পবিত্র ইনজিলে যার আগমনের সুসংবাদ রয়েছে। আহা! যদি রাজ্য পরিচালনার এই ব্যস্ততা থেকে একটু অবসর হতে পারতাম, তাহলে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর শিক্ষার বরকত গ্রহণ করে ধন্য হতাম।'

নাজাশি এবার কুরাইশ কাফেরদের প্রতিনিধিদলকে লক্ষ করে বললেন, 'মুসলিমরা কোনো অন্যায় করেনি। তারাই প্রকৃত ভালো হেদায়েত প্রাপ্ত এবং সত্যান্বেষী। তোমরা বরং তাদের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে বাধা দিচ্ছ। ইসলামের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করছ। তোমাদের সীমাহীন জুলুম-নিপীড়ন সইতে না পেরেই তারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তারা আমার আশ্রয়ে রয়েছে। আমি তাদেরকে তোমাদের অত্যাচারের বিষমিশ্রিত ধারালো তরবারির নিচে জবাই হতে দেবো না। তোমরা এখন যেতে পারো।

মুসলিমদের অপমান-অপদস্থ করার কত জল্পনাকল্পনা নিয়েই-না তারা এসেছিল! কিন্তু নাজাশির বক্তব্য তাদের সকল পরিকল্পনায় পানি ঢেলে দিলো।

কাফেরদের নির্লজ্জ চক্রান্ত

কাফেরদের প্রতিনিধিদলের দুই নেতা অত্যন্ত হতাশ ও ভারাক্রান্ত হয়ে নিজেদের বিশ্রামাগারে ফিরে গেল। সারারাত তারা নিজেদের মিশনে সফলতা অর্জনের কৌশল নিয়ে ভাবতে লাগল। সে রাতে তাদের এক ফোঁটা

ঘুমও হলো না। অবশেষে রাত জেগে চিন্তাভাবনা করে একটা কৌশল তারা খুঁজে পেল।

দ্বিতীয় দিন আমর ইবনুল আস পুনরায় নাজাশির দরবারে উপস্থিত হলো এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে বাদশাহকে লক্ষ করে বলল, 'মহামান্য বাদশাহ, যে কারণে পুনরায় আপনার পদচুম্বন করে আমার ধন্য হওয়ার সুযোগ হয়েছে তা হলো, গতকাল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আপনাকে বলা হয়নি। এই যে মুসলিমদের আপনি দেখছেন, তাদের আকিদা-বিশ্বাস ঈসা মাসিহের আকিদা-বিশ্বাসের বিপরীত। শুধু তাই নয়, এরা এই মহান নবীকে নিয়ে কটূক্তিও করে।'

নাজাশি দ্বিতীয়বার মুসলিমদের ডাকলেন। বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করলেন মুসলিমদের, ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে তোমরা কী ধারণা পোষণ করো?

উত্তরে মুসলিমরা বলল, আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহর একজন বান্দা ও তাঁর রাসুল। তাকে নবী বলে বিশ্বাস করা সমস্ত মুসলিমের ওপরই ফরজ।

মুসলিমদের এমন উত্তর শুনে জমিন থেকে এক টুকরো খড়কুটা উঠিয়ে নিয়ে নাজাশি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের এই বিশ্বাস ও ঈসা আ.-এর মর্যাদার মাঝে এই খড়কুটা পরিমাণও পার্থক্য নেই।

নাজাশি প্রথমেই তার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুরাইশের এই প্রতিনিধিদলের কোনো খারাপ মতলব রয়েছে। এখন তাদের এমন নির্লজ্জ চক্রান্তে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। কুরাইশদের জন্য তার হৃদয়ে আর এতটুকু সহমর্মিতাও রইল না। অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি প্রতিনিধিদলকে বললেন, যাও, আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যাও। আর কখনো তোমাদের মুখ যেন আমি না দেখি।

স্থায়ী নিবাস থেকে আদমের প্রস্থানের ইতিকথা শুনতে এসেছিল।

কিন্তু তোমার গলি থেকে সম্পূর্ণ আবরণহীন হয়ে বের হয়ে গেল।

আমির হামজা রা.-এর ইসলামগ্রহণ

আমির হামজা রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাকে যদি স্বাভাবিকভাবেও দেখা হয়, তাহলেও তা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণ করে দেয় যে, কাফেরদের জুলুম-শোষণ ও কঠোরতা দিন দিন ইসলামের অগ্রগতিকেই বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কাফেরদের নির্যাতন-নিপীড়নকেই মজলুম

মুসলিমদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া এবং এ কথা বলা যে, রক্তপাত করেই ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে, এটা যে কতটা নিচু মানসিকতা ও বেইনসাফির প্রমাণ, তা ওই ওপরওয়ালাই ভালো জানেন। ইতিহাসের কুখ্যাত জালেমদের মজলুম বানিয়ে নতুন প্রজন্মের সামনে উপস্থাপন করা, দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট জুলুমের ইতিহাসকে নিজেদের অজ্ঞতা ও সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে লুকানোর অপচেষ্টা করা ইনসাফ ও সুস্থ বিবেক-বোধকে হত্যা করার নামান্তর।

আবু জাহলের প্রলাপ

আমির হামজা রা. ছিলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত চাচা। প্রায় তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে শহরের বাইরে যেতেন। একদিনের ঘটনা। শিকারের উদ্দেশ্যে তিনি শহরের বাইরে গেলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কুখ্যাত আবু জাহলের সঙ্গে তার দেখা। সে ছিল ইসলামের ঘোর দুশমন। তার পুরো জীবনটাই কেটেছে ইসলামের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিকে থামানোর অপচেষ্টা এবং ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেই সে মূর্খতাসুলভ বকাঝকা শুরু করে দিলো। কিন্তু আশ্চর্য! ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মূর্খের সবগুলো কটুবাক্যই নীরবে শুনে গেলেন। তাঁর প্রতি আবু জাহলের শত্রুতার জন্য নয়, বরং অজ্ঞতার জন্য মনে মনে আফসোস করতে লাগলেন। আবু জাহল তার বকাঝকা ও প্রলাপের মাধ্যমে নিজের মনের জ্বালা মিটিয়ে রাগে গজগজ করতে করতে দ্রুত একদিকে হেঁটে চলে গেল। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নীরবে নিচের দিকে তাকিয়ে আপন গন্তব্যের পথ ধরলেন।

ক্রোধে ফেটে পড়লেন আমির হামজা

আমির হামজা রা.-এর এক বাঁদি অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে আবু জাহলের এসব নিকৃষ্ট গালাগাল ও বকাঝকা শুনছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখেও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমির হামজা রা. যখন শিকার শেষে বাড়ি ফিরলেন, তখন তার বাঁদি আবু জাহলের এমন ঘৃণ্য আচরণের কথা মনিবকে শুনিয়ে দিলেন। তিনি তখনও মুসলিম হননি। কিন্তু তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা লালন করতেন। অত্যন্ত স্নেহ করতেন

এই ভাতিজাকে। তাই প্রিয় ভাতিজার সঙ্গে আবু জাহলের এমন বেয়াদবি তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। রাগে-ক্ষোভে দাঁত কটমট করতে করতে আবু জাহলকে খুঁজতে বেরোলেন। অবশেষে হারাম শরিফে গিয়ে মুশরিক নেতাদের মাঝখানে তাকে বসে থাকতে দেখলেন।

আমির হামজা রা. ওখানে গিয়েই আবু জাহলের চেহারায় কষে এক চড় মারলেন, ফলে তার গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল। এবার আমির হামজা রা. আবু জাহলের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বললেন, বেকুব! নিজের শক্তি আর ক্ষমতার ওপর তোর খুব আস্থা না? কী ভেবেছিস তুই? কেউ তোর মোকাবিলা করতে পারবে না? তুই তো জানিস, মুহাম্মাদের সঙ্গে আগে থেকেই আমার রক্তের সম্পর্ক। আজ থেকে আধ্যাত্মিক সম্পর্কও হয়ে গেল। একটা কথা খুব ভালোভাবে মনে রাখিস। আগামী দিনে আর কখনো যদি আমি তোর এমন ঘৃণ্য আচরণ সম্পর্কে জানতে পারি, তবে তোকে জীবন্ত পুঁতে ফেলব।

চড় খেয়েও কমবখত আবু জাহলের শিক্ষা হলো না। আবারও সে নিকৃষ্ট গালাগাল শুরু করল। এমন স্পর্ধায় আমির হামজার ক্রোধের আগুনে যেন তেল ঢেলে দিলো। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি নিজের ধনুক দিয়ে আবু জাহলের মাথায় আঘাত করলেন। তার মাথা ফেটে গেল। সে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

রাসুলের দরবারে আমির হামজা

আবু জাহলকে তার অপকর্মের শাস্তি দিয়ে অত্যন্ত খুশি মনে আমির হামজা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তার ভালোবাসা ও স্নেহের প্রমাণ দিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সীমাহীন মায়া ও স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, মুহাম্মাদ! এখন আমি এমন এক মহান কাজ করে এসেছি, যা শুনলে তুমি খুশিতে বাগবাগ হয়ে যাবে।

চাচার কথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, আচ্ছা, তা আমি কি শুনতে পারি আমার প্রিয় চাচা এমন কী মহান কাজ করেছেন?

আমির হামজা রা. অত্যন্ত আনন্দ ও প্রশান্তচিত্তে বললেন, আবু জাহল তোমার সঙ্গে যে বেয়াদবি করেছে, আমি তাকে তার যথাযথ শাস্তি দিয়ে এসেছি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে তো কোনো মানুষের জন্য ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না। কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতিশোধের কথা তিনি স্বপ্নেও কখনো ভাবতেন না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনন্দ-বেদনার কেন্দ্রবিন্দুই ছিল ইসলামের প্রচার-প্রসার। একজন আল্লাহভোলা মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারলেই তিনি আনন্দিত হতেন, পরিতৃপ্ত হতেন। তাই চাচাকে লক্ষ করে তিনি বললেন, চাচা, আমি জানি আপনি আমায় কতটা ভালোবাসেন। কিন্তু আমি তো প্রকৃত খুশি সেদিন হব যেদিন আপনি ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর এটাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

আমির হামজা রা. তো একটু আগেই হারাম শরিফে কাফেরদের ভরা মজলিশে নিজের মুসলিম হওয়ার ঘোষণা দিয়ে এসেছিলেন। এখন হৃদয় থেকেই আনন্দচিত্তে পড়তে শুরু করলেন, 'আশাহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।' কালিমা পাঠ করে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ওপর অটল অবিচল থাকার ওয়াদা করলেন। আমির হামজা রা. এমন মানমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন যে, তার মুসলিম হওয়ার সংবাদ শুনে কাফেরদের পিলে চমকে গেল।[৬০]

প্রিয় পাঠক! বলুন, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আবু জাহলের এমন বাড়াবাড়ি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণই কি আমির হামজাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেনি?

কঠোরতার কালো মেঘ থেকে রহমতের বারিবর্ষণ

নাজাশির দরবার থেকে কুরাইশ প্রতিনিধিদলের এভাবে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসায় মক্কার কাফেরদের ঘৃণা ও ক্রোধ বহুগুণে বেড়ে গেল। ইসলামের অগ্রযাত্রাকে চিরতরে থামিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তারা সারা মক্কায় ঘোষণা দিয়ে দিলো, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের মাথা কেটে এনে দিতে পারবে, তাকে ১০০ উট উপহার দেওয়া হবে। কাফেরদের এমন নিকৃষ্ট কাজের ভার উমর ইবনুল খাত্তাব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। উমরের বীরত্ব ও বিচক্ষণতার কথা তো আজও মানুষের মুখে মুখে। তিনি মক্কার ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। এই একজনের বিরোধিতাই ইসলামের অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে এক হাজার কাফেরের চেয়ে কম ছিল না। তার ইসলাম গ্রহণ করাটাও কাফেরদের জুলুম নিপীড়নের বড় প্রমাণ। কারণ, তাদের সেসব নিকৃষ্ট

---

৬০. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া লি ইবনি হিশাম*, ১/২০৫; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/৭৬

আচরণই মানুষের হৃদয়ের আবাদভূমিতে ইসলামের চারাগাছ রোপণের জন্য সব অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বদা রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করে উমর নিজের খোলা তরবারি বাতাসে ঘোরাতে ঘোরাতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় মক্কার অলিগলিতে মুহাম্মাদকে তালাশ করতে লাগলেন। এদিকে মহান আল্লাহও নিজের উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা দান শুরু করলেন। উমরের হৃদয় রক্তপিপাসু ছিল কিন্তু তার তরবারির ধারে মরিচা পড়তে শুরু করল। এই তো, সামান্য কিছুদূর যেতেই পথিমধ্যে নুআইম ইবনে আবদুল্লাহর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। এতদিনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালাতের প্রদীপের আলোয় যার হৃদয়রাজ্য আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। উমরকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উমর! কোথায় যাচ্ছ? উমর উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, মুহাম্মাদের দেহ থেকে মাথা আলাদা করতে যাচ্ছি। নুআইম বললেন, আগে নিজের ঘরের খবর নাও পরে অন্যকে হত্যা করতে যেয়ো। তোমার আপন বোন আর ভগ্নিপতি যে গোপনে মুসলিম হয়ে গেছে সে খবর রাখো?

এমন সংবাদ শুনেই উমরের চেহারা ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে গেল। বিষাক্ত সাপ যেমন পদদলিত হলে রাগে ফুঁসতে থাকে, উমরও তেমন ফুঁসতে ফুঁসতে নিজের বোনের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। এদিকে তার বোন ও ভগ্নিপতি নিজেদের ঘরে একান্তে খাব্বাব ইবনুল আরত রা.-এর মুখ থেকে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শুনছিলেন। উত্তেজিত উমর দরজায় সজোরে আঘাত করলেন। ঘরের লোকেরা বুঝতে পারল যে, পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। তাই তারা দ্রুত কুরআনের অংশগুলো লুকিয়ে ফেললেন। খাব্বাব ইবনুল আরত রা. ঘরের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। উমরের বোন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দরজা খুলে দিলেন। ঘরে ঢুকেই উত্তেজিত উমর গন্ডগোল বাধিয়ে দিলেন। ভগ্নিপতির জামার কলার ধরে জোরে টান দিলেন। বোন যখন স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো, তখন বোনের ওপরও চড়াও হলেন। নিজের আদরের বোনকে মেরে আহত করে দিলেন। বোনও দমে যাওয়ার পাত্রী নন। ভাইয়ের হাতে মার খেয়ে তিনিও নিজ আত্মমর্যাদায় উদ্‌বেলিত হয়ে উঠলেন।

সাহসীরা সাহস পছন্দ করে। উমর একজন সাহসী মানুষ ছিলেন। তাই আপন বোনের এমন নির্ভীক ও নির্দ্বিধ বক্তব্যে তিনি বেশ প্রভাবিত হলেন। উমরের মনে প্রশ্ন জাগল, এ কোন শিক্ষা যা আমার বোন-ভগ্নিপতিকে এতটা

সাহসী ও তেজোদীপ্ত করে তুলল? এ কোন আদর্শ, নাঙ্গা তরবারি মাথার ওপর দেখেও যে আদর্শ থেকে তারা বিচ্যুত হচ্ছে না? উমরের রাগ প্রশমিত হলো। তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে, তোমরা এতক্ষণ যা পড়ছিলে তা আমাকেও একটু শোনাও। তারা খাব্বাব ইবনুল আরত রা.-কে ঘরের গোপন কোণ থেকে বের করে আনলেন। রাসুলের এই প্রিয় সাহাবি উমরের সামনে তার হৃদয়নিংড়ানো সুরে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করলেন। তেলাওয়াতের শুরু থেকেই উমর চাইছিলেন এই তেলাওয়াত যেন তার মাঝে কোনো প্রভাব সৃষ্টি না করে। কিন্তু এটা তার ক্ষমতার বাইরে ছিল। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ তার হৃদয়ে তিরের ন্যায় বিদ্ধ হচ্ছিল। খাব্বাবের তেলাওয়াত শেষ হতেই মিথ্যার কালো আঁধার ভেদ করে সত্যের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল উমরের হৃদয়ে। মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের বিজয় হলো। উমরের মুখ থেকে অবচেতন মনেই বেরিয়ে এলো, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।'

উমর এখন রাসুলের দরবারে

যে উমর রাসুলকে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে নাঙ্গা তরবারি হাতে বেরিয়েছিলেন। যার হৃদয়ে ছিল রাসুলের প্রতি একরাশ ঘৃণা। সেই উমরের হৃদয় এখন ইসলামের আলোয় আলোকিত। রাসুলের ভালোবাসায় টইটম্বুর।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও অগাধ ভক্তি নিয়ে অবনত মস্তকে উমর হাজির হলেন রাসুলের দরবারে। এই দিনগুলোতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরকাম ইবনে মাখজুমি নামক এক সাহাবির বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। কারণ, তার বাড়িটি বেশ প্রশস্ত ছিল। সকল সাহাবি সেখানে একত্র হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেদায়েতের অবারিত বারিধারায় নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে পারতেন। আজও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে নিজ অনুসারীদের মাঝে হেদায়েতের পবিত্র দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় উমর এসে দরজায় করাঘাত করলেন। আগেই সবাই শুনেছিলেন যে, মক্কার কাফেরদের সামনে উমর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার শপথ করেছে। সেই শপথ পূর্ণ করতে নাঙ্গা তরবারি হাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজতে বেরিয়েছে। এখন দরজায় করাঘাত করার পরে যখন ভেতর থেকে জানতে চাওয়া হলো, 'কে?' বাইরে থেকে আওয়াজ এলো, 'উমর ইবনুল খাত্তাব।' তখন সবার চেহারা ফ্যাকাশে

হয়ে গেল। বুক ধুকপুক করতে শুরু করল। এই বুঝি উমর ঘরে ঢুকে সব লন্ডভন্ড করে দিলো। কিন্তু বীরবাহাদুর আমির হামজা সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, উমর যদি কোনো সদুদ্দেশ্যে আসে, তাহলে তো ভালো। অন্যথা তার তরবারি দিয়েই আমি তার দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলব।

উমর এসেছেন শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এগিয়ে এসে দরজা খুললেন! অত্যন্ত শান্ত ও স্নেহের স্বরে বললেন, কী ব্যাপার খাত্তাবের ছেলে! হঠাৎ কেন আমার কাছে এসেছ? উমরের তরবারি তখন কোষবদ্ধ। দৃষ্টি অবনত। রাসুলের সামনে এখন যে উমর দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত। রাসুলের ভালোবাসায় উদ্‌বেলিত। তিনি এখন আর সেই রক্তপিপাসু উমর নন। পবিত্র কুরআনের মধুর তেলাওয়াতে একটু আগেই তার হৃদয় বিগলিত হয়ে গিয়েছে। এখন তিনি ইসলাম ও ইসলামের নবীর একজন খাঁটি প্রেমিক। হৃদয়ের গভীর থেকে উদ্‌বেলিত ভালোবাসায় উমরের দুচোখ অশ্রুতে টলমল করতে লাগল। অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ করে বললেন, নবীজি, আপনার কাছে আসার দুঃসাহস তো এই কারণেই করেছি যে, ইসলামের সত্যতার শক্তিতে আজ আমার ভেতরের কুফরের সব গর্ব-অহংকার ধুলোয় মিশে গেছে। হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমায় কবুল করে নিন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে গিয়ে উমরকে আপন ভাইয়ের ন্যায় বুকে জড়িয়ে নিলেন।

নবীজির দোয়া কবুল হলো

ইসলামের প্রচার-প্রসারকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছিলেন, যেন ইসলামের কট্টর বিরোধী দুই উমরের (আবু জাহল ও উমর ইবনুল খাত্তাব) মধ্য থেকে যেকোনো একজনের হৃদয় ইসলামের নুরে উদ্ভাসিত হয়। মহান প্রভু তাঁর প্রিয় বন্ধুর এই দোয়া কবুল করলেন। যে আশায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতদিন বুক বেঁধে ছিলেন, দয়াময় প্রভুর কাছে মিনতি করেছিলেন, যেকোনো একজন উমরের ইসলাম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তার প্রভাব ও নেতৃত্বে তিনি যে ইচ্ছাগুলো বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ তা পূর্ণ হওয়ার সময় হলো। এমন আনন্দঘন মুহূর্তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশিতে সুউচ্চ কণ্ঠে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুললেন। সাহাবিরাও তাঁর সঙ্গে আনন্দের আতিশয্যে তাকবিরের ধ্বনি তুললেন, 'আল্লাহু আকবার'

তাকবিরের ধ্বনিতে মক্কার প্রতিটি পাহাড়-পর্বত ও গিরিপথে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। সেইসঙ্গে কেঁপে উঠল কাবাঘরের ৩৬০ মূর্তি ও তাদের পূজারিদের অন্ধকার হৃদয়।

ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকাঙ্ক্ষায় উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করায় ইসলামের প্রচার-প্রসারের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। ইতিপূর্বে কাফেরদের নির্যাতনের ভয়ে মুসলিমরা চুপিচুপি ইসলামের বিধানাবলি পালন করত।

কিন্তু উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেই প্রকাশ্যে কাবা প্রাঙ্গণে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। কাফের-মুশরিকরা অনেক চেষ্টা করল তাকে বাধা দিতে। বেশ হট্টগোলও বাধিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা নোয়ানোর এই আন্দোলন এক অপ্রতিরুদ্ধ প্লাবন হয়ে কাফেরদের সব অপচেষ্টাকে ভাসিয়ে নিলো। ব্যর্থতার গ্লানিতে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। ইসলামের অনুসারীরা প্রকাশ্যে কাবা প্রাঙ্গণে নামাজ পড়তে শুরু করলেন।

কাফেরদের বয়কটসভা

কাফেরদের প্রতিনিধিদল হাবাশা থেকে বিফল মনোরথে ফিরে এলে কুরাইশ কাফেররা রাগে-ক্রোধে ফুঁসতে লাগল। যখন তারা দেখল মক্কার বড় বড় নেতৃবৃন্দের চেষ্টা তদবিরের পরও বনু হাশেম মুহাম্মাদের সহযোগিতা থেকে এক চুলও পিছু হটছে না, তখন তাদের আশঙ্কা হলো, আমাদের প্রতিনিয়ত বিরোধিতার পরও ইসলাম যেভাবে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে, এভাবে চলতে থাকলে একসময় আমাদের এই মাতৃভূমিতেই আমাদের বাপদাদাদের ধর্ম ইসলামের উত্তাল তরঙ্গে হারিয়ে যাবে। এদিকে আমির হামজা ও উমরের ন্যায় প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও ইসলাম গ্রহণ করছে। নতুন এই ধর্ম যদি দিন দিন এভাবেই উন্নতি করতে থাকে তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে একদিন আমাদের ধর্ম যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এইসব কথা চিন্তা করে ইসলামের অগ্রযাত্রার এই বাঁধভাঙা স্রোতকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য নতুন কোনো পন্থা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাফেররা জরুরি সভার আয়োজন করল। অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেক-বোধহীন এই মানুষগুলো বুঝবে কীভাবে যে, সত্য কখনো মিথ্যার কাছে পরাজিত হয় না।

কাফেরদের বড় বড় নেতারা একে অন্যের চেয়ে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলো। অবশেষে সভায় বনু হাশেমকে সামাজিকভাবে বয়কট করার সিদ্ধান্ত হলো। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে একটি চুক্তিনামাও প্রস্তুত করা হলো। সেখানে এই কথার ওপর সবাই স্বাক্ষর করল যে, কেউ বনু হাশেমের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখবে না। তাদের সঙ্গে কেউ বেচাকেনাও করবে না। সব ধরনের খাবার-পানীয় থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে। এমনকি কথাবার্তাও বন্ধ থাকবে। যাতে করে তারা নিজেরাই মুহাম্মাদের মাথা কাটার জন্য তাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে। কাফেরদের সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করল। সভা শেষে তা কাবাঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

বয়কটের কষ্টকর দিনগুলো

এই সামাজিক বয়কটের কারণে বনু হাশেম ব্যাপক সংকটে পড়ে গেল। কিন্তু তারা তাদের কলিজাকে লোহার ন্যায় শক্ত এবং হৃদয়কে পাথরের ন্যায় মজবুত করে সব দুঃখকষ্ট হাসিমুখে মেনে নিলো।

ঘটনার শুরু এভাবে। একদিন কাফেররা আবু তালেবকে ডেকে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলো যে, হয়তো তোমরা মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে তুলে দেবে, অন্যথা তির-বর্শার মাধ্যমেই তোমাদের সঙ্গে আমাদের এই সমস্যার সমাধান হবে। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল তো বাঁকা করতেই হবে। বোঝানোর দিন শেষ। তোমরা যদি জেদ ধরে বসে থাকো। কোনোভাবেই আমাদের কথা মানতে প্রস্তুত না হও। তাহলে তোমাদের সঙ্গে আমাদের তরবারির ভাষাতেই কথা বলতে হবে।

আবু তালেব কোনোভাবেই এটা মেনে নিতে পারছিলেন না যে, সবকিছু শুনেও তিনি নিজের আদরের ভাতিজাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন। তা ছাড়া তিনি তো শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগ পর্যন্ত ভাতিজাকে সঙ্গ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার পক্ষে এখন কী করে ওয়াদা ভঙ্গ করা সম্ভব? তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কাফেরদের জবাব দিলেন, 'যতদিন আমরা জীবিত আছি, মুহাম্মাদকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো না।' এমন কথা শুনে কাফেররা তাদের সিদ্ধান্তমতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর গোত্র বনু হাশেমকে শিআবে আবু তালেবে অবরুদ্ধ করে ফেলল।

'শিআবে আবু তালেব' মক্কার অদূরের একটি এলাকা। বনু হাশেম উত্তরাধিকারসূত্রে যার মালিকানা লাভ করেছিল। এই জনমানবহীন

উপত্যকায় নিপীড়িত জনগোষ্ঠীটি দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ যে দুঃখ-দুর্দশায় দিনাতিপাত করেছে, তার রয়েছে এক হৃদয় বিদারক উপাখ্যান। অভাব-অনটনের কারণে তারা ভিক্ষাবৃত্তি করার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। নিষ্পাপ শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করত। বনজঙ্গলের গাছগাছালির লতাপাতা খেয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে ঘুমিয়ে থাকত। মুমূর্ষু সন্তানের চেহারার দিকে তাকিয়ে মায়ের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠত।

আহ মিথ্যার পূজারি পৃথিবী! আহ শয়তানের অনুগামী পৃথিবী। তুমি তোমার এই বুকে সততা-আদর্শে উজ্জীবিত ন্যায়পরায়ণ মানুষদের সঙ্গে কত-না নিষ্ঠুর আচরণ করেছ।

এই পৃথিবীতে যোগ্য ব্যক্তির মূল্য নেই

এই অবিবেচক পৃথিবীতে মানুষের যোগ্যতাই মাঝে মাঝে তার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে যায়। ফুলের সৌন্দর্য-সুঘ্রাণই তাকে মালির হাতে তুলে দেয়। বুলবুলি পাখির মিষ্টি আওয়াজই তাকে শিকারির জালে আবদ্ধ করে।

পুষ্প আর পুষ্পকাননরা ডেকে বলে,

ওহে বুলবুলি,

এমন মধুমাখা কণ্ঠে তুমি গেয়ো না আর গান।

না হয় এই সুরেই চলে যাবে শিকারির হাতে তোমার প্রাণ।

এমন বন্দিত্ব কজনের ভাগ্যে জোটে?

পৃথিবীর বড় বড় মর্যাদাবান নবী-রাসুল ও মহামনীষীদের এভাবেই বন্দিশালায় আবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু কতই-না পবিত্র ও সৌভাগ্যবান সেই কারাগার, মানবসেবার অপরাধে যেখানে কোনো মহান ব্যক্তিকে বন্দি করা হয়েছে! বন্দিজীবনের সেইসব দুঃখ-যাতনা ও বিপদাপদ কতই-না ঈর্ষণীয়, সমাজ সংস্কারের অপরাধে কোনো ভালো মানুষকে যা ভোগ করতে হয়। শিকারির সোনার খাঁচায় তো গাধা আর কাককে বন্দি করা হয় না। হরিণ, বুলবুলি আর তোতা-ময়নাদের জন্যই তা নির্দিষ্ট থাকে।

হজের মৌসুমে ইসলামের দাওয়াত

নিকটবর্তী অঞ্চল ও দূরদূরান্ত থেকে প্রতি বছরই মানুষ বাইতুল্লাহ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করত। এই দিনগুলোতে সব ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ ও

দাঙ্গাহাঙ্গামাকে নিষিদ্ধ মনে করা হতো। সত্যের পথে আহ্বানকারী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দিনগুলোতে 'শিআবে আবু তালেব'-এর বাইরে এসে বাইতুল্লাহর জিয়ারতকারীদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু চরম হতভাগা আবু লাহাব নবীজির পেছনে ঘুর ঘুর করত আর মানুষকে লক্ষ করে বলত, ভাইয়েরা! এই লোক পাগল। তোমরা তাঁর কথায় কান দিয়ো না। তার কথা শুনে লোকেরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত, ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেত।

মুক্তির ব্যবস্থা

'শিআবে আবু তালেবে' বন্দি অবস্থায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর গোত্র বনু হাশিম তিন বছর অতিবাহিত করলেন। হজের মৌসুমে একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন কাবার দেয়ালে টাঙানো কাফেরদের চুক্তিনামাটি উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। পুরো চুক্তিনামাটির যেখানে শুধু আল্লাহর নাম লেখা ছিল সেই জায়গাটুকুই অবশিষ্ট ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালেবকে এই সংবাদ দিলেন। আবু তালেব কাফেরদের বোঝালেন, দেখো, এই সত্যতা তোমরা নিজ চোখে দেখো। আল্লাহর নামের কত শক্তি, তোমাদের চুক্তিনামার যেখানে তা লিপিবদ্ধ ছিল, উইপোকার আক্রমণ থেকে তা সুরক্ষিত থাকল। তাহলে সেই আল্লাহর ইবাদত করার কারণে কেন তোমরা মুহাম্মাদকে বন্দি করে রেখেছ? কাফেররা নিজ চোখে এই দৃশ্য দেখে ভীষণ ভড়কে গেল এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর গোত্রসহ শহরে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দিলো।

অপর এক বর্ণনায় জানা যায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর গোত্রকে নিয়ে 'শিআবে আবু তালেবে' বন্দি অবস্থায় তিন বছর অতিবাহিত করলেন, তখন মক্কার কিছু লোকের মনে এই অনুশোচনা জাগতে শুরু করল যে, আমরা এখানে কত আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছি অথচ আমাদের বনু হাশেমের ভাইয়েরা চরম দুঃখকষ্টে দিনাতিপাত করছে। মাত্র এক ফোঁটা পানির জন্য তারা হাহাকার করছে। নিষ্পাপ শিশুরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। অনুশোচনার অনলে দগ্ধ এমন কিছু লোক গোপন বৈঠকে মিলিত হলো। বিষয়টি নিয়ে তারা কিছুক্ষণ আলোচনা করল। অবশেষে তারা সবাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, এই

জুলুম-নিপীড়ন আর চলতে দেওয়া যায় না। যথেষ্ট হয়েছে। এবার চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলার সময় হয়েছে। আমাদের ভাইদের আমরা আবার শহরে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

কিন্তু ইসলামের চরম দুশমন আবু জাহল এমন সিদ্ধান্ত মানতে প্রস্তুত ছিল না। সে লাফ দিয়ে উঠে বলল, কখনোই না। আমি এই চুক্তিনামা কাউকে ছিঁড়তে দেবো না। তার কথা শুনে জামআ ইবনে আসওয়াদ বললেন, তোমার ওসব নির্দয় বক্তব্য আমরা পছন্দ করি না। অনেক জুলুম করেছ। এবার বন্ধ করো। আমরা এই অন্যায় চুক্তিনামা অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলব। তিন বছর আগে যখন এই চুক্তিনামা প্রস্তুত করা হয়, তখনও আমরা মনে মনে এর পক্ষে ছিলাম না। তার কথা শুনে আবু জাহল অনেক চিৎকার-চ্যাচামেচি করল, কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করল না। মুতয়িম ইবনে আদি কাবাঘরের দরজা থেকে সেই চুক্তিনামা নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

অবশেষে বয়কটের চরম দুঃসময়গুলো কেটে গেল। বনু হাশিম 'শিআবে আবু তালেবে' দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত দুঃখ-দুর্দশায় দিন কাটানোর পর আবার স্বাভাবিক ছন্দময় জীবনের দেখা পেল। এমন দুঃখকষ্টের পরও সত্যের পথে আহ্বানকারী প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প থেকে একটুও পিছু হটেননি, বরং শহরে এসেই তিনি পুনরায় নবোদ্যমে হকের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। কাফেররাও তাদের অভ্যাসমতো তাঁর বিরোধিতার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করল না।

দুটি হৃদয়বিদারক মৃত্যুর ঘটনা

নবুয়তের সূর্যোদয়ের ১০ বছর অতিবাহিত হতে চলল। এক মাসে দুটি হৃদয়বিদারক মৃত্যুর ঘটনা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখ ও যাতনার এক উত্তাল সাগরে নিয়ে ফেলল। তার সবচেয়ে কাছের দুজন মানুষ, যারা নবীজির ঘামের বিনিময়ে নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেও সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন, তারা তাকে ছেড়ে ওপারের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। প্রিয়জনদের চিরবিদায়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন মুষড়ে পড়লেন। প্রিয় চাচা আবু তালেব যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি তার পাশে ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় চাচাকে লক্ষ করে বলেন, হে আমার প্রিয় চাচা, আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি যেভাবে সীমাহীন স্নেহ, ভালোবাসা ও নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন, তার বিনিময়ে আপনাকে দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই।

আজকের এই মুহূর্তে আপনার কাছে আমার শুধু এই মিনতি, আপনি 'কালিমা তাইয়েবা' পাঠ করুন। যাতে করে আমি মহান আল্লাহর সামনে আপনার ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারি। আবু তালেব বললেন, কালিমা পড়তে তো আমার আপত্তি নেই, বরং তা আমার জন্য অত্যন্ত খুশির বিষয় ছিল। কিন্তু আমি কুরাইশের লোকদের সমালোচনার ভয় করি। তারা বলবে, আবু তালেব মৃত্যুর ভয়ে কালিমা পড়ে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর আব্বাস রা. আবু তালেবের ঠোঁট নড়তে দেখে মুখের কাছে কান নিয়ে শুনলেন তিনি কী বলছেন। এরপর মাথা উঠিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আপনি যা বলেছেন, আবু তালেব তা-ই বলছে।[৬১]

প্রিয় চাচার মৃত্যুশোক কাটিয়ে না-উঠতেই তিনদিন পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা রা.-ও তাকে ছেড়ে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। নিজের সবচেয়ে কাছের দুজন মানুষের এভাবে বিদায় নেওয়াতে তিনি যে কতটা হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর বুকের ভেতরটা যে ধু-ধু মরুভূমির ন্যায় কতটা খাঁ খাঁ করেছিল, তা বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু এত পেরেশানি ও দুশ্চিন্তার মাঝেও তিনি ভেঙে পড়েননি। মনোবল হারাননি। কিছুদিন পর আবার তিনি নবোদ্যমে দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন।

বিপদাপদের নতুন যুগ

আবু তালেবের ইন্তেকালে কাফেররা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর তাদের জুলুম-নির্যাতন এখন আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। চতুর্দিক থেকেই তারা তাকে অপমানিত, অপদস্থ করতে শুরু করল।

একদিনের ঘটনা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারের পথ ধরে হাঁটছিলেন, কোনো এক বদমাশ তাঁর মাথার ওপর ময়লা-আবর্জনা ঢেলে দিলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থাতেই ঘরে ফিরে এলেন। ফাতেমা রা. (যিনি আম্মাজান খাদিজা রা.-এর চলাফেরা, কথাবার্তা এবং রংঢং সবকিছুই পেয়েছিলেন। যাকে দেখলেই আম্মাজান খাদিজার কথা মনে হতো।) বাবার এমন দুরবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। তিনি কাঁদতে

---

৬১. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/১৫৮; তবে এই বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয়।

কাঁদতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা মুবারক পরিষ্কার করে দিচ্ছিলেন।

নিরীহ মুসলিমদের ওপর বজ্রাঘাত

যখন কাফেরদের তূণীরের শেষ তিরটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, তখন তারা রাগে-ক্ষোভে নিরীহ মুসলিমদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টিমরোলার চালাতে লাগল।

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বতোভাবে অপমান-অপদস্থ করা যেন তাদের একমাত্র আনন্দ-বিনোদন ও আলোচনা-পর্যালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এর মাধ্যমেই তারা নিজেদের কর্মোদ্দীপনা খুঁজে পেতে লাগল।

ইসলামের জন্য নিবেদিত এই দলটির ওপর তারা এমন মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল, অত্যাচারের ইতিহাসে যার কোনো নজির নেই। এতকিছুর পরও মিথ্যা ও ভ্রান্তপূজারিদের বড়াই সত্য ও ন্যায়ের সুউচ্চ আওয়াজের কাছে পরাস্ত হয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের আত্মিক শক্তির সামনে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো।

বেলাল রা.-এর ওপর কাফেরদের জুলুম-নিপীড়ন

বেলাল রা. তাওহিদের এক নির্ভীক সৈনিক। তিনি রাসুলকে ভালোবাসতেন, রাসুলও তাকে ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন মক্কার প্রসিদ্ধ কাফের উমাইয়া ইবনে খালফের কৃতদাস। উমাইয়া যখন জানতে পারল যে, বেলাল মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্ম গ্রহণ করেছে, তখন সে তার ওপর পাশবিক নির্যাতন শুরু করল। দুপুরে মরুভূমির উত্তপ্ত বালির ওপর তাকে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপর পাথর রেখে উমাইয়া তাকে ইসলাম ত্যাগ করতে বলত। কিন্তু মনিবের সর্বপ্রকারের জুলুমের জবাবেই তিনি শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' (আল্লাহ এক আল্লাহ এক)-এর স্লোগান দিতেন। 'আহাদ' 'আহাদ' স্লোগানে পাষণ্ড উমাইয়ার ভেতরে যেন ক্রোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠত। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে সে বেলালের বুকের ওপরে রাখা পাথরে চাপ দিতে থাকত। কিন্তু ইসলামের ভালোবাসার সামনে বেলাল রা.-এর কাছে এসব বিপদ ছিল খুবই নগণ্য।

সব কষ্টই বেলাল রা. সয়েছেন। সব যাতনাই তিনি বয়েছেন। কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য নিজের আকিদা-বিশ্বাস থেকে এক চুলও নড়েননি। কাফেরদের সীমাহীন অত্যাচারের বিপরীতে তিনি সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

কুখ্যাত উমাইয়া বেলাল রা.-এর গলায় রশি লাগিয়ে এলাকার বখাটে ছেলেদের হাতে তাকে তুলে দিত। তারা নির্মমভাবে টেনে টেনে তাকে শহরের অলিগলিতে ঘোরাত। তবুও তিনি নিজের আদর্শে অটল-অবিচল ছিলেন।

জ্বলন্ত কয়লার ওপর খাব্বাব রা.

খাব্বাব ইবনুল আরত রা. তামিম গোত্রের লোক ছিলেন। উম্মে তারার নামক এক মহিলার চাকর ছিলেন। তার হৃদয় যখন ইসলামের চিরন্তন আলোয় উদ্ভাসিত হলো তখন তিনিও কুরাইশ কাফেরদের জুলুম-নিপীড়নের শিকার হলেন। তারা তার হাত-পা বেঁধে উত্তপ্ত বালুর ওপর তাকে শুইয়ে দিত। যে বুকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা বসত করত, পাষণ্ডরা তার ওপর গরম পাথরের শিল রেখে দিত। কিন্তু তাতে কী? ইসলামের ভালোবাসার উষ্ণতা যে তার চেয়েও বেশি। পাথর যত গরম হতো, ভালোবাসার উষ্ণতাও তত বেড়ে যেত। অত্যাচার যত বাড়ত, হৃদয় পিঞ্জিরায় ভালোবাসার পোষা পাখিটাও যেন আরও সরব হয়ে উঠত।

আহা! একদিন তো তাকে জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে দেওয়া হলো। পাষণ্ডরা এতেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এক ব্যক্তিকে তার বুকের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলো চাপ দেওয়ার জন্য। যেন তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। সেদিন খাব্বাবের পিঠের যে করুণ অবস্থা হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জ্বলন্ত সেই কয়লাগুলো তার পিঠের নিচেই ঠান্ডা হয়ে গেল। তবুও তার হৃদয়ে ইসলামের ভালোবাসার উষ্ণতা ঠান্ডা হয়নি।

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর ওপর নির্মম নির্যাতন

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ছিলেন ইয়ামেনের অধিবাসী। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তিনিও কাফেরদের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হন। এক আল্লাহকে বিশ্বাস করার অপরাধে উত্তপ্ত বালুর ওপর তাকে শুইয়ে দিয়ে এত জোরে চাপ দেওয়া হতো যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। আঘাতের তীব্রতায় তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকত। এত কষ্ট পাওয়ার পরও যখন তার জ্ঞান ফিরত, তখনও তিনি ইসলামের সত্যতার স্লোগান দিতে থাকতেন, কুরাইশদের শত অন্যায়-অত্যাচারের পরও তার আকিদা-বিশ্বাসে এতটুকু ফাটল সৃষ্টি হয়নি।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা

আম্মারের এই ভালোবাসার অপরাধে ইসলামের চিরন্তন দুশমন আবু জাহল তাকে নির্দয়ভাবে কুড়াল দিয়ে আঘাত করে। জালেম এতেই ক্ষান্ত না হয়ে তার কাটা ঘায়ে লবণ ছিটিয়ে দিয়ে বলল, এখনো সময় আছে। ইসলাম ত্যাগ করে বাপদাদার ধর্মে ফিরে আয়। আম্মার রা. জবাইকৃত মুরগির ন্যায় ছটফট করতে করতে আবু জাহলকে লক্ষ করে বললেন, ইসলামের যে ভালোবাসা আমার এই অন্তরে স্থায়ী বসত গড়ে নিয়েছে। তোমার কুড়ালের আঘাত আর নুনের ছিটা কখনো তাকে এ বুক থেকে বের করতে পারবে না।

নির্যাতনের কসাইখানায় সুহাইব রা.

সুহাইব রা. নবুয়তের প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আম্মারের সঙ্গেই তিনি মুসলিম হন। রাসুলকে ভালোবাসার অপরাধে কাফেররা তাকে এমন অবর্ণনীয় নির্যাতন করেছিল যে কারও পক্ষে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখাও সম্ভব ছিল না। নিকৃষ্ট কাফেররা প্রায়ই তার দু-পা রশি দিয়ে বেঁধে মরুভূমির অগ্নিদীপক বালুর ওপর দিয়ে তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেত। আঘাতে আঘাতে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলত। একপর্যায়ে তার ডান বাহু ভেঙে যায়। এমন প্রাণবিনাশী কষ্টে তিনি অচেতন হয়ে পড়তেন। তবুও তিনি নিজের হৃদয়ের খাঁচায় ইসলামের ভালোবাসার যে পাখিটি সযত্নে পুষে রেখেছিলেন, কাফেররা তাকে হত্যা করতে পারেনি। তাদের দেওয়া সব কষ্টের জবাবে তিনি শুধু বলতেন, ইসলাম একটি সত্য ধর্ম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সত্য নবী।

আফলাহের ওপর এ কোন আপদ!

আবু ফুকাইহা রা.। যার উপাধি ছিল আফলাহ। তিনি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কৃতদাস ছিলেন। বেলাল হাবশি রা. এবং তিনি একসঙ্গে রাসুলের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সফওয়ান যখন আফলাহের ইসলাম গ্রহণের খবর জানতে পারল রাগে-ক্ষোভে তার সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল। আফলাহের দুহাত শক্ত করে বেঁধে পাথুরে ভূমির ওপর দিয়ে তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেল এই জালেম। যে কারণে তার পুরো শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল। এমন কঠিন নির্যাতনের পর সফওয়ান তাকে লক্ষ করে বলল, মুসলিম হওয়ার স্বাদ মিটেছে? আর নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিবি?

এমন শোচনীয় অবস্থাতেই তিনি জবাব দিলেন, ইসলাম আল্লাহর ধর্ম, তার শিক্ষাই সত্য এবং যথার্থ। এমন দ্ব্যর্থহীন জবাবে সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার রাগ ও ক্রোধের আগুন যেন লেলিহান অগ্নিশিখায় রূপ নিলো। সে এমনভাবে আফলাহের গলা টিপে ধরল যে, তার মৃত্যুর ব্যাপারে উপস্থিত লোকেরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল। অন্যান্য বন্ধুদের ন্যায় আফলাহও সব কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিলেন। কিন্তু আপন আদর্শে অবিচল পায়ে সামান্য কাঁপনও আসতে দেননি।

তার নাম আবু জর রা.

পতঙ্গ যেমন প্রদীপের ভালোবাসায় নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। আবু জর রা.-ও তেমন রাসুলের ভালোবাসায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসায় মজে ছিলেন। তার এই ভালোবাসা একসময় পাগলামির পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল।

শুরুরদিকে তার হৃদয়ও যখন ইসলামের নুরে আলোকিত হয়, তখন তিনিও কাফেরদের জুলুম-নিপীড়নের কালো আঁধারের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কঠোরতাই তাকে হেদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি বনু গিফার গোত্রের লোক ছিলেন। মদিনার উপকণ্ঠে একটি এলাকায় বসবাস করতেন। সেখানে থেকেই তিনি ইসলামের নবী এবং তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে জানতে পারলেন। পূর্ণ তদন্তের জন্য তিনি নিজের আপন ভাই উনাইস রা.-কে মক্কায় পাঠালেন। উনাইস রা. কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি মক্কায় এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখের পবিত্র বাণী শুনে মদিনায় ফিরে গেলেন। আবু জর গিফারি রা. তার কাছ থেকে পুরো বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। কিন্তু সত্যান্বেষী এই মানুষটি তার কবি ভাইয়ের সংক্ষিপ্ত জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাই তিনি মদিনা থেকে মক্কা পর্যন্ত সুদীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে মক্কায় এসে পৌছলেন এবং রাসুলের হাতে হাত রেখে মুসলিম হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন।

ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি মসজিদুল হারামে এসে উঁচু আওয়াজে কালিমা তাইয়িবা পাঠ করতে লাগলেন। এই অল্প সময়ে পবিত্র কুরআনের যে আয়াতগুলো তিনি মুখস্থ করতে পেরেছেন, সেগুলোও কাফেরদের সামনে অত্যন্ত আগ্রহসহকারে তেলাওয়াত করতে লাগলেন। যা তাদের জন্য চরম অস্বস্তিকর ছিল। তাই তারা তাদের চিরায়ত রূপে আবু জর রা.-এর সামনে হাজির হয়ে, তাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে লাগল। তাদের আঘাতে আবু

জর গিফারি রা.-এর চেহারা জখম হয়ে গেল। মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। সর্বশেষ তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। কাফেররা তো তাকে মেরেই ফেলত, তার তাওহিদি কণ্ঠকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিত, কিন্তু হঠাৎ আব্বাস রা. সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তখনও মুসলিম হননি। আবু জরকে দেখেই তিনি আঁতকে উঠলেন। কাফেরদের সাবধান করে দিয়ে বললেন, হায়! তোমরা এ কী করলে? ও তো বনু গিফার গোত্রের লোক। যাদের কাছ থেকে তোমরা ব্যবসার জন্য খেজুর আমদানি করো। একবার ভেবে দেখো তোমাদের এমন অবিবেচক আচরণের ফলাফল কতটা ভয়াবহ হতে পারে?

আব্বাসের কথায় কাফেরদের টনক নড়ল। এবার তাদের স্বার্থটা বড় হয়ে দেখা দিলো। আবু জর গিফারিকে ছেড়ে দিয়ে তারা যার যার কাজে ফিরে গেল। জ্ঞান ফিরলে তিনি সেখান থেকে উঠে রাসুলের দরবারে ফিরে এলেন। কিন্তু পরের দিন আবারও তিনি একত্ববাদের সুধায় তৃপ্ত হয়ে মসজিদুল হারামে গিয়ে একত্ববাদের স্লোগান দিতে লাগলেন। আজও কাফেররা সহ্য করতে না পেরে তার ওপর হামলে পড়ল। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাকে আঘাত করতে লাগল। একপর্যায়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরলে এই বীরবাহাদুর কাফেরদের লক্ষ করে বললেন, আমি মুসলিম হওয়ার কারণেই যদি তোমরা আমাকে এভাবে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে থাকো, তবে তোমাদের জানা উচিত যে, আমি এখনো মুসলিমই রয়েছি এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগ পর্যন্ত মুসলিমই থাকব। তোমাদের জুলুম-নিপীড়ন আমাকে সেই পবিত্র ও আলোকিত ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না, যা নির্জীব পাথরের মূর্তির পূজা এবং লজ্জাজনক কুসংস্কারের অপবিত্রতা দূর করে এক পরাক্রমশালী প্রভুর ইবাদত ও তাঁর রাসুলের উত্তম আদর্শ অনুকরণের প্রতি আহ্বান করে।

মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, ইসলামের এই একনিষ্ঠ প্রেমিকের এমন হৃদয় নিংড়ানো কথাগুলো উপস্থিত লোকদের মাঝে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করল এবং কয়েকজন কাফের মুসলিম হয়ে গেলেন।

বয়োবৃদ্ধ লোকটিও রেহাই পেল না

আমের ইবনে ফুহাইরা রা. অত্যন্ত দুর্বল বয়োবৃদ্ধ একজন মানুষ ছিলেন। শেষ বয়সে এসে মূর্তিপূজা থেকে তওবা করে ইসলামের সুরমা চোখে লাগালেন। মুসলিম হওয়ার অপরাধে কুরাইশরা এই বয়োবৃদ্ধ মানুষটিকে

বেদম প্রহার করল। কাঁটার বিছানার ওপর তাকে শুইয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি কাফেরদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শরীরে রক্তের শেষ বিন্দু বাকি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই পবিত্র ধর্ম ত্যাগ করব না। চাই তোমরা আমার ওপর যত নির্যাতনই করো না কেন।

কাফেরদের এই জুলুম-নিপীড়ন ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে। ধনী-গরিব, ছেলে, বুড়ো, কারও পরোয়া তারা করত না। যে ব্যক্তিই নিজ পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করবে, সেই হত্যার উপযুক্ত, চাই সে আপন বা পর, ধনী কিংবা গরিব।

ঈমানি পরীক্ষায় মুসআব রা.

মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-কে আল্লাহ প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক বানিয়েছিলেন। মুসলিম হওয়ার অপরাধে তার মমতাময়ী মা তাকে বন্দি করে ফেললেন। কয়েকজন নির্দয় আত্মীয় তাকে এই পরিমাণ প্রহার করল যে, একপর্যায়ে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি তাদেরকে লক্ষ করে বললেন, তোমাদের এসব মারপিট আমার আকিদা-বিশ্বাসে কাঁপন ধরাতে পারবে না। আগে আমার ঈমান যতটুকু ছিল। এখনো ততটুকুই রয়েছে। মূর্তিপূজার ন্যায় এ রকম চরম মূর্খতা আমার দৃষ্টিতে আর দ্বিতীয়টি নেই। আমি শুধু এবং শুধুই এক আল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাসী। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত আমাদের নবী।

জুলুমের শিকার উসমান রা.

উসমান ইবনে আফফান রা. মক্কার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণে পুরো গোষ্ঠীর মধ্যে যেন ভূমিকম্প শুরু হলো। সবাই একজোট হয়ে তার ওপর হামলে পড়ল। তার হৃদয়টা কেন আল্লাহর ভালোবাসার আলোকে আলোকিত হলো, এই অপরাধে আঘাতে আঘাতে তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। এই জালেমের দল তাকে এমন নির্মমভাবে মারপিট করল যে, তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। তবুও তিনি আদর্শে অনড় ছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন ইসলামের হেফাজতে।

জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.-কে প্রাণনাশের হুমকি

জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. আরবের প্রসিদ্ধ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। মানুষ তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। সম্মান করত। ইসলামের সত্যতাকে

উপলব্ধি করে তিনি যখন মুসলিম হলেন তখন তার চাচা আকিফ অগ্নিমূর্তি ধারণ করল। রশি দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে বেদম প্রহার করতে লাগল। তাকে একটি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, এখনই ইসলাম ত্যাগ করো, নয়তো তোমাকে আগুনের ভেতরে ফেলে দেবো। কিন্তু যে হৃদয়ে ইসলামের ভালোবাসার আগুন জ্বলে, জুলুমের আগুনে কি সে কখনো ভীত হয়? জ্বলন্ত আগুনকে সামনে দেখেও তিনি নির্দ্বিধকণ্ঠে চাচাকে বললেন, চাচা, তুমি যাচ্ছেতাই করতে পারো। চাইলে আমায় আগুনে জ্বালাও, অথবা সাগরে ডুবাও। কিন্তু আমার প্রাণ গেলেও আমি ইসলাম ত্যাগ করব না।

স্পর্শকাতর নারীদেহে জুলুমের কশাঘাত

কাফেররা তো পুরুষদের ওপর জুলুমের কোনো দিকই বাকি রাখেনি। কিন্তু আফসোস হলো, এই জালেমদের নাপাক হাত থেকে স্পর্শকাতর নারীদেহও মুক্তি পায়নি। দুপুরের প্রচণ্ড রোদে, তীব্র গরমে আরবের যে মরুভূমি ইরানের অগ্নিশিখার তপ্ততায় রূপ নেয়, জালেম কাফেররা সেই উত্তপ্ত মরুভূমির বালুর ওপর দিয়েই অসংখ্য মুসলিম মহিলাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেত। তাদের একটিই অপরাধ, এক আল্লাহ ছাড়া তারা আর কারও ইবাদত করে না। ইসলামের মোকাবিলায় সবরকমের জুলুম তারা নীরবে সয়ে গেছেন। তবুও ইসলামের আঁচল থেকে নিজেদেরকে বের করেননি। ভালোবাসা ও আনুগত্যের এই পরীক্ষায় মুসলিম মহিলাদের কৃতিত্ব পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

জালিমের কসাইখানায় প্রথম মুসলিম মহিলা

যে ভাগ্যবতী নারীরা মুসলিম হওয়ার অপরাধে জালিমের কসাইখানায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সালমা রা. ছিলেন অন্যতম। তিনি অত্যন্ত সাহসী মহিলা ছিলেন। ইসলামের নুরে তার কোমল হৃদয় যখন আলোকিত হলো, তখন তার স্বামী আসেম ইবনে আফওয়ান ও ভাই আস ইবনে রাফে ক্রোধে ফেটে পড়ল। এই দুই জালেম তাকে এত প্রহার করল যে, চেহারায় আঘাতের চিহ্ন বসে গেল। কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। তবুও তাদের ক্রোধ এতটুকু কমেনি, রক্তাক্ত অবস্থায় তার হাত-পা বেঁধে তাকে উত্তপ্ত বালুর ওপর ফেলে রাখল। এরপরও তারা যখন দেখল ইসলামের প্রতি তার ভালোবাসা একটুও কমেনি, তখন আসেম ইবনে আফওয়ান নিজের তরবারি বের করে তার বুকের ওপর বসে বলল, বল, এখন মুহাম্মাদের ব্যাপারে তোর কী ধারণা? ইসলাম ছাড়বি নাকি ছাড়বি না?

মৃত্যুকে সামনে দেখেও এই মহিলা সাহাবির ঈমানি চেতনায় কাঁপন ধরেনি। নির্ভীকচিত্তে তিনি স্বামীকে জবাব দিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর একজন সত্য নবী। ইসলাম একটি সত্য ধর্ম। দ্বীন-দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণ ও সফলতা তার মধ্যেই নিহিত। এটাই আমার ঈমান। আর এই কারণে যদি আমার মৃত্যুও এসে যায়, তাহলে তা আমার জন্য সৌভাগ্যের হবে।

ইসলামে এই বীরাঙ্গনা নারী সালমার কথা শুনে আসেম ইবনে আফওয়ান প্রচণ্ড ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলল। নিকৃষ্ট এই জালেম তার ধারালো তরবারি সালমার বুকের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। তরবারির আঘাতে আঘাতে তার বুকটা ক্ষতবিক্ষত করে দিলো। মহীয়সী সালমার মুখ থেকে শুধু আল্লাহু আকবার-এর একটি ক্ষীণ আওয়াজ বের হলো। মিথ্যাপূজারি এক জালিমের রক্তক্ষুধা মিটিয়ে সত্যপথের পথিক এক বীরাঙ্গনা নারী চিরতরে ঘুমিয়ে পড়লেন। আহা! এমন শান্তির ঘুম তো সৌভাগ্যবানদের কপালেই জোটে।

তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম মহিলা। যার পবিত্র রক্তের ফোঁটায় প্রথম আরবের মরুভূমি সিক্ত হয়েছিল।[৬২] এখানে আমি শুধু একজন মহিলার কথা উল্লেখ করেছি। তার ন্যায় আরও অনেক মুসলিম মহিলা ইসলামকে ভালোবাসার অপরাধে কাফেরদের জুলুমের শিকার হয়েছিলেন। কয়েকজনের নাম নিচে উল্লেখ করছি। কাফেরদের কোনো কঠোরতাই যাদেরকে আপন আদর্শ হতে বিচ্যুত করতে পারেনি। তারা হলেন সুমাইয়া রা., লুবাইনাহ রা., নাহদিয়া রা., উম্মে উবাইস রা., যুনাইরাহ রা.।

ইসলামের অনুসারী ও কঠোরতা

আমার হৃদয়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ইচ্ছা করছে, এই আগুনে সেসব একচোখা সাম্প্রদায়িক লেখকদের দৃষ্টি ও সাম্প্রদায়িকতাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে, যারা কাফেরদের এমন নিকৃষ্ট আচরণ, জুলুম-নিপীড়ন ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের হৃদয়বিদারক ঘটনাবলি জেনেও এই কথা বলে যে, তরবারির জোরেই ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে। তবে হ্যাঁ, তাদের এই ভুল কথাটিকে পরিবর্তন করে এভাবে বলা যায় যে, হ্যাঁ, সত্যিই কঠোরতার কারণেই ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে। তবে সেই কঠোরতা মুসলিমরা করেনি, বরং কাফেররাই তাদেরকে চরম নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে। তারা

---

৬২. তবে অন্যান্য বর্ণনায় সুমাইয়া রা.-কে প্রথম শহিদ বলা হয়েছে। দেখুন, *আল-ইসাবা*, ৬/৫০০

ছিল জালেম, আর মুসলিমরা ছিল মজলুম। কাফেরদের রক্তলোলুপ তরবারি কোষমুক্ত ছিল, আর মুসলিমদের তরবারি ঘরের এক কোণে পড়ে থাকায় তাতে মরিচা পড়েছিল। তাদের সঙ্গে সবসময় যদি কোনো তরবারি থেকে থাকে, তবে সেটা ছিল সততার তরবারি, ইসলামের ভালোবাসা ও সহমর্মিতার তরবারি। ইসলামের প্রচার-প্রসারের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ানো জালিমের জুলুমকে যা প্রতিহত করেছিল। আক্রমণ না করেই যা শত্রুকে কুপোকাত করে দিয়েছিল।

ইসলাম এবং ইসলামের নবী

আশ্চর্য! সেই শিক্ষা কতটা মর্যাদাপূর্ণ, বাস্তবসম্মত ও জীবনঘনিষ্ঠ ছিল। যা মুসলিমদের হৃদয়ে সততা ও ঈমানের এমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়েছিল! কাফেরদের জুলুম-নিপীড়নের কোনো বিক্ষুব্ধ কালো বাতাসই যাকে নেভাতে পারেনি। উলটো তাদের কঠোরতার প্রতিটি দিকই ইসলামের সবুজ-শ্যামল বাগানে নতুন চারাগাছ রোপণ করেছিল।

আমি আদৌ এ কথা মানতে প্রস্তুত নই যে, কোনো মিথ্যুক পৃথিবীর বুকে এতটা আলো বিলাতে পারে। কোন সে শক্তি, কোন সে তেলেসমাতি, যাতে জাদুগ্রস্ত হয়ে মুসলিমরা জ্বলন্ত কয়লা ও উত্তপ্ত বালুকেও আপন করে নিয়েছিল? শত অত্যাচারের পরও মুখ থেকে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি! সমস্ত ঘটনা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করলে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এ কথা মানতে বাধ্য হবেন যে, সেই জাদু, সেই তেলেসমাতি আর কিছুই ছিল না, বরং ইসলামের সততা ও ইসলামের নবীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বই ছিল সেই চুম্বকাকর্ষণ, যা পুরো পৃথিবীতে অভাবনীয় এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে, একে অন্যের রক্তের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মানবজাতিকে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে। যে তরবারি ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত ছিল, আজ সেই তরবারিই ভাইয়ের সুরক্ষায় সদা প্রস্তুত। যে ধর্মের মানুষ মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়, মৃত্যু থেকে পলায়ন করে না।

মহান সংস্কারকের তায়েফ গমন

ইসলামের নবী যখন অনুভব করলেন যে, মক্কাবাসীর হৃদয়ে কুফর-শিরকের মরিচা পড়ে গেছে। তাদের অপকর্ম তাদের হৃদয়ে অন্য কিছু গ্রহণ করার যোগ্যতাই নষ্ট করে দিয়েছে। তখন তিনি তাদের দিক থেকে হতাশ হয়ে পায়ে হেঁটে তায়েফে গমন করলেন। তায়েফ মক্কার উত্তর-পূর্ব কোণে

অবস্থিত ১৭ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি সুন্দর শহর। বড় বড় নেতা ও ধনী ব্যক্তিরা যেখানে বসবাস করত। সেখানকার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গোত্র ছিল উমায়ের গোত্র। এই গোত্রে প্রসিদ্ধ তিনজন মর্যাদাবান জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। যাদের নাম আবদ, মাসউদ ও হাবিব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম তাদের কাছে গেলেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও মূর্তিপূজার অসারতা সম্পর্কে তাদেরকে বোঝাতে চাইলেন। সর্বোপরি এই দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষগুলোকে সরল-সঠিক পথের দিকে আহ্বান করলেন।

কিন্তু অজ্ঞতার কালো আঁধার তাদেরকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, নিজেদের অজ্ঞতা সম্পর্কে তাদের অনুভূতিই ছিল না। যার কারণে তাদের মিথ্যার তেতো স্বাদে অভ্যস্ত হৃদয়ও মক্কার কাফেরদের ন্যায় ইসলামের সততার স্বাদ অনুভব করতে পারেনি। ফলে কুফরের কালো চশমা পরা চোখ দিয়ে তারা ইসলামের আলোকেই আঁধার ভাবতে লাগল।

তায়েফের মূর্তিপূজারি ও কল্পনাবিলাসী সম্প্রদায় বিশ্বনবীর নবুয়তের দাবিকে মানতে অস্বীকৃতি জানাল। তারা শুধু তাকে কটুবাক্য বলে ও গালমন্দ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং শহরের দুশ্চরিত্র, লম্পট ও নিকৃষ্ট লোকদেরকে নবীজির পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিল তাঁকে পাথর মারার জন্য। শহরের কুকুরগুলোকে তাঁর পেছনে ছেড়ে দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, দুষ্ট বালকদেরকে উদ্বুদ্ধ করল তাঁর পেছনে ঘুরে ঘুরে তাকে উত্ত্যক্ত করতে।

রহমাতুল লিল আলামিনের ওপর জুলুম-নির্যাতন

তায়েফের কাফের ও মূর্খ ব্যক্তিরা বাজারের দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। রহমাতুল লিল আলামিন যখন বাজারের পথ ধরে অতিক্রম করছিলেন, তখন দুপাশ থেকে তারা তাঁর পবিত্র পায়ে পাথর নিক্ষেপ শুরু করল। আহা! এ তো সেই পদদ্বয়, দোজাহানের সমস্ত সম্মান ও গৌরব যে দুপায়ে উৎসর্গ হতো। তাদের পাথরের আঘাতে আঘাতে নবীজির পা মুবারক রক্তাক্ত হয়ে গেল। পবিত্র জুতা মুবারক রক্তে ভরে গেল। আঘাতে আঘাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যন্ত্রণায় নীল হয়ে যেতেন, ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহটাকে মাটির ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি একটু বসতে চাইতেন। জালেম কাফেররা তখন তাঁর বাহু ধরে জোরপূর্বক তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিত। তিনি যখন পুনরায় চলতে শুরু করতেন, তারা আবারও পাথর নিক্ষেপ শুরু করত। তালি বাজাত। অশ্লীল ভাষায় বকাঝকা করত, উপহাস করত, নিকৃষ্ট গালি দিত, আরও কত...

আহা! এভাবেই কুফরের আঁধার ও অজ্ঞতার ঝড় জ্ঞান ও আলোর মিনারকে ধসিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছিল।

প্রিয় পাঠক! এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা কি এই কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না যে, চরম লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও কষ্ট-ক্লেশ সয়েও ইসলাম কঠোরতা পরিহার করে নম্রতা ও উদারতার পরিচয় দিয়েছিল? প্রিয় অসাম্প্রদায়িক ও নিরপেক্ষ গুণিজনদের কাছে আমার নিবেদন, এই কথা কি সত্য নয় যে, ইসলাম সীমাহীন দুঃখকষ্ট ও মুসিবতের কোলেই চোখ খুলেছিল! চরম প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল! শত্রুদের তরবারির ছায়াতেই ধীরে ধীরে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছিল?

মহান প্রভুর কাছে মিনতি

তায়েফের নিষ্ঠুর কাফেররা তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন ও অপমান-অপদস্থ করার পরে নিজেদের বুকের জ্বালা মিটিয়ে যখন যে-যার কাজে ফিরে গেল, তখন রহমাতুল লিল আলামিন একটি আঙুরবাগানে এসে বসলেন। সজল দুচোখে দয়াময় প্রভুর কাছে মিনতি করতে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন। সেদিন মুনাজাতে প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দয়াময় প্রভুর নিকট যে মিনতি করেছিলেন, ইসলামি ইতিহাসের পরতে পরতে আজও তা সংরক্ষিত রয়েছে। মহান আল্লাহর দরবারে দুহাত তুলে তিনি বললেন,

> হে আল্লাহ, হে মহান পরাক্রমশালী প্রভু, তোমার এই দুর্বল অসহায় বান্দা তোমার মহান দরবারে নিজের দুর্বলতা, অসহায়ত্ব ও মানুষের দেওয়া লাঞ্ছনা-বঞ্চনার ফরিয়াদ করতে এসেছে। হে আল্লাহ, তুমিই তো সবচেয়ে মেহেরবান। দুর্বল আর অসহায় মানুষকে তো তুমিই সাহায্য করো। তুমিই তো আমার মালিক, আমার পালনকর্তা। হে চিরঞ্জীব প্রভু, এ কার হাতে তুমি আমায় তুলে দিয়েছ? এমন মানুষের হাতে, যে আমায় দেখে নাক সিটকায়? নাকি এমন শত্রুর হাতে, যাকে তুমি আমার ব্যাপারে সর্বময় অধিকার দিয়ে রেখেছ? তবে হ্যাঁ, মাবুদ গো, আমি আজ যত মুসিবতের সম্মুখীন হচ্ছি, যত দুঃখ-যাতনা বয়ে বেড়াচ্ছি, তা যদি আমার প্রতি তোমার রাগ বা অসন্তুষ্টির কারণে না হয়, তুমি মাবুদ যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে দুনিয়ার কোনো কঠিন থেকে কঠিনতর মুসিবতেরও আমি পরোয়া করি না। তোমার নিরাপত্তাই আমার জন্য যথেষ্ট। তোমার দয়া ও কুদরতের যে আলোয় সমস্ত অন্ধকার আলোকিত হয়ে যায়, যে

আলোয় দুনিয়া-আখেরাত সজ্জিত হয়, আমি তোমার সে আলোর মধ্যে আশ্রয় চাই। যেন তোমার রাগ ও ক্রোধ আমার ওপর অবতীর্ণ না হয়। মাবুদ গো, তোমার ক্রোধ আর অসন্তুষ্টিই যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে, তাহলে তো আমার ওপর সন্তুষ্ট হওয়ার ক্ষমতাও তোমার রয়েছে। দয়া করে তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। কারণ, তোমার সাহায্য ছাড়া আমি কোনো অকল্যাণ থেকে বাঁচতে পারব না। কোনো নেক আমল করার শক্তিও পাব না।

কাফেরদের বিরোধিতা ও কঠোরতাসত্ত্বেও তিনি এই জালেমদের এলাকায় এসে ধৈর্য, সহনশীলতা ও আদর্শে অবিচলতার যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা শুধু তাঁর দ্বারাই সম্ভব। এমন কঠিন থেকে কঠিনতর জুলুম-নিপীড়নের মুখোমুখি হয়েও তাঁর মুখ থেকে কারও বিরুদ্ধে বদদোয়া বের হয়নি। তাঁর উদার হৃদয়ে অত্যাচারী কাফেরের জন্যও দয়া ও অনুগ্রহের মহাসমুদ্র ঢেউ খেলছিল। যদিও তায়েফ থেকে তিনি হতাশ ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন, তবুও তাঁর প্রতিজ্ঞা ও অবিচলতায় এতটুকু চিড় ধরেনি।

মুতয়িমের আশ্রয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তায়েফে ব্যর্থ হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃভূমি মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কার কাফেররা যখন তাঁর আগমনের সংবাদ শুনল। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা শহরে প্রবেশ করতে দেবে না। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহরে প্রবেশ করতে চাইলে তারা তাকে বাধা দিলো। কোনোভাবেই তারা তাকে শহরে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু মুতয়িম নামক এক ব্যক্তি এসব দেখে সহ্য করতে পারলেন না। তার শরীরের রক্ত যেন টগবগ করতে লাগল। সে চিৎকার দিয়ে কাফেরদের উদ্দেশ করে বলল, ধিক্কার তোমাদের আরব রক্তকে, ধিক্কার তোমাদের ন্যায় আরবদেরকে। পুরো পৃথিবীতে যারা আতিথেয়তায় অদ্বিতীয়, পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে যাদের আতিথেয়তার সুনাম, তারাই আজ নিজেদের স্বদেশি ভাইকে শহরে ঢুকতে না দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে! তোমাদের এমন কাজ আরবীয় চরিত্রের বিপরীত। আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিচ্ছি। এখন যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করবে, সে যেন আমাকেও নিজের শত্রু ভাবে। মুতয়িমের এমন নির্ভীক বক্তব্য শুনে কাফেররা রাগান্বিত হয়ে বলল, আচ্ছা, তা তুমিও কি মুসলিম হয়ে গেছ?

জবাবে মুতয়িম বললেন, না, আমি মুসলিম হইনি। কিন্তু আমি আমার কোনো স্বদেশি ভাইকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।[৬৩]

মহান আল্লাহর আশ্রয়ে নবীজি

মুতয়িমের ঘরে আশ্রয় নিয়েও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হকের দাওয়াত দিতে লাগলেন। এদিকে কাফেরদের ঘৃণা ও ক্রোধও বাড়তে লাগল। একপর্যায়ে মুতয়িমও তাদের ক্রোধের শিকার হয়ে গেলেন। রহমাতুল লিল আলামিন নিজে সব নির্যাতন নীরবে সইতে পারতেন। কিন্তু তাঁর কারণে নিরপরাধ মুতয়িম কাফেরদের আক্রোশের শিকার হোক, এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি এটাকে নিজের আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদার ওপর চরম আঘাত মনে করলেন। তাই যখন কাফেরদের কঠোরতা বেড়ে গেল, তখন তিনি প্রকাশ্যে এই ঘোষণা করে দিলেন যে, এখন আমি কারও আশ্রিত নই। আমি আমার রবের আশ্রয়ে রয়েছি। তাই আমার কারণে কেউ মুতয়িমকে কষ্ট দিয়ো না।

আরবের মেলা ও আসরগুলোতে ইসলামের দাওয়াত

জাহেলি যুগের আরব এমন এমন মেলা ও আসরে সরগরম ছিল, যেখানে ঘোড়দৌড়, তির নিক্ষেপ এবং কুস্তি লড়াইয়ের ন্যায় বীরত্ব ও সাহসিকতার নৈপুণ্য প্রদর্শন হতো। এসবের মাধ্যমে বড় বড় নেতা ও ধনীদের কাছ থেকে প্রশংসা ও পুরস্কার উসুল করা হতো। আবার চরিত্রহীন লম্পট কবি-সাহিত্যিকেরা সবার সামনেই কুরুচিপূর্ণ ও যৌন সুড়সুড়িমূলক কবিতা আবৃত্তি করে কবি সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হতো। এই কবিরা নিজেদের কবিতায় বিভিন্ন কুমারী যুবতী মেয়েদের নাম নিয়ে প্রেম-ভালোবাসার এমন এমন কবিতা আবৃত্তি করত যে, চতুর্দিকে বাহ বাহ রব পড়ে যেত। লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে অত্যন্ত নির্দ্বিধ ও গর্বের সঙ্গে এসব কবিতা পাঠ করা হতো।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুশ্চরিত্র লোকদের চরিত্র সংশোধন ও কুফর-শিরকের কালো পর্দায় আপাদমস্তক আবৃত এই মানুষগুলোর মধ্যে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিতে সেসব মেলায় গমন করতেন। তাদের চরিত্র সংশোধন ও সভ্যতার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করতেন। মূর্তিপূজা ও শিরকের অভিশাপ দূর করতে নিজের সব শক্তি ব্যয়

---

৬৩. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/১৭২; *আসাহহুস সিয়ার*, ৫৭; *জাদুল মাআদ*, ৩/৩০

করে মানুষকে বোঝাতেন এবং মহান ক্ষমতাধর প্রভুর দিকে সবাইকে আহ্বান করতেন। কিন্তু ইসলামবিরোধীরা সবসময় ছায়ার ন্যায় তাঁর পিছু লেগে থাকত। মন্দচরিত্রের বিরুদ্ধে যখনই তাঁর মুখ থেকে ফুলের ন্যায় সুন্দর কোনো বাক্য বের হতো, তখনই কাফেরদের নাপাক মুখের আবর্জনাসদৃশ কথাগুলো তাঁর হৃদয়কে আহত করে তুলত। চতুর্দিক থেকে তাঁর নিন্দা ও কুৎসা রটনার তুফান শুরু হতো। তারা মানুষকে বোঝাত যে, এই লোকের কথায় কান দিয়ো না। সে নিজের বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে। সে লাত, মানাত, আসাফ ও নায়েলা নামক মূর্তিদের পূজাকে অজ্ঞতা ও বোকামি বলে আখ্যায়িত করে। তাই তোমরা এই ধর্মত্যাগীর কথায় কান দিয়ো না।

এসব শুনে মানুষ নবীজির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত, কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করত না।

সফল ব্যর্থতা ও ব্যর্থ সফলতা

এমন বেদনাদায়ক ব্যর্থতায়ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতাশ হননি। তিনি এই কথা খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, মানুষের কাজ শুধু একাগ্রতার সঙ্গে চেষ্টা করা। ফলাফল তার হাতে নয়। চেষ্টা মানুষের হাতে, ফলাফল আল্লাহর হাতে। নিছক বাহ্যিক সফলতা আল্লাহর নিকট প্রশংসিত নয় বরং প্রকৃত চেষ্টাই প্রশংসিত হয়।

এমন অনেক মহামনীষী এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, সমাজ ও দেশের সংস্কারে যারা নিজেদের সবকিছু বিলীন করে দিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন। অথচ তাদের কথা শোনার মতোও কেউ ছিল না। বাহ্যিকভাবে যদিও তাদের পুরো জীবনটাই ব্যর্থতার এক দুঃখজনক উপাখ্যান ছিল। কিন্তু ইতিহাস তাদের মাথায় সফলতার মুকুট পরিয়েছে। ইতিহাস আজও তাদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। অন্যদিকে সমাজসংস্কারকের দাবিদার এমন অনেক মানুষও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, পুরো পৃথিবী যাদের পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ত। যশ-খ্যাতি আর সম্মানের কমতি যাদের ছিল না। যাদের জীবনের সফলতার জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠত। কিন্তু আল্লাহ তাদের গলায় অভিশাপের শৃঙ্খল পরিয়েছেন, অপমান ও অপদস্থতার চিরস্থায়ী শাস্তিতে তাদেরকে বন্দি করেছেন। পার্থক্য শুধু নিয়তের ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ত ছিল মানুষের চরিত্র সংশোধন ও সভ্যতার উন্নয়ন করা। তাই তাঁর বাহ্যিক ব্যর্থতাও মূলত সফলতা ছিল। সুতরাং তাঁর হতাশ হওয়ার কী আছে?

মক্কার দর্শনার্থীদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হকের প্রতি আহ্বান করতেন। কিন্তু তার ডাক শোনার মতো কেউ কেউ থাকলেও বিরোধিতা করার লোক ছিল অগণিত। তবুও তিনি সাহস হারাননি। হজের দিনগুলোতে যখন দূরের ও নিকটবর্তী অঞ্চলের দর্শনার্থীরা মক্কায় আগমন করত, তখন তিনি তাদের মধ্যে হকের বাণী প্রচার করতেন। তবে তাঁর এসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো। মানুষের হৃদয় পাপাচারের রঙে কালো হয়ে গিয়েছিল, সে হৃদয় কী করে এখন নেক আমলের রঙে রঙিন হবে? তাদের সে হৃদয়ে বাতিল আকিদা ও শয়তানি কুমন্ত্রণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, আখলাক-চরিত্র ও রুহানিয়াতের সুমহান নীতিবাক্য কী করে তাদের হৃদয়ের ঘরে বসত গড়বে? তবে হ্যাঁ, এরপরও সভ্যতা ও সুন্দর চরিত্রমাধুর্যের এই শিক্ষার প্রতি মানুষকে আহ্বান করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা একেবারেই বিফল হয়নি। সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলো যদিও এই নশ্বর পৃথিবীর চাকচিক্যে মজে থাকা হৃদয়সমূহকে নিজ রঙে রঙিন করতে পারেনি। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে অবশ্যই আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়েছিল। যার মাধ্যমে সেই হৃদয়গুলোতে ভবিষ্যতে কখনো সত্যের রঙে রঙিন হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাগ্যাকাশে নবুয়তের সূর্যোদয়ের ১০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। এই বছরই তাঁর পবিত্র মেরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের কাছে নিয়ে সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করেন। কোনো কোনো আলেমের মতে নবুয়তের ১২তম বছর মেরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়। আর অনেক বিদগ্ধ গবেষক আলেম তো এটাও প্রমাণ করেছেন যে, মেরাজের ঘটনা শুধু একবার নয়, বরং বারবার ঘটেছে। তাই এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা থেকে আমি বিরত থাকলাম। তবে হ্যাঁ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখার পরে বিশদ যে সিরাতগ্রন্থ লেখার স্বপ্ন আমি অধম দেখি, যদি বেঁচে থাকি আর এমন কোনো গ্রন্থ লেখার সৌভাগ্য হয়, তাহলে তাতে মেরাজ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

এই বছরই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা বিনতে আবু বকর রা. ও সাওদাহ বিনতে জামআ রা.-কে বিয়ে করেন।

এক ক্ষমতালোভী আরব

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের জয়ধ্বনি পুরো আরবের দিগ্‌দিগন্তে গুঞ্জন সৃষ্টি করেছিল। মরুভূমির প্রতিটি বালুকণা হেদায়েতের সুবহে সাদিকের আলোয় জেগে ওঠার বার্তা দিচ্ছিল। ঠিক এই সময়ের ঘটনা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিয়েছিলেন বনু আমের গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিতে। তখন ফারাস নামক এক ক্ষমতালোভী তাঁর কাছে এসে বলল, আমি যদি মুসলিম হই এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিজের সর্বস্ব ব্যয় করি, তাহলে কখনো যদি আপনি ইসলামবিরোধীদের ওপর বিজয়ী হন, তখন কি আমাকে আপনার খলিফা নিযুক্ত করবেন?

জবাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইসলাম আর ক্ষমতার লোভ, দুটি ভিন্ন বিষয়। ইসলামের ভালোবাসা তো দুনিয়ার সমস্ত লোভ-লালসা থেকে বহু উর্ধ্বে। যদি মুসলিম হওয়ার আগ্রহ থাকে, তাহলে একনিষ্ঠভাবে সমস্ত কলুষ থেকে হৃদয়কে পরিষ্কার করে হেদায়েতের নুর দিয়ে তা আলোকিত করো। খেলাফত আর ক্ষমতালাভের আশা মন থেকে বের করে দাও। তা ছাড়া খেলাফতও আল্লাহর এক বিশেষ দান। তিনি যাকে চান তাকেই খলিফা বানান। কাউকে খলিফা বানানোর ক্ষমতা আমার নেই।

ফারাস এমন বাস্তবসম্মত উত্তর শুনে ভেংচি কেটে বলল, বেশ তো, ইসলামের প্রচার-প্রসারে আমরা সর্বস্ব বিলীন করব, আর বিজয়ী হয়ে রাজত্বের মজা লুটবে তুমি, তাই না? না না, তা হবে না। যাও যাও, নিজের রাস্তা মাপো। তোমার আর তোমার ইসলামের প্রয়োজন আমার নেই।[৬৪]

আমার প্রজ্ঞার চেয়ে এই প্রজ্ঞা উত্তম

এখন মুহাম্মাদি বাগানে নবুয়তের ১১তম বসন্ত চলছে। বাগানের বিচিত্র ফুলেরা চারিদিকে সুবাস ছড়াচ্ছে। বুলবুলিদের মিষ্টি আওয়াজে আশপাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে। এমনই একদিন সুআইদ ইবনে সামেত নামক এক ব্যক্তি মক্কায় আগমন করল। সে ছিল মদিনার আউস গোত্রের লোক। নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার কারণে সে সবার কাছে কামেল উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিল। কোনো এক কারণে নবীজির দরবারে এসে উপস্থিত হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন।

---

৬৪. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩০৭

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কামেল বলল, সম্ভবত আপনার কাছে সেই মহামূল্যবান মণি-মুক্তা নেই, যার অত্যুজ্জ্বল আলোয় আমার হৃদয়রাজ্য আলোকিত হয়ে আছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

: আচ্ছা, তা তোমার কাছে কোন বিরল মণি-মুক্তা রয়েছে, যা আমার কাছে নেই?

কামেল বলল,

: আমার কাছে লোকমানের হেকমত রয়েছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

: ও তাই! আমার কাছে যে হেকমত রয়েছে, তার সামনে লোকমানের হেকমতের সুউচ্চ পর্বতও নিচু হয়ে যাবে।

কামেল এ কথা শুনে লোকমানের হেকমতসংবলিত কিছু কবিতা আবৃত্তি করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোনাল। নবীজি তার কবিতা শুনে প্রশংসা করে বললেন, তোমার কথাগুলো তো চমৎকার। তবে এখন এরচেয়েও চমৎকার ও উত্তম কথা শোনো। এই বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন। পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শুনে কামেল অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে গেল এবং কোনোরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা না করেই এই কথা স্বীকার করে নিলো যে, নিঃসন্দেহে আপনার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কাছে লোকমানের হেকমত নিষ্প্রভ।[৬৫]

আয়াস ইবনে মুআজ

মদিনার আউস এবং খাজরাজ[৬৬] গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বেশ কিছু বছর যাবৎ সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। তাদের রক্তপিয়াসি তরবারি মায়ের নিষ্পাপ সন্তানদের রক্তে মরুভূমির প্রতিটি বালিকণাকে রঞ্জিত করার জন্য কোষমুক্ত হতে ছটফট করছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বনু আবদুল আশহালের

৬৫. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩০৮-৩০৯

৬৬. **আউস এবং খাজরাজ :** ইসলামপূর্ব সময়ে মদিনার প্রধান দুটি গোত্র আউস ও খাজরাজ। বনু কায়লার প্রধান-পুরুষ হারেসার দুই পুত্রের নাম ছিল আউস ও খাজরাজ। হিজরতের সময় মদিনায় আউস ও খাজরাজ গোত্রের শাখাগোত্রের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩ ও ৩৬টি। মক্কা থেকে নবীজি ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের সময় মদিনায় প্রধানত এই দুই শ্রেণির মানুষই বসবাস করত। পাশাপাশি ইহুদি গোত্রগুলোও সেখানে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করত।-সম্পাদক

কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আনাস ইবনে রাফে মক্কায় কুরাইশদের সঙ্গে একটি মৈত্রীচুক্তি করতে এলো। যাতে করে খাজরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কুরাইশরা তাদের সহযোগিতা করে। এই প্রতিনিধিদল মক্কায় এসে কুরাইশদের সঙ্গে দেখা করার আগেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি অত্যন্ত নম্র ও সহানুভূতির ভাষায় তাদেরকে বললেন, আমার কাছে এমন বিরল ও মহামূল্যবান সম্পদ রয়েছে, যা তোমাদেরকে একদিকে যেমন দুনিয়ার এই রঙ্গমঞ্চে সম্মান ও সুখ্যাতির স্বর্ণশিখরে পৌছিয়ে দেবে, অন্যদিকে আখেরাতেও তোমরা এর কারণে সমস্ত নেয়ামতের মালিক হবে।

প্রতিনিধিদল বলল, সানন্দে আপনি আমাদের সামনে তা উপস্থাপন করুন। আমরা তো এমন জিনিসই লুফে নিতে আগ্রহী। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ করে বললেন, গোমরাহির এই চারণভূমিতে দিগ্ভ্রান্ত মানবতাকে সরল-সঠিক পথ দেখাতে মহান আল্লাহ আমাকে নবী হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আর পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে হেদায়েতের আলোকবর্তিকা পবিত্র কুরআনকে তিনি আমার ওপর নাজিল করেছেন। এই বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে ইসলামের ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলেন। কুরআন শরিফের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন। মহান আল্লাহর একত্ববাদ বিষয়ে অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে সারগর্ভ আলোচনা করলেন। এই প্রতিনিধিদলের একজন যুবক সদস্য ছিলেন আয়াস ইবনে মুআজ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যাশ্রিত এই প্রাঞ্জল ও সাবলীল বক্তব্যে তিনি এতটাই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, হে আমার সম্প্রদায়, যে উদ্দেশ্যে আমরা মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে চুক্তি করতে এসেছি, এই বিরল ও মহামূল্যবান জ্ঞান ও হেকমত তারচেয়েও বেশি উত্তম। এসো হেদায়েতের এই উজ্জ্বল আলো দিয়ে আমরা নিজেদের অন্ধকার হৃদয়কে আলোকিত করি।

রাসুলের মর্যাদা ও পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ ও অবুঝ আনাস ইবনে রাফে আয়াসকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলো। অবশেষে এই প্রতিনিধিদল একদিকে যেমন নিজেদের হৃদয়কে হেদায়েতের আলো থেকে বঞ্চিত করে ফিরে গেল, অন্যদিকে কুরাইশদের সঙ্গেও তারা মৈত্রীচুক্তি করতে ব্যর্থ হলো। এর কিছুদিন বাদেই আয়াস ইবনে মুআজ এই পৃথিবীর মায়াজাল ছিন্ন করে ওপারে পাড়ি জমান। মৃত্যুর আগে তিনি নিজের মুসলিম হওয়ার ঘোষণা

দেন। পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি এমন এক আলো সঙ্গে নিয়ে যান, যা তাকে জাহান্নামের অন্ধকার পথ থেকে মুক্ত করে জান্নাতের আলো-ঝলমল প্রশস্ত পথে নিয়ে যাবে। যে পথে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয় শান্তির নির্মল বায়ু। অশান্তির কালো ধোঁয়ায় যেখানে মানুষ কষ্ট পায় না।[৬৭]

জাদুকর নিজেই যখন জাদুগ্রস্ত

জাহেলি যুগের আরবসমাজে জাদুবিদ্যার বেশ প্রচলন ছিল। আরবের দিগ্‌দিগন্তে বড় বড় দক্ষ ও অভিজ্ঞ জাদুকররা বসবাস করত। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ একজন জাদুকর ছিলেন ইয়ামেনের অধিবাসী জিমাদ ইবনে আজদি। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এই পবিত্র শহর মক্কায় এসে হাজির হন, যার অলিগলি থেকে ন্যায় ও সততার এক বিপ্লবের জন্ম হচ্ছিল। এখানকার মিথ্যার পূজারিরা জিমাদকে সাবধান করে দিয়ে বলল, মুহাম্মাদ নামের এই লোকটির ওপরে কোনো অশুভ প্রেতাত্মা ভর করেছে। ইদানীং সে যুগ যুগ ধরে চলে আসা আমাদের আরবসভ্যতার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার ছড়ায়। সে বলে, মূর্তিপূজা নাকি মানুষের জন্য নিকৃষ্ট এক অভিশাপ। এমনকি আমাদের বাপদাদাদের রীতিনীতি ও নিয়মকানুনও নাকি বিশ্বমানবতার জন্য এক মর্মন্তুদ আজাব। সে নিজেই নতুন এক ধর্মের গোড়াপত্তন করেছে। যার প্রচার-প্রসারে সে রাতদিন একাকার করে ফেলেছে। তাই জনাবের জন্য উচিত হবে তাঁর আশেপাশেও না যাওয়া।

জিমাদ ইবনে আজদি বেশ দম্ভের স্বরে বলল, আচ্ছা, তাই নাকি? তাহলে তো লোকটাকে আমার একবার দেখতে হয়! চলো চলো, তোমরা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। দেখবে কত দ্রুত আমি নিজের জাদুর তেলেসমাতি দিয়ে তাঁর মন-মগজ সুস্থ করে তুলি।

কাফেররা তাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পাঠিয়ে দিলো। জিমাদ নিজের জাদুবিদ্যার শক্তিতে আশ্বস্ত হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, হে মুহাম্মাদ, মনোযোগ দিয়ে আমার জাদুমন্ত্র শোনো, যাতে আমি তোমার মাথা থেকে দুষ্ট জিনদের প্রভাব দূর করতে পারি।

---

৬৭. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩১০; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৫/৪২৭; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৩/১০৮০-১০৮১

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে তাকে বললেন, আচ্ছা, তা না হয় শুনব। তবে তার আগে আমার মন্ত্রটাও একটু শোনো, এরপরে না হয় আমি তোমার মন্ত্র শুনব। জিমাদ বলল, ঠিক আছে, প্রথমে না হয় তোমার কথাই শুনি। বলো, আমি তা শোনার জন্য প্রস্তুত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিশুদ্ধ ও সাহিত্যের মানদণ্ডের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত খুতবাটির প্রথম কয়েক লাইন (আম্মা বাদ পর্যন্ত) পড়ে শোনালেন। জিমাদ বিমোহিত হয়ে পড়ল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষার সূক্ষ্মতা ও বিশুদ্ধতায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে থামিয়ে দিয়ে সে বলল, অনুগ্রহপূর্বক আপনি আপনার এই প্রাঞ্জল কথাগুলো আরও একবার বলুন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও নিজের জাদুময় খুতবার প্রথমাংশ পাঠ করলেন। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ জিমাদের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে যাচ্ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার সাবলীলতা ও বিশুদ্ধতায় সে বিমুগ্ধ হয়ে বলল, পৃথিবীর অনেক বড় বড় জাদুকর, সুমিষ্টভাষী কবি ও গণকদের কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার কথার ন্যায় এমন হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষণীয়, উচ্চমার্গীয় ও বিশুদ্ধ বক্তব্য আমি কারও কাছ থেকে শুনিনি। এটা আপনার জাদুময় কথার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আপনার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই সাহিত্যের সাগরের একেকটি জ্যোতির্ময় মণি-মুক্তা। যুগ যুগ জ্বললেও যার চোখ ধাঁধানো দ্যুতি একটুও হ্রাস পাবে না। দয়া করে আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। ইসলাম গ্রহণ করে আমি ধন্য হতে চাই।

এভাবেই একজন বড় জাদুকর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের জাদুমন্ত্র দিয়ে সুস্থ করতে এসে নিজেই মোহগ্রস্ত হয়ে গেল। আধ্যাত্মিকতা ও একত্ববাদের এই তুলনাহীন জাদুকরের একটি কথার তেজও সহ্য করতে পারল না।[৬৮]

মুশরিকরা যখন এমন অবাককরা ঘটনা শুনল, তখন তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ব্যর্থতার গ্লানি ও ইসলামের উন্নতির হিংসায় তাদের সারা শরীরে যেন দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠল। নিজেদের ক্রোধ ও ক্ষোভ মেটাতে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে লাগল।

---

৬৮. *সহিহ মুসলিম*, ৮৬৮ (কিতাবুল জুমা); *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/৭৯-৮০; *খাসায়িসুল কুবরা*, ১/২৫০২ (বাংলা)

সুমিষ্টভাষী কবিও মোহগ্রস্ত

সৃষ্টিজীবের সর্দার, বিশ্বমানবতার গৌরব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হক ও সততার জাদু থেকে সেই লোকদের বাঁচার কোনো উপায় ছিল না, যাদের হৃদয়ে এই জাদুময় বিপ্লবকে বোঝার মতো ন্যূনতম বিবেক-বোধ ও জ্ঞানবুদ্ধি ছিল। এখন আমি যে ঘটনাটি উল্লেখ করব, তা সেই সময়ের ঘটনা, যখন মক্কার প্রতিটি অলিগলি থেকে একত্ববাদের প্রতিধ্বনি ভেসে আসছিল। কিন্তু সে আওয়াজ শুনে হৃদয়ে জায়গা দেওয়ার মতো কানগুলো বধির হয়ে গিয়েছিল।

তোফায়েল ইবনে আমর নামক এক ব্যক্তি মক্কায় আগমন করলেন। তিনি ইয়ামেনের দাউস গোত্রের সর্দার ছিলেন। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-বিত্ত ও জ্ঞান-বিচক্ষণতার কারণে ইয়ামেনের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে তাকে গণ্য করা হতো।

একদিকে তার ঘর যেমন ছিল সম্পদে ভরপুর, অন্যদিকে তার মন-মগজও ছিল জ্ঞানের প্রাচুর্যে টইটম্বুর। এ ছাড়াও তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারতেন এবং বেশ সুমিষ্টভাষী কবিও ছিলেন।

কুরাইশের নেতারা যখন তার আগমনের সংবাদ শুনল, তখন তারা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। ঢাকঢোল পিটিয়ে তাকে শহরে নিয়ে এলো। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিকের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পর তারা তাকে এটাও জানাল যে, শহরে এমন এক প্রসিদ্ধ জাদুকর রয়েছে, যার জাদু থেকে না মুক্তির কোনো পথ আছে আর না তার কোনো প্রতিরোধব্যবস্থা আছে। সে জাদুকরদের জাদুকর, বড় বড় জাদুকররাও তাঁর কাছে এসে জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাঁর প্রাঞ্জল ভাষা ও কথার পাণ্ডিত্যে বড় বড় গুণিজন ও কবিরা পর্যন্ত তাঁর অনুগত হয়ে পড়ে। তাই আপনি খুব সতর্ক হয়ে থাকবেন। অন্যথা ওই জাদুকরের কথা যদি একবার আপনার কানে এসে যায়, তাহলে আপনি তাঁর জুতা সোজা করাটাকেও নিজের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করবেন।

তোফায়েল ইবনে আমর তাদের কথা শুনে পূর্ব-সতর্কতাবশত নিজের কানে তুলা গুঁজে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। কুরাইশ কাফেররা তাকে বারবার সতর্ক করায় যখনই তিনি কোনো অলিগলি দিয়ে হাঁটতেন, কানে তুলা দিয়ে রাখতেন। একদিন সৌভাগ্যক্রমে কানে তুলা দেওয়া অবস্থাতেই তিনি মসজিদুল হারামে গিয়ে পৌছলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। পবিত্র কপাল

মাটিতে রেখে মহান আল্লাহর কুদরতি কদমে সেজদা করছিলেন। তোফায়েল তো কানে তুলা দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু চোখে তো পট্টি বাঁধেননি। তাই নামাজের রুকু, সেজদা, কিয়াম ইত্যাদি দেখে তিনি খুব প্রভাবিত হলেন। মনে মনে চিন্তা করলেন, আচ্ছা, আমি তো একজন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মানুষ। আমার বিদ্যাবুদ্ধির কথা তো সবার মুখে মুখে। আমার জাদুময় বক্তৃতা মানুষের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাহলে এই ব্যক্তির কথায় এমন কী জাদু রয়েছে, যা আমাকেও প্রভাবিত করবে? দাঁড়াও, আমাকে আগে দেখতে দাও যে, তাঁর তূণীরে এমন কোন তির রয়েছে, যার ভয়ে কুরাইশের লোকেরা এতটা ভীত-সন্ত্রস্ত?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাজ শেষ করে নিজ ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। তোফায়েলও দ্রুত পা ফেলে তাঁর পেছনে ছুটতে লাগলেন। অল্প কিছুদূর গিয়ে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ করে বললেন, আমি আপনার কথা শুনতে চাই। জবাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, শোনো তাহলে। সামান্য সময়ের ব্যবধানেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ কথায় তোফায়েলের হৃদয়ে আন্দোলন সৃষ্টি হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন। ইসলাম সম্পর্কে সাবলীল ভাষায় সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ আলোচনা পেশ করলেন। তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই তোফায়েলের হৃদয়ে রেখাপাত করছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা শেষ হতেই তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন।

কুরাইশরা যখন তোফায়েলের মতো এমন একজন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার সংবাদ শুনল তখন অবাক-বিস্ময়ে আঙুল কামড়ে বসে রইল। তারা এবার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নিলো যে, মুহাম্মাদের আকর্ষণীয় জাদুমন্ত্র হতে বাঁচাটা অসম্ভব। এই মহাবিপদ থেকে যদিও উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব, তবে এর থেকে বাঁচার একটা পন্থা রয়েছে। তা হলো, মুহাম্মাদের গলার আওয়াজকেই চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেওয়া। কারণ, আজকে আমরা যতগুলো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, সব তাঁর কারণেই হচ্ছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর পাশবিক নির্যাতন করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে নিজেদের কাজ শুরু করল।

আদ্দাস

সত্যান্বেষী এক ব্যাকুল হৃদয়

তায়েফের মুশরিকদের জুলুম-নিপীড়নের শিকার হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আঙুরবাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, উতবা এবং শাইবা নামক দুজন সর্দার তার মালিক ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের বাগানে গিয়ে বসলেন, তখন তাঁর দুর্দশা দেখে তাদের মায়া হলো। তারা তাদের খ্রিষ্টান কৃতদাস আদ্দাসের হাতে একটি পাত্রে কিছু আঙুর দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করল। নবীজির সামনে আঙুরের পাত্র রেখে কয়েক পা দূরে গিয়ে আদ্দাস অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে আঙুর মুখে দিতে শুরু করলেন। আদ্দাসের সত্যান্বেষী ব্যাকুল হৃদয়ে এই শব্দগুলো এমন প্রভাব সৃষ্টি করল যে, কিছুক্ষণের জন্য যেন তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। অত্যন্ত অবাক হয়ে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আমি এমন জাদুময় কথা তো আর কারও মুখে শুনিনি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরিচয় জানতে চেয়ে বললেন, তুমি কে? কোথায় থাকো? তোমার ধর্মই-বা কী? আদ্দাস নিজের বংশ পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার বাড়ি নিনাওয়া[৬৯] শহরে। আমার পূর্বপুরুষরা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আচ্ছা! তাহলে তুমি ইউনুস ইবনে মাত্তা আ.-এর শহর নিনাওয়ার অধিবাসী!?

আদ্দাস অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি ইউনুস ইবনে মাত্তাকে কীভাবে চেনেন?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি তো আমার ভাই। তিনিও আল্লাহর একজন নবী ছিলেন, আর আমিও আল্লাহর একজন নবী।

---

৬৯. উত্তর ইরাকে অবস্থিত ইরাকের একটি প্রদেশ। নিনাওয়াকে বাইবেলে আসিরীয় সাম্রাজ্যের নিনেভেহ শহর নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রদেশটির আয়তন ৩৭,৩২৩ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ। শহরটি দজলা বা তাইগ্রিস নদীর তীরে প্রাচীন নিনেভেহ শহরের ধ্বংসাবশেষের বিপরীত তীরে অবস্থিত।-সম্পাদক

এই কথা শুনেই আদ্দাস আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠলেন। বিস্ময়াভিভূত হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার নাম কী? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার নাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে আদ্দাসের চেহারায় খুশির ঝিলিক দেখা গেল। চোখে-মুখে দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত কোনো জিনিস পাওয়ার পরিতৃপ্তি। তার হৃদয়সমুদ্রে যেন খুশির তরঙ্গরা ঢেউ খেলতে শুরু করল। তিনি মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, হ্যাঁ, আপনিই সেই মহান সম্মানিত নবী, তাওরাত ও ইনজিলে যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সেখানে এ কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, আপনি পবিত্র মক্কা শহরে আগমন করবেন। শুরুরদিকে আপনার গোত্রের লোকেরা আপনার বাণীকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে। এমনকি তারা আপনার ওপর এমন অবর্ণনীয় জুলুম-নিপীড়ন করবে যে, আপনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুরো পৃথিবীতে আপনার বাণী ছড়িয়ে পড়বে। হেদায়েতের যে প্রদীপ আপনি প্রজ্বলিত করবেন, তার আলোয় পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত হয়ে যাবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, আদ্দাস, তুমি কি আমার এই হেদায়েতের আলো দ্বারা নিজের হৃদয়রাজ্যকে আলোকিত করবে না?

আদ্দাস পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় নবীজির সামনে আদবের সঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি তো সেই কবে থেকেই আপনার আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে আছি। আপনার হেদায়েতের আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে ব্যাকুল হয়ে আছি। আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। সৌভাগ্যক্রমে আজ আমি আপনার দেখা পেয়েছি। এখন আপনি আমায় সরল-সঠিক দ্বীনের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সত্যান্বেষী এই প্রেমিকের হৃদয়কে আলোকিত করে নিলেন।[৭০]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুমিষ্ট ভাষা ও আকর্ষণীয় কথায় প্রভাবিত হয়ে আদ্দাস অত্যন্ত বিনয় ও ভালোবাসায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঝুঁকে পড়লেন এবং তাঁর মুবারক হাত ও

---

৭০. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩০৫; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/১৭০; *আসাহহুস সিয়ার*, ৫৬-৫৭

পায়ে চুম্বন করতে লাগলেন। উতবা ও শাইবা যখন দূর থেকে কৃতদাসের এমন আশ্চর্যজনক কর্মকাণ্ড দেখতে পেল, তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, আমাদের গোলামও দেখি আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। এই মানুষটা দেখি তাকেও বিগড়ে দিলো!

আদ্দাস যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় জানিয়ে মনিবদের কাছে ফিরে এলেন, তখন উতবা ও শাইবা তাকে জিজ্ঞেস করল, আদ্দাস তোর আবার কী হলো যে, তুই এই লোকটার হাতে-পায়ে চুমু দিতে শুরু করলি?

আদ্দাস অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বললেন, এমন মহান ব্যক্তিদের হাতে-পায়ে চুমু দিতেও সৌভাগ্যের প্রয়োজন হয়। তিনি আমাকে এমন কিছু বিষয় বলেছেন, যার মধ্যে দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ নিহিত। নবীগণ ছাড়া এমন বিষয় আর কেউ বলতে পারে না। এমন পুণ্যাত্মা লোকদের অস্তিত্বও পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর। পুরো পৃথিবীর বুকে আজ এমন কোনো মানুষ নেই, যে এই মহান মানুষটির সমপর্যায়ের হতে পারে।[৭১]

তখন এই মিথ্যার পূজারিরা তাকে বিদ্রুপ করে বলল, ছি ছি, নিজের বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করে কোথাকার কার ধর্ম গ্রহণ করেছিস। তোর মতো হতভাগা আর বোকা কেউ হয়?

প্রত্যুত্তরে আদ্দাস বললেন, না না, এমন কথা বলবেন না। আমি তো এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করছি, যার থেকে উত্তম কেউ বর্তমানে এই পৃথিবীতে নেই। যে হেদায়েতের ধর্মকে আমি বুকে আগলে নিয়েছি, তার জন্য এমন শত শত বাপদাদার ধর্মকেও আমি উৎসর্গ করতে পারি। অজ্ঞতার আঁধার ভেদ করে আমি জ্ঞানের বাতিঘরে প্রবেশ করেছি। কুফরের তিমির রজনি থেকে বের হয়ে ঈমানের আলোকিত দিবসে এসে পৌঁছেছি। সুতরাং আমি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি।

এভাবেই এক সত্যান্বেষী ব্যাকুল হৃদয় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

হকের প্রভাব

সত্য ও ন্যায়ের আহ্বায়ক, দয়া ও অনুগ্রহের প্রতিমূর্তি, ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর মক্কার মুশরিকরা ইসলামের তাবলিগের অপরাধে যে অমানবিক অত্যাচার করেছে, জুলুম-নিপীড়নের

---

৭১. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩০৫; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/১৭০-১৭১

ইতিহাসে তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তি, আপন আদর্শে অনড় প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সৎসাহসের সঙ্গে ইসলামের অনুসারী করতে গিয়ে কাফেরদের তরবারির সামনে নিজের বুক পেতে দিয়েছেন। শক্তি ও সহ্যের ইতিহাসে তারও কোনো তুলনা নেই। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এমন বিরল দৃষ্টান্ত কাফেররা ইতিপূর্বে কখনো চোখেও দেখেনি, শোনেওনি। কয়েকজন বড় বড় শিক্ষিত ও গুণিজন হক-বাতিলের এমন বিস্ময়কর দ্বন্দ্বে বেশ প্রভাবিত হলেন। যাদের হৃদয়ে কখনো অবচেতনভাবেও ইসলামের মর্যাদা ও সৌন্দর্যের কথা জাগ্রত হয়নি, তাদের হৃদয়েও ইসলাম এবং ইসলামের নবীর জন্য কিছুটা সহমর্মিতার অনুভূতি সৃষ্টি হলো।

বাহ্যিকভাবে তাকালে তাদের এই ধরনের অনুভূতি ও আবেগকে একটি প্রাসঙ্গিক বা সাময়িক অনুভূতি মনে হতে পারে। যেকোনো বিপদ্গ্রস্ত মানুষকে দেখে যা হৃদয়ে জাগ্রত হয়। মূলত পিতৃপুরুষদের ধর্মকে ত্যাগ করার পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, বংশীয় ও সামাজিকভাবে যে কতটা পাশবিকতার শিকার হতে হয়, তা তাদের চোখের সামনে ছিল। যে কারণে ইসলামের নবী ও তাঁর অনুসারীদের অবিচলতা ও কাফেরদের সবরকমের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ হতে দেখে কিছু কিছু ইসলামবিরোধীর হৃদয়ে সত্যের যে আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল, তারা তা প্রকাশ করতে পারেননি। তবে অধিকাংশের হৃদয়েই হকের প্রভাব মজবুতভাবে আসন গেড়ে নিয়েছিল, অনেক সময় তার প্রমাণও মিলেছে।

হৃদয়ের একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা নিয়ে সত্য ও ন্যায়ের প্রচার-প্রসারে যারা ঘাম ঝরিয়েছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তারা কখনো ব্যর্থ হননি। ইতিহাস সাক্ষী, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারাই শুদ্ধতা ও সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নিয়েছে, তাদের সেই উদ্যোগ নিষ্ফল হয়নি। এমনকি মহান সংস্কারকদের মৃত্যুর পরও মানুষের হৃদয়ে তাদের ভক্তি ও ভালোবাসার প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যে সংস্কারক তার জীবদ্দশায় সফলতার মুখ দেখেননি, তার মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া মিশন সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছে গেছে।

সততা এবং ন্যায়ের কোনো বিনাশ নেই। আজকের পৃথিবী যদিও এর গুরুত্ব বুঝতে অক্ষম। কিন্তু কোনো একদিন সে অবশ্যই বুঝবে। সত্য অচিরেই তার প্রভাব ও ক্ষমতা দেখাবে। কোনো একদিন সত্যের প্রভাব ও ক্ষমতা মানুষ উপলব্ধি করবেই। ইসলামের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই হয়েছে। সূচনালগ্নে যারা

ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল, পরবর্তী সময়ে তারাও ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়েছিল। দিনরাতের আগমন-নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামও তার শিক্ষা, সুমহান আদর্শ ও সর্বজনীনতার কারণে দিগ্‌বিদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। আর আজও তার অনুগতদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আদমশুমারিই এর চাক্ষুষ প্রমাণ।

ইয়াসরিবে ইসলামের প্রথম যাত্রা

আউস ও খাজরাজের সেই প্রসিদ্ধ যুদ্ধে আপন মায়ের সন্তানরা একে অন্যের রক্ত নিয়ে হোলি খেলায় মেতে উঠেছিল। যে যুদ্ধে কুরাইশদের সহযোগিতার আশায় আনাস ইবনে রাফে-এর নেতৃত্বে বনু আবদুল আশহাল গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মক্কায় এসেছিল। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ইতিহাসে এই যুদ্ধটি বুআস-এর যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ।

এখন যুদ্ধ শেষ। হজের মৌসুম এসে গেছে। দূর ও নিকটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাইতুল্লাহর মুসাফিররা কাবা প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হতে শুরু করেছে। ধৈর্য ও সাহসিকতার সেই মহান মূর্তপ্রতীক, যিনি পৃথিবীর বুকে একত্ববাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল ছিলেন। হজের মৌসুমে ইসলামের প্রচার-প্রসারের এমন সুবর্ণ সুযোগ দেখেও কীভাবে তিনি নীরবে বসে থাকেন? সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে তিনি হকের দাওয়াত পৌঁছে দিতে লাগলেন। দিনের বেলায় কুখ্যাত আবু জাহল তার চরম নির্বুদ্ধিতার কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজকে নিস্তব্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টায় সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করছিল। তাই নবীজি ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে রাতের আঁধারকেই উপযুক্ত সময় মনে করলেন। রাতের ঘোর আঁধারে তিনি চুপিচুপি নিজের ঘর থেকে বের হতেন এবং জাহেলিয়াতের অমাবশ্যার আঁধারে বসবাস করা মানুষগুলোর হৃদয়কে নিজের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার চেষ্টা করতেন।

এক রাতের ঘটনা। দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করতে করতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে তিন-চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত আকাবা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি সেখানে কিছু লোককে পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন অবস্থায় দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের কাছে গিয়ে বিশুদ্ধ ভাষা ও সম্মোহনী বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের অন্তরে ইসলামের সততার শিক্ষা গেঁথে দিতে লাগলেন। যার ফলে তারা সবাই সেখানেই মুসলিম হয়ে যায়। সেই ছয়জন সৌভাগ্যবানের নাম হলো, ১. আবু উমামা আসআদ

ইবনে জারারাহ রা., যে নাজ্জার গোত্রের অধিবাসী এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয় ছিলেন। ২. রাফে ইবনে মালিক রা., যার কাছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেইসময় পর্যন্ত কুরআনের যতগুলো আয়াত নাজিল হয়েছিল লিখিত অবস্থায় দিয়েছিলেন। ৩. আউফ ইবনে হারেস রা.। ৪. কুতবা ইবনে আমের রা.। ৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.। ৬. উকবাহ ইবনে আমের রা.।

ইসলাম গ্রহণ করে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই বিষয়ে পুরোপুরি আশ্বস্ত করলেন যে, ইনশাআল্লাহ! আমরা মদিনায় গিয়ে মানুষের আঁধারে ছাওয়া হৃদয়গুলোকে ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।

পরবর্তী সময়ে সংঘটিত ঘটনাগুলোও এই কথা খুব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে যে, সত্যবাদী এই মহান মানুষগুলো নিজেদের অঙ্গীকার পূরণে অবিরাম প্রচেষ্টা করেছিলেন। যাদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় মদিনার অলিগলিতে ইসলামের চর্চা শুরু হয়।

আকাবার[৭২] প্রথম বাইয়াত

মদিনা ছিল সেই সৌভাগ্যবান শহর, অদূর ভবিষ্যতে যার প্রতিটি বালুকণা ইসলামের চিরস্থায়ী নুরের জ্যোতির্ময়তায় পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় জ্বলজ্বল করবে। ইসলাম মদিনায় এক বছর অতিবাহিত করল। এই এক বছরে মদিনায় ইসলামের সফলতা বা ব্যর্থতা বিষয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুই জানতে পারেননি। সেই ছয়জন পুণ্যাত্মার প্রচেষ্টার ফলাফল জানতে তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। মদিনা থেকে কোনো খবর আসার অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে পরবর্তী হজের মৌসুম এসে গেল। তিনি নিজের চিরায়ত নিয়মে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাতে যখন চুপিচুপি দ্বীনের দাওয়াত দিতে বের হতেন, তখন তাঁর ব্যাকুল দুচোখ বারবার সেই মানুষগুলোকে খুঁজে ফিরত।

অবশেষে এক রাতে আবারও তিনি তাদেরকে আকাবা নামক স্থানে বসে থাকতে দেখলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে তারা

---

[৭২] আকাবা : আরবিতে সংকীর্ণ গিরিপথকে 'আকাবা' বলা হয়। মক্কা থেকে মিনায় গমনের পথে মিনার ময়দানের পশ্চিমে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ 'আকাবা' নামে খ্যাত ছিল। উল্লেখ্য, হজের সময় মিনায় যে তিনটি স্তম্ভকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তার প্রথমটি অর্থাৎ জামারায়ে আকাবা এই গিরিপথটির প্রান্তেই অবস্থিত।-সম্পাদক

আনন্দের আতিশয্যে দৌড়ে তাঁর কাছে ছুটে এলেন। কুশল বিনিময়ের পর তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মদিনার গত এক বছরের দাওয়াতি কাজের ফলাফল শোনালেন। এই এক বছরেই মদিনার প্রতিটি দেয়াল-দালানে, ইট-পাথরে, ইঞ্চি ইঞ্চি ভূমিতে ইসলামের ফুটন্ত গোলাপের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বছর তাদের সঙ্গে অন্য সাতজন লোকও মদিনা থেকে এসেছিলেন। তীব্র পিপাসার্ত হয়ে যারা সুদূর মদিনা থেকে ছুটে এসেছেন হেদায়েতের ঝরনা থেকে পিপাসা নিবারণ করতে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকেও ইসলামে দীক্ষিত করে বাইয়াত নিলেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে সক্রিয় হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করলেন। তারা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আবেদন করলেন, নবীজি, আপনি আমাদের সঙ্গে আপনার বিশ্বস্ত কোনো মুবাল্লিগকে পাঠিয়ে দিন, যে মদিনার দিগ্‌ভ্রান্ত লোকদেরকে সরল-সঠিক পথের দিশা দেবেন। আমাদের শহরে আপনার ন্যায়-ইনসাফ ও সততার শিক্ষা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। খুব শীঘ্রই আপনি সত্যান্বেষী একটি বিজয়ী দলকে আপনার পতাকাতলে সমবেত হতে দেখবেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-কে জরুরি দিক-নির্দেশনা দিয়ে তাদের সঙ্গে মদিনায় প্রেরণ করলেন।

মদিনায় ইসলামের সুমহান বিজয়

আকাবার প্রথম বাইয়াত ইসলামের প্রচার-প্রসারের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। বলা যায় এখান থেকেই ইসলামের প্রচার-প্রসারের মূল অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। ইসলামের প্রচার-প্রসার নামে যদি কোনো গ্রন্থ রচনা করা হয়, তাহলে তার সূচনা হবে বাইয়াতে আকাবা দিয়ে। আর মদিনার কিছু সৌভাগ্যবান মানুষের ইসলামগ্রহণ হবে সে গ্রন্থের বর্ণিল শিরোনাম।

মুসআব ইবনে উমায়ের রা. মদিনায় পৌঁছে সাইদ ইবনে জারারাহ রা.-এর ঘরে অবস্থান করলেন। এই ঘরটিকেই তিনি ইসলামের প্রচারকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করলেন। অজ্ঞতার ও আঁধারে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরপাক খাওয়া মানুষেরা ইসলামের সুমহান জ্যোতির্ময় শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে প্রতিদিন দলে দলে সেখানে ভিড় করতে শুরু করলেন। অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানেই মদিনার অসংখ্য ঘর হতে আল্লাহু আকবার-এর ধ্বনি ভেসে আসতে শুরু করল। আউস-খাজরাজের প্রায় প্রতিটি শিশুই মুসলিম হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন। পবিত্র মক্কা তো ছিল মূর্তির আখড়া। সেখানকার

মানুষের কাছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন ছিল হুমকির মুখে। মক্কার কাফেররা ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানের দুশমন। অন্যদিকে মদিনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইসলাম খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। সেখানকার মানুষগুলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জ্যোতির্ময় চেহারা দেখার আশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলেন।

পরবর্তী হজের মৌসুমে মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর নেতৃত্বে মদিনা থেকে বেশ কিছু নারী-পুরুষের একটি কাফেলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করল। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের মণিকোঠায় এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েও এলো যে, তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিনীত নিবেদন করবেন, যেন তিনি মক্কার কাফেরদের জুলুম-নিপীড়ন থেকে বের হয়ে মদিনায় হিজরত করে সেখানকার জমিনকে বরকতময় ও সৌভাগ্যবান করেন।

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কাফেলার আগমনের সংবাদ জানতে পারলেন। তাই রাতের আঁধার যখন তার কালো চাদরে পুরো পৃথিবীকে আবৃত করে নিলো, তখন তিনি সন্তর্পণে ঘর থেকে বের হয়ে তাঁর দর্শনপ্রত্যাশীদের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে আব্বাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। যদিও তার হৃদয় তখনও ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়নি, কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলির আকর্ষণে তাঁর দাওয়াতের প্রতিও আব্বাসের সহমর্মিতা ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও সঙ্গে নিয়ে নিলেন। হাঁটতে হাঁটতে নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। মক্কা থেকে প্রায় তিন-চার মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করার পর তাঁরা আকাবা নামক স্থানে এসে পৌছলেন। যেখানে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীরা অধীর আগ্রহে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন অমুসলিমও ছিলেন, যারা মুসলিম না হলেও ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামের নবীকে ভালোবাসতেন। মক্কার মুশরিকরা তখনও এই ধরনের মজলিশ সম্পর্কে অবগত হয়নি।

রাসুল এবং রাসুলপ্রেমিকদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ পারস্পরিক একান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। মদিনার লোকেরা তাদের হৃদয়ের সব আবেগকে একত্র করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করলেন। আব্বাস যখন জানতে পারলেন যে, মদিনার মুসলিমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের শহরে নিয়ে যেতে চাইছে, তখন তিনি তাদের সামনে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত একটি ভাষণ দিলেন। যেখানে তিনি এই বিষয়টি খুব জোরালোভাবে উপস্থাপন করলেন যে, যদি তারা সত্যিই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র কদমের ছোঁয়ায় নিজেদের শহরের প্রতিটি ধূলিকণাকে আলো-ঝলমল করতে চায়, মায়াবী চাঁদনি রাতে আকাশের ওই ঝলমলে চাঁদ-তারাদের সৌন্দর্যকেও যদি নিজেদের ভূমির ধূলিকণার সৌন্দর্যের কাছে ম্লান করতে চায়, তাহলে তারা যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুরক্ষায় নিজেদের শরীরের শেষ রক্তফোঁটা ঝরাতেও প্রস্তুত থাকে। এখানে মক্কায় তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পরিবারবর্গের সঙ্গে বসবাস করছেন। বিপদের সময় তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে হলেও তাকে রক্ষা করবে। কিন্তু মদিনায় তো তিনি এমন লোকদের কাছে যাবেন, যাদের সঙ্গে তাঁর রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা যদি নিজেদের এই বিশ্বাস ও ভালোবাসার সম্পর্ককে রক্তের সম্পর্কের ন্যায় সুদৃঢ় করতে পারো এবং তাঁর সুরক্ষায় প্রয়োজনে শত্রুর তরবারির নিচে মাথা পেতে দিতেও প্রস্তুত থাকো, তাহলে সানন্দে তাকে নিজেদের শহরে নিয়ে যাও। অন্যথা তোমাদের জন্য এটাই ভালো হবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাওয়ার আশা মন থেকে মুছে দাও।

আব্বাসের বক্তব্য শুনে বারা ইবনে মারুর রা. বলেন, আমরা তো আপনার বক্তব্য শুনেছি। এখন এই ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকেও কিছু শুনতে চাই।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আবেদন মঞ্জুর করে সবার সামনে নিজের মহামূল্যবান কথাগুলো এমন সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করলেন যে, যেন ইসলামের গূঢ়তত্ত্ব ও জ্ঞানের দরিয়ায় জোয়ার উঠতে শুরু করল। উপস্থিত সকল পিপাসার্তকে তিনি সেই হেদায়েতের সমুদ্র হতে পরিতৃপ্ত করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বক্তব্যে এই বিষয়েও বিস্তারিত আলোকপাত করলেন যে, তারা তাকে মদিনায় নিয়ে গেলে কী কী সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হবেন এবং কোন কোন দায়িত্বের ভার তাদেরকে বহন করতে হবে।

বারা ইবনে মারুর রা. পুরো বক্তব্য শোনার পর বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা সব সংকট মোকাবিলায় প্রস্তুত আছি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনে নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করে

দেবো। আপনার মুবারক চেহারা দর্শনের স্বাদ অর্জনের জন্য আমরা তো দুনিয়ায় সব স্বাদ-আহ্লাদও বিসর্জন দিতে পারি।

বারা ইবনে মারুর রা. নিজের বক্তব্য শেষ করার আগেই আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাদের সঙ্গে এই মর্মে ওয়াদা করুন যে, কখনো আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবেন না। জবাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এমনটি কখনো হবে না। আমার জীবনমরণ এখন তোমাদের সঙ্গে। তোমরা যতদিন ইসলামের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হবে না, ততদিন আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না।

অতঃপর সবাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত হলেন। ইতিহাসে এটা বাইয়াতে আকাবায়ে সানি বা আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত নামে প্রসিদ্ধ। বাইয়াতপর্ব সম্পন্ন হলে আসআদ ইবনে জারারাহ রা. সবাইকে লক্ষ করে বললেন, হে মদিনাবাসী, মনে রেখো, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাইয়াত। তোমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আজ আমরা এখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে বাইয়াত হওয়ার মাধ্যমে পুরো আরবজাতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। তার জবাবে উপস্থিত লোকেরা সমস্বরে বলে উঠলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য পুরো আরবজাতি কেন, পুরো পৃথিবীর বিরুদ্ধেও যদি আমাদের নাঙ্গা তরবারি হাতে নিতে হয়, তাহলেও আমরা ভীত হব না। এই ওয়াদা ও স্বীকারোক্তির পরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্য হতে ১২ জন সম্মানিত ব্যক্তিকে নির্বাচন করে মদিনার ইসলামের তাবলিগের জিম্মাদারি তাদের হাতে অর্পণ করলেন। সেই মহৎপ্রাণ লোকদের নাম হলো, ১. রাফে ইবনে মালেক রা. ২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. ৩. সাদ ইবনে উবাদা রা. ৪. সাদ ইবনে রাবি রা. ৫. আসআদ ইবনে হুসাইর রা. ৬. বারা ইবনে মারুর রা. ৭. আসআদ ইবনে জারারাহ রা. ৮. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. ৯. উবাদা ইবনে সামিত রা. ১০. আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান রা. ১১. মুনজির ইবনে আমর রা. ১২. সাদ ইবনে হাইসামা রা.।[৭৩]

---

৭৩. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩১৮-৩২২; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/১৮৯-১৯০

সভার গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেল

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ১২ জন দায়িত্বশীলকে ইসলামের তাবলিগসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। এমন সময় পাহাড়ের চূড়া থেকে একজন কাফের উচ্চ আওয়াজে কুরাইশদেরকে ডেকে বলতে লাগল, কে কোথায় আছ? দেখে যাও, দেখে যাও। এখানে মুহাম্মাদ তাঁর বন্ধুবান্ধব ও কিছু অপরিচিত লোকের সঙ্গে বসে বসে তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল পাকাচ্ছে।

তার এমন চিৎকার-চ্যাঁচামেচিসত্ত্বেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নির্ভীক। কারণ, তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, এখন গভীর রাত। সবাই সুখনিদ্রায় বিভোর। এত তাড়াতাড়ি কেউ হাঙ্গামা বা হট্টগোল বাধাতে এখানে আসবে না। তাই তিনি বেশ প্রশান্ত ও ধীরস্থিরভাবেই নিজের কাজে ব্যস্ত রইলেন। যখন সব কার্য সম্পাদন হলো, তখন দু-একজন করে করে সবাই সঙ্গোপনে সেখান থেকে উঠে যার যার গন্তব্যে চলে গেলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও চাচা আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কুটিরে ফিরে এলেন।

মুশরিকদের দৌড়ঝাঁপ

সকাল হওয়ামাত্রই মক্কার মুশরিকরা এই গোপন বৈঠক সম্পর্কে অবগত হলো। গভীর রাতে তারা যখন ঘুমিয়ে, মুহাম্মাদ তখন তাঁর লোকদেরকে নিয়ে গোপনে বৈঠক করে, এমন সংবাদ শুনেই তারা অস্থির হয়ে উঠল। দ্রুত তাদের কয়েকজন বড় বড় সর্দার মদিনাবাসীদের তাঁবুতে গিয়ে মূল ঘটনা জানতে চাইল। যেহেতু মদিনার লোকেরাও এই গোপন বৈঠক সম্পর্কে অবগত ছিল না, তাই তারাও কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারল না। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল নামে মদিনার একজন প্রভাবশালী নেতা ছিল। যে পরবর্তী সময়ে মুনাফেকদের সর্দার হয়েছিল। সে মক্কার কুরাইশদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, তোমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো যে, মদিনার লোকেরা মুহাম্মাদের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি। কারণ, তারা কোনো কাজ করবে আর আমি তা সম্পর্কে কিছুই জানব না এটা অসম্ভব। তার কথায় মুশরিকদের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যার যার কাজে ফিরে গেল। হতভাগা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তো নিজেই অন্ধকারে ছিল। রাতের গোপন মজলিশ ও চুক্তিনামা সম্পর্কে সে নিজেও কিছু জানত না।

সাদ ইবনে উবাদার ওপর নির্যাতন

কুরাইশরা চলে যাওয়ার পর মদিনার লোকেরাও তাদের কাফেলা নিয়ে আপন মাতৃভূমির উদ্দেশে রওয়ানা হলো। তারা চলে যাওয়ার পরে কুরাইশরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারল যে, সে রাতের গোপন বৈঠকের কথা কোনো গুজব নয়, বরং সত্যিই সে রাতে এ রকম কিছু হয়েছিল। প্রতারণার অভিযোগে মদিনাবাসীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য তারা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছুটে এলো। কিন্তু এসে দেখে মদিনার কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। শুধু মুনজির ইবনে আমর ও সাদ ইবনে উবাদা রা. কোনো প্রয়োজনে রয়ে গিয়েছিলেন। কুরাইশদেরকে দেখেই মুনজির সটকে পড়লেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাদ ইবনে উবাদা রা. এই হিংস্র পশুদের হাতে বন্দি হয়ে গেলেন। ব্যস, শুরু হলো কিল-থাপ্পড় আর চড়-ঘুসি। মারতে মারতে তারা সাদ রা.-কে শহরে নিয়ে এলো। এই জালেমদের হাতে তার শহিদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই প্রবল ছিল। কিন্তু মক্কার দুজন সম্মানিত ব্যক্তি জুবায়ের ইবনে মুতয়িম ও হারেস ইবনে উমাইয়া সেখানে এসে পৌঁছলেন। তারা সাদ ইবনে উবাদাকে খুব ভালোভাবেই চিনতেন। রক্তাক্ত সাদকে দেখে তারা শিউরে উঠলেন। কুরাইশদেরকে লক্ষ করে বললেন, এই লোকটি আমাদের ওপর অনেক অনুগ্রহ করেছে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে আমরা মদিনায় গেলে তার বাড়িতেই অবস্থান করি। তোমরা তার ওপর এমন জুলুম-নির্যাতন করছ কেন? অনেক হয়েছে, এবার বন্ধ করো। এসব বলে-কয়ে খুব কষ্ট করে তারা সাদ রা.-কে কাফেরদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করলেন। সাদ ইবনে উবাদা রা. মুক্তি পেয়েই মদিনার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।[৭৪]

হিজরতের কথা নবীজি কখন জানলেন?

উপরিউক্ত ঘটনাগুলো পড়ার পর কারও কারও এমন কথা বলার সম্ভাবনা রয়েছে যে, যেহেতু আগেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাহলে পরে আবার হিজরতের সময় মদিনার হিজরত করার আদেশসংবলিত ওহি নাজিল হওয়ার কারণ কী? উত্তর হলো, মূলত মদিনায় হিজরত করার বিষয়ে বাইয়াতে আকাবায়ে সানি-এর অনেক আগেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবগত

---

৭৪. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩২৬; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/১৯৫; *জাদুল মাআদ*, ৩/৫১

হয়েছিলেন। এমনকি স্বপ্নে তাকে সেই স্থানও দেখানো হয়েছিল, যেখানে তিনি হিজরত করবেন। এই সমস্ত ঘটনার পেছনে মূলত মানুষের চোখের আড়ালে অদৃশ্য এক শক্তি কাজ করছিল। যেমন আমার বিশ্বাস হলো দুনিয়ার ছোট-বড় যেকোনো ঘটনার আড়ালেই একটি অদৃশ্য শক্তি কাজ করে। পৃথিবীর ছোট-বড় প্রতিটি কাজই একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ পায়। যেহেতু সবকিছু নিয়ন্ত্রণের মালিক মহান আল্লাহর কর্মকাণ্ড মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে, তাই মানুষ নিজ সব কাজকর্মকেই নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শ্রমের ফলাফল মনে করে। সে ভাবে, আমার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের কারণেই এই কাজটি সংঘটিত হয়েছে।

বাস্তবতা হলো, মানুষ নিজের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ঠিক তখনই করতে পারে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও রহমত যখন তার অনুগামী হয়। এটা আল্লাহর নিজস্ব চাওয়া ছিল যে, তিনি তাঁর একজন সম্মানিত বান্দাকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বেই অবগত করে দেবেন। পরবর্তী সময়ে যেটা প্রকাশ পাবে। হিজরতের কথা যদিও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্বেই জানানো হয়েছিল। কিন্তু তার নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। পরে যখন হিজরতের আদেশসংবলিত ওহি নাজিল হলো, তখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এখন সময় হয়েছে বেরিয়ে পড়ার। তাই তিনি আগেই নিজের অনুসারীদেরকে হিজরতের আদেশ দিয়ে দিলেন এবং নিজের ব্যাপারে যখন হুকুম এলো, তখন তিনিও প্রিয় বন্ধু আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মদিনার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।

মদিনায় হিজরতের সাধারণ অনুমতি

একদিকে আকাবায়ে সানি-এর প্রশস্ত দরজা দিয়ে ঢুকে মুসলিমরা যেমন ইসলামের তাবলিগের এক বিস্তৃত ও সুরক্ষিত ভূমি দেখতে পেল, অন্যদিকে ইসলামের এমন অভূতপূর্ব বিজয় দেখে মুশরিকদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ক্রমশ বেড়ে চলা দ্বীনে মুহাম্মাদির উন্নতি যেন তাদের হিংসা ও ক্রোধের আগুনে তেল ঢেলে দিলো। সত্য গ্রহণ করার অপরাধে মুসলিমদের ওপরে তাদের জুলুম-নিপীড়নের তীব্রতা আরও বেড়ে গেল। দিন দিন বেড়ে চলা তাদের এমন জুলুমের তুফান দেখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে মদিনার নিরাপদ ভূমি ও অনুকূল পরিবেশে হিজরত করার আদেশ দিলেন। যেখানকার ভোরের বাতাসে তিনি সত্য প্রেম ও বিশ্বস্ত চেতনার সুঘ্রাণ পাচ্ছিলেন।

কাফেরদের বাধাপ্রদান

মক্কার কাফেররা হিজরতকারী মুসলিমদের পথে পথে বাধা দিতে চেষ্টা করল। কাউকে বন্দি করে রাখল। কারও ধনসম্পদ কেড়ে নিলো। আবার কারও স্ত্রী-সন্তানদের আটকে রেখে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাকে একাকী হিজরত করতে বাধ্য করল।

এ রকম একটি ঘটনা শুনুন। আবু সালামা রা. যখন হিজরত করে মদিনায় যাচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজের জীবনসঙ্গিনী ও তাদের ভালোবাসার ফল ছোট্ট শিশুসন্তান সালামা রা.-কে উটের পিঠে আরোহণ করালেন। এমন সময় উম্মে সালামা রা.-এর গোত্রের কিছু লোক এসে তাকে সিদ্ধান্তের সুরে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলো যে, তোমার যদি ইচ্ছা হয় তুমি চলে যাও। কিন্তু আমরা আমাদের মেয়েকে কোনোভাবেই ভিনদেশে যেতে দেবো না।

তর্কাতর্কির একপর্যায়ে আবু সালামার গোত্রের লোকেরাও এসে উপস্থিত হলো। তারাও আবু সালামাকে লক্ষ করে নিজেদের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলো, তোমার দুচোখ যেদিকে চায় যেতে পারো, কিন্তু তোমার ছেলে হলো আমাদের গোত্রের সম্পদ। আমরা তাকে যেতে দেবো না।

বনু আবদুল আসাদ শিশুপুত্র সালামাকে আর বনু মুগিরা উম্মে সালামাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল। অবশেষে বাধ্য হয়ে আবু সালামা রা. স্ত্রী-সন্তান ছাড়া একাই মদিনায় হিজরত করলেন।

সুহাইব রুমি রা. যখন হিজরত করছিলেন, তখন কাফেররা তার হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রার সম্পদ ও আসবাবসামগ্রী ছিনিয়ে নিলো। যে কারণে একেবারে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় তিনি হিজরত করেন। হিশাম ইবনে আস রা. যখন মক্কার জুলুম-নির্যাতনের পরিবেশ ছেড়ে মদিনার পথে হিজরত করছিলেন, তখন কাফেররা তাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করে কয়েদখানায় বন্দি করে রাখল।

মোটকথা, এভাবেই চরম উৎপীড়ন ও বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা দু-একজন করে করে হকের ভালোবাসায় নিজেদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদের মায়া ত্যাগ করে মদিনায় চলে গেলেন। এখন মক্কায় শুধু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর প্রিয় বন্ধু আবু বকর রা. ও আলি রা. উপস্থিত আছেন। কয়েকজন অক্ষম, অসুস্থ ও দুর্বল মুসলিমও ছিলেন। যারা কোনোভাবেই হিজরত করতে পারতেন না। তাই বাধ্য হয়ে তারা মক্কাতেই রয়ে গেলেন।

কিছু কথা

চরম প্রতিকূল পরিবেশ ও জুলুমের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সবুজ-শ্যামল ভূমিতে মৌমাছির ন্যায় ছুটে যেতে আগ্রহী মুসলিমরা কাফেরদের বাধাসত্ত্বেও হিজরত করতে সফল হওয়াটা কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না। কাফেরদের চোখে এটা এমন কোনো সাধারণ অপরাধ ছিল না যে, মক্কার মূর্তিপূজারিরা এমনি এমনিই তাদের ছেড়ে দেবে; বরং তাদের হৃদয়ে ক্রোধ ও ঘৃণার লেলিহান অগ্নিশিখা দাউদাউ করে জ্বলছিল। তারা চাইছিল ইসলামের সফলতা ও উন্নতির সবুজ-সতেজ ভূমিতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে। যেন তাদের ক্রোধের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু...ইসলাম এক বিদ্যুৎঝলকের নাম, যে নিজেই নিজের জ্যোতি দিয়ে কুফর-শিরকের খড়কুটাকে জ্বালিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। বাস্তব অবস্থা যখন এমনই ছিল তাহলে কীভাবে সম্ভব যে, আগুন আগুনকে ভস্ম করে দেবে? বিদ্যুৎকে বিদ্যুৎ গ্রাস করে নেবে? তা ছাড়া অবস্থাটাও ছিল এমন যে, একদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অন্যদিকে সত্যের অগ্নিশিখা। একদিকে কুফরের অগ্নিকাণ্ড, অন্যদিকে ঈমানের বিজলিচমক। বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরও কাফেররা শিক্ষা নেয়নি যে, ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আমাদের উদ্ভাবিত সব কৌশল ও চেষ্টা-প্রচেষ্টাই ইসলামের বাগানে আরও নতুন সজীবতা এনে দিয়েছে। ওই ওপরওয়ালা জানেন, সেই বাগানের সতেজতায় কত বৃক্ষ ফলদার হয়েছে, ফুলে-ফলে চারদিক কতটা সুবাসিত হয়েছে। ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির কাহিনি, সফলতা ও কামিয়াবির গল্প কাফের-মুশরিকদের জুলুম-নিপীড়ন ও রক্তপাতের গল্প দিয়েই লেখা হয়েছে। তাদের সব অপচেষ্টাই তাদের কুফর ও শিরকের পায়ে শক্ত বেড়ি পরিয়ে দিয়েছিল। যা ধীরে ধীরে তাদের পুরোপুরি আবদ্ধ করে ফেলেছিল। দ্বীনে মুহাম্মাদির ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিকে প্রতিহত করার পরিবর্তে তারা নিজেরাই হকের আওয়াজের প্রতিধ্বনি হয়ে গেল।

মিথ্যার পূজারিদের চুল্লিতে প্রস্তুতিকৃত প্রতিটি ইটই ইসলামের প্রাসাদ নির্মাণে স্থায়ী ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছিল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ কাফেরদের প্রতিটি ধ্বংসযজ্ঞই ইসলামের প্রচার-প্রসারে একটি জাঁকজমকপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। তারা যে ফুলকলিকে পা দিয়ে পিষে ফেলতে চেয়েছিল, তা এমন এক সুরভিত ফুল হয়ে ফুটেছিল, যার প্রতিটি পাপড়ির সৌন্দর্য, সুবাস, সতেজতা ও স্নিগ্ধতায় আশেক ভোমরের দল পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্ত হতে ছুটে এসেছিল তার কাননে।

ইসলামি ইতিহাসের দুটি রক্তাক্ত পৃষ্ঠা

ইসলামি ইতিহাসের এমন দুটি রক্তাক্ত পৃষ্ঠা রয়েছে, যেখানে সেসব সৌভাগ্যবান মহাপুরুষের অকাতরে রক্ত বিলিয়ে দেওয়ার কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে, যারা পৃথিবীর সব সুখ-শান্তিকে পেছনে ফেলে মানবতার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণের লক্ষ্যে শরীরের শেষ বিন্দু রক্ত বিসর্জন দিতেও এতটুকু দ্বিধা করেনি। এক মহাসত্য ও বাস্তবতা হলো, তাদের সেই ফোঁটা ফোঁটা রক্তই একদিন বিশাল সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। যার উত্তাল তরঙ্গে তাদের কট্টর বিরোধীদের কঠিন থেকে কঠিনতর বিরোধিতাও খড়কুটার ন্যায় ভেসে গেছে। অজ্ঞতার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা বিশাল বাহিনীও তাদের সুখ্যাতি ও সমুজ্জ্বল কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করতে পারেনি। এমন অসাধারণ সফলতা ও বিজয়ের কারণ শুধু একটিই ছিল। আর তা হলো, ন্যায় ও সততার পেছনে সবসময় অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহান প্রভুর সাহায্য ও আত্মিক শক্তি কাজ করে। যারাই আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার পতাকা নিজেদের হাতে তুলে নেবে, অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা কোনো অদৃশ্য সাহায্যকারীর হাত দেখতে পায়। যে হাতের শক্ত থাবায় দুনিয়ার বড় বড় ক্ষমতাশালী ও কঠিন থেকে কঠিনতর শক্তিগুলোও নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায়।

কাফেরদের বুকে মুসলিমদের হিজরতের তির

মক্কায় কাফেররা যখন দেখল তাদের চরম বিরোধিতা ও বাধা-প্রতিবন্ধকতাসত্ত্বেও মুসলিমরা মদিনায় হিজরত করে চলে গেছে, এমনকি তাদের নবীও এই জুলুমের অক্টোপাস হতে নিজেকে মুক্ত করতে হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তাদের রাগ ও ক্রোধের কোনো সীমা রইল না। তারা চিন্তা করল, এখন তো মুসলিমরা আমাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে, আমাদের নেতৃত্বাধীন এলাকা থেকে হিজরত করে নিরাপদ ভূমিতে ঘর বেঁধেছে। যদি তাদের মতো তাদের নবীও হিজরত করে অন্যত্র চলে যান, তাহলে তো নিঃসন্দেহে আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্ম এই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাবে। শুধু তাই নয়, বরং আমাদের জানমালও হুমকির মুখে পড়বে। কারণ, প্রবল আশঙ্কা রয়েছে যে, তারা মদিনার লোকদেরকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে তাদের সহযোগিতায় আমাদের ওপর আক্রমণ করবে এবং আমাদের জুলুম-নিপীড়নের প্রতিশোধ নেবে। সেই মানুষগুলো যদি কখনো প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে মক্কায় হামলা করে তাহলে তাদের কী

অবস্থা হবে, এই ভেবেই সবাই ভীষণ শঙ্কিত হয়ে পড়ল। অনাগত সেই বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য তারা একটি জরুরি পরামর্শসভার আয়োজন করল।

দারুন নদওয়ায় কাফেরদের পরামর্শসভা

দারুন নদওয়ায় মক্কার সমস্ত প্রসিদ্ধ গোত্রের সর্দাররা উপস্থিত হলো। ইসলামবিরোধী এই সর্দারদের নামের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। তাই বিষয়টি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনার উদ্দেশ্যে তাদের নাম উল্লেখ করলাম না। তবে এতটুকু বলে দেওয়া দরকার যে, সেই পরামর্শসভায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোত্র বনু হাশেমের কোনো সর্দার অংশগ্রহণ করেননি। কারণ, এই পরামর্শসভার উদ্দেশ্যই ছিল প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ভয়ংকর পরিকল্পনা করা। এই পরামর্শসভার প্রধান ছিল অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বয়োবৃদ্ধ একজন মানুষ। এই কথা তো সুস্পষ্ট যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্তিত্বই ছিল তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্ম মিটে যাওয়ার আশঙ্কার মূল কারণ। তা ছাড়া মজলুম মুসলিম কর্তৃক জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়ার সেই ভয়েরও মূল কারণ ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পরামর্শসভার সবার সামনে এখন এই বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল যে, কীভাবে পর্বতসম দৃঢ়তার অধিকারী এই মানুষটিকে মূর্তিপূজার বিরোধিতা ও একত্ববাদের দাওয়াত থেকে বিরত রাখা যায়। যে বিস্ময়কর মানুষটি বিশ্বমানবতাকে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার সুখ দিতে এসেছিলেন, একজন প্রস্তাব দিলো, তাঁকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে কোনো গোপন কুঠুরিতে বন্দি করে রাখা হোক। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সার্বক্ষণিক সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করা হোক। যাতে করে কোনো ধরনের খাবার-পানি তাঁর কাছে না পৌঁছে আর এভাবেই একদিন সে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবে এবং আমাদের সমস্যারও স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে।

কিন্তু পরামর্শসভার প্রধান সেই নিকৃষ্ট বৃদ্ধ লোকটি তাকে ধমক দিয়ে বলল, মূর্খ! তোমার কি মনে হয় যাদের প্রহরায় রাখা হবে, তারা এই জাদুকরের হাত থেকে বাঁচতে পারবে? তা ছাড়া এটারও কি নিশ্চয়তা রয়েছে যে, তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে মুক্ত করতে চেষ্টা করবে না এবং শহরে কোনো গোলযোগ সৃষ্টি হবে না?

একজন বলল, এত ঝামেলার কী দরকার? তাকে শহর থেকে বের করে দাও। ব্যস! তোমরা তখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। কারণ, এতে করে বাঁশও থাকবে না বাঁশিও বাজবে না।

নিকৃষ্ট বৃদ্ধ লোকটি এই মতদাতার অনভিজ্ঞতার ওপরও আফসোস করতে করতে বলল, আচ্ছা, তাই নাকি? তোমার তো দেখি বেশ ভালোই বুঝ-বুদ্ধি হয়েছে। তোমার কথামতো আমরা মুহাম্মাদকে শহর থেকে বের করে দিই, যাতে সে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে আমাদের বিরুদ্ধে উসকে দিতে পারে। তা ছাড়া যদি তাকে শহর থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্তই হয়, তাহলে তো আমাদের কিছুই করতে হবে না। সে তো নিজেই শহর ছাড়ার পরিকল্পনা করছে।'

বেশ কিছুক্ষণ এভাবেই একেকজন একেক প্রস্তাব দিচ্ছিল আর নিকৃষ্ট বৃদ্ধ সেসব নিজের বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে খণ্ডন করছিল। অবশেষে ইসলামের চিরন্তন দুশমন আবু জাহল এমন এক ভয়ংকর প্রস্তাব দিলো যে, তা শুনে রক্তে লালায়িত হিংস্র পশুরা রক্তের নেশায় লাফিয়ে উঠল। আবু জাহলের বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করে তাকে আবুল হিকাম উপাধিতে ডাকতে লাগল। তার প্রস্তাব ছিল, প্রত্যেক গোত্র থেকেই একজন সাহসী বীর যোদ্ধা নির্বাচন করা হবে। তারা সবাই একত্র হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রক্তে নিজেদের নাপাক তরবারি রঞ্জিত করবে। এইভাবে তাকে হত্যা করলে এর দায়ভার সমস্ত গোত্রের ওপর বর্তাবে। আর বনু হাশেম সব গোত্র থেকে প্রতিশোধ নিতে পারবে না। এতে করে কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যার বিধান বাদ হয়ে দিয়ত বা রক্তপণ আদায় করতে হবে। আর সেটা আমরা সবাই মিলে আদায় করে দেবো।

সকল সর্দারের ঐকমত্যে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। কারা কারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্তে নিজেদের রক্তক্ষুধা নিবারণ করবে, তাদেরও নির্বাচন করা হলো। পরবর্তী রাতকে এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হলো।[৭৫]

* * *

[৭৫]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩৫০; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/২০৬; *জাদুল মাআদ*, ৩/৫২

তৃতীয় পর্ব

হিজরতের আদেশ

সকল বিষয়ে অবগত, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ তাঁর রাসুলকে কাফেরদের এমন ভয়ংকর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন, সেইসঙ্গে মদিনায় হিজরতেরও আদেশ দিয়ে দিলেন।

দুপুরের রোদের তীব্রতায় যখন সমস্ত মানুষ নিজেদের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিল, পথঘাট তখন নিশ্চুপ-নীরব। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। ঠিক এই সময়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধীরে ধীরে পা ফেলে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকরের ঘরে এসে পৌঁছলেন। এমন অসময়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এভাবে আগমনে আবু বকর রা. বুঝতে পারলেন যে, বোধ হয় হিজরতের আদেশ এসে গেছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রা.-এর ঘরে প্রবেশ করেই প্রথমে জানতে চাইলেন, এখানে অপরিচিত কেউ আছে? জবাবে আবু বকর জানালেন, আমার দুই কলিজার টুকরো মেয়ে আয়েশা ও আসমা ছাড়া কেউ নেই।

অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আবু বকর, হিজরতের আদেশ এসে গেছে। এ কথা শুনেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার সফরসঙ্গী কে হবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু বকর সিদ্দিক।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে নিজের নাম শুনে আবু বকর রা.-এর যেন খুশির সীমা রইল না। চোখে তার আনন্দাশ্রু ঝিলিক দিতে শুরু করল। অত্যন্ত আবেগজড়ানো কণ্ঠে তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আগে থেকেই সফরের জন্য দুটি উট প্রস্তুত করে রেখেছি। তার একটি আপনাকে হাদিয়া দিলাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বিনামূল্যে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না, বরং মূল্য নেওয়ার জন্য

এতটাই পীড়াপীড়ি করলেন যে, শেষে আবু বকর রা. উটের মূল্য নিতে বাধ্য হলেন।

তখন থেকেই হিজরতের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। প্রিয় বন্ধুর বাড়ি থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ বাড়িতে ফিরে গেলেন। আবু বকর রা. হিজরতের জন্য প্রস্তুত দুটি উটকে আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত নামক এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করলেন। আসমা বিনতে আবু বকর রা. জরুরি পাথেয় প্রস্তুত করতে শুরু করলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বজোড়া বিশ্বস্ততা

চরিত্রমাধুর্য ও প্রশংসনীয় গুণাবলির মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের অনুগত করে নিয়েছিলেন। মক্কার মুশরিকরা যদিও তাঁর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কঠোর বিরোধিতা করত। কিন্তু তাঁর বিরল সত্যবাদিতা ও নেককাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। তাঁর আমানতদারি এতটা প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাঁর প্রাণের দুশমন হয়েও কাফেররা তাঁর কাছে নিজেদের মহামূল্যবান সম্পদ, টাকাপয়সা ও স্বর্ণালংকার আমানত রাখত এবং নিজেদের সম্পদ সুরক্ষিত মনে করে নিশ্চিন্তে ঘুমাত।

হিজরতের পূর্বের এই সময়টিতেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনেক মানুষের আমানত গচ্ছিত ছিল। তিনি নিজের চাচাতো ভাই আলি ইবনে আবু তালেব রা.-কে আমানতের এই সম্পদসমূহ তাদের প্রকৃত মালিকের কাছে সুরক্ষিত অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে বলেন, আমানতগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে তবেই তুমি মদিনায় হিজরত করো।

সেদিনই যদি তিনি সবার আমানত ফিরিয়ে দিতেন এবং আলি রা.-কে সফরসঙ্গী করে মদিনায় হিজরত করতেন, তাহলে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে চলে যাওয়ার পরই আলি রা. তা মালিকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

বন্ধু যখন পাশে থাকে
শত্রু কীই-বা করতে পারে?

শত্রুরা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধ্যা হতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর নবুয়তের আলোয় আলোকিত কুটিরটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। নামাজ পড়ার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার অপেক্ষায় কাফেররা ঘাপটি মেরে বসে রইল। যখনই তিনি বের হবেন সঙ্গে সঙ্গেই ধারালো

তরবারি দিয়ে তাঁর কল্লা নামিয়ে ফেলবে। এই মিথ্যার পূজারিরা কী করে বুঝবে যে সততা ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বানকারী এই মহান পুণ্যাত্মার রক্ষাকারী স্বয়ং সর্বশক্তিমান? যার এক ইশারায় এই পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

রাত ক্রমশ গভীর হতে শুরু করল। মরুভূমির উঁচু পাহাড়ের নিস্তব্ধ কোনো গুহা থেকে কুকুরের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। মানুষজন ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে শুধু কয়েকজন রক্তপিপাসু হিংস্র পশু। এক মহান মানবের রক্তে লালায়িত হয়ে যারা তাঁর ঘরের পাশে ওত পেতে বসে আছে। এমন সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর আদেশে আলি রা.-কে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আপন চাদর দিয়ে তার শরীর ঢেকে দিলেন। অতঃপর সুরা ইয়াসিনের শুরুরদিকের কয়েকটি আয়াত পড়ে ঘর থেকে বের হলেন। মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে ওত পেতে থাকা প্রত্যেকেই এমনভাবে অচেতন হয়ে পড়ল যে, যেন কোনো বিষাক্ত সাপ তাদের দংশন করেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ধীর-শান্তভাবে নিরাপদে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে তাদের হৃদয়ের মতো চক্ষুগুলোও অন্ধ হয়ে গেল। যার কারণে তারা কিছুই দেখতে পেল না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রা.-এর বাড়িতে এসে হাজির হলেন। সেখানে তাঁর পথ চেয়ে ব্যাকুল হয়ে বসে ছিলেন আবু বকর রা.। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আসতে দেখেই তিনি খুশিতে উল্লসিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর দুই বন্ধু একে অন্যকে সঙ্গী করে মক্কার নিম্নাঞ্চলের দিকে চার মাইল অতিক্রম করার পরে একটি ঘুটঘুটে অন্ধকার গুহার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মানুষ এই গুহাটিকে 'সওর গুহা' নামে অভিহিত করত। পূর্ব থেকেই গুহাটি নির্ধারণ করা হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করলেন। আবু বকর রা. গুহার ভেতরে গিয়ে ভালোভাবে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলেন। অতঃপর শরীরের কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে সেই টুকরো কাপড় দিয়ে গুহার দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে যে গর্তগুলো দিয়ে আলো আসছিল সেগুলো বন্ধ করে দিলেন। বাইরের আলো নেই তাতে কী? তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের অত্যুজ্জ্বল আলো দ্বারা এই অন্ধকার গুহাকে আলোকিত করে রেখেছিলেন।[৭৬]

---

৭৬. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩৫২; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/২০৭; *জাদুল মাআদ*, ৩/৫৩-৫৯

দিশেহারা রক্তলোলুপ হিংস্র পশুরা

রক্তলোলুপ যে হিংস্র কাফেররা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের চারদিকে প্রহরারত ছিল, তারা বারবার ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল। যেহেতু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানায় আলি রা. চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন, সেহেতু তারা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বসেছিল যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনো ঘুমে বিভোর। তারা ভাবছিল, নামাজ পড়তে বের হলেই বুঝবে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করার স্বাদ কত তিক্ত হয়? কিন্তু এই নির্বোধরা জানত না যে, সোনার পাখি তো সেই কবেই ডানা মেলে উড়াল দিয়েছে। এখন তো শুধু খালি খাঁচাটাই পড়ে আছে। ধীরে ধীরে রাতের আঁধার ভেদ করে যখন সুবহে সাদিক উদিত হলো, ভোরের মিষ্টি আলোয় চারদিক আলোকিত হতে শুরু করল, আলি রা. তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা থেকে উঠে ঘরের বাইরে বের হলেন। রক্তলোলুপ হিংস্র পশুরা তাকে দেখেই অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, মুহাম্মাদ কোথায়? জবাবে আলি রা. খুব বিরক্তিভাব নিয়ে বললেন, আমি কী জানি? আমি তো সারারাত ঘুমে বিভোর ছিলাম। তাঁর খবর তো তোমাদের জানা থাকার কথা। তোমরাই তো তাঁর জন্য শিকারির ন্যায় ওত পেতে বসে ছিলে। কাফেররা এমন কথা শুনেই রাগে ফেটে পড়ল। সবাই মিলে এক জোট হয়ে তার ওপর হামলে পড়ল। কিল-ঘুসি আর চড়-থাপ্পড়ে তাকে আহত করে নিজেদের রাগ কমানোর চেষ্টা করল। পুরো মক্কায় এ খবর রটে গেল। প্রতিটি ঘরে ঘরে তল্লাশি করা হলো। প্রতিটি অলিগলিতে প্রহরী বসানো হলো। কিন্তু তাতে লাভ কী? নবীজি মক্কায় থাকলেই তো তারা খুঁজে পাবে। তিনি তো রাতেই তাদের চোখে ধুলো দিয়ে শহর ছেড়ে বহুদূরে চলে গেছেন।[৭৭]

রাসুলকে হত্যায় পুরস্কার ঘোষণা

অল্পক্ষণের মধ্যেই মক্কার মুশরিকদের মধ্যে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। সবাই হতবাক, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ভেদ করে মুহাম্মাদ কখন কীভাবে পালিয়ে গেল! বড় বড় নেতারা রাগে-ক্ষোভে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। পাহারাদার সিপাহিদের যাচ্ছেতাই গালমন্দ করে রাগ কমানোর চেষ্টা করল। তাদের একটাই প্রশ্ন, তোমরা এতজন পাহারাদার থাকতে সেই জাদুকর

---

৭৭. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/২১১; *জাদুল মাআদ*, ৩/৫৪; *রহমাতুল লিল আলামিন*, ১/৯৬

কীভাবে হাওয়া হয়ে গেল? লানত পড়ুক তোমাদের ওপর। তোমরা কি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলে?

শহরে চিরুনি অভিযান শুরু হলো। কিন্তু কেউ তাঁকে খুঁজে পেল না। হতচ্ছাড়া আবু জাহল গিয়ে আবু বকরের ঘরের দরজায় করাঘাত করতে শুরু করল। আসমা বিনতে আবু বকর রা. দরজা খুলে বের হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? সকাল সকাল কী উদ্দেশ্যে আমাদের গরিবালয়ে আগমন করলেন? আবু জাহল বলল, তোমার বাবা কোথায়? মেয়েটি নিজের কানে হাত রেখে অত্যন্ত রূঢ়কণ্ঠে বলল, আমি কী জানি? এমন উত্তরে রাগে-গোস্বায় দানবের ন্যায় গোঙাতে গোঙাতে হতভাগা আবু জাহল এই নিষ্পাপ মেয়েটির কানে এত জোরে থাপ্পড় মারল যে, কানের দুল নিচে পড়ে গেল। আতঙ্কে মেয়েটি থরথর করে কাঁপতে লাগল।[৭৮] কাপুরুষ আবু জাহল তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে পুরো ঘর তল্লাশি করল। কিন্তু কোথাও কারও হদিস মিলল না।

যখন তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো, তখন তারা এই মহান মানুষটিকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ১০০ উট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিলো। যে ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জীবিত বন্দি করে অথবা তাঁর মৃতদেহ নিয়ে আসতে পারবে, তাকে এই অবিশ্বাস্য পুরস্কার দেওয়া হবে। লোভী আরবরা পুরস্কারের লালসায় সব কাজ ছেড়ে এই নাপাক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চতুর্দিকে হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করল। শাবাশ আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত! শাবাশ! তিনি জানতেন যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা. এখন কোথায় আছেন। চাইলে তাদের ধরিয়ে দিয়ে তিনি এমন মহামূল্যবান পুরস্কার অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু না, এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তিনি তা করেননি। অথচ তিনি তখনও কাফের ছিলেন।

আমরা দুজন নই তিনজন

কাফেররা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজছিল। একদল সৈনিক পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আবু বকর রা.-এর পদচিহ্ন অনুসরণ করে একেবারে সওর গুহার মুখে এসে পৌঁছল। তারা নবীজি

---

৭৮. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩৫৬

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা.-এর এতটাই নিকটে ছিল যে, গুহার ভেতর থেকে তারা তাদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন। আবু বকর রা. অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, নবীজি! এখন কী হবে? তারা তো গুহার মুখে এসে গেছে। প্রত্যুত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত প্রশান্তচিত্তে বললেন, ভয় পেয়ো না। এখানে আমরা শুধু দুজন নই, বরং আমাদের সঙ্গে এখানে আরও একজন আছেন। তিনি সেই সত্তা, যার আয়ত্তে এই সুবিশাল আকাশ, জমিন ও এ দুটির মাঝে যা-কিছু আছে সব। পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ গুহার মুখে এসে নিজের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলো, ব্যস! তাদের পায়ের চিহ্ন এখানেই শেষ হয়েছে। এখন মুহাম্মাদ হয়তো এই গুহায় আছে অথবা এখান থেকে সোজা আকাশে উঠে গেছে। আল্লাহর অপার মহিমায় কাফেররা সেখানে পৌছার পূর্বেই গুহার মুখে একটি মাকড়সা বাসা বুনেছিল। একপাশে কবুতর বাসা বানিয়ে তাতে ডিম পেড়ে রেখেছিল। শুধু তাই নয় ছায়াদার একটি গাছও সেখানে উঠে গিয়েছিল। কাফেররা এসব দেখে বলল এমন অন্ধকার আর পরিত্যক্ত গুহায় কোনো মানুষ ঢুকতে সাহস করবে? আর কেউ যদি ঢুকেই থাকে তাহলে গুহার মুখে এই মাকড়সার বাসা এলো কোত্থেকে? কবুতরই-বা এত অল্প সময়ে এখানে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ল কীভাবে? আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এখানে এমন ছায়াদার গাছই-বা কীভাবে জন্ম নিলো? এতসব প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে তারা সেখান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো।[৭৯]

সওর গুহায় খাবারের ব্যবস্থা

আবু বকর রা. তাঁর কলিজার টুকরা সন্তান আবদুল্লাহকে আগেই বলে দিয়েছিলেন, যেন সে দিনের বেলায় চুপিচুপি এসে শহরের সব খবরাখবর জানিয়ে যায়। আর আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর দায়িত্ব ছিল সময়-সুযোগ বের করে খাবার পৌছে দেওয়া। আর তাঁর খাদেম আমের ইবনে ফুহাইরা রা.-এর কাজ ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি বকরি চরাতে চরাতে এদিকে আসতেন এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে বকরির দুধ দোহন করে তা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা.-কে পান করিয়ে পুনরায় বকরির পাল নিয়ে শহরে ফিরে যেতেন। এতে করে বকরির পালের বিচরণের

---

৭৯. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/২১১-২১২; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১/৩৪৮; *আত-তবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সাদ*, ১/২২৯; *জাহাবি*, *তারিখুল ইসলাম*, ১/১৪৫; তবে এই বর্ণনাটির ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে।

কারণে আসমা ও আবদুল্লাহ রা.-এর পদচিহ্ন মুছে যেত এবং কাফেরদের সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশই বাকি থাকত না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই একনিষ্ঠ অনুরক্তরা তাদের দায়িত্ব পালনে কিঞ্চিত অবহেলা বা অসচেতনতার পরিচয় দেননি। কাফেরদের এমন চিরুনি অভিযান ও অনুসন্ধানসত্ত্বেও তাদের আসা-যাওয়ার বিষয়টি গোপন থাকা সত্যিই অকল্পনীয়। এত অল্পবয়সেই তাদের এমন সীমাহীন সতর্কতা ও গোপন বিষয়কে বুকে চেপে রাখার অসাধারণ ক্ষমতা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

মদিনার পথে

সওর গুহার যে অন্ধকারকে সারা পৃথিবীর সমস্ত আঁধার হিংসা করছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই আঁধারকে নিজের চিরস্থায়ী আলোয় আলোকিত করার পর তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। কাফেরদের সরগরম অনুসন্ধানও কিছুটা ঠান্ডা হয়ে এলো। ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে ভাগ্যের কাছে হেরে গিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেল। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝলেন যে, এখন মদিনায় সফর করতে কোনো আশঙ্কা নেই। আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিতকে উট নিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য ডেকে পাঠানো হলো। তিনি সন্ধ্যায় নিজের উট ও আবু বকরের উটদুটি নিয়ে গুহায় পৌছলেন। আসমা বিনতে আবু বকর রা.-ও খাবারদাবার নিয়ে উপস্থিত হলেন। এদিকে আবু বকর রা.-এর খাদেম আমের ইবনে ফুহাইরা রা.-ও সেখানে এসে পৌছলেন। একটি উটে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরোহণ করলেন। অন্যটিতে আবু বকর রা. ও তার খাদেম আমের সওয়ার হলেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ধার্য করে আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিতের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল। তাই তিনিও নিজের উটে চেপে তাদের সফরসঙ্গী হলেন।

মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা সুলাইমানের রাজত্বের চেয়েও দামি

যদি এ কথা সঠিক হয় যে, মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা এমন এক উজ্জ্বল মণি-মুক্তা, যা গুটি কতক মানুষের পবিত্র হৃদয়েই পাওয়া যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এ কথা মেনে নিতে হবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয় সেই পবিত্র চেতনায় টইটম্বুর ছিল। মদিনার পথে রওয়ানা হওয়ার আগে তিনি অত্যন্ত আফসোস ও ব্যথাভরা দৃষ্টিতে মাতৃভূমি পবিত্র মক্কার দিকে তাকিয়ে থেকে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, আহা! আমার প্রিয়

মাতৃভূমি! তোমার প্রতি আমার সীমাহীন ভালোবাসা যেন হৃদয়েয় গভীরে উত্তাল সমুদ্রের ন্যায় ঢেউ খেলছে। আফসোস! তোমার অধিবাসীরা আমাকে তোমার সতেজ আবহাওয়ায় শ্বাস নেওয়ার উপযুক্ত মনে করেনি। তাই বড় দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুসজল নয়নে আমি তোমায় আলবিদা জানাচ্ছি।[৮০]

আবু বকর নেই তাতে কী?

আবু বকর রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হিজরত করে চলে যাওয়ার পর তার ঘরে এমন এক আকর্ষণীয় ঘটনা ঘটল, যা আশা করি সুহৃদ পাঠকদেরও অভিভূত করবে। আবু বকর রা.-এর চলে যাওয়ার সংবাদ যখন তার পিতা জানতে পারলেন, তখন তিনি খুব হতাশ হয়ে পড়লেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, আবু বকর খালি হাতে যায়নি; বরং অর্থকড়িও সঙ্গে নিয়ে গেছেন। তার ধারণাও ভুল ছিল না। কারণ, আবু বকর রা. তার সমস্ত সম্পদ (যার মূল্য প্রায় পাঁচ হাজার দিরহাম হবে) নিজের সঙ্গে নিয়ে গেছেন। আবু কুহাফা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে স্বীয় নাতনি আসমাকে বললেন, দেখো তো এ কেমন মুসিবতের কথা। তোমার বাবা নিজে তো চলে গেছে, সঙ্গে সমস্ত পয়সাপাতিও নিয়ে গেছে।

আসমা বিনতে আবু বকর রা. অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বাকপটু মেয়ে ছিলেন। দাদার পেরেশানি দেখে তিনি বললেন, না না, তিনি তো আমাদের জন্য অনেককিছুই রেখে গেছেন। এই কথা বলে তিনি দ্রুত একটি থলের মধ্যে কিছু হালকা পাথরের টুকরো ভরে তা অর্থকড়ি রাখার নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিলেন। তারপর বয়োবৃদ্ধ অন্ধ দাদার হাত ধরে তাকে থলের কাছে নিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ থলে ধরে দেখতে লাগলেন। এদিকে নাতনিও সান্ত্বনার সুরে বলতে লাগলেন, দেখো দাদা! তোমার ছেলে আমাদের জন্য কত্ত অর্থকড়ি রেখে গেছেন। এই বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে দাদাকে সেখান থেকে নিয়ে এলেন। টাকার থলে ধরে দেখার পর বৃদ্ধ আবু কুহাফা খুশিতে বাগবাগ হয়ে বলতে লাগল, যাক, এখন আর আবু বকরের চলে যাওয়াতে কোনো দুঃখ নেই।[৮১]

---

৮০. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৯২৫

৮১. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩৫৭; *আল-মুসনাদ লি* *আহমাদ*, ৬/৩৫০

অত্যন্ত আশ্চর্যকর এক মুজেজা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রা.-এর ছোট্ট কাফেলার রাহবার তাদেরকে ভিন্নপথে মদিনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ, এখানে কোনো কাফের তাদের খুঁজতে খুঁজতে এদিকে চলে আসার আশঙ্কা ছিল। এত সতর্কতার পরও এক ব্যক্তি তাদের দেখে ফেলল। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরোপুরি চিনতে না পারলেও তার মনে প্রবল সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে সে মক্কায় গিয়ে প্রথমেই সুরাকা ইবনে মালিককে জানাল যে, আমি তিনজন দ্রুতগামী আরোহীকে মদিনার দিকে যেতে দেখেছি। এ কথা শুনেই সুরাকা লাফিয়ে উঠল। তার চোখে-মুখে লোভের কুৎসিত হাসি ঝলমল করে উঠল। ১০০ উট পুরস্কার পাওয়ার কথা কল্পনা করেই সে চমকে উঠল। দ্রুত সেই সংবাদদাতার মুখে চাপা দিয়ে বলল, ভাই! এই কথা আর কাউকে বলো না। যদি এই খবর জানাজানি হয়ে যায় তাহলে আমি ১০০ উটের মালিক হতে পারব না। এই কথা বলেই সে দ্রুত নিজের ঘোড়া প্রস্তুত করে ফেলল এবং একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে ঘোড়াটাকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিলো। নিজে খুব সচেতনতার সঙ্গে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে শহরের বাইরে চলে এলো এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছোট্ট কাফেলাকে ধাওয়া করতে তিরের বেগে ছুটে চলল। অল্প কিছুদূর যেতেই তার ঘোড়া লাফিয়ে উঠে তাকে নিচে ফেলে দিলো। কিন্তু সুরাকা এত সহজে দমার পাত্র নয়। ১০০ উট পুরস্কার পাওয়া কম কথা নয়। আবারও সে ঘোড়ায় চেপে বসল এবং উটের পদচিহ্ন দেখে দেখে পথ চলতে লাগল। যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছোট্ট কাফেলা তার দৃষ্টিসীমার ভেতরে এসে গেল, তখন আবারও তার ঘোড়া লাফিয়ে উঠে তাকে নিচে ফেলে দিলো। কিন্তু এবারও সে ঘোড়ায় চড়ে পুনরায় ছুটতে শুরু করল। যখন সে কাফেলার একেবারে নিকটে এসে পৌঁছল, তখন তার ঘোড়ার পাগুলো পেট পর্যন্ত পুরোপুরি মাটিতে ধসে গেল। এবার সুরাকা বুঝতে পারল যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ একজন সত্য নবী। তাঁর গায়ে হাত তোলার ক্ষমতা বা শক্তি আমার নেই। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সুরাকা পেছন থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাক দিলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার দিকে ফিরে তাকালেন, তখন সে কাতরস্বরে বলল, মুহাম্মাদ! ১০০ উটের লোভ আমাকে এতটাই পাগল করে

দিয়েছে যে, উটের লোভে আপনাকে বন্দি করার জন্য আমি আপনার পিছু নিয়েছি। এখন আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। দয়া করে আপনি আমাকে এই ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তার কথা শুনেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! এই লোক যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে এই আজাব থেকে তাকে মুক্তি দাও। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া শেষ করার আগেই ঘোড়ার পা মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। এবার তো সুরাকার পুরোপুরিই বিশ্বাস হয়ে গেল যে, মুহাম্মাদ সত্যিই আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা ও রাসুল। ভালোবাসা ও ভক্তিতে গদগদ হয়ে এবার সে নিজের কাছে অর্থকড়ি যা ছিল তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাদিয়া দেওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিতে অস্বীকার করলেন। সুরাকা বলল, এখন আমি মক্কায় ফিরে যাওয়ার পথে যাকেই এদিকে আসতে দেখব ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আপনারা নিশ্চিন্তে মদিনার দিকে যাত্রা করুন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন। সুরাকা ঘোড়ায় আরোহণ করে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলো। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হতো তাকেই বলত, ভাই ফিরে যাও, এদিকে তালাশ করে কোনো লাভ নেই। আমি অনেক দূর পর্যন্ত তাদের অনুসন্ধানে গিয়েছি। কিন্তু কোথাও তাদের চিহ্ন পেলাম না।[৮২]

জুবায়ের ইবনুল আওয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ

সুরাকা ইবনে মালেককে বিদায় দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই জুবায়ের ইবনুল আওয়ামের সঙ্গে কাফেলার লোকদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি তখন শাম থেকে কাপড়ের ব্যবসা শেষ করে মক্কায় ফিরছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সফরসঙ্গী আবু বকর রা.-কে তিনি বেশ কিছু মূল্যবান কাপড় উপহার দিলেন এবং সফরে যাতে কোনো কষ্ট না হয় সেজন্য কাফেলার জরুরি সব আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন। বিদায় নেওয়ার সময় এই কথাও বলে গেলেন যে, খুব শীঘ্রই আমিও মক্কা থেকে হিজরত করে আপনার খেদমতে চলে আসব।

---

৮২. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৫২ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি, ইলাল মাদিনাহ); *সহিহ মুসলিম*, ২০০৯ ও ২০৯১; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩৫৭; *জাদুল মাআদ*, ৩/৫৬

সিদ্দিকে আকবরের একটি সতর্কবাক্য

রাস্তায় যাদের সঙ্গে দেখা হতো তাদের অধিকাংশই আবু বকর রা.-কে চিনতেন। কারণ, অনেক আগ থেকেই তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে এই পথে সফর করতেন। কিন্তু তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনত না। তাই লোকেরা যখন তার কাছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় জানতে চাইত তখন তিনি অত্যন্ত অর্থবহ এই বাক্যটি বলতেন, 'তিনি আমার পথপ্রদর্শক।' এই কথায় একদিকে যেমন রাসুলের রেসালাতের স্বীকৃতি ছিল, অন্যদিকে সাধারণত সফরের পথপ্রদর্শক বুঝে আসার কারণেও গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যেত না। অন্যথা মুশরিকরা জানতে পারলেই পিছু ধাওয়া করত।

কুবা উপত্যকায় হকের সূর্যোদয়

নির্ভরযোগ্য মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে পূর্বদিগন্তে সত্যের যে সূর্যোদয়ের মাধ্যমে মিথ্যার সব আঁধার মিটে গিয়েছিল, তা ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ অক্টোবর কুবা উপত্যকায় উদিত হয়েছিল। যা মরু আরবের প্রতি ইঞ্চি ভূমিকে আলোকিত করে দিয়েছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর মক্কা থেকে হিজরত করে আবু বকর রা.-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনার পথে যাত্রা শুরু করেন। মক্কার কাফেরদের মূর্খতা ও সীমালঙ্ঘন এমন একজন মহামানবের কল্যাণ ও বরকত থেকে তাদের বঞ্চিত করে দিয়েছিল, যার পদধূলিও জ্ঞানী-গুণিদের চোখের সুরমা ছিল। যার দুচোখে ছিল বিশ্বজয়ের হাতছানি। কথায় আছে, গাছ কখনো তার ফলের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। তেমনই কাফেররাও তাদের অজ্ঞতা ও মিথ্যার পূজার কারণে সত্যের সূর্যের কিরণ থেকে আলো গ্রহণ করতে পারেনি। মদিনাবাসীই এই মহাসৌভাগ্যের মালিক হলো। যারা তাঁর জ্যোতি দিয়ে নিজেদের হৃদয়রাজ্যকে জ্যোতির্ময় করেছিল।

মদিনায় নবীজির শুভাগমনের সংবাদ

ফুল যখন ফুটতে থাকে, তখন তার সৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে থাকে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালাতের সংবাদ একটু দেরিতেই মদিনায় পৌঁছেছিল। কিন্তু সত্যের দাওয়াত পেয়েই তাদের অধিকাংশ লোকই নিজেদের বুককে ইসলামের আলো দিয়ে আলোকিত করেছিলেন। যেখানে এমন অসংখ্য মানুষও ছিলেন,

যারা এই জ্যোতির্ময় ঈমানের আলো দিয়ে নিজেদের হৃদয়ের ঘরকে আলোকিত করতে ব্যাকুল ছিলেন। বসন্তের আগমনের পূর্বে আশেক বুলবুলিদের মিষ্টিগানে বাগান যেমন মুখরিত হয়ে ওঠে, তেমনই মদিনায় বসবাসরত হেদায়েতের প্রেমপিয়াসি আত্মাগুলো যখন এই খুশির সংবাদ শুনল যে, হেদায়েতের প্রোজ্জ্বল প্রদীপ তাদের শহরের দিকেই আসছেন, গোমরাহির উপত্যকায় দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খাওয়া এই মানুষগুলো যখন বুঝতে পারল যে, হেদায়েতের আলোকস্তম্ভ ও যোগ্য পথপ্রদর্শক তাঁর পদধূলি দিয়ে তাদের শহরকে ধন্য করতে আসছেন, তখন তাদের হেমন্তের দুর্দশাগ্রস্ত হৃদয়েও যেন বসন্তের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল। তাদের দুগাল বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

প্রিয়জনের আগমনের সংবাদ পেয়ে প্রেমিকহৃদয় কী করে ঘরে বসে থাকে? ভালোবাসায় পাগল হৃদয় তো সর্বদা ভবঘুরে হয়ে থাকে। প্রিয়জনের অলিগলিতেই তার ঘোরাফেরা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একনজর দেখার অপেক্ষায় অস্থির হৃদয়গুলো তাদের ঘরের আরামের বিছানা ত্যাগ করে বিস্তৃত মরুভূমিকেই নিজেদের ভবঘুরে ভালোবাসা প্রকাশের জন্য নির্ধারণ করে নিলো। মদিনার সৌভাগ্যবান মানুষগুলো শহরের বাইরে এসে অত্যন্ত অস্থির হয়ে সময় কাটাতে লাগল যে, কখন তাওহিদের সাকি হয়ে তাদের ভালোবাসার শরাব পান করাবেন। চাতক পাখির ন্যায় প্রতিটি মানুষ মক্কার পথের দিকে তাকিয়ে থাকত। হায়! কী করে আমি তাদের সেই মুহূর্তের হতাশা ও বেদনায় নীল হওয়া চেহারার ছাপ ফুটিয়ে তুলব, সারাদিনের অপেক্ষা শেষে তখন তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না আসায় ব্যর্থ মনোরথে ঘরে ফিরে যেত।

হতাশার আঁধারে আশার আলো

অবশেষে তাদের হতাশার আঁধার ভেদ করে আশার আলো প্রকাশ পেল। অপেক্ষার অবসান ঘটল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র কদমের ছোঁয়ায় কুবা উপত্যকা যেন জান্নাতে পরিণত হলো। প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও বেলা গড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না আসায় সবাই যার যার ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। প্রথম এক সৌভাগ্যবান ইহুদি তাকে দেখার গৌরব অর্জন করল। ইহুদি লোকটি তখন তার বাড়ির ছাদে বসে থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পথপানে চেয়ে ছিল। তার আশেক দুচোখ দূর থেকেই নবীজি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পায়। প্রথমে সে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করল। ভাবল, আমার দুচোখ আমায় ধোঁকা দিচ্ছে না তো? অবশেষে সে যখন বুঝতে পারল যে, সত্যিই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন। তখন সে আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে লাগল, হে ইয়াসরিববাসী! হে দুপুরের বিশ্রামকারীরা! যার আগমনের অপেক্ষায় তোমরা রাতদিন সব এক করে ফেলেছ, তোমাদের আনন্দ ও খুশির সেই মুহূর্ত এসে গেছে। তোমাদের প্রিয় মানুষটি এসে গেছেন।

উষ্ণ অভ্যর্থনা

এমন সংবাদ শুনেই মানুষের হৃদয় খুশিতে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠল। প্রেমিক হৃদয়গুলো তাদের প্রিয়তমের সৌন্দর্য অবলোকনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগল। নিষ্পাপ শিশুরা 'রাসুলুল্লাহ' স্লোগান দিতে দিতে 'সানিয়াতুল বিদা'-এর দিকে দৌড়াতে লাগল। আবু বকর রা. যখন মদিনাবাসীকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসতে দেখলেন, তখন মনিব ও গোলামের মাঝে কিছুটা পার্থক্য তৈরির জন্য নিজের চাদর খুলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার ওপর দিয়ে দিলেন। যাতে করে তাকে চিনতে মানুষের কোনো অসুবিধা না হয়। বিশ্বাসী ও প্রেমিককণ্ঠের স্লোগানে স্লোগানে পুরো মদিনা গুঞ্জরিত হতে শুরু করল। নারীরা খুশিতে গান গাইতে লাগল :

> যতদিন প্রার্থনাকারীরা প্রার্থনা করবে, ততদিন আমাদের ওপর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আবশ্যক। কারণ, আজ পূর্ণিমার চাঁদ সানিয়াতুল বিদা-এর উঁচু টিলা থেকে আমাদের ওপর উদিত হয়েছে।(৮৩)

---

৮৩. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/২২৫; আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর মতে এই কবিতাটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনায় হিজরতের সময় গাওয়া হয়নি। তিনি নিজ গ্রন্থ *জাদুল মাআদ*, ৩/৫০০-এ দাবি করেছেন এই কবিতাগুলো তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় গাওয়া হয়েছে। তার যুক্তি হলো, সানিয়াতুল বিদা-এর অবস্থান শাম থেকে মদিনায় আসার পথে। মক্কা থেকে মদিনায় আগমনকারী কেউ এই উপত্যকা দেখতে পায় না। তবে তিনি এই ব্যাপারে অন্য কোনো সুস্পষ্ট দলিল বা নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি। অপরদিকে আল্লামা সুলাইমান মনসুরপুরি রহ. তার লিখিত গ্রন্থ *রহমাতুল লিল আলামিন*-এ বলেন, কবিতাগুলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদিনায় আগমনের সময়ই আবৃত্তি করা হয়েছিল। তবে হতে পারে উভয় সময়ই কবিতাগুলো আবৃত্তি করা

এভাবেই মদিনাবাসী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উষ্ণ অভ্যর্থনার মাধ্যমে কুবা উপত্যকায় নিয়ে যান। কুবা মদিনা থেকে দুই মাইল দূরত্বের একটি এলাকা। তবে তা মদিনারই অংশ ছিল।

সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের মেহমানদারি

সবারই হৃদয়ের আকুতি ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তার মেহমানদারি গ্রহণ করে তাকে ধন্য করেন। কিন্তু এমন সৌভাগ্য তো কোনো মহাসৌভাগ্যবানের কপালেই জুটতে পারে। একজন ভাগ্যবানই এই মহাসৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে মেহমানদারি করাতেও তো কপাল লাগে। যে কপাল সবার থাকে না। এই সৌভাগ্য লেখা ছিল শুধু কুলসুম ইবনে হিদ্‌ম রা.-এর কপালে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মেহমানদারি গ্রহণ করলেন। আর আবু বকর রা. হাবিব ইবনে আলতাফ রা.-এর ঘরে মেহমান হলেন।[৮৪] দলে দলে মানুষ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতে আসতে লাগল এবং অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা শুনতে লাগল। তাঁর আলো দিয়ে নিজেদের হৃদয়কে আলোকিত করতে লাগল। মহান আল্লাহর নির্দেশে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৪ দিন কুবাতে অবস্থান করলেন। প্রতিটি তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে হেদায়েতের অমিয় সুধা পান করিয়ে তৃপ্ত করলেন।

কুবায় মসজিদ নির্মাণ

এই সংক্ষিপ্ত সময়েই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ঐতিহাসিক মসজিদটি নির্মাণ করেন। যার ব্যাপারে পরবর্তী সময়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

> যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর স্থাপিত হয়েছে, সেটাই তোমার দাঁড়ানোর বেশি উপযুক্ত। তাতে এমন লোক আছে, যারা পাক-পবিত্রতাকে বেশি পছন্দ করে। আল্লাহ পাক-পবিত্র লোকদের পছন্দ করেন। [সুরা তওবা : ১০৮]

হয়েছিল। তা ছাড়া এ-ও হতে পারে যে, এই কবিতাটি আগে থেকেই মদিনার শিশু-কিশোরদের কাছে পরিচিত ছিল। কারও আগমনে তারা তা আবৃত্তি করত। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সময়ও তারা তা আবৃত্তি করেছিল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।-অনুবাদক

৮৪. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩৬১। তবে উক্ত গ্রন্থে হাবিব ইবনে আলতাফ রা.-এর স্থলে কুবাইব ইবনে ইসাফ রা.-এর নাম উল্লেখ রয়েছে।-অনুবাদক

সরলতার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

মুসলিমদের নির্মিত এটিই প্রথম মসজিদ। যা নির্মাণে ইসলামের সরলতার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। যে সরলতা ও সাদাসিধে জীবনযাপনের ব্যাপারে পৃথিবীর মহান মনীষীরা গুরুত্বারোপ করেছেন। ধর্ম এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ও পথপ্রদর্শকদের সেইসব সরলতা ও নির্মোহতা গ্রহণ করতে আজও বড় বড় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

মসজিদ নির্মাণের সময় উৎসাহী মুসলিমদের সঙ্গে তাদের প্রিয়তম রাসুলও স্বেচ্ছায় সানন্দে কাজ করতে লাগলেন। এদিকে সাহাবিরা বারবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার এমন দিনমজুরের মতো কাজ করা আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত করেছে। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মূলনীতি থেকে পিছু হটেননি। তিনি তাদের বললেন, 'প্রকৃত বন্ধু তো সেই, যে সর্বাবস্থায় তার বন্ধুদের সঙ্গে থাকে। কখনো তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে না। এটা কীভাবে সম্ভব যে, তোমরা কাজ করবে আর আমি শুধু বসে বসে তা দেখব?'

আলি রা.-এর আগমন

তখনও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবায় অবস্থান করছিলেন, এরমধ্যেই মক্কা থেকে আলি রা. আগমন করেন। যিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আশ্চর্য বিষয় হলো যেদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওর গুহা থেকে মদিনার উদ্দেশে রওয়ানা হন, সেদিনই আলি রা. মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। যেহেতু শত্রুদের ভয়ে তিনি রাতের বেলায় সফর করতেন এবং দিনে কোথাও আত্মগোপন করে থাকতেন, তাই তার মদিনায় পৌছতে কিছুটা দেরি হয়ে যায়। তা ছাড়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো উটে করে সফর করেছিলেন। আর আলি রা. পায়ে হেঁটে এসেছেন।

তিনি যখন কুবায় এসে পৌছেন। তখন সফরের ক্লান্তিতে তার পুরো শরীর ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। বালু ও পাথুরে ভূমির ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে সফর করার কষ্ট যে কতটা নিদারুণ হতে পারে, তা একমাত্র ভুক্তভোগী ব্যক্তিই বুঝতে পারবে। তার দু-পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। কুবার নিকটে এসেই তিনি সীমাহীন কষ্টে মাটিতে বসে পড়েন এবং সামনে পা

বাড়ানোর মতো শক্তি হারিয়ে ফেলেন। এই অবস্থায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আগমনের সংবাদ শুনেই আনন্দের আতিশয্যে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন। আলি রা.-এর কষ্ট দেখে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তার পায়ের ফোসকা চুমু দিয়ে বললেন, আলি, আমি তোমার পায়ের ফোসকাগুলোতে চুমু দিচ্ছি। কারণ, সত্যের পথে তুমি তোমার সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করে দিয়েছ। আশা করি তোমার পরে যারা এই দুর্গম পথে আগমন করবে, তারা তোমার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এরপরে নবীজি তাঁর প্রিয় সাহাবিকে নিয়ে নিজের আবাসস্থলে ফিরে এলেন।[৮৫]

মদিনায় নবীজির আগমন

মদিনার প্রতিটি অলিগলি সুসজ্জিত। পুরো শহরে সাজ সাজ রব। দেখেই মনে হচ্ছে কোনো মহান নেতার আগমন ঘটবে। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর শুক্রবার দিন নবীজি কুবাবাসী থেকে বিদায় নিয়ে মদিনায় গমন করেন। তাঁর আগমনে পুরো শহরে খুশির বন্যা বয়ে গেল। সবাই রাসুলুল্লাহর আগমনের স্লোগান দিতে শুরু করল। শহরের অলিগলি মানুষের বাঁধভাঙা উল্লাসে ফেটে পড়ল। মদিনা আজ জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। আশপাশের সমস্ত এলাকার মানুষ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে মদিনায় উপস্থিত হয়েছেন। প্রতিটি ঘরের ছাদে দর্শনার্থীদের ভিড়। নারী ও শিশুরা আনন্দ-সংগীত গাইতে লাগল।

মুসলিমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম জানাচ্ছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়েমেনি পাগড়ি মাথায় উটের ওপরে বসে ছিলেন। কাঁধে সাদা চাদর। এমন সাদাসিধে পোষাকেও তাকে কোনো মহান প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। কারণ, মণি-মুক্তা কখনো পুরোনো আর ছেঁড়া কাপড়ে গোপন হয় না। যেখানেই থাকুক না কেন, সে আশপাশ আলোকিত করে তুলবেই। সেসময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঠোঁটে মুচকি হাসি খেলা করছিল। চোখে-মুখে আনন্দের দ্যুতি। ইতিপূর্বে মদিনার মানুষ কখনো কারও আগমনে এমন জাঁকজমকপূর্ণ উষ্ণ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেনি। কখনো কারও আগমনে তারা এতটা আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। এটা এক অসাধারণ মর্যাদাপূর্ণ শোভাযাত্রা ছিল।

৮৫. তবে চুমু দেওয়ার বিষয়টি আমি সিরাতের কোনো গ্রন্থে পাইনি।-অনুবাদক

মেহমানদারির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

এমন মর্যাদাবান লোকদের পদধূলিও চোখের সুরমা হওয়ার উপযুক্ত। তাদের চোখের দৃষ্টি প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্যকিরণের মতো। যে জিনিসের দিকেই তারা তাকান, আলোকিত করে দেন। তাদের নিশ্বাসেও সুঘ্রাণ ছড়ায়। যে পরিবেশেই তা ছড়িয়ে পড়ে, সুবাসিত করে দেয়। তাদের প্রতিটি কাজই পূতপবিত্র হয়। এমনকি তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেও তারা সম্মানিত ও পূতপবিত্র করে দেন। পৃথিবীতে এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি কি রয়েছে, যে এই মহামানবদের অস্তিত্বের প্রদীপকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আঁধার ঘরে আলো জ্বালাবে না? তাদের মুবারক কদমের ধূলি গায়ে মাখার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাইবে না?

প্রত্যেক গোত্রের লোকেরাই আপ্রাণ চেষ্টা করল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমানদারি করার গৌরব অর্জন করতে। মুহাম্মাদি বাতিঘরের প্রেমিক পতঙ্গরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের লাগাম ধরে রাখল। প্রত্যেকেই ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতের মাধ্যমে নিজের ঘরকে সম্মান ও গৌরবের দিক দিয়ে রাজকীয় বালাখানা বানাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে সব ঝগড়াঝাঁটির অবসান ঘটালেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উটকে আদেশ করা হয়েছে। যে ব্যক্তির ঘরের সামনে গিয়ে বসে পড়বে, আমি তার ঘরেই অবস্থান করব। সুতরাং তোমরা উটের লাগাম ছেড়ে দাও।

মদিনায় প্রথম জুমার নামাজ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বনু সালিম ইবনে আউফ গোত্রের এলাকায় পৌঁছলেন, তখন জুমার নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখানেই একটি মাঠে জুমার নামাজ আদায় করলেন। তখন ১০০ জন মুসলিম তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করেন। তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেন। মদিনায় এটিই ছিল তাঁর প্রথম জুমার নামাজ এবং প্রথম খুতবা।

এই গ্রন্থের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষের হৃদয়ের কল্যাণকর আবেগ-অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলা, তাই সংক্ষিপ্তাকারে হলেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই খুতবা আমি এখানে উল্লেখ করছি।

মদিনায় নবীজির প্রথম খুতবা

প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করছি। তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। তাঁর কাছেই আমরা আমাদের গুনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করি, প্রবৃত্তির মন্দ তাড়না থেকে আশ্রয় চাই। তিনি মহান। তিনি সম্মানিত। দুনিয়ার বড় থেকে বড় রাজাবাদশা ও ক্ষমতাশালীদের চেয়েও তিনি বড় এবং প্রভাবশালী। তিনি একক ক্ষমতার অধিকারী। জলে-স্থলে তাঁর কর্তৃত্ব বিরাজমান। সৃষ্টিজীবের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর অধীন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং সর্বদ্রষ্টা। আমরা নেক আমল বা বদ আমল যা-কিছুই করি না কেন, তিনি সবকিছুই দেখেন। ভালো কাজের প্রতিদান দেন এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেন। তিনি মেহেরবান ও দয়ালু। আমাদের ভালোর জন্যই তিনি শাস্তি ও বিপদাপদ দেন। তিনি তো পরম করুণাময়। সেসব লোকের ওপর তিনি দয়া করেন, যারা তাঁর বান্দাদের ওপর দয়া করে। তিনি প্রতাপশালী। সেইসব লোকের ওপর তাঁর ক্রোধের বজ্রপাত হয়, যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে এবং তাঁর শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে। তাই তোমরা তাঁকে ভয় করো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকো। ভালো পথে অগ্রসর হও। মনে রেখো, এই মহান প্রভুর রাজত্ব খুব বিস্তৃত। তোমরা তাঁর রাজত্ব থেকে পলায়ন করে কোথাও যেতে পারবে না। তাই তাঁর দিকেই ফিরে এসো। তাকে কখনো অসন্তুষ্ট করো না। মনে রেখো, তিনি যদি তোমাদের ওপরে অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই তোমাদের কাজে আসবে না। তাই তাঁর সন্তুষ্টিই যেন তোমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য হয়। তিনি যদি তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত শক্তিই তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা যদি তাঁর সামনে মাথানত করে দাও, তাহলে পুরো পৃথিবী তোমাদের সামনে মাথানত করবে। তোমরা যদি শুধু তাকেই ভয় পেতে শেখো, তাহলে দুনিয়ার সবচেয়ে বর্বর ও অবাধ্য শক্তিগুলো তোমাদের ভয় পেতে শুরু করবে। সেই মহিমান্বিত প্রভু যিনি সর্বদা তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখেন, তিনিই তোমাদের কল্যাণ ও সফলতার জন্য আমাকে পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছেন। আমি তাঁর একজন বান্দা ও রাসুল। যদি তোমরা আমার দেখানো পথকেই নিজেদের জীবন চলার সরল-সঠিক পথরূপে গ্রহণ করতে পারো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের অনুসরণ করতে পারো, তাহলে ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারবে। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও,

তাহলে মনে রেখো, দুনিয়ার সমস্ত শক্তি তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং কোথাও কল্যাণ ও সফলতার মুখ দেখবে না।[৮৬]

সৌভাগ্যবান আবু আইয়ুব আনসারি রা.

অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় দেওয়া এই খুতবার মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যান্বেষী মানুষকে শুধু এবং শুধুই এক আল্লাহর ইবাদত, সত্যবাদিতা ও নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। খুতবা শেষে পুনরায় তিনি বাহনে চেপে বসে সামনের দিকে চলতে শুরু করলেন। নববি সৌন্দর্যের পাগল প্রেমিকরা চতুর্দিক থেকে খুশিতে স্লোগান দিচ্ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেহমানদারি করানোর সৌভাগ্য অর্জনের জন্য তারা অস্থির হয়েছিল। কিন্তু মানবসৃষ্টির সূচনালগ্নেই এই সৌভাগ্য আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর চাঁদকপালে লিখে দেওয়া হয়েছিল। তাই তো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উট তার ঘরের সামনে গিয়েই বসে পড়ল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। আবু আইয়ুব আনসারি রা. অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁর সামানাদি ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং ঘরের দ্বিতীয় তলাটি তাকে ব্যবহার করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সুবিধার্থে ঘরের নিচের তলাকেই বেছে নিলেন।

মসজিদে নববি নির্মাণ

মদিনার যে পতিত ভূমিটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের পদধূলি স্পর্শ করার গৌরব অর্জন করেছিল, মাআজ ইবনে আফরা রা.-এর আত্মীয় দুজন এতিম বাচ্চা সেটার মালিক ছিল। ভেড়া-বকরির রাখালরা সেখানে এসে বিশ্রাম নিত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলেন এই ভূমিটিতে আল্লাহর ঘর বানাতে। প্রভুর পাগল প্রেমিকরা যেখানে পরম ভক্তি ও ভালোবাসায় সেজদাবনত হবে। তিনি যখন সেই ভূমির মালিক সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন মাআজ ইবেন আফরা রা. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যে এতিম বাচ্চারা এই ভূমির মালিক, আমিই তাদের লালনপালন করি। তাই আমি তাদের বোঝাব যেন তারা তাদের এই জমিন আপনাকে হাদিয়াস্বরূপ দিয়ে দেয়।

---

৮৬. *সিরাতুল মুস্তফা সা.* (ই.ফা.বা.), ১/৩৪২; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/২১৩

তার কথা শেষ না হতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে উঠলেন, না, এটা কখনো হতে পারে না। আমরা কীভাবে এতিম বাচ্চাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার মতো ঘৃণ্য কাজ করতে পারি? চাই তা আল্লাহর ঘর নির্মাণের জন্য হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। আমরা তাদের থেকে এই ভূমি ক্রয় করতে চাই। তারা যদি তা বিক্রি করতে সম্মত হয়, তাহলে আমরা তা ক্রয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করব।

অবশেষে এতিম বাচ্চারাও আল্লাহর ঘর নির্মাণের জন্য সানন্দে তাদের জমিন বিক্রি করতে রাজি হলো। আবু বকর রা. তার বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করেন। এই পতিত ভূমিতে কয়েকটি খেজুরগাছ আর মুশরিকদের কয়েকটি পুরোনো কবরও ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে পুরো ভূমির বনজঙ্গল ও গাছগাছালি কেটে সমতল করে দেওয়া হলো। সবাই অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করল। এই মসজিদ নির্মাণেও ইসলামের সরলতার ছাপ প্রকাশ পেয়েছিল। মসজিদের দেয়াল পাথর ও কাদামাটি দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। ওপরে ছিল খেজুরপাতার ছাউনি। এই মসজিদ নির্মাণের সময়ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অভ্যাসমতো নিজেও কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৮৭]

নবনির্মিত বাতিঘর

যতদিন পর্যন্ত মসজিদ এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থাকার ঘর নির্মিত হয়নি, ততদিন তিনি আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর ঘরেই অবস্থান করেন। যখন মসজিদ ও কামরার নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলো, তখন তিনি যায়েদ ইবনে হারেসা ও আবু রাফে রা.-কে মক্কায় পাঠিয়ে ফাতেমাতুজ জাহরা, উম্মে কুলসুম, সাওদাহ বিনতে জামআ, উসামা ইবনে যায়েদ এবং তার মাকে মদিনায় নিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রা.-ও প্রিয়জনদের নিয়ে মদিনায় চলে এলেন। পরিবারের সবাই এসে পৌছলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন ঘরে উঠলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপর মেয়ে রুকাইয়া রা. তো তার স্বামী উসমান রা.-এর সঙ্গে হাবাশায় অবস্থান করছিলেন, কিন্তু যাইনাব রা.-কে তার কাফের স্বামী মদিনায় আসতে দেয়নি।

---

৮. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩৬৩; *আল-বিদায়া ওয়া[illegible]*, ৩/২৪২

ইহুদিদের সর্বোচ্চ নেতার ইসলামগ্রহণ

হকের গোপন ভেদ ও গূঢ় রহস্য সেসব মানুষের জন্য জাদুময় আকর্ষণ ছিল, যাদের তা বোঝার মতো বোধশক্তি ছিল। কিন্তু মিথ্যার পূজারি মন্দ ও নির্বোধ লোকদের কাছে কখনো তার বড়ত্ব ও যথার্থতা বিকশিত হয়নি। এইজন্যই উলামায়ে কেরাম ও জ্ঞানী-গুণীরা ততটা সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন হয় না, যতটা হয় সেসব মানুষ, আল্লাহ যাদের দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্চক্ষুর দৌলত দান করেননি।

মদিনার ইহুদিদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা.। যিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একজন ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন ইউসুফ আ.-এর বংশধর, অন্যদিকে জ্ঞানগরিমায়ও অনন্য। যে কারণে সবার হৃদয়েই তার সম্মান ও ভালোবাসার আসন ছিল। তিনি এক সত্যান্বেষী মানুষ ছিলেন। সত্য যাই হোক না কেন, তা গ্রহণ করতে তিনি কখনোই দ্বিধা করতেন না। মদিনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সংবাদ তার কানেও পৌঁছেছিল। সবার মুখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা শুনে তিনিও কয়েকজন অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা শোনার জন্য চলে এলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মহান আল্লাহর একত্ববাদ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের জহুরি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জ্যোতির্ময় মুক্তাসদৃশ প্রতিটি কথাকে নিজের জ্ঞান ও ইলমের কষ্টিপাথরে যাচাই করলেন। নবীজির অসাধারণ ও অদ্বিতীয় চমক দেখে বিমোহিত হয়ে গেলেন। তিনি অনুভব করলেন, একত্ববাদের আলোয় উজ্জ্বল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাদুময় বক্তব্যের প্রতিটি দুষ্প্রাপ্য মণি-মুক্তা যে দ্যুতি ছড়াচ্ছে, সাগরের কোনো হিরে-জহরত কিংবা আকাশের কোনো নক্ষত্রেও তা নেই। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তার সঙ্গীদের নিয়ে উঠে চলে গেলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব এবং মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে করতে তিনি রাত কাটিয়ে দিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি নড়াচড়া এবং বাহ্যিক অবয়ব যেন সত্যের আহ্বায়ক হয়ে তার কল্পনার চোখকে বিমুগ্ধ করে তুলছিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মণি-মুক্তা সমতুল্য

প্রতিটি শব্দ যেন তিরের ন্যায় তার হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে যাচ্ছিল। পরের দিন সকালে ভোরের মিষ্টি আলোয় যখন চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল, তিনি দ্রুত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বেশ কিছু জটিল প্রশ্ন করলেন। সেগুলোর উত্তর একমাত্র নবী ছাড়া আর কারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতিটি প্রশ্নের এমন সর্বোৎকৃষ্ট জবাব দিলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলিম হয়ে গেলেন।

ইহুদি নেতাদের ইসলামের দাওয়াত

নিজের হৃদয়কে ইসলামের আলোয় আলোকিত করার পর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আমার অনুসারীদের নিকট প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে উত্তম হবে অন্যান্য ইহুদি নেতাদের ডেকে এনে আপনি তাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন। তারা যদি সবাই আমাকে নিজেদের অনুসৃত ব্যক্তি ও সর্বোচ্চ নেতা মনে করে, তাহলে আপনি তাদেরকে আমার অনুসরণ করার আহ্বান করুন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথামতো বড় বড় ইহুদি নেতাদের ডেকে এনে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, আমাদের জন্য সেই ধর্মমতই উত্তম ও শ্রেয়, যে ধর্মের অনুসরণ করে আমাদের পিতৃপুরুষরা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই আমাদের নতুন কোনো ধর্ম বা হেদায়েতের প্রয়োজন নেই। আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতার জন্য নিজেদের ধর্মীয় মূলনীতিগুলোই যথেষ্ট।

এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সবাই একসঙ্গে জবাব দিলো, তিনি তো অত্যন্ত বিচক্ষণ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের মহাসমুদ্রের অধিকারী একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আমরা সবাই তার অনুসরণ করি। তাকে শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসি। তিনি আমাদের মনিব আর আমরা তার সেবকতুল্য।

ইহুদি নেতাদের উত্তর শুনে নবীজি বললেন, যে ব্যক্তিকে তোমরা তোমাদের সর্বোচ্চ নেতা মনে করো, যার জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে তোমরা সবাই একমত, তিনি যদি মুসলিম হন, তাহলে কি তোমরা তার অনুসরণ করবে?

এর উত্তরে ইহুদি নেতারা বলল, আল্লাহ না করুন সে যেন মুসলিম না হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার তাদের এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। প্রতিবারই তারা একই উত্তর দিলো। এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা.-কে পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে সবার সামনে আসতে বললেন। তিনি এসেই সুউচ্চ আওয়াজে কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে শুরু করলেন। উপস্থিত ইহুদি নেতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইল। তাদের মধ্যকার অনেক সৌভাগ্যবানই ইসলামের সত্যতার এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে তখনই মুসলিম হয়ে যান। আর অনেক হতভাগা এই বলে আফসোস করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল যে, হায়! মুহাম্মাদ দেখি আমাদের নেতাকেও তাঁর জাদুতে বশ করে ফেলেছে।[৮৮]

আজানের সূচনা

আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসাবে স্বীকার করার পরে ইসলামের চার রোকন নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন হলো নামাজ। তাই তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির প্রথম দিনেই এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি মুসলিমদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। তখন শুধু দুরাকাত নামাজই পড়া হতো। পরবর্তী সময়ে যখন নবুয়তপ্রাপ্তির ১২তম বছরে মেরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। ইসলামের সমস্ত বিধানের একটাই লক্ষ্য। মুসলিমদের এক কেন্দ্রবিন্দুতে একত্র করে তাদের মাঝে ঐক্য, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা। এতদিন পর্যন্ত মুসলিমদের নামাজের জন্য একত্র করার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম চালু হয়নি। কেউ আগে কেউ পরে এসে ধর্মীয় এই ফরজ বিধান আদায় করে নিত। ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ-সম্প্রীতির প্রতি আহ্বানকারী প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম কীভাবে মেনে নিতে পারেন? তাই একদিন তিনি এই বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি পরামর্শসভার আয়োজন করলেন। যেখানে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করা হলো যে, মুসলিমরা কখন নামাজের জন্য একত্র হবে, আর সেজন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করা

---

৮৮. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৩৮১

হবে, সবাইকে এই বিষয়ে আরও চিন্তাভাবনা করতে বলে সেদিনের মতো সভা শেষ করেন। কিন্তু চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হলো না।

কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী সেই রাতেই মহান আল্লাহ সাতজন সাহাবিকে আর অন্যান্য বর্ণনা অনুযায়ী দুজন সাহাবি উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-কে স্বপ্নে নুরানি চেহারার অধিকারী একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে দেখান। যিনি তাদেরকে বর্তমানে প্রচলিত আজানের বাক্যগুলো শিক্ষা দেন। যার মাধ্যমে আজও মুসলিমরা নামাজের সময় হলে সবাইকে একত্র হওয়ার জন্য আহ্বান করে।

এই বরকতময় স্বপ্ন দেখার পর যখন সকাল হলো, তখন সাহাবিরা অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে স্বপ্নে দেখা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন এবং স্বর্গীয় দূতের শিখিয়ে দেওয়া আজানের বাক্যগুলোও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোনালেন। দেখা গেল সবাই একই স্বপ্ন দেখেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার স্বপ্নের বিবরণ শোনার পর বললেন, সুবহানাল্লাহ! এই বাক্যগুলো দিয়েই তো আজানের সূচনা হওয়া উচিত। অতঃপর তিনি বেলাল রা.-কে লক্ষ করে বললেন, যেহেতু তোমার কণ্ঠ সুন্দর তাই তুমিই আজান দেওয়ার এই সম্মানিত দায়িত্ব গ্রহণ করো। বেলাল রা. তখনই ফজরের নামাজের জন্য আজান দিলেন। আর এভাবেই এমন হৃদয়কাড়া পবিত্র আওয়াজের সূচনা হলো। যা শুনে প্রতিটি মুমিন-মুসলিমের হৃদয় প্রভুর ইবাদতের জন্য উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে।

ভ্রাতৃত্ববন্ধন

হিজরতের প্রথম বছরে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির মাঝে অন্যতম হলো 'ভ্রাতৃত্ববন্ধন' প্রতিষ্ঠার ঘটনা। ইসলামের ভালোবাসায় নিঃস্ব হয়ে যে-সকল মুসলিম নিজেদের প্রিয় মাতৃভূমি, ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে মদিনায় হিজরত করে এসেছিলেন, তাদের না ছিল একটু থাকার জায়গা, না ছিল টাকাপয়সা। তাই তাদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। যাতে করে তারা পেরেশানি ও মুসিবতের চোরাবালিতে হারিয়ে না যায়। এই কারণেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববি নির্মাণ হওয়ার পর সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও ইসলামি ভ্রাতৃত্বের ওপর এমন এক আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য দিয়েছিলেন, যার প্রতিটি শব্দ শ্রোতাদের হৃদয়ে রেখাপাত করেছিল। বক্তব্য শেষে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের লক্ষ করে বলেন,

যদিও এখনো মুহাজিররা তোমাদের ঘরেই অবস্থান করছে। কিন্তু তাদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। তারা আদৌ চায় না যে তারা পায়ের ওপর পা তুলে বেকার বসে থাকবে আর তোমরা কামাই-রোজগার করে তাদের খাওয়াবে। তারা নিজেদের হাত এবং শক্তি দিয়ে কামাই করতে চায়। পরিশ্রম করে খেতে চায়। কিন্তু কাজ শুরু করার জন্যও তো পুঁজির প্রয়োজন হয়। আর তোমরা তো ভালো করেই জানো যে, তাদের কাছে এই ধরনের কোনো পুঁজি নেই। তাই জরুরি হলো তোমরা কথায় কাজে সর্বদিক দিয়ে তাদের সহযোগিতা করবে এবং নিজের আপন ভাইয়ের ন্যায় তাদের বুকে আগলে নেবে।

এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মুহাজির ও একজন আনসারকে দাঁড় করিয়ে দুজনের হাত এক করে দিয়ে বললেন, আজ থেকে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই। এভাবে সমস্ত মুহাজিরকে তিনি আনসারদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। ইতিহাসে এই অসাধারণ ঘটনাটি ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। ইতিহাস সাক্ষী, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে যে বন্ধন জুড়ে দিয়েছিলেন, রক্তের সম্পর্কের চেয়েও তা স্বতন্ত্র একটি মজবুত সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল। এমনকি কোনো আনসার সাহাবি যদি ইন্তেকাল করতেন, তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদের মালিক হতেন তার মুহাজির ভাই। আর আপন অমুসলিম আত্মীয়রা তা থেকে বঞ্চিত হতো। প্রত্যেক আনসার সাহাবি তার ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদকে দুভাগ করে অর্ধেক তার মুহাজির ভাইকে দিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি যার ঘরে দুজন স্ত্রী ছিল, তিনি একজনকে তালাক দিয়ে নিজের মুহাজির ভাইয়ের সঙ্গে তাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। ভ্রাতৃত্ববন্ধন তৈরি হওয়ার পর মুহাজিরদের আর্থিক কষ্ট দূর হয়ে গেল। বাকি রইল ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের কথা। ইসলামের ভালোবাসায় তারা তো সেসব মক্কায় ফেলে এসেছিলেন। তাই এখন তাদের সেসবের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তা ছাড়া আনসার সাহাবিরাই ছিল এখন তাদের প্রকৃত বন্ধু ও আপন ভাই। তাদের ঘরই ছিল মুহাজিরদের নিজেদের ঘর।

ইহুদিদের কয়েকটি গোত্রের ষড়যন্ত্র

মদিনার আশেপাশে এমন অনেক গোত্র বসবাস করত, যারা বংশীয়ভাবে আরব হওয়া সত্ত্বেও ইহুদি হয়ে গিয়েছিল। তারা সবসময় কোনো না কোনো ফেতনা-ফাসাদ ও গোলযোগ তৈরি করে রাখত। এমনকি পুরো আরবে

তাদের বিশৃঙ্খলা ও ফেতনা-ফাসাদের কথা উপমা হিসাবে ব্যবহার হতো। সবসময় তারা রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনাশে কোনো না কোনো ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করে রাখতই। তাদের মধ্যে তিনটি গোত্র নিজেদের সীমালঙ্ঘন ও বিশৃঙ্খলার জন্য বেশি প্রসিদ্ধ ছিল। তারা হলো বনু কাইনুকা, বনু নাজির ও বনু কুরাইজা। এটা কীভাবে সম্ভব যে দোজাহানের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আসার পরও তাদের ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে অবগত হবেন না? তিনি যখন এমন বেদনাদায়ক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তাঁর শান্তি ও সন্ধি প্রতিষ্ঠার চেতনায় যেন ভূমিকম্প শুরু হলো। তাদের এসব চক্রান্ত ও নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের কথা ভেবে তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ইহুদিদের এই তিন গোত্রের নেতাদেরকে ডেকে এনে উপদেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহর জমিনে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো না। নিজেদের অধীনস্থ লোকদেরকে শান্তি ও কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করো। নিরপরাধ ও অসহায় মানুষের রক্তে মরু-আরবের ধুলোবালিকে রক্তাক্ত করো না। যদি তোমরা আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে ভদ্র এবং ভালো আচরণ করো, তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে ভদ্র এবং ভালো আচরণ করব। তোমাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবো।

ইহুদি নেতারা তাঁর সত্যাশ্রিত এই কথাগুলো মেনে নিলো এবং সে অনুযায়ী কাজ করার অঙ্গীকার করে বিদায় নিলো।

সৃষ্টিজীবের সর্দার প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান্তি ও নিরাপত্তায় আগ্রহী হৃদয় শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথা আর ওয়াজ-নসিহতকেই যথেষ্ট মনে করলেন না, বরং মৌখিকভাবে অঙ্গীকার করার অল্প কয়েকদিন পরেই পুনরায় তিনি ইহুদি নেতাদেরকে ডেকে এনে একটি লিখিত শান্তিচুক্তি প্রস্তুত করলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের ঐকমত্যে এই চুক্তিপত্রে ইহুদিদের সঙ্গে মদিনার অন্যান্য মুশরিকরাও শরিক ছিল।

চুক্তিপত্রের কিছু শর্ত

এক. মদিনা মুনাওয়ারায় যদি কোনো বহিঃশত্রু আক্রমণ করে, তাহলে এখানকার অধিবাসীরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের মোকাবিলা করবে এবং শহরকে শত্রুদের আক্রমণ হতে রক্ষা করবে।

দুই. মদিনার ইহুদিরা মক্কার কুরাইশ বা তাদের মিত্রদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে পারবে না।

তিন. মদিনার অধিবাসীরা কেউ কারও ধর্ম পালন কিংবা ধনসম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

চার. মদিনার অধিবাসী গোত্রগুলোর মধ্য হতে যদি দুই গোত্রে কোনো কারণে সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দেয় এবং কোনোভাবেই তারা নিজেদের সংকটের সমাধান করতে না পারে, তাহলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দুপক্ষের মধ্যে মীমাংসা করবেন। তিনি যে ফয়সালা করবেন তা দু-পক্ষকেই কোনোরূপ আপত্তি উত্থাপন ছাড়াই মেনে নিতে হবে।

পাঁচ. যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও রসদসামগ্রী ক্রয়ে সব গোত্রই সমানভাবে অংশ নেবে।

ছয়. যে গোত্রগুলোর সঙ্গে মদিনার ইহুদিদের বন্ধুত্ব রয়েছে, মুসলিমরাও তাদেরকে নিজেদের বন্ধু মনে করবে। আর যে গোত্রগুলোর সঙ্গে মুসলিমদের সন্ধিচুক্তি হবে, ইহুদিরাও তাদের সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় আচরণ করবে।

সাত. মদিনার ভেতরে সব ধরনের মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তপাত করাকে অবৈধ মনে করতে হবে।

আট. সর্বোপরি মজলুম-নিপীড়িত মানুষের সাহায্য করাও সবার ওপর অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।

এইসব শর্তই নেতারা আনন্দচিত্তে মেনে নিলেন এবং স্বেচ্ছায় সানন্দে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। শান্তি, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণের বিষয়টি মাথায় রেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই চুক্তিপত্র প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পরও মদিনার দূরবর্তী গোত্রগুলোকে তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তাঁর এই আহ্বান সফলও হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ওয়াদ্দান নামক এলাকা, যা মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি অবস্থিত, সেখানে সফর করেছিলেন এবং বনু হামজা, ইবনে বকর, ইবনে আবদে মানাফ গোত্রকে এই চুক্তিতে আবদ্ধ করে তাদের সর্দার আমর ইবনে বখশির কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও বুওয়াত ও জুল আশিরাহ পাহাড়ের অধিবাসী লোকদেরকে এবং বনু মুদলাজ গোত্রকেও এই চুক্তিতে আবদ্ধ করেন।

এই চুক্তির দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

সুহৃদ পাঠক, এই চুক্তিপত্রের শর্তগুলো পাঠ করার পরে এখন আমরা সহজেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবন করতে পারি।

এক. এই চুক্তির সব শর্ত, বিশেষ করে চার নম্বর শর্ত দ্বারা দিবালোকের ন্যায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মদিনাবাসী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসাধারণ সম্মান ও বড়ত্বের কথা খুব ভালোভাবেই অনুভব করেছিল। এই অল্প সময়েই তারা বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, নবীজির বুকে শান্তি, নিরাপত্তা ও সৌহার্দ-সম্প্রীতির চেতনায় উদ্ভাসিত ন্যায়পরায়ণ ও নিঃস্বার্থ একটি হৃদয় রয়েছে। এই চুক্তিনামা যেন চিৎকার করে করে পুরো পৃথিবীকে জানিয়ে দিচ্ছিল যে, দেখো দুনিয়াবাসী দেখো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় এসেই তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতার বলয় তৈরি করে নিয়েছেন। বড়-ছোট সবার হৃদয়েই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। তাঁর উত্তম চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলি সবার হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিল।

দুই. ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষই অবচেতন মনে তাঁর দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও সুমহান চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য ছিলেন। তৎকালীন আরবের সঠিক অবস্থা বিবেচনা করে যদি আমরা এই শর্তগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিই, তাহলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসবে যে, সেই সময় এই শর্তগুলো কতটা যৌক্তিক ও সময়োপযোগী ছিল। সত্যিই এটা কোনো সাধারণ মস্তিষ্কের কাজ নয়।

দ্বিতীয় হিজরি

কেবলা পরিবর্তনের গোলযোগপূর্ণ ঘটনা

দ্বিতীয় হিজরির প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলোর মধ্য হতে কেবলা পরিবর্তনের গোলযোগপূর্ণ ঘটনাটি একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ ঘটনাটি মূলত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিমদের ঈমানের পরিপক্বতা ও রাসুলের প্রতি তাদের আনুগত্য ও ভালোবাসার পরীক্ষা ছিল।

বিস্তারিত ঘটনা হলো, প্রথমদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়তেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিসগণ একমত যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় যাওয়ার পর ১৬ মাস পর্যন্ত এভাবেই নামাজ পড়েছেন। এরপর তাঁর হৃদয়ে কাবাঘরের দিকে ফিরে প্রিয়তম প্রভুর সঙ্গে গোপন আলাপ করার আগ্রহ হলো। অত্যন্ত বিনয়কাতর হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ, আপনি কাবাকে কেবলা বানিয়ে দিন! অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধুর ডাকে সাড়া দিলেন। দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসের ১৫ তারিখ

সোমবার দিনে আয়াত নাজিল হলো। তাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সকল উম্মতকে কাবা অভিমুখী হয়ে নামাজ পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববিকে কাবামুখী করে দিলেন। আর এই কাজ করতে গিয়েও তিনি আপন অভ্যাস অনুযায়ী সাধারণ মুসলিমদের সঙ্গে নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন থেকেই মুসলিমরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কাবাঘরের দিকে ফিরে নামাজ পড়তে লাগল।

ইহুদিদের গোলযোগ

ইহুদিরা যখন কেবলা পরিবর্তনের সংবাদ শুনতে পেল, তখন তারা তা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। তাদের রাগান্বিত হওয়ার কারণ ছিল, এতদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমরা তাদের কেবলা অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়তেন। এটা তাদের জন্য অনেক গৌরব ও সম্মানের বিষয় ছিল। এখন কেবলা পরিবর্তন হওয়াকে তারা নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাবের ওপর চরম আঘাত মনে করল। তাই দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলিমদেরকে রাসুলের আনুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করতে লাগল। তারা সবাইকে এই কথা বোঝাতে চেষ্টা করল যে, কেবলা কোনো পরিবর্তন হওয়ার মতো বিষয় নয়। তারা তাদের সম্ভাব্য সব উপায়ে মুসলিমদেরকে কেবলা পরিবর্তনের আদেশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে চেষ্টা করল।

মুসলিমদের শান্তশিষ্ট নিরাপদ ভূমিতে ফেতনা-ফাসাদ আর বিশৃঙ্খলার আগুন তো জ্বলবেই। কেননা এক আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ইতিপূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কেবলা হিসাবে নির্ধারণ করার মূল কারণ ছিল, পরবর্তী সময়ে যখন কেবলা পরিবর্তন করার আদেশ দেওয়া হবে, তখন যেন রাসুলের অনুসারীদের ঈমানি পরীক্ষা নেওয়া যায়। যাতে করে এই কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, প্রকৃতপক্ষে কারা রাসুলের আদেশ মানতে প্রস্তুত আর কারা তাঁর আদেশ অমান্য করে। সুতরাং যারা মূলত আল্লাহর বিধান পালন করতে অপ্রস্তুত ছিল, এই ঘটনা তাদের জন্য বেশ কষ্টদায়ক ছিল। আর যাদের হৃদয় হেদায়েত ও ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল, তারা নির্দ্বিধায় আল্লাহর ফয়সালার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে আসমানি বিধানকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

কেবলা নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই

যে লোকেরা নিজেদের ক্ষমতা, প্রভাব ও অহংকারকে টিকিয়ে রাখতে মুসলিমদেরকে তাদের রাসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উসকানি দিচ্ছিল, তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলা একটি আয়াত নাজিল করেন। যার সারমর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা তো সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ইবাদত-মুনাজাতের জন্য তো কোনো দিক নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কোনো বিশেষ দিকে ফিরে নামাজ পড়লেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, তিনি যদি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো একটি দিক নির্ধারণ করে দেন, তাহলে সেদিকে ফিরেই নামাজ পড়া আবশ্যক। মানুষের দৃষ্টি অস্পষ্ট ও সীমাবদ্ধ। সে কীভাবে অসীম সত্তার বিধানাবলির গূঢ় রহস্য বুঝতে সক্ষম হবে? তার কাজ হলো কোনোরূপ আপত্তি ও দ্বিধা ছাড়াই প্রভুর নির্দেশ মেনে নেওয়া।

> নিশ্চয় আল্লাহর নেককার ও অনুগত বান্দা তো সেই, যে তাঁর ওপর, তাঁর রাসুলের ওপর, তাঁর কুরআনের ওপর এবং ফেরেশতা ও কেয়ামতদিবসের ওপর ঈমান আনে এবং তাঁকে ভালোবেসেই নিজের সম্পদ হতে আত্মীয়স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও দাস-দাসীদের কল্যাণে ব্যয় করে। (সুরা বাকারা : ১৭৭)

এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলিমদের ঈমানও মজবুত হয়ে গেল। আর সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে যেন পানি ঢেলে দেওয়া হলো। পরিবেশ আবারও শান্ত হয়ে গেল। ইহুদিদের গোলযোগের সব অপচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। সর্বশক্তি ব্যয় করেও তারা কিছুই করতে পারল না।

বদরের যুদ্ধ

মুশরিকদের ফেতনা-ফাসাদ

সুহৃদ পাঠক, সৃষ্টিকুলের সর্দার, অত্যন্ত দয়ালু ও সহনশীল, সৌহার্দ-সম্প্রীতির প্রতি আহ্বানকারী প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এবার সেই কোলাহলময় মুহূর্তটি এসে গেল, যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে তাকে এই আদেশ দিতে হলো যে, মুসলিমরা যদি নিজেরা জীবিত থাকতে চায় এবং ইসলামকে জীবিত দেখতে চায়, তাহলে সত্যের পক্ষে এবার নাঙ্গা তরবারি হাতে নিতে হবে। প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা মক্কার

কুরাইশদের ফেতনা-ফাসাদ আর জুলুম-নিপীড়ন এখন ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা তাদের শয়তানি শক্তি, কুটিল চাল ও গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের সবুজ-শ্যামল বাগানকে বিরান করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করেনি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের সমস্ত অপচেষ্টার ঝঞ্ঝাবায়ু ইসলামের বাগানে প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ুর ন্যায় দোলা দিয়ে গেছে এবং সত্যের সবুজ-শ্যামল বাগানে ফোঁটা ফোঁটা আবেহায়াত ছিটিয়েছে।

মুসলিম রক্তে তৃষ্ণার্ত মুশরিক

বারবার ব্যর্থতা ও হেরে যাওয়ার গভীর অনুভূতি তাদের হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিলো। এবার তারা মরণপণ সিদ্ধান্ত নিলো, প্রতিদিনের এসব ঝগড়াঝাঁটি ও খিটিমিটি আর ভালো লাগে না। এবার যা করার একদিনেই করে ফেলবে। এই ধর্মত্যাগীদের নিঃশেষ করেই আমরা শান্ত হব। এখন সময় এসেছে বিশাল একটি দুঃসাহসী বাহিনী গঠন করার। যারা মুসলিমদেরকে চিরতরে এই ভূমি হতে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

তাওহিদি জনতার প্রতিরোধ

তাদের এমন ষড়যন্ত্রের কারণে দয়া-অনুগ্রহ, বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির প্রতি সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা থাকার পরেও সত্য ও হকের নিরাপত্তায় মুসলিমরা প্রতিরোধ করতে বাধ্য হলেন। সেই কঠিন মুহূর্তে যদি দয়াময় প্রভু তাঁর বান্দাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিতেন, তাহলে ওই আল্লাহদ্রোহীদের জুলুম-নিপীড়ন ও কুফর-শিরকের কালো পানিতে মুসলিমরা হয়তো ভেসে যেত। জুলুম ও পৈশাচিকতার সেই বিশাল সমুদ্র দেখেও যদি মহান পরাক্রমশালী প্রভুর রাগ ও ক্রোধের আগুন প্রজ্বলিত না হতো, তাহলে আজ পৃথিবীর মানচিত্র হতে মুসলিমরা একটি ভুল শব্দের ন্যায় মিটে যেত। আরবের কুফরিভূমিতে এমন কোনো ঘাড় থাকত না, যা তাঁর মহান দরবারে সেজদায় নুয়ে পড়বে। এমন কোনো হৃদয় থাকত না, যেখানে তাঁর ইবাদতের আগ্রহ-উদ্দীপনা ও তাঁর ভালোবাসা বসত করবে।

রহমতের ঢেউ

মহান পরাক্রমশালী প্রভু যখন দেখলেন, মিথ্যার ধ্বজাধারী বিশাল ফেরাউনি বাহিনী সত্যের ধারকবাহক গুটি কতক অসহায় মুসলিমদের পবিত্র মাথাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, কুফরির নাপাক আঘাতে তাদের বুক বিদীর্ণ করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে মাঠে নেমেছে এবং সেই মুহূর্তটিও খুবই

সন্নিকটে এসে গেছে, যখন তাঁর প্রিয় বান্দারা শয়তানের দোসরদের তরবারির আঘাতে জমিনে পড়ে ছটফট করবে, তখন তাঁর আত্মমর্যাদায় জোশ উঠল, তাঁর রাগের সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ ঢেউ খেলতে শুরু করল।

তিনি সবচেয়ে মর্যাদাবান ফেরেশতা জিবরাইল আ.-কে আদেশ দিলেন, যাও, ইসলামের দয়ালু ও সহনশীল নবীকে আমার পক্ষ হতে এই বার্তা পৌঁছিয়ে দাও যে, তিনি যেন তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে ইসলামের হেফাজতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হন এবং ইসলামের ভালোবাসায় হক-বাতিলের এই বাঁচা-মরার লড়াইয়ে নাঙ্গা তরবারি হাতে ময়দানে অবতীর্ণ হন।

প্রভুর ভালোবাসার শরাবে বিহ্বল মুসলিমরা এমন খবর শুনে ভালোবাসার পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। ভালোবাসার কুরবানির ময়দানে নিজেদের সর্বস্ব বিলীন করে দিতে, মায়ের বুক খালি করতে, স্ত্রীর সোহাগের বাঁধন ছিন্ন করতে এবং সন্তানদেরকে এতিম করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এবং এই মুষ্টিমেয় মানুষই বিশাল ফেরাউনি বাহিনীকে কচুকাটা করে মরুভূমির তপ্ত বালুতে ফেলে রাখল।

মিথ্যার পূজারিদের কি ধারণা ছিল যে, তাদের এইসব ষড়যন্ত্রের হেমন্তবাতাসেই ইসলামি বাগানের ফুলের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে? তারা ভেবেছিল মুষ্টিমেয় মুসলিমদের রক্তে তারা নিজেদের তপ্ত মরুদ্যানকে সিক্ত করবে। যেন ইসলামি বাগানের ফুলগুলো রসকষহীন নির্জীব নিস্পন্দ হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিমদের সঙ্গে ছিল আল্লাহর রহমত আর মুশরিকদের সঙ্গে ছিল শয়তানের দোসর। মুসলিমবাহিনীর তাকবির ধ্বনিতেই শয়তানি শক্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে খড়কুটার ন্যায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রইল। যারা মুসলিমদের রক্তপিপাসায় কাতর হয়ে এসেছিল, তারা নিজেরাই ইসলামি বাগানের ফুল ও ফুলকলিদেরকে নিজেদের রক্ত পান করিয়ে বিদায় নিলো। যে কারণে ইসলামের এই সবুজ-শ্যামল বাগানে এমন এক বসন্তের আগমন ঘটল যে, কেয়ামত পর্যন্ত আর কখনো হেমন্তের আগমনের ভয় রইল না। হক-বাতিলের এই লড়াইয়ের পরই ইসলাম পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল এবং আজও দাঁড়িয়ে আছে।

দিনকানা লোকদের অপবাদ

যে-সমস্ত সাম্প্রদায়িক, দিনকানা বুদ্ধিজীবী নিজেদের দৃষ্টিতে জাতির শস্যাগারে সবসময় নেফাকের আগুনই দেখতে পায় এবং এতেই তারা মজা পায়, তারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বাস্তবতাকেও মিথ্যা ও ছলচাতুরির

অন্ধকার মোহে লুকিয়ে ফেলার অপচেষ্টা করে। তারা সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে এই কথা বলতে থাকে যে, ইসলামের নবী তার অনুসারীদেরকে লুটপাট, খুনখারাবি ও রক্তপাতের উদ্দেশ্যে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন এবং পুরো আরবে রক্তের হোলিখেলা চালু করেছেন। কিন্তু যে-সমস্ত বিবেকবান মানুষ ইসলামি বিধান ও নীতিমালাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন, তারা এ কথা বুঝতে পারবেন যে, ইসলামবিরোধীদের এই সমস্ত কথা বাস্তবতাকে চরম অপমান ও তিরস্কার করা এবং একটি সন্দেহাতীত বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়।

ইসলামের যুদ্ধবিধান

ইসলামের যুদ্ধবিধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে স্বতন্ত্র একটি বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন। তাই এখানে সেই বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। এটি স্বতন্ত্র একটি বিষয়। অচিরেই আমি এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা করেছি। এখানে আমি শুধু সেসব কারণ ও ঘটনার ওপরই সামান্য আলোকপাত করব, যেগুলো ইসলামের প্রথম যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে লোকদের হৃদয়ে এখনো সাম্প্রদায়িকতার মরিচা পড়েনি, যাদের সুস্থ মস্তিষ্ক এখনো সাম্প্রদায়িকতার পাগলামিতে বিকৃত হয়নি, তারা যদি আমার সামনের আলোচনা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন, তাহলে তারাও আমার সঙ্গে এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করবেন যে, দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্য ইসলাম যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করেনি, বরং তাদের উদ্দেশ্যই ছিল বাতিলের বিষবাষ্প হতে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলাকে নিরাপদ রাখা।

একটি অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি

আমার এই মতামতকে কেউ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ভাববেন না। কারণ, মূর্তিপূজার দোলনাতেই আমি বেড়ে উঠেছি। ছেলেবেলার পুরো সময়টাই আমি পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরিকৃত মূর্তির পূজারিদের মধ্যে কাটিয়েছি। আজও আমি এমন লোকদের মধ্যেই বসবাস করি, গঙ্গার জলকে যারা পাপের পঙ্কিলতা হতে পবিত্র হওয়ার মাধ্যম মনে করে। চন্দনের টিকাকে যারা মুক্তির অসিলা মনে করে। আমার এই কথাগুলো হৃদয়ের গহিন কোণ থেকে উদ্‌বেলিত হয়ে বেরিয়ে আসছে। এই কথাগুলো এমন এক অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা লালনকারীর হৃদয়ের ব্যাকুলতা হতে উচ্চারিত হচ্ছে, সত্যান্বেষণের ব্যাকুলতায় যার জীর্ণ-শীর্ণ ও ক্ষীণকায় শরীর ছটফট করছে। আমি হৃদয়ের ভাষাতেই কথা বলি। সত্য প্রকাশে আমি কারও

এতটুকুও পরোয়া করি না যে, তার হৃদয়ে আমার কথাগুলা হয়তো কাঁটা হয়ে বিঁধবে কিংবা কারও পুরোনো কোনো ক্ষতে অলৌকিক উপশমের কাজ করবে। আমি এজন্য নিজেকে অত্যন্ত গর্বিতও মনে করি।

কারও কারও বিশ্বাস, মক্কায় অবস্থানের সময় যে মুসলিমদের ওপর সীমাহীন পৈশাচিক নিপীড়ন করা হয়েছিল, এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। সেখানকার প্রতিটি মুহূর্ত তাদের জন্য নতুন নতুন বিপদাপদ নিয়ে হাজির হতো। জীবনটা বিতৃষ্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মদিনায় হিজরতের পরেই তারা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছিল। আত্মরক্ষার শক্তি ও সক্ষমতা অর্জন করেছিল। যেন স্বাধীনতার সুখময় জান্নাতে তারা প্রবেশ করেছিল। সেখানে না ছিল কোনো পেরেশানি, না ছিল কোনো দুঃখদুর্দশা। মূলত এই ধরনের বিশ্বাস যারা লালন করেন, তারা ইসলামি ইতিহাসের অভূতপূর্ব ত্যাগ, সহনশীলতা ও অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অসাধারণ অধ্যায়গুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেননি।

পবিত্র মক্কাভূমিতে তো শুধু মুশরিকদের জ্বালাতন ছিল, কিন্তু মদিনায় এসে মুসলিমরা তিনটি বড় বড় শত্রুর কবলে পড়ল। প্রথমত মদিনার ইহুদি সম্প্রদায়, কেবলা পরিবর্তনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে মুশরিকদের লেখা গোপন পত্র এদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। দ্বিতীয়ত একদল মুনাফেক, যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিলেও প্রতিনিয়ত ইসলাম ধ্বংসের কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্র তৈরিতে ব্যস্ত থাকত। ইসলামের ফুলে-ফলে হতে থাকা বাগানকে বিরান করে দিতেই তারা মুসলিম হয়েছিল। তৃতীয়ত মক্কার কুচক্রী ও ইসলামবিদ্বেষী কুরাইশশক্তি, মুসলিমদের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা নিয়েই যাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল—সেই বিরোধ ও শত্রুতার আগুন তো এখন আরও বেশি দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে। কারণ, তাদের উপাস্যদের শত্রু মুসলিমরা তাদের হাত থেকে পলায়ন করে এখন মদিনায় শান্তিতে বসবাস করছে। তা কি সহ্য করা যায়? এভাবে মুসলিমদের পলায়ন করাকে তারা নিজেদের চরম ব্যর্থতা ও পরাজয় মনে করছিল। তাই প্রতিনিয়ত ইসলাম ধ্বংসের নীল নকশা তৈরিতে তারা কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছিল। হাতে গড়া এই নির্বোধ-নিশ্চুপ মূর্তিদের সম্মানে প্রয়োজনে তারা নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিতেও প্রস্তুত ছিল।

মদিনায় আবু জাহলের প্রতারণার ফাঁদ

হজ কিংবা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার মতো ক্ষমতা কোনো মুসলিমের ছিল না। কোনো দুঃসাহসী মুসলিম যদি এমন কাজ করে বসত, তাহলে মিথ্যার পূজারিদের অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হতো।

একবার ইসলাম ও ইসলামের নবীর চিরদুশমন আবু জাহল তার ষড়যন্ত্র বিস্তারের উদ্দেশ্যে মদিনায় আগমন করে। ফিরে যাওয়ার সময় আব্বাস ইবনে রবি রা.-কে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে মক্কায় নিয়ে গেল। মক্কায় এসে তার ওপর কুখ্যাত এই জালেম অত্যন্ত নির্মমভাবে নির্যাতন করে এবং কয়েদখানায় বন্দি করে রাখে।

মদিনার চারণভূমিতে মুশরিকদের লুটতরাজ

মক্কার মুশরিকদের হৃদয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিশোধের আগুন যে কতটা ধিকিধিকি জ্বলছিল, এই ঘটনা থেকেই তা অনুমান করা যায়। কুরজ ইবনে জাবের নামক মক্কার এক সর্দার প্রায় ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করে মদিনায় পৌঁছল এবং সেখানকার এক চারণভূমিতে হামলা করে মুসলিমদের অনেকগুলো উট চুরি করে নিয়ে গেল। মুসলিমরা এই লুটতরাজের খবর পেয়ে সফওয়ান নামক স্থান পর্যন্ত শত্রুর পিছু নিলো। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, কুরজ ইবনে জাবের এতগুলো উট নিয়ে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। আগে থেকেই মক্কার লোকেরা মুসলিমদের প্রকাশ্যে যুদ্ধের হুমকি দিত। আর আজ এমন নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে তারা মুসলিমদের হতবাক করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা এটাও বুঝিয়ে দিলো যে, ৩০০ মাইল দূর থেকে এসেও তোমাদের সম্পদ লুটে নিতে পারি।

মক্কার লোকদের হুমকিপত্র

ফেতনা-ফাসাদ, লুটতরাজ আর যুদ্ধের হুমকি-ধমকিতেই মুশরিকরা বসে থাকেনি, বরং মদিনার নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল ও ইহুদিদের সম্মিলিত ঐক্য পরিষদকে এই হুমকিপত্র পাঠাল যে, মুহাম্মাদ আমাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তোমরা তাকে আশ্রয় দিয়েছ। আল্লাহর কসম খেয়ে আমরা লিখছি, হয়তো তোমরা এই লোককে হত্যা করবে অথবা মদিনা থেকে বের করে দেবে, অন্যথায় আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হব। কুরাইশের বীরবাহাদুর যুবকরা তোমাদের পুরুষদেরকে তাদের তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে এবং মহিলাদেরকে দাসী বানিয়ে রাখবে।

নবীজির প্রতি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর হিংসা

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মদিনার এক পূজনীয় ব্যক্তি ছিল। তার প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিধি ছিল বিস্তৃত। আউস ও খাজরাজের লোকেরা তো তার বিশেষ অনুরাগী ছিলই, মদিনার অন্য গোত্রগুলোও তাকে বেশ মান্য করত। এককথায় সে পুরো শহরের মুকুটহীন সম্রাট ছিল।

সেখানকার অধিবাসীদের ইচ্ছা ছিল, মদিনা শহরে ধুমধাম করে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে এবং সেই অনুষ্ঠানে সবার মতৈক্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে মদিনার সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। পুরো শহরের অলিগলিতে তার নেতৃত্বের কথা ঘোষণা করে দেওয়া হবে। এমনকি তার মাথায় পরানোর জন্য একটি মুকুটও তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা বোঝার সাধ্য কার? মদিনার ভূমিতে তার বাদশাহির রঙিন স্বপ্ন তো ধুলোয় মিশে গিয়েছিল। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে মনোনীত হলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবিরা হিজরত করে মদিনায় আগমন করার পরে আউস-খাজরাজ ছাড়াও বিশাল একটি জনগোষ্ঠী তাকে নিজেদের রাহবার ও নেতা হিসাবে মেনে নিলো, বিশেষ করে আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদের মধ্যে ইসলামের প্রভাবটা বেশি পড়েছিল। কারণ, তাদের গোত্রের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিল। সর্বশেষ তারা যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে স্বীকার করে সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে নিলো, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের বাদশাহির স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো। নিজের এতদিনের লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন-সাধনা এভাবে মাটি হয়ে যাওয়ায় তার ঘৃণা ও ক্রোধের অন্ত ছিল না। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে লাগল। কিন্তু লোকটি বেশ চালাক ও সচেতন ছিল। সে জানত, এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করা মানে নিজেই নিজেকে অপদস্থ করা। তাই মুখ বন্ধ রাখলেও ঘৃণা ও হিংসার আগুনে সারাক্ষণ তার ভেতরটা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। সে এমন একটি মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় ছিল, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রতিশোধ নিয়ে সে নিজের হৃদয়ের আগুন নেভাবে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পরামর্শসভা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল, এবার মক্কার কুরাইশদের প্রেরিত হুমকিপত্র পেয়ে সে যেন পুরোই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। চিঠি পড়তেই বিদ্যুৎগতিতে তার মস্তিষ্কে একটা ষড়যন্ত্র খেলে গেল। সে ভাবল, প্রতিশোধের আগুন নেভানোর এই তো সুবর্ণ সুযোগ। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে তার অধীনস্থদের নিয়ে গোপনে পরামর্শসভায় বসল। তাদেরকে কুরাইশদের হুমকিপত্র পড়ে শোনাল। ইসলামের নবী ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিয়ে উপস্থিত লোকদেরকে উত্তেজিত করে তুলল। কে জানে, হয়তো সেদিন মদিনার অলিগলিতে রক্তের হোলিখেলা শুরু হতো। কিন্তু সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির জন্য যিনি নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করেছিলেন, সেই মহান নেতা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজের গোপন ষড়যন্ত্র ও মক্কার কুরাইশদের হুমকিপত্রকে কাজে লাগিয়ে শহরের শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সংবাদ শুনেই অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। তবে, তিনি সেসব লোকের মতো ছিলেন না, যারা অল্পতেই ভেঙে পড়ে। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে ইসলামবিরোধীদের গোপন পরামর্শসভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ইসলামবিরোধীদের সভায় নবীজির ভাষণ

সভায় পৌঁছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট ভাষায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সামনে সন্ধি এবং সৌহার্দ-সম্প্রীতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তোমাদের ধনসম্পদ ও স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি তোমাদের সঙ্গে বসবাসরত মুসলিমরা যতটা সহমর্মী হবে, মক্কার কুরাইশরা ততটা হবে না। তারা তো তোমাদেরকে নিজেদের অত্যন্ত গোপন ফাঁদে ফেলে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। যদি তোমরা তাদের প্রতারণা ও উসকানিতে উত্তেজিত হয়ে অপরিণামদর্শী কোনো কাজ করে বসো, তাহলে মনে রেখো, তোমাদেরকে তার কঠিন মূল্য দিতে হবে। কুরাইশের লোকেরা যদি মদিনায় হামলাও করে তাতেও আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। কারণ, তখন আমরা মদিনাবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের মোকাবিলা করতে পারব। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের প্রতিবেশী মুসলিমদের থেকে নিরাশ হয়ে যাও, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

তখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের ভাই-বন্ধু, আত্মীয়স্বজনদের ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠবে। তাই এই মুহূর্তে করণীয় হলো মক্কার কুরাইশদের হুমকিপত্রের নির্দেশনামতে আমল করতে অস্বীকার করা এবং আমাদের সঙ্গে তোমাদের যে শান্তি ও সন্ধিচুক্তি হয়েছে, তা যথাযথভাবে পূর্ণ করা। এতেই সবার মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যৌক্তিক আলোচনায় উপস্থিত লোকদের টনক নড়ল। তারা তাঁকে সমর্থন করতে বাধ্য হলো। নবীজির হৃদয়ের ব্যাকুলতামিশ্রিত কথায় তাদের ক্রোধের প্রজ্বলিত আগুন ঠান্ডা হলো। তাঁর অসাধারণ বিচক্ষণতা ও সময়োপযোগী পদক্ষেপে মদিনার অলিগলি আপন মায়ের সন্তানদের রক্তে রঞ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পেল। উপস্থিত লোকেরা পুনরায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অঙ্গীকার করল যে, আর কখনো তারা ইসলামের বিরোধিতা করবে না। সভা ভেঙে গেল। যে যার কাজে ফিরে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর প্রতিশোধ নেওয়ার জল্পনাকল্পনা মাটিতে মিশে গেল।

মক্কার কাফেরদের বেড়ে চলা ফেতনা-ফাসাদ

উল্লিখিত ফেতনা-ফাসাদ ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামের নবী ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি কাফেরদের হৃদয়ে ঘৃণা, ক্ষোভ ও প্রতিশোধের আগুন দিন দিন কীভাবে বেড়েই চলেছিল। সকল সৌন্দর্যের আধার প্রিয়তম প্রভুর কুদরতি কদমে সেজদাবনত হওয়া কেউ আরবের জমিনে একটি প্রশান্তির শ্বাস ফেলবে, এটা ছিল তাদের সহ্যের বাইরে। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইসলামকে একটি ভুল অক্ষরের ন্যায় মিটিয়ে দেওয়ার ধ্বংসাত্মক চিন্তা-চেতনায় তাদের নাপাক মস্তিষ্ক উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। মানবতার জন্য চরম লজ্জাকর লাত-উজজার পূজা-অর্চনা তাদের দিল-দেমাগে এতটাই চেপে বসেছিল যে, বারবার নিজেদের ব্যর্থতা দেখেও তাদের হুঁশ ফেরেনি। ইসলামের সবুজ-শ্যামল ভূমি লীন করে দেওয়ার আশায় তারা সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গই প্রজ্বলিত করেছিল, যা তাদের নিজেদের ফসলিভূমিই জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে জুলুম-নিপীড়ন, কূটচাল ও ষড়যন্ত্রের কোনো নাপাক চেষ্টাই তারা বাকি রাখেনি। কিন্তু আল্লাহর কুদরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আজ পর্যন্ত কেই-বা জয়ী হয়েছে? সত্যের জন্যই হয় চিরঞ্জীব হয়ে। আর মিথ্যা? সে তো সত্যের এক ঠোকরেই অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়।

তূণীরের শেষ তির

মিথ্যার পূজারিরা মুসলিমদের বুক বিদীর্ণ করার লালসায় যতগুলো তিরই নিক্ষেপ করেছিল, সবগুলোই মহান আল্লাহর অলৌকিক ইশারায় ফিরে এসে তাদের বুকেই বিঁধেছে। তাদের ষড়যন্ত্রের তূণীর তিরশূন্য হতে চলেছিল। শুধু একটা রক্তাক্ত তিরই অবশিষ্ট ছিল। দীর্ঘদিন ধরে তারা নিজেদের প্রতিশোধের পাথরে ঘষে ঘষে যার ফলা ধারালো করছিল। কিন্তু তারা কি জানত যে, তাদের দুর্ভাগ্য তাদের এমন বালখিল্যতা নিয়ে হাসাহাসি করছিল? কারণ, সে জানত যে, মক্কার কাফেররা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসযজ্ঞ তৈরি করছে। মক্কার কুরাইশ কাফেররা হুমকিপত্র প্রেরণ করেও যখন মদিনাবাসীকে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারল না, তখন তারা নিজেরাই রাতদিন খেটে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বিশাল একটি বাণিজ্যিক কাফেলা শামের উদ্দেশে প্রেরণ করল। উদ্দেশ্য ছিল, এই ব্যবসার মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হবে, তা দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র ও রসদসামগ্রী প্রস্তুত করা হবে।

ইসলামের প্রথম যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কার কাফেরদের এমন গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তিনি এই মিথ্যার পূজারি মুশরিকদের বোকামির জন্য আফসোস করতে লাগলেন। তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে ব্যথিত হলেন। আবু সুফিয়ানের কাফেলা রওয়ানা হওয়ার এক মাস পর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা.-এর নেতৃত্বে ১০-১২ জন সাহাবিকে সার্বিক খোঁজখবর নেওয়ার জন্য পাঠালেন। আবু সুফিয়ানের কাফেলা তো শামেই ছিল। পথিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের পর্যবেক্ষকদলের লোকদের সঙ্গে শাম থেকে মালামাল নিয়ে ফেরা মক্কার কিছু লোকের সাক্ষাৎ হলো। দু-দলের কথাবার্তা একপর্যায়ে তর্কাতর্কিতে গিয়ে পৌঁছল। অবশেষে তরবারিই তাদের মধ্যে মীমাংসা করল। মক্কার দুজন লোক গ্রেপ্তার হলো এবং আমর ইবনে হাজরামি নামক এক ব্যক্তি নিহত হলো। ইসলামের প্রথম যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এটাই ছিল। মুসলিমবিশ্বের একজন মহান ইতিহাসবিদ আল্লামা তাবারি রহ. লিখেছেন, আমর ইবনে হাজরামি নিহত হওয়ার এই ঘটনা যেন মক্কার কুরাইশদের ক্রোধ ও প্রতিশোধের আগুনে তেল ঢেলে

দিলো। যে যুদ্ধগুলোতে কুরাইশরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে আরবের পুরো মরুপ্রান্তরে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল এটাই ছিল সেই যুদ্ধগুলোর প্রেক্ষাপট।

আবু সুফিয়ানের ভুলের কারণে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন

আবু সুফিয়ানের কাফেলা শামে নিজেদের ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকাকালে আমর ইবনে হাজরামি নিহত হওয়ার দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। এই দুর্ঘটনাটা কুরাইশের হিংসা ও শত্রুতার আগুনকে আরও তাতিয়ে দিলো। এদিকে আবু সুফিয়ান ও তার কাফেলা আশঙ্কাবোধ করল যে, এই মুহূর্তে নিরাপদে তাদের মক্কায় পৌঁছা সম্ভব নয়। কারণ, তাদেরকে মদিনার পাশ দিয়েই মক্কায় ফিরতে হবে। আর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মুসলিমরা তাদের কাফেলা লুট করবে।

আবু জাহলের বাহিনী

যেহেতু আগে থেকেই মক্কার কাফেররা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেহেতু এই মুহূর্তে আবু জাহলের বাহিনী প্রস্তুত করতে কোনো সমস্যাই হয়নি। ঢাল-তরবারি নিয়ে সবাই আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। এই বাহিনীতে মক্কার প্রসিদ্ধ বীরবাহাদুর যুবকরা শামিল হয়। সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার। যাদের কাছে ৭০০ উট ও ৩০০ ঘোড়া ছিল। রসদপত্রও ছিল যথেষ্ট। মক্কার সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও গোত্রপতি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কয়েকজনের নাম হলো, তুআইমা, ওবায়েদ, হারস, আবুল বখতরি, জামআ, রেফাআ, নওফল, মুনাব্বাহ, আবু কায়েস, ওকাইল, হানজালা, মাসউদ, আসি, ওয়ালিদ, উতবা, শাইবা এবং সায়েবসহ আরও অনেকে। আবু লাহাব এই যুদ্ধে বিশেষ কোনো কারণে আসতে পারেনি। তাই সে নিজের পুত্রকে প্রেরণ করল। সৈন্যদের নাচ, গান ও বিনোদনের জন্য সবরকমের ব্যবস্থা ছিল। জাতির অতীতের গৌরব ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সৈনিকদেরকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য সুন্দরী রমণীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও বাবুর্চি-চাকরবাকরসহ সব ধরনের লোকই উপস্থিত ছিল। এর দ্বারাই বোঝা যায় কাফেররা কতটা আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে মুসলিমদের ওপর চড়াও হয়েছিল।

মুসলিমদের অস্থিরতা

মদিনার মজলুম মুসলিমরা অত্যন্ত আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন। যেদিন কুরাইশদের হুমকিপত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকট পৌঁছেছিল, সেদিন থেকেই তাদের দিনের স্থিরতা ও রাতের নিদ্রা, দুটোই হারিয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সারারাত ইবাদত, মুনাজাত ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। দুশমনের অতর্কিত হামলার আশঙ্কায় রাতের বেলায় অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে মুসলিমদেরকে শুতে হতো।

জিহাদের আদেশ

যদিও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় যুদ্ধবিগ্রহ থেকে সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপনকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন, কিন্তু মক্কার কাফেরদের প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা ফেতনা-ফাসাদ ও গোলযোগের কারণে মুসলিমদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তাদের আরবীয় আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদায় আঘাত হানল। বারবার তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যুদ্ধের অনুমতি চাইতে লাগলেন। কিন্তু তিনি সবসময় ধৈর্য ও সহনশীলতার উপদেশ দিতেন। এখন যেহেতু ইসলামবিরোধীদের আস্ফালন সীমা অতিক্রম করে গেছে, সেহেতু এবার আল্লাহর পক্ষ থেকেই যুদ্ধের অনুমতি মিলে গেল এবং কাফেরদের থেকে এতদিনের জুলুম-নির্যাতনের কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেওয়ার সুযোগ হলো। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমদের হৃদয়ে দীর্ঘদিনের লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণেরও সময় হলো।

মদিনায় মুসলিমদের পরামর্শসভা

আবু জাহলের তাগুতি সেনাদল অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মদিনার দিকে আসছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা থেকে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারছিলেন। শত্রুরা যখন একেবারে নিকটে এসে পৌঁছল, তখন তিনি একটি পরামর্শসভার আয়োজন করলেন। সেখানে আবু বকর ও উমর রা.-সহ অন্যান্য বড় বড় বীরবাহাদুর সাহাবিরা অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। মুহাজিরদের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু আনসারদের ব্যাপারে তিনি কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। কারণ, তারা বাইয়াত হওয়ার সময় এই কথার স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন যে, ইসলামবিরোধীদের সঙ্গে তারা তখনই যুদ্ধ

করবে, যখন তারা মদিনায় হামলা করবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসন্ধানী দুচোখ বারবার তাদের দিকে ফিরছিল।

সাদ ইবনে মুআজ রা.-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

এই অবস্থা দেখে সাদ ইবনে মুআজ রা. উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আমাদের মতামতের অপেক্ষা করছেন? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। এটা শুনে সাদ রা. অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে তার সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন, যা সমস্ত আনসার সাহাবির হৃদয়কে উদ্‌বেলিত করে তুলল। তিনি বললেন, আমরা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাইয়াত নিয়েছি, মদিনার ইট-পাথর আর দেয়াল-দালানের নয়। আমরা আমাদের নবীজির ভালোবাসার যে চাদরে নিজেদেরকে আবৃত করে নিয়েছি, মাতৃভূমি মদিনার কোনো আকর্ষণই সেটাকে ছিন্ন করতে পারবে না। এটা কীভাবে সম্ভব যে, আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার রাহবার যুদ্ধের অন্ধকার গলিপথের দিকে বেরিয়ে যাবেন আর আমরা মদিনার ঘরবাড়িতে নিশ্চিন্তে বসে থাকব? মক্কার লোকেরা তো আমাদের মতোই মানুষ, তাহলে আমরা কেন তাদের ভয় পাব? আল্লাহর কসম! যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দেন, তাহলে আমরা তাঁর ইশারায় সাগরে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত আছি।

মিকদাদ রা.-এর তেজোদীপ্ত ভাষণ

এরপর মিকদাদ রা. উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা ইসলাম ও ইসলামের নবীর জন্য নির্দ্বিধচিত্তে শত্রুর খোলা তরবারির নিচে নিজেদের মাথা পেতে দিতে প্রস্তুত আছি। আমরা বনি ইসরাইলের সেসব লোকের মতো নই, যারা তাদের নবী মুসা আ.-কে বলেছিল, যে আল্লাহ তোমাকে তাঁর নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, তিনি কি তোমার পক্ষে লড়বে না? যাও, তুমি আর তোমার আল্লাহ মিলে যুদ্ধ করো, আমরা বসে বসে তা দেখব।

মুসলিমবাহিনীর রওয়ানা

আনসার ও মুহাজির সাহাবিরা স্বেচ্ছায় সানন্দে জিহাদের জন্য আগ্রহ দেখানোর কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মুজাহিদকে একত্র করলেন। যারা নাঙ্গা তরবারি হাতে মাথায় কাফন বেঁধে যুদ্ধের জন্য ঘর ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের

সবাইকে নিয়ে আবু জাহলের বাহিনীর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

শহর থেকে এক মাইল দূরত্বে এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্যদের গণনা করলেন। যে-সমস্ত কম বয়সী মুজাহিদ যুদ্ধের অকল্পনীয় কষ্ট ও ধকল সহ্য করার উপযুক্ত ছিল না, তাদেরকে সৈন্যদল হতে আলাদা করে মদিনায় ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। এই মুষ্টিমেয় মুজাহিদের হৃদয়ে ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার প্রেরণা ও আগ্রহ কতটা গভীর ছিল, তা বোঝার জন্য ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

আমর ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কে যখন কম বয়সী হওয়ার কারণে সৈন্যদল হতে বাদ দেওয়া হলো, তখন তিনি পায়ের গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। যেন কম বয়সী হলেও তাকে দীর্ঘকায় যুবকের ন্যায় মনে হয়। শুধু তাই নয়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকেও আল্লাহর দ্বীনের হেফাজতের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার অনুমতি দিন। এমন আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও জিহাদে শরিক হওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

মুসলিমবাহিনীর সৈন্য ও রসদস্বল্পতা

আবু জাহলের মিথ্যার পূজারি বাহিনীর তুলনায় তাওহিদের প্রাণ উৎসর্গকারী বাহিনীর সৈন্য ও রসদ খুবই অপ্রতুল ছিল। সৈন্যসংখ্যা তো এতটাই স্বল্প ছিল যে, আমর ইবনে আবু ওয়াক্কাসের ন্যায় কম বয়সী সৈনিকদেরকে বাহিনীতে শামিল করার পর সৈন্যসংখ্যা সর্বমোট ৩১৩ জন হলো। যা ছিল শত্রুবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ। আর যুদ্ধাস্ত্র ও রসদসামগ্রী এতটাই স্বল্প ছিল যে, কাফেরদের ন্যায় উন্নত অস্ত্রশস্ত্র তো দূরের কথা, সবার হাতে দেওয়ার মতো পরিপূর্ণ হাতিয়ারও ছিল না। কারও কাছে তরবারি আছে তো ঢাল নেই। তির আছে তো বর্শা নেই। বর্শা আছে তো তির-তরবারি নেই। আবু জাহলের বাহিনীতে বীর, বলবান ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যুবকরা ছিল। আর মুসলিমবাহিনীতে ছিল জীর্ণ-শীর্ণ, কঙ্কালসার দেহের অধিকারী, কম বয়সী ও দুর্বল বয়োবৃদ্ধ কিছু লোক। কাফেররা ছিল উট কিংবা অশ্বারোহী। তাদের মাথায় ছিল লোহার তৈরি শিরস্ত্রাণ। অথচ মুসলিমদের কাছে শিরস্ত্রাণ তো দূরের কথা, পর্যাপ্ত হাতিয়ারও ছিল না। তাদের কাছে সর্বসাকুল্যে ৭০টি উট

আর দুটি ঘোড়া ছিল। যুবাইর ও মিকদাদ রা. এ দুই ঘোড়ার আরোহী ছিলেন। একটি উটের ওপর তিন-চারজন সৈন্য আরোহণ করেছিলেন। অনেকেই পদব্রজে রণাঙ্গনে এসে পৌঁছেছিলেন। এতকিছুর পরও রণাঙ্গন মুসলিমদের অনুকূলে ছিল। কারণ, আল্লাহর রহমত সারাক্ষণ তাদের পাশে ছিল। আর কাফেরদের ওপর ছিল আসমানি গজব। মুসলিমদের শরীর হয়তো দুর্বল ছিল, কিন্তু তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইসলামের প্রেমের উত্তাপ ছিল। বাতিলের অনুসারীদের দেহ হয়তো সবল ছিল, কিন্তু কোনো এক অলৌকিক শক্তি তাদের ভেতরের চেতনা নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

বদরের ময়দানে

বদর মদিনা হতে প্রায় ৮০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রাম।[৮৯] এখানেই সত্য-মিথ্যার সংঘাত হয়েছিল। এখানেই ঈমান ও কুফরের সংঘর্ষ হয়েছে। এখানে মুসলিমরা নিজেদের এবং কাফেরদের রক্তে ইসলামের বাগানকে সিঞ্চিত করেছিল। সত্যের অনুসারীদের যে তরবারিগুলোতে এতদিন বেকার পড়ে থাকায় মরচে ধরে গিয়েছিল, সেগুলো এখানেই সূর্যের প্রখর রোদে চমকে উঠেছে এবং শয়তানি শক্তিগুলোর ফেরাউনের ন্যায় দাম্ভিক আর বেপরোয়া লোকদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়েছে।

মুশরিকবাহিনী আগেই রণাঙ্গনে পৌঁছে উপযুক্ত ভূমি দখলে নিয়ে সেখানে ছাউনি ফেলল। রণাঙ্গনের সকল সুযোগ-সুবিধা তারা এককভাবে দখল করে নিলো। মুসলিমরা এসে নিম্নভূমিতে অবস্থান করল। সেখানে কোনো পানির কূপ ছিল না। ভূমি এতটা বালুময় ছিল যে, উটের পা বালুতে দেবে যাচ্ছিল। তাই হুবাব ইবনে মুনজির রা.-এর পরামর্শমতে মুসলিমরা আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে একটি পানির কূপ দখলে নিলো।

উদয়াচল থেকে চলতে চলতে ক্লান্ত সূর্যটা অস্তাচলে প্রবেশ করল। একটু পরেই পুরো পৃথিবী রাতের কালো আঁধারে ছেয়ে গেল। ক্লান্ত-শ্রান্ত মুসলিম সৈনিকেরা বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়লেন, কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারারাত জেগে থেকে সত্যের বিজয়ের জন্য মহান প্রভুর দরবারে দুহাত প্রসারিত করে কাঁদতে লাগলেন। একপর্যায়ে রাতের আঁধার ভেদ করে সুবহে সাদিক উদিত হতে শুরু করল।

---

৮৯. মক্কা-মদিনার সর্বমোট দূরত্ব প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার আবু জাহলের আগ্রাসী বাহিনী মদিনার কাছাকাছি এলে মুসলিমবাহিনী শহরের বাইরে অগ্রসর হয়ে প্রতিরোধ করে।-সম্পাদক

সারিবদ্ধ বাহিনী

কাফেরদের দিক থেকে যুদ্ধের দামামা বাজতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গুটি কতক সৈনিককে সারিবদ্ধ করতে শুরু করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে একটি তির ছিল, সেটা দিয়ে ইশারা করে করে তিনি কাতার প্রস্তুত করছিলেন। মুহাজিররা সংখ্যায় ৬০ কিংবা ৮০ জন ছিলেন। তাদের পতাকা ছিল মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর হাতে। হুবাব ইবনে মুনজির রা. মদিনার খাজরাজ গোত্রের পতাকাবাহী ছিলেন। আর আউসের পতাকা ছিল সাদ ইবনে মুআজ রা.-এর হাতে।

লড়াইয়ের আহ্বান

কুখ্যাত আবু জাহল যখন সারিবদ্ধভাবে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে দেখল, তখন আরবের নিয়মানুযায়ী সে নিজের বাহিনীর তিনজন দুঃসাহসী বীরপালোয়ানকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য নির্বাচন করল। তারা হলো, উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদ ইবনে উতবা। তারা সৈন্যদল হতে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত দাম্ভিকতার সঙ্গে ময়দানের এদিক-সেদিক ঘোড়া দৌড়াতে লাগল এবং মুসলিমদের দিকে তাকিয়ে হুংকার ছেড়ে বলতে লাগল, তোমাদের মধ্যে এমন কোনো বীরবাহাদুর আছে, যে আজ আমাদের তরবারির রক্তপিপাসা নিবারণ করার জন্য আমাদের মোকাবিলা করার সাহস করবে?

মুসলিমবাহিনীর তিন মর্দেমুজাহিদ আউফ, মুয়াওয়িজ ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. কাতার থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের মুখোমুখি হলেন। উতবা তাদেরকে প্রশ্ন করল, তোমরা কারা? প্রত্যুত্তরে সাহাবিরা বললেন, আমরা আনসার সাহাবি। উতবা বলল, তোমাদের সঙ্গে আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব না। যারা নিজেদের ভিটে-বাড়ি ছেড়ে জাতির সঙ্গে গাদ্দারি করে তোমাদের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের তিনজন লোককে বলো আমাদের মোকাবিলা করতে।

উতবার কথা শুনে এই তিন আনসারি সাহাবি ফিরে এলেন। এবার মুসলিমদের প্রসিদ্ধ তিনজন বীরবাহাদুর মুহাজির সাহাবি তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে কাতার থেকে বেরিয়ে এলেন। ওয়ালিদের মুখোমুখি হলেন আলি ইবনে আবু তালেব রা.। শাইবার মোকাবিলায় উবাইদা ইবনুল হারেস রা. এবং উতবার নাপাক হাড্ডিগুলোকে জাহান্নামের দাওয়াত দিতে বেরিয়ে এলেন আমির হামজা রা.। আলি ও হামজা রা. মুহূর্তের মধ্যেই নিজেদের

প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুপোকাত করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু অভিশপ্ত শাইবার আঘাতে উবাইদা ইবনুল হারেস রা. মারাত্মক আহত হলেন। তা দেখে আলি রা. অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শাইবাকেও জাহান্নামের পথ দেখালেন এবং আহত উবাইদা ইবনুল হারেস রা.-কে বহন করে মুসলিমশিবিরে নিয়ে এলেন।

ইসলামের হেফাজতের জন্য মৃত্যুকে ছেলেখেলা মনে করা উবাইদা ইবনুল হারেস তার অন্তিম মুহূর্তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি কি শাহাদাতের মর্যাদা হতে বঞ্চিত হব? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না আমার প্রিয় সাহাবি! তুমি তো শাহাদাতের সুমহান মর্যাদা অর্জন করেছ। সত্যের পথে মৃত্যুকে যারা আলিঙ্গন করে নেয়, তারা শহিদ, তারা কখনো মৃত হয় না। এমন সুসংবাদ শুনে উবাইদা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পুরো মুসলিমশিবিরকে কাঁপিয়ে আল্লাহু আকবার-এর ধ্বনি তুললেন এবং মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে ওপারে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

শুরু হলো তুমুল লড়াই

দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ হতেই দুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে শুরু হলো তুমুল লড়াই। দুদিকের জানবাজ বীরবাহাদুর সৈনিকেরা একে অন্যের ওপর হামলে পড়ল। কাফেরশিবিরের প্রতিটি বীরবাহাদুর যোদ্ধাই নিজের বীরত্ব প্রকাশ ও দীর্ঘদিনের লালিত প্রতিশোধের বাসনা পূরণার্থে সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু অতীতে যেমন সত্যের বিরুদ্ধে করা তাদের সব ষড়যন্ত্রই বিফল হয়ে গিয়েছিল, তেমনই আজকের এই তির-তরবারির লড়াইয়েও তাদের প্রতিশোধের আগুন নিজেদের রক্তেই ঠান্ডা হয়ে গেল। মুসলিম বীরযোদ্ধারা এমন নির্ভীকচিত্তে তাকবিরধ্বনি দিতে দিতে হামলা করছিল যে, মুশরিকদের কোথাও স্বস্তিতে পা ফেলারই ফুরসত ছিল না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই এই গুটি কতক মুসলিম বাহাদুরের তরবারির সামনে টিকতে না পেরে তারা পলায়ন করতে শুরু করল। রণাঙ্গন মুসলিমরা নিজেদের দখলে নিয়ে নিলো। পরাজিত কাফেরবাহিনী যে-যার মতো করে ছুটে পালাল।

দুপক্ষের নিহতের সংখ্যা

ইসলামি ইতিহাসের এই প্রথম যুদ্ধেই ইসলামের সবুজ-শ্যামল বাগানের ফুলকলিদের গায়ে এমন রঙের বাহার এলো যে, কেয়ামত পর্যন্ত তার সৌন্দর্য

স্থায়ী হয়ে গেল। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিমদের মাত্র ১৪ জন সৈনিক শাহাদতবরণ করলেন। যাদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন মুহাজির সাহাবি আর বাকিরা আনসারি সাহাবি। অপরদিকে কাফেরদের ৭০ জন সৈনিক নিজেদের নাপাক হাড্ডিগুলোকে জাহান্নামের ইন্ধন বানাতে রওয়ানা হয়ে গেল। তাদের বড় বড় নেতৃস্থানীয় ও বীরযোদ্ধারা নিহত হলো। কুরাইশদের পুরো সামরিক শৃঙ্খলাই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। শাইবা, উতবা, আবু জাহল, জামআ ইবনে মাসউদ, আস ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে খালফ, আলি ইবনে উমাইয়া-এর ন্যায় কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই মিথ্যার হেফাজতে মায়ের কোল খালি করে, সন্তানকে পিতৃহীন করে এবং স্ত্রীর সোহাগ ত্যাগ করে জাহান্নামের পথ ধরল। তাদের মাতাপিতা ও স্ত্রী-সন্তানদের আর্তনাদ ও বিলাপধ্বনিতে অন্য বাতিলদের হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল এবং এই আগুন থেকেই পরবর্তী সময়ে উহুদযুদ্ধের সূচনা হয়।

বদরযুদ্ধের কিছু বেদনাদায়ক দৃশ্য

আবুল বখতরির হত্যা

দয়ার সাগর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবিদেরকে আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, বনু হাশিমের সেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যারা স্বেচ্ছায়-সাগ্রহে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, বরং কুরাইশদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণেই আবু জাহলের এই বাহিনীতে শরিক হতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের হৃদয়ের কথা বিবেচনা করে তাদেরকে যেন ছাড় দেওয়া হয় এবং ক্ষমার উপযুক্ত মনে করা হয়। তাদের মধ্যে আবুল বখতরি ও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবও ছিলেন। বাতিলের জুলুম-নিপীড়নে চরম ক্রুদ্ধ ও ঈমানি বলে বলীয়ান সাহাবি আবু হুজাইফা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন দয়ার নীতি পছন্দ করলেন না। তাই তিনি বলে উঠলেন, কখনো এমন হবে না। কোনো মিথ্যার পূজারির জন্যই আমি কোনো সুযোগ-সুবিধা মেনে নিতে পারি না। এটা কীভাবে সম্ভব যে, আমি আমার আপন ভাইকে তো নিজ তরবারি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করব, অথচ আব্বাসের দিকে ধনুক তাক করা থেকে বিরত থাকব? যদি সে আমার সামনে এসে যায়, আমি তাকে আদৌ ক্ষমা করব না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। একটু পর আবু হুজাইফা রা. নিজের এমন বিষয়টি অনুভব করতে পারলেন এবং খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে নবীজির কাছে এসে অনুনয়বিনয় করে ক্ষমা চাইলেন এবং তাদেরকে ছাড় দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন।

ঘটনাক্রমে যুদ্ধের সময় মাহজার ইবনে জিয়াদ নামক এক সাহাবির সামনে এসে হাজির হলেন আবুল বখতরি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অনুগত সাহাবি তাকে বললেন, আমাদের সামনে থেকে দূরে সরে যাও। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা তোমাকে হত্যা না করি। আবুল বখতরি সেখান থেকে সরে গেল, কিন্তু একটু পরেই নিজের এক সহযোদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাহজারের তরবারির নিচে পড়ে নিহত হলো।[৯০]

পরাজয়ের অন্তিম মুহূর্তে কাফেররা যখন দিশেহারা হয়ে যে-যার মতো করে ছুটে পালাচ্ছিল, উমাইয়া ইবনে খালফ ও আলি ইবনে উমাইয়াও জীবনের এমনই কঠিন দুঃসময়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছিল। হঠাৎ আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. তাদেরকে দেখতে পান। উমাইয়া ও আবদুর রহমানের মধ্যে জাহেলি যুগে খুব গভীর বন্ধুত্ব ছিল। প্রিয় বন্ধুর এমন দুর্দশা দেখে আবদুর রহমানের হৃদয়ে বন্ধুত্বের ঢেউ উঠল। তিনি বাপ-বেটা দুজনকেই নিজের নিরাপত্তায় নিয়ে নিলেন এবং তাদের ধরে মুসলিমশিবিরের দিকে এগিয়ে চললেন। সত্য-মিথ্যার এমন আশ্চর্যজনক মেলামেশা বেলাল রা.-এর নিকট বরদাশত হলো না। এমন অসহনীয় দৃশ্য দেখেই তিনি সাহাবিদেরকে হামলা করতে আহ্বান করলেন। আবদুর রহমান রা. তার সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করলেন যেন বেলাল রা. তার এই পদক্ষেপ থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু তারা তার কথা না শুনে বাপ-বেটাকে হত্যা করে বললেন, হক ও বাতিলের মধ্যে কোনো বন্ধুত্ব হতে পারে না।

উমর ইবনুল হুমাম আনসারি রা.-এর শাহাদাত

উমর ইবনুল হুমাম আনসারি নামক এক সাহাবি খেজুর খেতে খেতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইসলামের জন্য যদি আজকের এই লড়াইয়ে আমি নিহত হই, তাহলে কি আমি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করব? এই কারণে কি আপনি আমায় জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন? জবাবে নবীজি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। শাহাদাতের সুধাপানে ব্যাকুল সাহাবি নিজের হাতের খেজুর দূরে ছুড়ে মারলেন এবং নাঙ্গা তরবারি নিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শত্রুশিবিরে ঢুকে পড়লেন আর লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন।[৯১]

---

[৯০]. এই ঘটনাটি সামান্য পরিবর্তনের সঙ্গে *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনে হিশামে* উল্লেখিত আছে। দেখুন, ২/৪৬৯

[৯১]. *সহিহ মুসলিম*, ১৯০১; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/৩০৩

বিরল সহ্যশক্তি

এই যুদ্ধের যে ঘটনাটি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এবং মুসলিমদের শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও ইসলাম রক্ষার চেতনার প্রশংসা করতে বাধ্য করেছে, সেটা হলো অত্যন্ত কম বয়সী একজন সাহাবি মুআজ ইবনে আমর রা.-এর অকল্পনীয় সহ্যশক্তির বিরল ঘটনা। যুদ্ধের একপর্যায়ে মুশরিকদের সর্বোচ্চ নেতা আবু জাহল এই সাহাবির সামনে এসে পড়ল। ইসলামের কুখ্যাত এই দুশমনের পুরো দেহই লৌহবর্মে ঢাকা ছিল। মুআজ রা. তার পায়ের কিছু অংশ অনাবৃত দেখতে পেলেন। তিনি অত্যন্ত কৌশলে আবু জাহলের পায়ের সেই অনাবৃত অংশে তরবারি দিয়ে আঘাত করে পা উড়িয়ে দিলেন। ইকরামা ইবনে আবু জাহল যখন পিতার এমন করুণ দশা দেখল, তখন আহত বাঘের ন্যায় মুআজের ওপর হামলে পড়ল এবং তার বাহুতে এত জোরে আঘাত করল যে, প্রায় পুরো হাতটিই বাহু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সামান্য একটু চামড়া লেগেছিল, এমন ঝুলন্ত হাত নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে মুআজ ইবনে আমর রা. যখন সমস্যা অনুভব করলেন, তখন অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সেই কর্তিত হাতকে পায়ের নিচে রেখে প্রচণ্ড জোরে টান দিয়ে বাহু থেকে এমনভাবে আলাদা করে ফেললেন, যেমন পথপ্রান্তরের কোনো দুরন্ত রাখাল নির্দ্বিধচিত্তে গাছের ডাল ভেঙে আলাদা করে ফেলে।[৯২]

ইসলামের চিরশত্রুর অন্তিম মুহূর্ত

তাওহিদের আরেক বীরযোদ্ধা মুআওয়িজ ইবনে আফরা রা.-এর হাতে এই হতভাগা ফেরাউন আবু জাহলের মৃত্যু হয়। সে তার অধীনস্থ ও প্রভাবিত সমাজে সমস্ত শক্তি ব্যয় করে ইসলামকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার নাপাক চেতনা ছড়িয়েছে।

মুয়াওয়িজ ইবনে আফরা রা. যখন এই হতভাগাকে এমন অপদস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন, তখন তিনি এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আবু জাহলের ওপর ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ করে বসলেন। যে কারণে সে অর্ধজবাইকৃত পশুর ন্যায় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি করতে লাগল। যুদ্ধ শেষে যখন পরাজিত শত্রুরা রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে গেল, তখন ইসলামের মহান সেনানায়ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর

---

৯২. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ২/৪৭৩

প্রিয় সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে আবু জাহলের লাশ খুঁজতে পাঠালেন। আদেশ পেয়েই ইবনে মাসউদ রা. যুদ্ধের মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা লাশগুলোর মধ্য থেকে আবু জাহলের লাশ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। আবু জাহলের অর্ধমৃত লাশ দেখে আনন্দের আতিশয্যে তিনি তার বুকে চেপে বসলেন। আবু জাহলের দুচোখ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিল, দুচোখ খুলে সে যুদ্ধের ফলাফল জানতে চাইল। জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আরে মিথ্যার পূজারি এখনো তুমি যুদ্ধের ফলাফলের কথা জিজ্ঞেস করছ? হায়রে নির্বোধ! কোনো পরাজিত বাহিনী ছাড়া আর কেই-বা তাদের সেনানায়ককে এভাবে মাটিতে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে? এই কথা বলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তার মাথা কাটতে উদ্যত হলেন। এমন সময় আবু জাহল বলে উঠল, এতদিন আমি কুরাইশদের নেতৃত্ব দিয়েছি। আমি চাই মৃত্যুর পরও তারা আমাকে তাদের নেতা হিসাবে স্বীকার করুক। তুমি আমার মাথাটা কাঁধের অংশ থেকে কাটো, যাতে করে মাথাটা দেখতে বড় দেখায় এবং তা আমার নেতৃত্বের একটি বিশেষ চিহ্ন হয়ে থাকে।

চিরকাল আকাশচুম্বী দাম্ভিকতায় যে লোকটা মানুষকে মানুষ মনে করত না, ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন যার মাধ্যমে হয়েছে, মৃত্যুর সময়েও তার এমন দাম্ভিকতা দেখে ইবনে মাসউদ ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তরবারির এক আঘাতেই তার দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেললেন।

মদিনায় বিজয়ের সুসংবাদ

মহান আল্লাহ যখন তাঁর অপরিসীম দয়া ও মেহেরবানিতে বাতিলের বিষদাঁত ভেঙে তাদের পরাস্ত করলেন, সত্যের অনুসারীদেরকে বিজয় দান করলেন, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন খুশির সংবাদ মদিনায় অবস্থানরত সেসব মুসলিমের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করলেন, যারা বিশাল এক হাজার কাফেরবাহিনীর মোকাবিলায় মাত্র ৩১৩ জন অস্ত্রশস্ত্রহীন দুর্বল মুসলিমের হার না মানা এই লড়াইয়ের ফলাফল জানতে ব্যাকুল ছিলেন। প্রতিনিয়ত মদিনার প্রত্যেক মুসলিম উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকতেন বদরের দিকে, ওদিক থেকে আসবে কি কোনো অশ্বারোহী? শুনতে পারব কি বিজয়ের সুসংবাদ? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার শহর এলাকাগুলোতে অবস্থানরত মুসলিমদেরকে এই সুসংবাদ শোনাতে যায়েদ ইবনে হারেসা রা.-কে এবং পল্লি এলাকার মানুষকে এই বিজয়ের সুসংবাদ শোনাতে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-কে পাঠিয়ে দিলেন।

উসামা ইবনে যায়েদ রা. (যাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে রেখে এসেছিলেন) বলেন, বদরের যুদ্ধের এমন গৌরবময় বিজয়ের সুসংবাদ শুনে তো মদিনার লোকদের আনন্দের সীমা থাকত না। শিশু-কিশোরদের হাসিমাখা মুখের তাকবিরধ্বনিতে মদিনার অলিগলি সেদিন গমগম করত। কিন্তু আফসোস! বদরের বিজয়ের খবর আমাদের নিকট তখন এসে পৌঁছে, যখন আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের দুলালি রুকাইয়া রা.-কে দাফন করছিলাম। এমন বেদনাদায়ক ঘটনায় পুরো মদিনা সেদিন শোকাহত ছিল। আহা! একদিকে মদিনার আকাশে শোকের কালো মেঘ, অন্যদিকে বদরের আকাশে হাসির ঝিলিক।

মক্কায় শোকের মাতম

অদৃশ্যের আড়াল থেকে মাঝেমধ্যে এমনসব ঘটনা আমাদের সামনে ঘটে যায়, যার কল্পনাও হয়তো আমরা কখনো করিনি। মক্কার কুরাইশদের জন্য আবু জাহলের দুঃসাহসী বাহিনীর এমন নির্মম পরাজয়টাও এ রকম এক অকল্পনীয় ঘটনা ছিল। তারা ভাবতেও পারেনি যে, মুষ্টিমেয় অসহায় কিছু লোক এভাবে বিশাল এক হাজার দুঃসাহসী ও অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত এক সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করবে! পুরো মক্কায় তাদের পরাজয়ের এ সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। ঘরে ঘরে শোকের মাতম পড়ে গেল। ভেতর থেকে উদ্‌বেলিত হয়ে আসা কান্নায় তারা চিৎকার করে হাউমাউ করে কাঁদতে চাইছিল, কিন্তু অপমানের এই শোকগাথা একটু গলা ছেড়ে গাইতেও পারছিল না, প্রিয়জনের বিরহে বিলাপের করুণ বাঁশি একটু উচ্চ আওয়াজে বাজাতেও পারছিল না। কারণ, এতে শত্রুরা হাসাহাসি করবে। মক্কায় তখনও কিছুসংখ্যক মুসলিম রয়ে গিয়েছিলেন, যারা অন্যান্য মুহাজিরের সঙ্গে হিজরত করে মদিনায় যাননি বা যেতে পারেননি। তাদের ঘরে আজ আনন্দের বন্যা বইছে। হৃদয়ের গহিন কোণ থেকে তারা মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছিলেন। বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে কুরাইশদের শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল। আবু লাহাব এই ব্যথা সইতে না পেরে এক সপ্তাহের মধ্যেই শোকসন্তপ্ত হৃদয় নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

গনিমতের মাল বণ্টন

এই যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিমরা যে গনিমতের সম্পদ লাভ করেছিল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো আবদুল্লাহ ইবনে কাব রা.-

এর কাছে হস্তান্তর করলেন এবং সফরা নামক স্থানে যোদ্ধাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিলেন।

যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার

প্রাচীন কাল থেকেই আরবে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, বিজয়ী দল পরাজিত যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে খুবই পৈশাচিক আচরণ করত। সীমাহীন জুলুম-নিপীড়ন ও পাশবিক অত্যাচারের পর নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে হত্যা করত, কিন্তু মুসলিমরা পুরো বিপরীতে ছিল। পুরো আরব অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের দিকে। এ কী করে সম্ভব? মুসলিমরা সেদিন তাদের যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে যেভাবে ভদ্র ও শালীন আচরণ করেছিল, আজ পর্যন্ত যা মানবসভ্যতার ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় হয়ে রয়েছে। সচ্চরিত্রের এই দুর্ভিক্ষের যুগে হৃদয়টা এখনো খুঁজে পায় আত্মার খোরাক। ৭০ জন যুদ্ধবন্দিদের থেকে মাত্র দুজনকে তাদের সীমাতিরিক্ত ফেতনা-ফাসাদ ও কুটিল ষড়যন্ত্রের কারণে হত্যা করা হয়েছিল। একজন হলো ইবনুল হারেস। সফরা নামক স্থানে আলি রা. তাকে হত্যা করেছিলেন। অন্যজন উকবা ইবনে আবু মুইত। যাকে ইরকুজ জবিয়্যা নামক স্থানে আসেম ইবনে সাবিত আনসারি রা. হত্যা করেন। এরচেয়ে বড় দয়ার আচরণ আর কী হতে পারে যে, সুহাইল ইবনে আমরের ন্যায় কুখ্যাত ইসলামবিদ্বেষী ও গোলযোগ সৃষ্টিকারীকেও হত্যা করা হয়নি।

উমর রা. এই দুশমনকে দেখেই রাগে দাঁত কামড়াতে শুরু করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চেয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি এই নিকৃষ্ট লোকটার গর্দান উড়িয়ে দিই। কিন্তু দয়ার সাগর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দেননি। সফরে থাকাকালীন এই বন্দিদেরকে কোনোরূপ কষ্ট দেওয়া হয়নি, অথচ বন্দিদের নির্যাতন করা ছিল আরবের লোকদের স্বাভাবিক নিয়ম।

আবু আজিজ ইবনে উমায়েরের বর্ণনা

আবু আজিজ ইবনে উমায়ের বলেন, আনসার সাহাবিদের যে দলের প্রহরায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তারা আমার সঙ্গে অত্যন্ত সহমর্মিতা ও দয়ার আচরণ করেছেন। তারা যখন খাবার খেতে বসতেন, আমাকে রুটি খেতে দিতেন আর নিজেরা খেজুর খেতেন। এতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে

তাদেরকে রুটি ফেরত দিয়ে খেজুর চাইতাম, কিন্তু তারা তা ফেরত নিতে অস্বীকার করতেন।

বদরের বন্দিরা আনসারদের ঘরে

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধবন্দিদের একদিন আগেই মদিনায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। বন্দিরা মদিনায় পৌছতেই তিনি আনসারদেরকে তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলে দিলেন, তোমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করবে তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করার। আনসাররা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ মান্য করলেন। হিজরতের পর মদিনার আনসার সাহাবিরা তাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করতে গিয়ে মুহাজিরদের সঙ্গে যেভাবে উত্তম আচরণ করেছিলেন, তেমনই আজ যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গেও একই আচরণ করলেন। তারা বন্দিদের আরাম-আয়েশের জন্য নিজেদের আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। নিম্নের ঘটনাটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইসলাম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক

ইসলামি ইতিহাসের পরতে পরতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, যেগুলোর মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সেদিনের সেই মুসলিমদের কাছে ইসলামের সম্পর্ক সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়েও উর্ধ্বে ছিল। যা রক্ষা করতে গিয়ে প্রয়োজন হলে সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতেও তারা দ্বিধা করতেন না। আবু আজিজ ইবনে উমায়ের মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর আপন ভাই ছিলেন। তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বণ্টনের সময় আবু ইয়াসার নামক এক আনসারি সাহাবির ভাগে পড়লেন। মুসআব ইবনে উমায়ের রা. নিজের আত্মীয়তার সম্পর্ককে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে আবু ইয়াসার রা.-কে বললেন, এই লোকটির মা অত্যন্ত ধনী মহিলা। যদি সে যৌক্তিক মুক্তিপণ আদায় করতে না চায়, তাহলে তোমাকে কঠোর হতে হবে। সে আমার ভাই, এই ভেবে তুমি তাকে কোনো ধরনের ছাড় বা সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করবে না।

আবু আজিজ নিজের আপন ভাইয়ের এমন আচরণ দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন এবং অত্যন্ত পেরেশান হয়ে মুসআবকে বললেন, আফসোস! আপন ভাই হয়েও তুমি আমার সঙ্গে শত্রুর ন্যায় আচরণ করছ? আমার ব্যাপারে এমন কথা বলা তোমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

মুসআব ইবনে উমায়ের রা. অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন, তুমি এখন আমার ভাই নও। আমার ভাই তো সে, যার হেফাজতে তুমি এখন আছ।

আরও একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা

মুসলিমরা তাদের সঙ্গে যতই ভদ্র আচরণ করুক না কেন, বন্দি তো বন্দিই। একদিকে যে-সমস্ত গরিব সাহাবি নিজেরাই পেটপুরে দুবেলা খেতে পারেন না, তাদেরকেই যুদ্ধবন্দিদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া, অন্যদিকে মুক্তিপণ ছাড়াই বন্দিদেরকে ছেড়ে দেওয়াটা অনুচিত ছিল। তাই এই দুটি বিষয়কে সামনে রেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরামর্শসভায় তাঁর বড় বড় সাহাবিদের কাছে করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

উমরের পরামর্শ

জালেম আর বাতিলের নাম শুনলেই উমর রা.-এর রক্ত টগবগ শুরু করত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে যুদ্ধবন্দিদের আলোচনা শুনতেই তার হৃদয়সমুদ্রে জুলুম-নিপীড়ন, কুফর ও মিথ্যাকে চিরতরে নির্মূল করে দেওয়ার চেতনা ঢেউ খেলতে শুরু করল। উত্তেজিত হয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন,

> হে আল্লাহর রাসুল, আমার মতে এই জালেমদের পরিণাম এটাই হওয়া উচিত যে, আমাদের প্রত্যেকেই নিজেদের আত্মীয় বা চেনাজানা রয়েছে এমন কয়েদিকে হত্যা করবে, যেন মক্কার কাফেররা বুঝতে পারে যে, হকের বিরোধিতা করার পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে। তারা এটাও বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের ভালোবাসায় মুসলিমরা নিজেদের আত্মীয়তার সমস্ত সম্পর্ককে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত।

পেছনের পাতাগুলো পড়ার পর আমার সুহৃদ পাঠকের কাছে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সারা পৃথিবীর জন্য যিনি রহমত ও বরকত ছিলেন, পুরো জীবনটাই যার অপরের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও ভালোবাসায় মোড়া ছিল, কারুনের রাশি রাশি ধনভান্ডারের চেয়েও শতগুণ বেশি রহম ও করুণা যার হৃদয়ঘরে বসত করত, সন্ধি ও সম্প্রীতি স্থাপনের প্রতি যিনি সবসময় উন্মুখ হয়ে থাকতেন, তার পক্ষে উমর রা.-এর এই পরামর্শ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। রক্তপাত ও হানাহানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কী করে পুনরায় তিনি মদিনার অলিগলিতে রক্তের স্রোত বইয়ে দেন? তিনি মক্কার সমস্ত ফেতনাবাজ

ও ষড়যন্ত্রকারীকে মুক্ত করে দিতে চাইছিলেন। কোনো ধরনের প্রতিশোধ নিতে চাইছিলেন না। তাই তিনি উমর রা.-এর মতামতকে পাশ কাটিয়ে আবু বকর রা.-এর দিকে তাকালেন।

আবু বকরের মতামত

আবু বকর রা. অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় তার মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাকানোর ভাষা বুঝতে পেরে বললেন,

> হে আল্লাহর রাসুল, আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে বদরের বন্দিদের থেকে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়াটাই ভালো মনে হচ্ছে। এতে করে একদিকে আমরা যেমন সেই অর্থ দিয়ে যুদ্ধের সরঞ্জাম ও রসদসামগ্রী ক্রয় করে আগামী দিনে কাফেরদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারব, তেমনই হতে পারে এই মুক্তি পাওয়া লোকদের মধ্য থেকে কোনো সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রা.-এর এই পরামর্শকে খুব পছন্দ করলেন। অন্য মুসলিমরাও এতে ঐকমত্য পোষণ করলেন। প্রত্যেক বন্দির ফিদিয়া সর্বোচ্চ চার হাজার দিরহাম থেকে নিয়ে সর্বনিম্ন এক হাজার দিরহাম নির্ধারণ করা হলো। এমন অনেক বন্দি ছিল, যারা মুক্তিপণ আদায়ে সক্ষম ছিল না। তাই বিনা মুক্তিপণেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তবে তাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানত, তাদেরকে বলা হলো, ১০ জন মুসলিম বালককে লেখাপড়া শিখিয়ে দিলে তবেই তোমরা মুক্তি পাবে। মোটকথা, রক্তস্নাত এই আরব, যেখানে যুদ্ধবন্দিদেরকে চরম অবর্ণনীয় নির্যাতনের মুখোমুখি করে অবশেষে নির্মমভাবে হত্যা করা হতো, সেই আরবেই মুসলিমরা নিজেদের অসাধারণ চরিত্রমাধুর্যে নতুন এক রীতির প্রচলন করলেন। ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাসী ও সুস্পষ্টভাষী কোনো ব্যক্তিই তাদের ভদ্রতা, দয়া ও অনুগ্রহের এমন ঈর্ষণীয় গুণাবলির প্রশংসা না করে পারবে না।

শিকারি নিজেই নিজের ফাঁদে আটকে গেল

সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার পিতা উমাইয়া ইবনে খালফ এবং তার ভাই আলি ইবনে উমাইয়া বদরযুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তাই তার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল। উমায়ের ইবনে ওয়াহাব। গুপ্তহত্যায় যে ছিল

সিদ্ধহস্ত। সফওয়ান উমায়ের ইবনে ওয়াহাবকে রাজি করাল মদিনায় গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার জন্য। এটা ছিল একেবারেই অপরিণামদর্শী একটা পদক্ষেপ। জালেম সফওয়ানের চোখে তো মিথ্যার আবরণ পড়ে গিয়েছিল। সে কীভাবে জানবে যে, তার এমন নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রই উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের জন্য রহমতের বারিধারায় পরিণত হবে? উমায়ের ইবনে ওয়াহাব একটি বিষমিশ্রিত তরবারি নিয়ে রাগে-ক্ষোভে ফুঁসতে ফুঁসতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে দ্রুত মদিনায় এসে পৌছল।

উমায়ের ইবনে ওয়াহাবকে মদিনার অলিগলিতে এভাবে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা করতে দেখে উমর রা. নিজের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে প্রথমেই বুঝতে পারলেন, কিছু না কিছু গন্ডগোল তো অবশ্যই রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উমায়েরের ওপর আক্রমণ করে তার জামার কলার ধরে টানতে টানতে তাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলালেন। অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে তাকে বললেন, উমায়ের, মদিনায় কী উদ্দেশ্যে এসেছ? সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলল, যুদ্ধে আমার ছেলে বন্দি হয়েছে, তার খোঁজ নিতে এসেছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উমায়ের, প্রাণের ভয়ে মিথ্যা কেন বলছ? সত্য তো পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল। মিথ্যার ধুলাবালি দিয়ে সত্যের আলোকিত চেহারা কখনো মলিন করা যায় না। সাফ সাফ কেন বলে দিচ্ছ না যে, তুমি আমায় হত্যা করার জন্য এসেছ? এই কথা বলে তিনি উমায়েরের সামনে তার আর সফওয়ানের মধ্যে গোপনে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তা পুরোপুরি বলে দিলেন। তাদের মধ্যে গোপনে লেনদেনের যে চুক্তি হয়েছিল সেটাও বলে দিলেন। উমায়ের ইবনে ওয়াহাব চমকে উঠে বলল, এটা আপনি কীভাবে জানলেন? আমাদের দুজনের মধ্যে যে গোপনচুক্তি হয়েছিল, সে ক্ষেত্রে আমরা এমন গোপনীয়তা অবলম্বন করেছি যে, আমি আর সে ছাড়া তৃতীয় কেউই সেটা জানে না। নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসুল। এই কথা বলে সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে মুসলিম হয়ে গেল। আবারও সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যার পরাজয় হলো। ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে বাতিল যত প্রকারের চেষ্টাই করুক না কেন, পরিশেষে তাদের সেই চেষ্টা ও পরিশ্রম ইসলামেরই নতুন কোনো বিজয় বা সফলতা নিয়ে এসেছে।

ফাতেমা রা.-এর বিয়ে

ফাতেমা রা. বাল্যকালের আদর-স্নেহের বয়স অতিক্রম করে এখন যৌবনের সেই বয়সে এসে পৌঁছেছেন, যখন একজন সতীসাধ্বী পূতপবিত্র নারীর জন্য একজন স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুভব করা জরুরি হয়ে পড়ে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আদরের দুলালির বিয়ে নিয়ে ভাবছিলেন। মেয়ে বড় হয়েছে। একজন ভালো পাত্রের হাতে তো তাকে তুলে দিতেই হবে। পিত্রালয় ছেড়ে শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময় তো হলো। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাবও এলো। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলিকে মেয়ের জামাই হিসাবে পছন্দ করলেন। এই বিষয়ে তিনি মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। পিতার মুখে পাত্র আলির নাম শুনে তিনি লজ্জায় নিচের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যার চোখের এ চাহনি চেনেন। নীরবতার ভাষা বোঝেন। তাই মেয়ের সন্তুষ্টি দেখে তিনি আলি রা.-কে বললেন, যাও, সংসারের জরুরি সামানাদি সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। তিনি রুপার দুটি বাহুবন্ধ (বাহুতে ব্যবহৃত বিশেষ অলংকার), দুটি বড় থালা, একটি পেয়ালা, একটি ছোট পাত্র, দুটি বড় মটকা, একটি চাক্কি, একটি চালনি, দুটি চাদর ও একটি বালিশ ক্রয় করলেন।

বিয়ের জরুরি সব সামান সংগ্রহ হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনাস রা.-কে আদেশ দিলেন, আনসার ও মুহাজির সাহাবিদেরকে আমার কন্যা ফাতেমার বিয়ের সুসংবাদ দাও। লোকেরা সুসংবাদ শুনেই মসজিদে এসে একত্র হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ের খুতবা দিলেন এবং উপস্থিত মেহমানদের মধ্যে খেজুর বিতরণ করলেন। অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালনের পরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আদরের দুলালিকে উম্মে সুলাইম রা.-এর সঙ্গে আলি রা.-এর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে আগমন করলেন। অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে নবদম্পতির জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, এই স্বামী-স্ত্রী দুজনের হৃদয়েই তুমি দুজনার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যাকে বললেন, মা, আমি আমার বংশের সবচেয়ে উত্তম লোকটির কাছে তোমাকে বিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি আলি রা.-কে স্ত্রীর যথাযথ দায়িত্ব আদায়ে সচেতনতা ও তার মন রক্ষার উপদেশ দিয়ে ফিরে এলেন।

সবচেয়ে সাদামাটা বিয়ে

এই বিয়েটি অত্যন্ত সাদামাটা ছিল। বিয়ের সময় আলি রা. সামান্য কয়েকটি সামগ্রী ক্রয় করেছিলেন। সেগুলোর বর্ণনা তো একটু আগেই আমরা দিয়েছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় কন্যাকে উপহারস্বরূপ যা দিয়েছিলেন তা হলো, খেজুরকাঠের তৈরি একটি চৌকি, দুটি মটকা, একটি পাত্র, একটি নরম গদি ও দুটি চাক্কি।

সারা পৃথিবীর বাদশাহ নিজের মেয়ের বিয়েতে যেভাবে সাদামাটা আয়োজন করেছেন, অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর কথা না হয় বাদই দিলাম, অন্তত মুসলিমরা তো তাদের নবীর এই সুমহান আদর্শকে বুকে ধারণ করে নিজেদের বিয়েশাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় ও অপচয় হতে বিরত থাকতে পারে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ের এমন সাদামাটা বিয়ে থেকে সেসব মানুষ শিক্ষার্জন করতে পারে, যারা বিয়েকে কেন্দ্র করে অজস্র টাকা অবলীলায় খরচ করে ফেলে। মানুষের দুদিনের বাহবা কুড়ানোর জন্য তো অনেকে আগ-পর না ভেবে সারা জীবনের জন্য বিশাল ঋণের বোঝাও মাথায় তুলে নেয়। যে কারণে এই বিয়ে দ্বারা ঘর আবাদ হওয়া তো দূরের কথা, উলটো সবকিছু বরবাদ হয়ে যায়। আজকের এই দিনে প্রয়োজন হলো, মুসলিমরা তাদের যেকোনো কাজই নৈতিক সাহসিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করবে। কেউ কিছু বললে বা তিরস্কার করলে তারা তার সামনে সারা পৃথিবীর বাদশাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শকে তুলে ধরবে এবং তার কর্মপন্থাকে প্রমাণ হিসাবে দেখাবে।

দ্বিতীয় হিজরির আরও কিছু ঘটনা

ঈদুল ফিতরের নামাজ, সদকাতুল ফিতর এবং রমজানের রোজা এই বছরই ফরজ হয়। বদরের যুদ্ধের দুমাস পর সাভিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের কারণ হলো, আবু সুফিয়ান ২০০ অশ্বারোহী নিয়ে হঠাৎ মদিনায় পৌছে এবং সেখানকার কিছু খেজুরবাগান জ্বালিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, যারা ওই বাগানগুলো পরিচর্যার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তাদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলে। সংবাদ পেয়েই মুসলিমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেখানে ছুটে এলেন। কিন্তু তাদের আসতে দেখে কাফেররা দ্রুত সেখান থেকে পলায়ন করে। মুসলিমরা বেশ কিছুটা দূর তাদের পিছু ধাওয়া করে। পথে বিভিন্ন জায়গায় তারা ছাতুভরতি কিছু পুটলি পায়, যেগুলো কাফেররা তাদের বোঝা

হালকা করার জন্য ফেলে গিয়েছিল। এই কারণেই এই যুদ্ধ গাজওয়ায়ে সাভিক নামে (ছাতু বা আটার যুদ্ধ) প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

তৃতীয় হিজরি

মুসলিমরা শত্রুর কবলে

হিজরতের তৃতীয় বছরটা সত্যিই মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত দুঃসময় ছিল। বদরের যুদ্ধে বিজয়ের পর থেকেই চারদিক থেকে শত্রুরা ইসলামের সবুজ-শ্যামল ফসলিভূমিকে জ্বালিয়ে দিতে প্রতিশোধের লেলিহান শিখা জ্বালাতে শুরু করল। সৌহার্দ ও সম্প্রীতির মহান আহ্বায়ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেশের শান্তি-শৃঙ্খলাকে হুমকির মুখে দেখে শত্রুদের বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা? কে বোঝে কার ব্যথা? নবীজির নসিহত শোনার মতো কান তো সেই কবেই বধির হয়ে গিয়েছিল।

আফসোস! মদিনার মুনাফেক সম্প্রদায়, মক্কার মুশরিক গোত্রগুলো এবং কাফেরদের বিশাল বাহিনী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ হতে মুবারক মাথাকে বিচ্ছিন্ন করাটাকেই নিজেদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়েছিল। যে মহান সত্তা একমাত্র আল্লাহর কুদরতি কদমে সেজদাবনত হওয়া ছাড়া পৃথিবীর যেকোনো রাজাবাদশা ও দাম্ভিক-প্রভাবশালীর সামনে মাথাবনত করাকে চরম অপমান মনে করতেন। দয়াময় প্রভু যাকে এই দিগ্‌ভ্রান্ত মানবতার জন্য হেদায়েতের অত্যুজ্জ্বল সূর্য করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যার মুবারক দুই কদমের নিচে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ ও সফলতা নিহিত। যে কদমের ধূলি যদি কেউ সুরমা হিসাবে চোখে লাগায়, চর্মচক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্চক্ষুও খুলে যায়। হায়রে! কতটা নির্বোধ হলে কাফেররা সেই মহান নবীকে নিজেদের নাপাক তিরের লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করেছিল। আসলে হকের প্রদীপের আলোয় যে ঘর আলোকিত হয়, তাদের হৃদয়ে তো সে ঘর ছিল না। রহমতের অবারিত বারিবর্ষণ তো হয়েছিল, কিন্তু আফসোস! তা গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত জমিন ছিল না। হায় দুর্ভাগা! সত্যের ডাক শুনেও তুমি বেখবর! আহা! গাছ নিজেই নিজের ফলের মিষ্টতার ব্যাপারে উদাসীন!

মদিনার মুনাফেক সম্প্রদায়

সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু তো সে, বন্ধুর বেশে এসে যে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে। সে তো আঁচলের নিচে লুকিয়ে থাকা এমন বিষধর সাপ, যার ছোবল

হতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। মদিনার মুসলিমদের মাঝে এমন একটি সম্প্রদায় শামিল হয়ে গিয়েছিল, যারা শুধু সময়ের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে মুসলিম হয়েছিল। কিন্তু তাদের এই ইসলামগ্রহণই এমন এক ফাঁদ ছিল, অত্যন্ত সুচতুর ও বিচক্ষণ না হলে যে ফাঁদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। এই ইসলামবিদ্বেষীদের উদ্দেশ্যই ছিল সময়-সুযোগে যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো পদ্ধতিতে ইসলামের মূলোৎপাটন করা। ইসলামের চারাগাছ উপড়ে ফেলা। মদিনার প্রশান্ত পরিবেশে ফেতনার আগুন লাগানো। ওপরে ওপরে তাদেরকে তো মুসলিমদের জন্য বেশ দয়ার্দ্র ও সহমর্মীই মনে হচ্ছিল, কিন্তু পর্দার অন্তরালে তারা ইসলাম বিনাশের সব ধরনের অপচেষ্টাই করে যাচ্ছিল। আর এভাবেই একসময় হেদায়েতের সবুজ-শ্যামল বাগানের দৃষ্টিনন্দন ফুলের গায়ে ইরতিদাদের (ধর্মত্যাগ) হেমন্ত চাপিয়ে দুনিয়ার জমিন থেকে ইসলামি বাগানকে মিটিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল।

কিন্তু অন্তর্চক্ষু হতে বঞ্চিত এই মুনাফেকরা তাদের চর্মচক্ষু দিয়ে কখনো দেখেনি বা দেখার চেষ্টাও করেনি যে, হকের এই ধ্বনি কখনো মিথ্যার চার দেয়ালের ভেতরে আটকে রাখা যায়নি, বরং সেই দেয়ালগুলো থেকেই পুনরায় হকের প্রতিধ্বনি ভেসে এসেছে। তারা কখনো কুদরতের এই সুস্পষ্ট নীতি অনুভব করেনি বা করতেও চায়নি যে, সত্য একটি মজবুত সুবিশাল শিলাখণ্ডের ন্যায়। আর মিথ্যা হলো একটি ঠুনকো কাচের টুকরা। পাথরের সঙ্গে কাচের মোকাবিলা হলে ফলাফল কী হবে তা কার অজানা? পাথরের ওপর কাচ দিয়ে আঘাত করো কিংবা কাচের ওপর পাথর দিয়ে, দুই অবস্থাতেই কাচ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। মুনাফেকদের জেদ ও সীমালঙ্ঘনের কারণে অবশেষে তাদেরকে সে দিনটিও দেখতে হলো, আল্লাহর অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী প্রত্যেক বিদ্রোহীকেই যা দেখতে হয়। সৃষ্টির সূচনাতেই মহান আল্লাহ তাঁর সত্য ও ন্যায়ের পতাকাধারীদের বিজয় ও সাহায্যের যে অঙ্গীকার লিখে দিয়েছিলেন, আজ তারা তা প্রত্যক্ষ করল। মুনাফেকরা তাদের মারাত্মক কপটতা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের কিশতিকে উলটে দেওয়ার যারপরনাই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা ইসলামের কোনো ক্ষতিই করতে পারল না। দ্বীন ও হেদায়েতের তরি নিরাপদেই তীরে ভিড়েছিল। কিন্তু কপট ও ববধার্মিকদের ডিঙি মাঝনদীতেই নিমজ্জিত হয়েছিল।

মুনাফেকদের সর্বোচ্চ নেতা

মদিনার মুনাফেকদের সর্বোচ্চ সম্মানিত ও সর্বেসর্বা নেতা ছিল সেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল, ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধের আলোচনায় যার কথা বলা হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করার কারণে তার নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ইজ্জত-সম্মানে মারাত্মক আঘাত লেগেছিল। বাদশাহি ও খ্যাতি অর্জনের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তাই তো সে সন্ধি ও শান্তির পতাকাবাহী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও হঠকারিতার আগুন প্রজ্বলিত করেছিল। বদরযুদ্ধের সময় এই ফেতনাবাজ কী কী অপচেষ্টা করেছিল, তা সুহৃদ পাঠকের অজানা নয়। এই যুদ্ধে মুসলিমদের জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল বিজয় দেখে তার সাহসের কোমর ভেঙে গেল। তার বক্রদৃষ্টিতে এই মুহূর্তে প্রতিশোধ নেওয়ার আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে সেও প্রকাশ্যে মুসলিম হয়ে গেল। মুখ দিয়ে তো সে কালিমা পড়ত, কিন্তু হৃদয়টা তার কাফেরের চেয়েও খারাপ ছিল। সে নিজের অধীনস্থ লোকদেরকেও তার ন্যায় লোক-দেখানো ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিলো। এভাবেই বেশ বড় একটি দল মুসলিম হয়ে গেল। তবে তাদের এই ইসলামগ্রহণ মুসলিমদের কোনো কল্যাণ কিংবা তাদের নিজেদের কোনো কামিয়াবি ও সফলতার জন্য ছিল না, বরং সুযোগ বুঝে ইসলামের চারাগাছকে উপড়ে ফেলে পৃথিবীর বুক হতে একত্ববাদের আওয়াজকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেওয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

নিজেদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী মুনাফেকরা মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে লাগল। মুসলিমদেরকেও মুরতাদ বানানোর অপচেষ্টা করতে লাগল। অন্যদিকে আরবের অন্য ইহুদিদের সঙ্গেও তারা সুসম্পর্ক স্থাপন করে নিলো। আর এভাবেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মদিনার ইহুদি ও মুনাফেক সম্প্রদায়, দুটি বৃহৎ শক্তি মুসলিমদের সঙ্গে বসবাস করে আঁচলের নিচে লুকানো সাপের ন্যায় ফণা তুলে বসেছিল।

ইহুদি গোত্রগুলোর গোলযোগ

মদিনা এবং মদিনার আশেপাশে ইহুদিদের বেশ কিছু গোত্র বসবাস করত। তবে তাদের মধ্য হতে তিনটি গোত্র নিজেদের শক্তিসামর্থ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি

ও লড়াইয়ে পারদর্শিতার কারণে প্রসিদ্ধ ছিল। সেই গোত্রগুলোর নাম হলো : ১। বনু কাইনুকা ২। বনু নাজির ৩। বনু কুরাইজা।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় এসে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ে যে চুক্তিনামা প্রস্তুত করেছিলেন, মদিনার এই তিনটি গোত্রও বিশেষভাবে তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের সর্দাররা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গেই যেখানে স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু আফসোস! এই লোকগুলো পরবর্তী সময়ে নিজেদের সন্ধি ও শান্তিচুক্তির কোনো পরোয়াই করেনি। মুখে যে বিষয়ের স্বীকৃতি দিয়েছিল, হৃদয়ে তা মেনে নিতে পারেনি। মুসলিমদের প্রতিটি উন্নতি-অগ্রগতি যেন তাদের বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধছিল। তারা সবসময়ই চাইত, যেভাবেই হোক ইসলামের এই অগ্রগতিকে যেন রুখে দেওয়া যায়। বদরের যুদ্ধে তারা মুসলিমদের কোনো সাহায্য তো করেইনি, উলটো কাফেরদের যুদ্ধকে আরও বেগবান করতে সব ধরনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ার্জন যেন তাদেরকে 'ভুনা কাবাব' বানিয়ে দিলো। প্রতিশোধস্পৃহা, প্রতিহিংসা ও ষড়যন্ত্রের কোনো সীমা রইল না। একদিকে মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কুরাইশদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের মাধ্যমে নিজের প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার আগুনকে আরও প্রজ্বলিত করার চেষ্টা করল, অন্যদিকে তাদের চারপাশে বসবাসরত মুসলিমদেরকে নিজেদের অশালীন গালাগাল ও ফেতনা-ফাসাদের সম্মুখীন করার অপতৎপরতা অব্যাহত রাখল।

কাব ইবনে আশরাফের গালাগাল

বদরপ্রাঙ্গণে হক ও বাতিলের সংঘাতে হকের বিজয়সংবাদ নিয়ে মদিনায় পৌঁছলেন যায়েদ ইবনে হারেসা রা.। এক ইহুদি নেতা, কাব ইবনে আশরাফ এই সংবাদ শুনে রাগে ফেটে পড়ল। যায়েদ রা.-কে লক্ষ করে সে বলল, হতভাগা! তোর ধ্বংস হোক! যদি এই সংবাদ সত্য হয়, তাহলে তো এই জীবন আর জীবন রইল না। এমন জীবন নিয়ে বেঁচে থেকেই-বা কী লাভ? কুরাইশরা আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশ। তারাই যদি আজ এসব চুনোপুটি মুসলিমদের কাছে পরাজিত হয়, তাহলে এ জীবন রেখে আর লাভ কী?

প্রিয় পাঠক, এর দ্বারাই বোঝা যায় যে, ইহুদিরা ইসলামের উন্নতি-অগ্রগতিতে কতটা বিচলিত হতো এবং ইসলামবিরোধীদের ক্ষমতা ও প্রভাব মিটে যেতে দেখে কতটা শঙ্কিত থাকত।

বদরযুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের সংবাদ যখন সত্য প্রমাণিত হলো, তখন কাব ইবনে আশরাফ রাগে-গোস্বায় জ্বলে-পুড়ে কাবাবের মতো হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, ফণা তোলা কালনাগের ন্যায় ফুঁসতে ফুঁসতে সে মক্কায় এসে হাজির হলো। বদরে নিহত কাফেরসৈন্যদের নামে শোকগাথা লিখে লিখে তাদের পরিবারের লোকদেরকে উত্তেজিত করতে লাগল। তার কবিতা শুনে তাদের চোখ দিয়ে পানি নয়, যেন রক্তের স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল। নিজের কবিতার মাধ্যমে সে তাদের নিহত সৈনিকদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পুনরায় যুদ্ধের জন্য উসকানি দিতে লাগল। কয়েকদিন কুরাইশদের হৃদয়ে প্রতিশোধের বীজ রোপণ করে পুনরায় সে মদিনায় ফিরে এলো এবং এখানে এসেও সে অকথ্য ভাষায় ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের মাধ্যমে মুসলিমদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। এমনকি এই দুশ্চরিত্র লম্পট কবি মুসলিমদের সতীসাধ্বী নারীদের নামে বিশ্রী ও কুরুচিপূর্ণ কবিতা লিখে তা মোড়ে মোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল।

কাব ইবনে আশরাফ নামের এই মন্দভাষী যখন মুসলিম পর্দানশিন নারীদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল, তখন বাধ্য হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবিদের পীড়াপীড়ির কারণে তাকে হত্যার অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়েই মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা. তার কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কাব ইবনে আশরাফের বাড়িতে হাজির হলেন এবং তাকে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

কাব ইবনে আশরাফের স্থলবর্তী

কাব ইবনে আশরাফ তার নির্মম পরিণাম ভোগ করার পর আরেক শয়তান ভাষার তিরধনুক নিয়ে ময়দানে হাজির হলো। তার নাম ছিল সাল্লাম ইবনে আবু হুকাইক। কথায় আছে, ছাত্র কখনো কখনো তার শিক্ষক হতেও আগে বেড়ে যায়, সাল্লাম ইবনে আবু হুকাইক তো এই কাব ইবনে আশরাফেরই স্থলাভিষিক্ত ছিল। বাজে ও অসভ্য গালাগালে সে কাব ইবনে আশরাফকেও ছাড়িয়ে গেল। অবশেষে তার অসভ্যতা ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও হত্যা করার অনুমতি দিলেন। কাব ইবনে আশরাফকে আউস গোত্রের একজন ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা হত্যা করেছিলেন। তাই এবার খাজরাজ গোত্রের একজন বীরবাহাদুর মুসলিমদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষতকারী এই লম্পটকে শায়েস্তা করতে মাঠে নামলেন। তিনি নিজের আটজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে খাইবারে

(এই দুশ্চরিত্র এখানেই বসবাস করত) গিয়ে সাল্লাম ইবনে আবু হুকাইককে বুঝিয়ে দিলেন যে, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও অসভ্য গালাগালের পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে।

গালমন্দ তো ইহুদিদের জাতীয় স্বভাব

মুসলিমদের মহান পদপ্রদর্শক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং লাঞ্ছিত-অপদস্থ করাটা ইহুদিদের সার্বক্ষণিক হাসি তামাশার বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে আঘাত হানতে তাঁর দরবারে এসে তাঁর প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবিদের সামনেই তারা তাঁকে নিয়ে বিদ্রুপ ও অশালীন আচরণ করত। তবুও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একান্ত অনুগত এবং সবকিছু নীরবে সয়ে যাওয়া সাহাবিদের নিজেদেরকে সংযত করে রাখাটা সত্যিই অকল্পনীয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো 'আসসালামু আলাইকুম'-এর স্থলে 'আসসামু আলাইকুম (তোমার মৃত্যু হোক)'-এর ন্যায় কদর্য আচরণ ও হৃদয় বিদীর্ণকারী কথাও শুনেছেন, তবুও তিনি নিজেকে সংযত রেখেছেন। তাঁর অনুসারীরাও তাঁর শিখিয়ে দেওয়া সবর ও সহনশীলতার শিক্ষায় নিজেদেরকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছিলেন। রাসুলের আদেশই তাদের কাছে শিরোধার্য ছিল। অথচ এরা তো তারাই, যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘামের বিনিময়ে নিজেদের রক্ত বইয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আর এখন? তাদের প্রিয়তমের শানে চরম আপত্তিকর ও বেয়াদবিমূলক বক্তব্য কিংবা আচরণ দেখেও নিজেদেরকে সংযত করে রেখেছেন। কারণ, তাদের হৃদয়ে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে আনুগত্যও ছিল। আনুগত্যহীন ভালোবাসা তো মূল্যহীন।

প্রজ্বলিত আগুনে রহমতের বারিধারা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের এই সমস্ত কুৎসা রটনা ও ফেতনা-ফাসাদ মুখ বুজে নীরবে সহ্য করে গিয়েছেন। মুখে মুখে তর্ক না করে, অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাদের সমাবেশস্থলে উপস্থিত হতেন। খুবই হৃদয়গ্রাহী ও মোলায়েম ভাষায় তাদেরকে বোঝাতে চাইতেন, মন্দ কাজ হতে ফেরাতে চাইতেন। ফেতনা-ফাসাদ, ঘৃণা, ক্রোধ ও প্রতিশোধের আগুনে উপদেশ ও কল্যাণকামিতার শীতল পানি ছিটাতেন।

কিন্তু হায়! এ তো সেই আগুন ছিল না, রহমতের বারি বর্ষণে যা নিভে যায়। তারা তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ শুনতই না,

উলটো সন্ধি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দের বিষয়টি নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। মারাত্মক আপত্তিকর মন্তব্য করত। তারপরও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের অভিভাবকত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের গুণ ধরে রাখতেন। অত্যন্ত কোমল ভাষায় তিনি অভিভাবকের স্বরে বলতেন–

মনে রেখো, আমিই আল্লাহর সেই রাসুল, সেই শেষ নবী, যার আগমনের প্রতীক্ষায় তোমরা দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিয়েছ। তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলিতে যার আগমনের সুসংবাদ রয়েছে। বলো, কী এমন সমস্যা রয়েছে, যার কারণে তোমরা আমায় মেনে নিতে পারছ না? কেন তোমরা নিজেদের ইহকালীন ও পরকালীন সুখসমৃদ্ধির জন্য আমার আনীত শিক্ষা গ্রহণ করছ না? আল্লাহ তাআলা আমাকে 'রহমাতুল লিল আলামিন' করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাই তোমাদের বিষাক্ত তিরের জবাবেও আমি ভালোবাসা ও মায়া-স্নেহের ভাষায় কথা বলি। আল্লাহর সরল-সোজা পথ হতে তোমাদেরকে বিচ্যুত হতে দেখে আমার হৃদয়ে যে ব্যথার পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে, হায়! তা আমি কীভাবে তোমাদের দেখাই? তোমাদের হেদায়েতের জন্য দিনরাত প্রতিটি মুহূর্ত আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি জানি, হকের বিরুদ্ধাচরণকারীদের পরিণাম কতটা ভয়াবহ হয়। তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা কোথায়? এইজন্যই আমার ব্যথাতুর হৃদয়ের শুধু এটাই আশা, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সত্যের সামনে নিজেকে সমর্পণ করুক। সিরাতে মুসতাকিমের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে জাগতিক জীবনেও সুখসমৃদ্ধি অর্জন করুক এবং পরকালেও স্থায়ী আরাম-আয়েশের জান্নাতে রঙিন যৌবন ও দয়াময় আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করুক। প্রতিনিয়ত আমি এই দোয়াই করি, আল্লাহ তাআলা যেন তার দয়া-অনুগ্রহে তোমাদের হেদায়েত দান করেন। যেন তোমরা তাওহিদের আওয়াজকে হৃদয়ের কান দিয়ে শোনো, মন দিয়ে উপলব্ধি করো এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারো। তোমাদের শেষ পরিণামও যেন আবু জাহল, উতবা ও শাইবা প্রমুখ ইসলামবিরোধীদের পরিণামের মতো না হয়।

ইসলামের চরম দুশমন এই ইহুদিরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন হৃদয়নিংড়ানো কথার জবাবে তাঁর রেসালাত নিয়ে কটূক্তি করতে শুরু করল এবং বিদ্রুপের স্বরে তাঁকে বলল, কুরাইশরা তো যুদ্ধের নিয়মকানুন আর কলাকৌশল সম্পর্কে বেখবর। আমাদের সঙ্গে যদি লড়াই করতে আসো, তবে খুব ভালোভাবেই দেখতে পাবে যে, যুদ্ধ কাকে বলে। মুষ্টিমেয় মুসলিমদের ভয়ে কুরাইশরা হয়তো পালিয়েছে, কিন্তু আমাদের ভয়ে

তো বাঘও ময়দান ছেড়ে পালায়। একটু অপেক্ষা করো। সময় হোক। তখন আমরাই তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো যে, আমরা কারা?

সদা শান্তি ও সন্ধির প্রতি আহ্বানকারী মহান চিকিৎসক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের অজ্ঞতার রোগকে দুরারোগ্য বুঝতে পেরে ভাঙা মন নিয়ে ফিরে আসতেন।

নিজেই নিজের গর্তে পড়ল

সন্ধি ও শান্তির নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারাত্মক সীমালঙ্ঘনকারী ধূর্ত ইহুদিদেরকে সরল পথে ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের চেষ্টা করেছেন। হৃদয়ের গহিনে সবসময় তিনি এই আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন যে, ইহুদিরা ফেতনার যে আগুন প্রজ্বলিত করেছে, কীভাবে তা নেভানো যায়। দেশ ও দেশের মানুষের নিরাপত্তা যেন হুমকির মুখে না পড়ে। কিন্তু সকল ক্ষমতার মালিক ওই ওপরওয়ালা ইহুদিদের ভাগ্যে 'অনিবার্য ধ্বংস'-ই লিখে দিয়েছিলেন। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তারা যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল, নিজেরাই তাতে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মুসলিমদের জন্য তারা যে গর্ত খুঁড়েছিল, নিজেরাই তাতে উপুড় হয়ে পড়ল। এমনকি নিজেদের বক্রচিন্তা ও গোঁয়ারতুমির কারণে সবকিছু হারিয়ে আজও পথে পথে ভিক্ষুকের ন্যায় ঘুরছে।[৯৩]

---

৯৩. স্বামীজি যখন এই কিতাবটি লেখেন, সময় তখন ১৯৩২ কিংবা ১৯৩৩ সাল। তখনও পৃথিবীজুড়ে ইহুদিরা বাস্তুহারা। না ছিল থাকার জায়গা, না ছিল পরার কাপড়। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ১৯ শতকের শেষের দিকে ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সেখানকার ইহুদিদেরকে দেশত্যাগ করতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। যার কারণে ইহুদিরা চরম সংকটের মুখোমুখি হয়। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তারা একযোগে কাজ করতে শুরু করে। পৃথিবীর কোথায় একটি ইহুদি রাষ্ট্র কায়েম করা হবে এ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনে তারা 'জায়নবাদ আন্দোলন' নামে একটা আন্দোলন শুরু করে। যার উদ্দেশ্য ছিল মসজিদে আকসাকে ভেঙে 'হাইকালে সুলাইমানি' প্রতিষ্ঠা করা এবং জেরুসালেমকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
১৮৮০ সনে ইহুদিদের জেরুসালেমে ফিরে যাওয়ার জন্য 'নাকান বেরেনবুয়ান' নামে এক অস্ট্রিয়ান একটি আন্দোলনের প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৯৭ সালে আরেক অস্ট্রিয়ান ইহুদি সাংবাদিক ড. থিওডর হার্জেল তার *'দি জিউইস স্টেট'* নামক গ্রন্থে জায়নবাদী আন্দোলনের রূপরেখা মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন এবং 'ইন্টারন্যাশনাল জায়োনিস্ট অর্গানাইজেশন' নামক একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। সেই বইয়ে তিনি বলেন, পৃথিবীর সমস্ত ইহুদির সংকট সমাধানের জন্য এবং ক্ষমতা অর্জনের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্রগঠনের বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যে প্রাথমিক প্রস্তাব হিসাবে চারটি দেশকে নির্বাচন করা হয়। ফিলিস্তিন, আর্জেন্টিনা, উগান্ডা এবং আফ্রিকার আরেকটি দেশ। এই ইহুদি সাংবাদিকের নেতৃত্বেই ১৮৯৭ সালের ২৯ ও ৩০ আগস্টে ইহুদিদের একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সুইজারল্যান্ডের 'বাজেল'

যেমন কর্ম তেমন ফল

জাহেলিয়াতের যুগে আরবের বিভিন্ন এলাকায় বিশাল বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ মেলা বসত। একবার বনু কাইনুকা গোত্রে এ রকম একটি মেলার আয়োজন করা হলো। একজন আনসারি নারী সেখানে দুধ বিক্রি করতে গেলেন। দুধ

নগরীতে। এই সম্মেলনে বিশ্বের ৩০টি ইহুদি সংগঠনের প্রায় ৩০০ ইহুদি নেতা জায়নবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে। পরবর্তী সময়ে যে পরিকল্পনাটি ২৪ প্রটোকল আকারে প্রণীত হয়। মূলত তখন থেকেই ইহুদিরা পৃথিবীর অর্থনীতি, মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যম ইত্যাদিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে শুরু করে। বহিরাগত ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনের মানুষের কাছ থেকে জমি কেনা বা লিজগ্রহণে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে তারা 'জুয়িশ ন্যাশনাল ফান্ড' গঠন করে। নিজেদের লক্ষ্য পূরণে তারা পুরোদমে কাজ শুরু করে। ব্রিটেন, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত ক্ষমতাবান ইহুদিরা সেসব দেশের সরকারগুলোকে সহযোগিতার জন্য চাপ দিতে থাকে। ১৮৯৭ সাল থেকেই ইহুদিরা দলে দলে ফিলিস্তিনে আসতে শুরু করে। তখন ফিলিস্তিন ছিল উসমানি খেলাফতের অধীনে এবং এর জনসংখ্যা ছিল ৪,৬০,০০০। এর মধ্যে ইহুদিরা ছিল মাত্র শতকরা তিন ভাগ।

উসমানি খেলাফতের তখন নাজুক অবস্থা। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তখন ক্ষমতায়। একদিকে শত্রুদের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে অর্থনৈতিক নড়বড়ে অবস্থা। এটাকে কাজে লাগিয়ে ইহুদিরা চেয়েছিল সুলতানকে বিপুল পরিমাণের অর্থ উপঢৌকন হিসাবে দিয়ে বিনিময়ে তার কাছ থেকে ফিলিস্তিনের ভূমিকে চাইবে। কিন্তু খলিফা এই প্রস্তাব শুনেই ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ফিলিস্তিনের তত্ত্বাবধান সরাসরি নিজের হাতে নিয়ে বহিরাগত ইহুদিদের আগমনকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেন। ইহুদিরা এতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং ড. থিউডর হার্জেল ঘোষণা করেন, যদি ইহুদিরা নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করতে চায়, তাহলে প্রথমে উসমানি খেলাফতকে ধ্বংস করতে হবে। এই লক্ষ্যে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা মিলে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র করে, একপর্যায়ে তারা সফলও হয়। ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আহা! ইমানুয়েল নামে যে ইহুদির মুখের ওপর সুলতান আবদুল হামিদ ইহুদিদের প্রস্তাব ছুড়ে মেরেছিলেন, সেই লোকটাকেই ইহুদিরা খলিফাকে তার ক্ষমতাচ্যুতির সংবাদ দিতে পাঠিয়েছিল!

১৮৮২-১৯০৩-এর ভেতরে পূর্ব-ইউরোপ ও রাশিয়া থেকে ২৫ হাজার ইহুদি ফিলিস্তিনে আসে। ফলে তাদের সংখ্যা শতকরা পাঁচে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়। ১৯০৪ থেকে ১৯১৪-এর মধ্যে আরও ৪০ হাজার ইহুদি আগমন করে। এবার তাদের জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা আটে। ১৯২৪ সনে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ১২-এ। তবে তখন তাদের অধিকৃত ভূমি ছিল মাত্র শতকরা তিন ভাগ। ১৯৩১-এ গিয়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭ পার্সেন্ট। ১৯৩৯ সনে আরও ২ লক্ষ ২৫ হাজারের বিশাল দল ফিলিস্তিনে অনুপ্রবেশ করে, ফলে জনসংখ্যার দিক থেকে ইহুদিরা হয়ে যায় শতকরা ৩০ পার্সেন্ট। ১৯৪০ থেকে ৪৮-এর ভেতরে আসে আরও ১ লক্ষ ১৮ হাজার ইহুদি। তখন জনসংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৩১ ভাগে। ১৯৪৮ সনে ব্রিটেন ফিলিস্তিন ত্যাগ করার পর আরব-ইসরাইল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দুঃখজনকভাবে সে যুদ্ধে ইহুদিরা জয়লাভ করে এবং ফিলিস্তিনের ৭৮ ভাগ এলাকা দখল করে সেটাকে ইহুদিরাষ্ট্র ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা তাদের স্বীকৃতি দেয়। পরের বছর ইসরাইল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্র হিসাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।-অনুবাদক

বিক্রয় শেষে ফিরে আসার সময় তিনি গহনাজাতীয় কিছু খরিদ করার জন্য পথিমধ্যে একটি স্বর্ণের দোকানে গেলেন, দোকানদার ছিল ইহুদি। একজন আনসারি নারীকে একা পেয়ে অসভ্য লম্পট ইহুদিটা তার শ্লীলতাহানি করতে উদ্যত হলো। অসহায় নির্যাতিত নারী চিৎকার দিয়ে সাহায্যের আবেদন করলেন। ঘটনাক্রমে সেই পথ দিয়েই একজন আনসার সাহাবি হেঁটে যাচ্ছিলেন। একজন নারীর আর্তচিৎকার শুনেই তিনি তার সাহায্যে দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ইহুদিরা তো আগে থেকেই মুসলিমদের ওপর চরম বিরক্ত ছিল। ভাবখানা এমন, যেন বাগে পেলেই দেখে নেব। আজ সে সুযোগ এসে গেল। একজন মুসলিমকে একজন ইহুদির সঙ্গে তর্ক করতে দেখে তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় তরবারি হাতে আনসারি সাহাবির ওপর আক্রমণ করল। আনসারি সাহাবিও তো তরবারির ছায়াতেই বড় হয়েছেন। তিনিও জানেন কীভাবে এই নারীলোলুপদের শায়েস্তা করতে হয়। কয়েকজন ইহুদির মোকাবিলায় একজন আনসারি সাহাবি বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না। নারীর সম্মান রক্ষার্থে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিলেন। পৃথিবীকে এই কথার প্রমাণ দিয়ে গেলেন যে, মুসলিমরা কখনো নারীকে অপমান-অপদস্থ করে না, বরং প্রয়োজন হলে নারীর আঁচলের ধুলোবালি ধুয়ে দিতে বুকের তাজা রক্তও ঢেলে দেয়। সাহাবি তো শহিদ হয়ে গেলেন, কিন্তু ইহুদিদেরকেও বুঝিয়ে গেলেন যে, মুসলিমদের সঙ্গে লড়তে আসা মানে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা।

একজন আনসারি সাহাবি শহিদ হওয়ার খবর শুনে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য আনসারি সাহাবিও ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন। ইহুদিরা তাদের ওপরও আক্রমণ করল। শুরু হলো তুমুল লড়াই। পুরো মেলায় যেন যুদ্ধের আগুন লেগে গেল। দাঙ্গাহাঙ্গামার এমন মর্মান্তিক খবর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটও পৌছল। সংবাদ পেয়েই তিনি সাহাবিদের নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে এসেই ইহুদিদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ দেখে বুঝতে পারলেন, এরা মদিনায় রক্তের হোলিখেলা চালু না করে শান্ত হবে না। একপর্যায়ে দুজন ব্যক্তির এই যুদ্ধ সমস্ত গোত্রে ছড়িয়ে পড়ল। শুরু হলো গোত্র-গোত্র দ্বন্দ্ব। ইহুদিদের ৭০০ যোদ্ধা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একটা দুর্গে অবস্থান নিলো। এদের মাঝে ৩০০ সৈন্য লৌহবর্ম পরিহিত ছিল। প্রায় ১৫-১৬ দিন তাদেরকে দুর্গের ভেতরে অবরুদ্ধ করে রাখার পর তারা মুসলিমদের হাতে আত্মসমর্পণ করল।

আরবে শাস্তির একটা বিধান হলো সকল যুদ্ধবন্দিকেই হত্যা করে ফেলা। দয়ালু মুসলিমরাই প্রথমে এই নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আরব জনগণকে হতবাক করে দিয়েছিল। বদরের ৭০ জন যুদ্ধবন্দি থেকে মাত্র দুজনকে হত্যা করা হয়েছিল। কারণ, এই দুই বন্দির বিদ্রোহ ও হঠকারিতা চূড়ান্তভাবে সীমালঙ্ঘন করেছিল। অন্য বন্দিদের জন্য আরাম-আয়েশের এমন আয়োজন করা হলো যেন বন্ধুর বাড়িতে বন্ধু বেড়াতে এসেছে। ইহুদিদের দীর্ঘদিনের গোলযোগ ও সীমালঙ্ঘনের কারণে সাধারণ মানুষ ভাবছিল, 'যাক' আজ বুঝি বেটাদের রক্ষা নেই। কিন্তু আবারও পৃথিবী অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। দয়া ও মায়ার নবী রহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুখ্যাত মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের সুপারিশে বনু কাইনুকার সকল যুদ্ধবন্দিকে হত্যা না করে শুধু দেশত্যাগ করে চলে যেতে বললেন। উবাদা ইবনে সামিত রা.-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবি এই উদ্ধত লোকগুলোকে মদিনা থেকে বের করে খাইবার পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন।

দৃষ্টান্তমূলক সতর্কীকরণ

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তো পর্দার অন্তরালে সর্বদা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তা ছাড়া তার মুনাফেকির বিষয়টিও সর্বজনস্বীকৃত ছিল। সমস্ত মুসলিমই জানত যে, সে আঁচলের নিচের এক বিষাক্ত সাপ। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে, তার সুপারিশেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধবন্দিদের হত্যা না করে দেশান্তর করেছিলেন? নিশ্চয় দয়ালু মেহেরবান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়েও তাদেরকে হত্যা না করার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁর হৃদয়ের গহিনে দয়া ও ভালোবাসার যে সাগর ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌বেলিত হতো, সেই সাগরের তীরে উপচে পড়া রহমতের ঢেউয়ের কারণেই তিনি এই দুষ্ট ইহুদিদেরকে প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন।

আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সিদ্ধান্তগ্রহণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সুপারিশের কোনো ভূমিকা ছিল না। যদিও তিনি আবদুল্লাহর সুপারিশের পূর্বে ইহুদিদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করেছিলেন। তবে এটা এইজন্যই করেছেন, যেন ইসলামবিরোধীরা বুঝতে পারে যে, মুসলিমরা শুধু দয়াই দেখাতে জানে না, প্রয়োজন হলে দুশ্চরিত্র ও

ফেতনাবাজদের দেহ থেকে মাথা আলাদা করতেও প্রস্তুত থাকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই আচরণে একটি গভীর প্রজ্ঞা লুক্কায়িত ছিল। একটু চিন্তা করলেই যার উপকারিতা অনুভব করা যায়।

উহুদযুদ্ধ

উহুদযুদ্ধ মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে সংঘটিত দ্বিতীয় বৃহৎ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যে যুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক মুসলিমের ভুলের কারণে মুসলিমরা চরমভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। একটি বিশেষ স্থানে নিয়োজিত মুসলিমবাহিনীর একটি নির্দিষ্ট উপদল বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেদের স্থান ত্যাগ করে গনিমতের সম্পদ হস্তগত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কাফেরদের পরাজিত পলায়নপর বাহিনী যখন দেখল মুসলিমদের অরক্ষিত পথে প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈনিকেরা গনিমতের মাল কুড়াতে ব্যস্ত, তখন তারা বিদ্যুৎগতিতে পুনরায় ফিরে এসে অপ্রস্তুত মুসলিমবাহিনীর ওপর আক্রমণ করল এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে নিয়ে নিলো। কিন্তু হাজারো সালাম মুহাম্মাদি আলোর সেসব প্রাণ উৎসর্গকারী পতঙ্গকে, চতুর্দিক থেকে প্লাবনের ন্যায় ধেয়ে আসা শত্রুবাহিনীকে দেখেও যারা ময়দান হতে পিছু হটেননি। সত্যের পতাকা সমুন্নত রাখতে তরবারি হাতে অবিরাম লড়াই করে গিয়েছেন। কারণ রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করাকে তো তারা চরম কাপুরুষতা ও অপমান মনে করতেন।

প্রত্যেক মুসলিম এক অকুতোভয় নির্ভীক সৈনিকের ন্যায় শত্রুশিবিরে ঢুকে কেয়ামত কায়েম করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে কাফেররা যুদ্ধের ময়দানে টিকতে না পেরে পরবর্তী বছরের জন্য যুদ্ধ মুলতবি করে পালাতে বাধ্য হলো। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিমদের বেশ ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। সামান্য ভুলের কারণে যুদ্ধের পুরো পরিস্থিতিই পালটে গিয়েছিল। যদি সেসব মুসলিম নিজেদের জায়গায় আরও কিছুক্ষণ সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাহলে চিরকালের জন্য কাফেরদের হৃদয়ে তাদের প্রভাব ও ভয়ভীতি আসন গেড়ে বসত। কে জানে, হয়তো এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আর কখনো তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মাথা তোলার সাহসই পেত না। সবই ওই ওপরওয়ালার হাতে। তিনি যা চান, তা-ই তো হয়।

উহুদযুদ্ধের কারণ

উহুদযুদ্ধের সবচেয়ে বড় কারণ হলো, কাফেররা এ কথা আদৌ মেনে নিতে পারছিল না যে, তাদের এই বেআইনি রাজ্যে এমন এক ধর্ম আপদ (?) হিসাবে নাজিল হয়েছে, যা তাদের চিন্তাধারা, রুচি-প্রকৃতি ও স্বভাব-চরিত্রকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করতে চায়। অথচ এতকাল তাদের ওপর কোনো নিয়মনীতি বা বাধানিষেধের কর্তৃত্ব ছিল না। তারা নিজেরাই ছিল সর্বেসর্বা। যখন-তখন আইনকানুন বা সংবিধান প্রণয়ন ও পরিবর্তনে তাদের বাধা দেওয়ার কে আছে?

মিথ্যার পূজারি আরবদের মূর্তিপূজার আয়নায় এটা এক চরম ঢিল নিক্ষেপ ছিল যে, মহান আল্লাহর সামনে সেজদাবনত না হয়ে যে মাথা এতদিন সৃষ্টির সামনেই নত হওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, মুহাম্মাদ আজ সে মাথাকে শুধুই এক আল্লাহর সামনে নত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন। এতদিন তারা আরবের মরুপ্রান্তরের রঙ্গমঞ্চে প্রেম-প্রীতি ও সৌন্দর্যের রঙিন খেলায় মত্ত ছিল। খেল-তামাশা ও আনন্দ-বিনোদনের আসরগুলোতে বসে নিজের পৌরুষের অহংকার প্রকাশই এতদিন তাদের সবচেয়ে প্রিয় ব্যস্ততা ছিল। মদের পেয়ালায় বুঁদ হয়ে সভ্যতা-ভদ্রতা ও লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে রং-তামাশায় মেতে ওঠা তাদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। এমন রঙিন দুনিয়া ছেড়ে নৈতিকতা ও সভ্যতার আইনকানুনে নিজেকে আবদ্ধ করে নেওয়া তাদের জন্য এতটাই বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ছিল যে, ভাবলেই যেন তাদের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতো। তাদের এই পথহারা জীবনের লক্ষ্য তো শুধু একটিই ছিল, কীভাবে নিজের ভেতরের প্রবৃত্তি ও পাশবিক চাহিদার সাময়িক আনন্দ ও রং-তামাশাকে উপলব্ধি করা যায়। শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে তারা যখন একটু বুঝতে শিখছিল, অনুভব করতে পারছিল, তখন থেকেই তারা তাদের বাপদাদাদের এইসব মূর্তির পূজা, মদ্যপান ও অজ্ঞতার দাসত্ব করায় ব্যস্ত দেখেছে। তাহলে কেন তারা এই সমস্ত কর্মকাণ্ডকে নির্ভুল ও নির্ভেজাল ভাববে না? তা ছাড়া আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মোকাবিলায় দুনিয়ার দুদিনের ভোগবিলাসকে তারা পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিল না। নিজেদের ধর্মের ওপরে তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। যে কারণে ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও মূলনীতিগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ও ভ্রান্তি ছড়ানোকে তারা নিজেদের ওপর ফরজ মনে করত। ইসলাম তাদের এমন স্বাধীনতার বাঁধভাঙা উল্লাস, সভ্যতা-ভব্যতাহীন সংস্কৃতি ও মাতলামিকে নিরন্তর অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছিল।

কেউ কেউ যদিও সত্যান্বেষী ও বিবেক-বোধসম্পন্ন ছিল, কিন্তু ইসলামের মহত্ত্ব ও সততার বিষয় বুঝতে পেরেও নিজেদের বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের কারণে ইসলাম গ্রহণ করেনি। সবকিছু বোঝা সত্ত্বেও তারা গোমরাহির ধু-ধু মরীচিকাতে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তাদের হৃদয়ে যদিও সত্যের প্রভাব ছিল, কিন্তু তারচেয়ে বহুগুণ বেশি ছিল আত্মীয়স্বজনের ভালোবাসা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহ। ইসলামের আলোর চেয়ে কুফরির অন্ধকার যেখানে প্রবল ছিল। তাই তারাও যখন দেখল এই মুসলিমদের অপ্রতিরোধ্য গোলার আঘাতে তাদের কুফরির শক্তিশালী দুর্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, তখন নিজেদের বানোয়াট ধর্মের হেফাজতে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে নামল। প্রথমদিকে তো মানানো-বোঝানো ও তর্কবিতর্কের মাধ্যমেই তারা ইসলামের অগ্রগতিকে রুখতে চেয়েছিল। মুখের ভাষায় যখন কাজ হলো না, তখন ধনসম্পদ, সুন্দরী রমণী, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভ দেখানো হলো, কিন্তু তারা কি জানত যে, দুনিয়ার এসব তুচ্ছ লোভ-লালসা ও চাকচিক্য দিয়ে তারা যাঁর হৃদয়কে কিনতে চাইছে, তাঁর মূল্য যে তাদের কল্পনারও বাইরে ছিল? সর্বশেষ হত্যার হুমকিও দেওয়া হলো। এতেও যখন কাজ হলো না, তখন তারা নিজেদের হাতা গুটিয়ে নিয়ে নাঙ্গা তরবারি হাতে বেরিয়ে এলো এবং মহান আল্লাহর দরবারে যে মাথা সেজদাবনত হয়, সে মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিলো। বদরযুদ্ধ ছিল তাদের রক্তপিপাসা নিবারণের প্রথম প্রচেষ্টা। আর উহুদযুদ্ধ ছিল তাদের হৃদয়ের প্রতিশোধের আগুন নেভানোর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। আহা! কত নিষ্পাপ-নিরপরাধ মানুষকে শুধু এই কারণেই হত্যা করা হতো যে, তারা শুধু বলত, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

উহুদযুদ্ধের অন্যতম কারণ

উহুদযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল বদরের যুদ্ধ। সে যুদ্ধে কাফেরদের বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ক্ষুদ্র একটি মুসলিমবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই তারা চাইছিল পুনর্বার বিশাল একটি বাহিনী নিয়ে মদিনায় আক্রমণ চালাতে, মুসলিমদের রক্তে নিজেদের প্রতিশোধের প্রজ্বলিত আগুন নেভাতে। এভাবেই বদর হয়ে ওঠে উহুদের প্রেক্ষাপট। বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য এখানে আমি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

প্রথম কারণ—প্রতিশোধস্পৃহা

বদরের যুদ্ধে মুষ্টিমেয় অস্ত্রশস্ত্রহীন মুসলিমদের কাছে কুরাইশদের রণসাজে সজ্জিত বিশাল বাহিনীর এমন লজ্জাজনক পরাজয়ে তাদের বাহাদুরি ও শক্তিমত্তার ওপর ভীষণ চোট লেগেছিল। পুরো আরব তাদের নিয়ে 'ছি ছি' করছিল। আর তাই পুনরায় মুসলিমদের সঙ্গে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের হারানো গৌরব ফিরে পেতে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া তাদের বড় বড় নেতাদের এভাবে নিহত হওয়াটাও কোনো চাট্টিখানি কথা ছিল না। নেতাদের মৃত্যু কুরাইশদের জন্য এতটা সহজে ভোলার মতো বিষয় ছিল না। তাদের বংশধরদের হৃদয়ে প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিশোধের লেলিহান অগ্নিশিখা সবকিছু জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে প্রস্তুত ছিল। রাগে-ক্রোধে তারা প্রতিনিয়ত দাঁত কামড়াচ্ছিল যে, কখন সেই সময় আসবে, যখন তারা মুসলিমদেরকে কাঁচা চিবিয়ে খাবে? আর এর মাধ্যমে নিজেদের নিকটাত্মীয় ও প্রিয় মানুষদের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে নিজেদের হৃদয়ের আগুন নেভাবে।

দ্বিতীয় কারণ—ইহুদি ও মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র

ইহুদি কবি কাব ইবনে আশরাফ ও সাল্লাম ইবনে আবু হুকাইক উসকানিমূলক বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে কুরাইশদের তাজা ক্ষতে যেন লবণ ছিটিয়ে দিয়েছিল। তারা কুরাইশদেরকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য বলেছিল, পরাজিত হয়ে মহিলাদের ন্যায় আঁচলে মুখ লুকিয়ে বসে থাকা কোনো বীরপুরুষের কাজ নয়। যদি তোমাদের মধ্যে এতটুকু আরবীয় আত্মমর্যাদাও থেকে থাকে, তবে নিজেদের নিহত স্বজনদের হত্যার প্রতিশোধ নাও।

আগে থেকেই তো কুরাইশরা প্রতিশোধের তপ্ত আগুন জ্বালিয়ে বসেছিল। এখন এই সমস্ত কথায় তাদের উত্তপ্ত আগুনে যেন আরও তেল ঢেলে দেওয়া হলো। ইহুদি সর্দাররা তাদেরকে পুরোপুরি আশ্বস্ত করল যে, আমরা তোমাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করব। তোমরা চুপচাপ ঘরে বসে থেকো না। একটা বিশাল দুঃসাহসী বাহিনী প্রস্তুত করে ভয়ংকর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বায়ুর ন্যায় মক্কা থেকে বের হও এবং পৃথিবীর মাটি থেকে মুসলিমদের নামনিশানা মুছে দাও। মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও কুরাইশদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল এবং সেও নিজের প্রতিশোধস্পৃহায় পাগলপ্রায় হয়ে পড়েছিল। সে কাফেরদের আশ্বস্ত করতে বলল, আমরা কখনোই মুসলিমদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না।

উলটো তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে তোমাদের যথাসম্ভব সহযোগিতা করব। এই সমস্ত কথায় কুরাইশদের রক্ত আরও টগবগিয়ে উঠেছিল।

তৃতীয় কারণ—সর্দারপত্নীদের রক্তপিপাসা

ইসলামের চিরদুশমন কুরাইশ নেতা আবু জাহল বদরে মুসলিমদের হাতে নিহত হওয়ার পর আবু সুফিয়ান তার মূর্খতার গদিতে আসন গেড়ে বসল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উকবার পিতা ও ভাই বদরযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। রাতদিন প্রতিনিয়ত সে তার নিহত আত্মীয়স্বজনদের জন্য বিলাপ করত। শুধু তাই নয়, স্বামী আবু সুফিয়ানকে ধিক্কার দিয়ে বলত, আমার বীরবাহাদুর আত্মীয়রা তো মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছে। এখন তুমি বসে বসে কুরাইশদের ওপর কর্তৃত্বের মজা লুটছ! পানিতে ডুবে মরতে পারো না! যদি তুমি পুরুষ হয়ে থাকো, তোমার ভেতরে যদি আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু থাকে তাহলে যাও, একটি দুঃসাহসী বাহিনী নিয়ে গিয়ে মুসলিমদের টুঁটি চেপে ধরো! প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত নিজের জন্য সব আরাম-আয়েশকে হারাম করে দাও! তারা আমাদের শক্তিকে খর্ব করেছে। আমাদের বীরবাহাদুর যোদ্ধাদের হত্যা করেছে। এর ক্ষতিপূরণ তখনই হবে, যখন আমরা দেখব যে, আমাদের বাহিনী মুসলিমদেরকে সবজির ন্যায় কেটে কুচিকুচি করছে। মনে রেখো, কুরাইশ নেতাদের ওয়ারিশদের হৃদয়ের আগুন একমাত্র মুসলিমদের রক্তেই নিভবে। তোমাদের পুরুষদের শরীরের রক্ত যদি ঠান্ডা হয়ে থাকে, কাপুরুষের ন্যায় তোমরা যদি স্ত্রীদের আঁচলে মুখ লুকিয়ে বসে থাকো, তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যদি তোমাদের এতটাই ভয় হয়, তাহলে চলো, আমরা মহিলারাও তোমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করব। আমাদের বীরত্ব দেখে হয়তো তোমাদের বরফজমাট রক্তে বাহাদুরির ঢেউ উঠবে।

চতুর্থ কারণ—আবু সুফিয়ানের অঙ্গীকার

স্বয়ং আবু সুফিয়ানও প্রতিশোধের ক্ষুধায় অস্থির ছিল। কারণ, আবু জাহলের মৃত্যুর পর তার আসনে বসার সময় সে কুরাইশদের সামনে এই অঙ্গীকার করেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিহতদের হত্যার প্রতিশোধ না নেব, ততক্ষণ পর্যন্ত সকল আরাম-আয়েশকে নিজের জন্য হারাম মনে করব। না স্ত্রীর সৌন্দর্যের বাগানে ফুলের ঘ্রাণও নেব, না মাথায় তেল লাগাব। কুরাইশদের সামনে তখনই মুখ দেখানোর উপযুক্ত হব, যখন সেই অঙ্গীকার পূরণ করতে পারব।

প্রতিশোধের লেলিহান আগুন

এই চারটি কারণই এমন ছিল, যেগুলো কুরাইশদের হৃদয়ে বিদ্বেষ, বিদ্রোহ, শত্রুতা ও ক্রোধের প্রজ্বলিত আগুনকে ক্ষণে ক্ষণে উসকে দিচ্ছিল। অবশেষে এই প্রজ্বলিত আগুন ইরানের অগ্নিশিখার ন্যায় নিজের সমস্ত তেজ ও শক্তিতে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। তাদের এই প্রজ্বলিত আগুন চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল, যেন নিজের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে ইসলামের সবুজ-শ্যামল বাগানকে ছাই করে তবেই তা শান্ত হবে। কিন্তু ইসলাম নিজেই তো এমন এক বিদ্যুৎঝলক ছিল, যা কুফর, শিরক, বাতিল ও গোমরাহির সমস্ত খড়কুটাকে নিমেষেই ছাই করে দিতে অদৃশ্যের আবরণ ভেদ করে বিকশিত হয়েছিল। পাথরবৃষ্টির ভয়ে তো সে ব্যক্তিই শঙ্কিত থাকে, কাচের বাড়িতে যে বসত করে। কঙ্করময় ভূমিতে যার বসবাস, ধুলোবালির ঝড়ে তার কী আসে যায়।

দুঃসাহসী বাহিনীর বিশাল রণপ্রস্তুতি

বদরের যুদ্ধে হক ও বাতিলের প্রথম মুখোমুখি সংঘর্ষের সময় মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা শাম থেকে ফিরে আসছিল। এই কাফেলার সঙ্গে ছিল পঞ্চাশ হাজার মিছকাল স্বর্ণ ও সহস্রাধিক উটের বিশাল বহর। কাফেরদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সমস্ত সম্পদই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে অকাতরে খরচ করা হলো। লক্ষ্য শুধু একটাই, মায়ের কোলের নিষ্পাপ-নিরপরাধ শিশুর রক্তে যেন আরবের মরুপ্রান্তরকে রঞ্জিত করা যায়। কী অপরাধ ছিল নবীজির? কী দোষ ছিল মুসলিমদের? কুফর ও আল্লাহদ্রোহিতার এমন অন্ধকার সময়ে অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রান্তি ও অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন মানবতাকে হেদায়েতের আলোকিত পথে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, এটাই ছিল তাঁর অপরাধ! মিথ্যার দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে সত্য ও ন্যায়ের মুক্ত স্বাধীন খোলা আকাশের নিচে মুসলিমরা একটু স্বস্তির নিশ্বাস নিতে চেয়েছিল, এটাই ছিল তাদের দোষ! সততা ও ন্যায়ের আহ্বায়ক, সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী এই গুটি কয়েক মানুষকে আরবের ভূখণ্ড হতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে কাফেররা একটি বিশাল শক্তিশালী বাহিনী গঠন করল। ধারালো তরবারি, বুকবিদীর্ণকারী বর্শা, মজবুত লৌহবর্ম ও ঢাল তৈরি করা হলো। নিজেদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও শক্তিবৃদ্ধির তাগিদে অন্যান্য গোত্রের নিকটও প্রতিনিধি পাঠানো হলো,

যাতে তারাও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এই নাপাক অপচেষ্টায় অংশগ্রহণ করে। রণোদ্দীপক সংগীতশিল্পী ও দফ বাজিয়ে বাজিয়ে কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে বীরত্ব ও বাহাদুরির স্পৃহাকে শতগুণ বাড়িয়ে তোলা কবি সাহিত্যিক এবং সুন্দরী গায়িকা রমণীদেরকেও সঙ্গে নেওয়া হলো। এমনকি মক্কার হাবশি গোলামদেরকেও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাহিনীতে যোগ করা হলো। এভাবেই যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত তিনহাজার সৈনিকের এক বিশাল তাগুত[১৪] বাহিনী আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। এ ছাড়াও হিন্দ বিনতে উতবার নেতৃত্বে রণসংগীত গেয়ে সৈনিকদের উত্তেজিত করে তোলার জন্য যে-সমস্ত মহিলা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

হিন্দের রক্তপিপাসু ইচ্ছা

কুরাইশদের নেতা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের সবচেয়ে বেশি শত্রুতা ছিল হামজা রা.-এর সঙ্গে। যিনি বদরযুদ্ধে হিন্দের নিকটাত্মীয়দের কয়েকজনকে জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রতিশোধের আগুন নির্বাপিত করার এক হীন উদ্দেশ্যে সে পূর্ণপ্রস্তুতি নিয়েই মক্কা থেকে বেরিয়েছিল।

জুবাইর ইবনে মুতয়িমের কৃষ্ণাঙ্গ একজন ক্রীতদাস ছিল। ওয়াহশি নামেই সে সমধিক পরিচিত ছিল। যুদ্ধে সে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। বল্লম বা বর্শা ছুড়ে শত্রুকে কুপোকাত করাতে তার জুড়ি ছিল না। প্রতিশোধের আগুন নেভানোর জন্য হিন্দ এই ক্রীতদাসটিকে বেছে নিলো। ক্রীতদাসের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করল, যদি সে হামজাকে হত্যা করে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে, তাহলে সে নিজের সমস্ত মূল্যবান অলংকার ওয়াহশিকে পুরস্কারস্বরূপ দিয়ে দেবে। জুবাইর ইবনে মুতয়িমও এই কাজের বিনিময়ে তার ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেওয়ার ওয়াদা করল। বুঝতেই পারছেন, এই তাগুতবাহিনী মুসলিমদের রক্তপিপাসায় কতটা কাতর হয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল।

---

[১৪]. আল্লাহর অবাধ্যতা করা। পরিভাষায় মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য যা-কিছু প্রভু ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তা-ই তাগুত। বা আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধানে বিচার করে, ইত্যাদি।-সম্পাদক

মদিনায় সংবাদ এলো

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. যদিও ততদিনে মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও বিভিন্ন কারণে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেননি। তিনি কুরাইশদের এমন ভয়ংকর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবগত করার জন্য চিঠি লিখে একজন বাহকের মাধ্যমে দ্রুত মদিনায় সংবাদ পাঠালেন। চিঠি পড়েই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে জরুরি পরামর্শসভার আয়োজন করলেন। কাফেরদের সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করে এ বিষয়ে সবার মতামত জানতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! প্রয়োজনে আমরা আমাদের শরীরের প্রতিফোঁটা রক্ত দিয়ে দেবো, তবুও আপনার শরীর হতে এক ফোঁটা ঘাম বেরোতে দেবো না। কাফেরদের আসতে দিন। তারা এলেই বুঝতে পারবে যে, মুসলিমরা কোনো কচি চারাগাছ নয় যে, চাইলেই উপড়ে ফেলা যাবে। যদি মহান আল্লাহর সাহায্য আমাদের সঙ্গে থাকে, তাহলে তাদেরকে এমন শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব যে, পুনরায় ভুলেও মদিনার দিকে আসার সাহস করবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো বেশ ভালোভাবেই জানি যে, তোমরা বাতিলের কাছে কখনো মাথানত করবে না। আমি জানতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে আমরা কি শহরের ভেতরেই অবস্থান করে শত্রুর মোকাবিলা করব, না বাইরে বেরিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হব?

অভিজ্ঞ ও বয়স্ক সাহাবিরা এই কথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করলেন যে, আমরা শহরের ভেতরে অবস্থান করেই শত্রুর মোকাবিলা করব।

মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও এই মজলিশে উপস্থিত ছিল। সেও শহরের ভেতরে থেকেই যুদ্ধ করার পক্ষে মত দিলো। কে জানে, হয়তো তার এতে গোপন কোনো উদ্দেশ্য সফল হতো। তবে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, অধিকাংশ সাহাবির মতের বিরোধিতা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

নবীজির একটি স্বপ্ন

মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এই বিষয়ে কোনো ওহি নাজিল হয়নি যে, মুসলিমরা কি শহরের ভেতরে থেকেই শত্রুকে প্রতিরোধ করবে, না ময়দানে গিয়ে মুখোমুখি লড়াই করবে। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

হৃদয়ের গভীরে বারবার এটিই ভালো মনে হচ্ছিল যে, আমরা শহরে থেকেই শত্রুর মোকাবিলা করব। কারণ, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, একটি ধারালো তরবারির ধারের কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে। তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন, এই যুদ্ধে মুসলিমদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই স্বপ্নে তিনি আরও দেখেন, যুদ্ধের লৌহবর্মের ভেতরে একটি হাত ঢুকে পড়েছে। স্বপ্নে দেখা সেই লৌহবর্মকে তিনি মদিনা দ্বারা ব্যাখ্যা করলেন। আর তাই তিনি মদিনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করাটাকেই উত্তম বলে বিবেচনা করছিলেন।

যৌবনের ব্যাকুল উন্মাদনা

যৌবন পাগলামি করতে চায়। সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা হতে মুক্তি চায়। বাঁধভাঙা উল্লাসে হারিয়ে যেতে চায়। যে-সমস্ত যুবক সাহাবি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিজেদের বীরত্ব ও পৌরুষের ঝলক দেখাতে পারেননি, বয়স্ক ও অভিজ্ঞ সাহাবিদের এই মতামত তাদের পছন্দ হলো না। তারা উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে নিজেদের সাগরের মতো বিশাল হৃদয়ে বীরত্ব ও বাহাদুরির যে ঢেউ উঠছে, যৌবনের যে তরঙ্গ আছড়ে পড়েছে, তা প্রকাশ করতে চাইছিলেন। যেহেতু আল্লাহর পক্ষ হতে এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি, সেহেতু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দয়া ও স্নেহের চিরায়ত অভ্যাসমতো যুবকদের মতামতই গ্রহণ করলেন।

প্রতিরোধ প্রস্তুতি

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত আগ্রহভরে ও আবেগাপ্লুত হয়ে জুমার নামাজ আদায় করলেন এবং দয়াময় আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হয়ে মুসলিমদের বিজয় ও সাহায্যের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর নিজ ঘরে প্রবেশ করে যুদ্ধের পোশাক পরিধান করে বাইরে এলেন। এমন সময় অনেক যুবক সাহাবির হৃদয়ে এই অনুশোচনা জাগ্রত হলো যে, হায়! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো শহরে অবস্থান করেই যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। অথচ আমাদের জেদের কারণে তিনি এখন বাইরে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং আমাদের জন্য উত্তম হলো নবীজির কাছে লজ্জিত হয়ে সিদ্ধান্ত তাঁর ওপরই ছেড়ে দেওয়া। তখন তারা তাই করলেন, কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন না। বললেন, কোনো নবী যদি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেন, তবে শত্রুর

বিরুদ্ধে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলা তার জন্য শোভনীয় নয়।[৯৫]

রসদপত্রহীন মুসলিমবাহিনী

এক হাজার মুসলিম সৈনিক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে হক-বাতিলের এই বাঁচা-মরার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মদিনা থেকে উহুদ পাহাড়ের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মদিনা থেকে দেড় মাইল দূরত্বের পথ অতিক্রম করতেই মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার ৩০০ অনুসারীকে নিয়ে এই বাহানায় মদিনায় ফিরে এলো যে, যাদের কাছে তার মতো এমন একজন সম্ভ্রান্ত (?) ব্যক্তির মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই, তাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করার কোনো মানে হয় না। এবার বিশাল সুসজ্জিত কাফেরবাহিনীর মোকাবিলায় রসদপত্রহীন মাত্র ৭০০ মুসলিম শাহাদাতের তীব্র বাসনা বুকে নিয়ে উহুদপানে ছুটে চললেন। তিনশজন মুনাফেক মুসলিমবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গেছে তাতে কী? এ তো বড় খুশির বিষয়। এক আল্লাহর দ্বীনের হেফাজতের জন্য শাহাদাতের অমিয় পানে ব্যাকুল মুসলিমবাহিনী এখন কপটতার কলঙ্কমুক্ত।

মুসলিম সৈন্যদের শাহাদাতের স্পৃহা

এই সামান্যসংখ্যক মুসলিমদের হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসা ও শাহাদাতের বাসনায় কতটা পরিপূর্ণ ছিল, তা একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করলে সহজেই বুঝে আসবে। মুসলিমবাহিনী যখন মদিনা হতে দুই-আড়াই মাইল দূরত্ব অতিক্রম করল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সৈনিকদের যাচাইবাছাই শুরু করলেন। কম বয়সী কিশোর মুজাহিদদেরকে দল থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। তখন এমন অনেক কম বয়সী কিশোর ছিল, যারা নিজেদের পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে কিছুটা দীর্ঘকায় বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল, যাতে করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বাহিনী থেকে বাদ না দেন। তাদের এমন স্পৃহা দেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৪/১৫ বছর বয়স্ক কয়েকজন শক্তিসামর্থ্যবান কিশোর সাহাবিকেও যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন। এরা ছাড়া ছোট ছোট যারা ছিল তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। সব মিলিয়ে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা কাফেরবাহিনীর এক পঞ্চমাংশ বা তারচেয়েও কম ছিল। কারণ, কোনো কোনো গ্রন্থে মহিলা ও চাকরবাকরদের মিলিয়েই

---

৯৫. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/১৯; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/১২

কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা পাঁচ হাজার বলা হয়েছে। আর অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের কথা যদি বলি, তাহলে তো কাফেরদের তুলনায় মুসলিমদের নিকটে তার এক-দশমাংশও ছিল না। এই যুদ্ধে কয়েকজন মহীয়সী মুসলিম নারীও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন—

১। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.

২। উম্মে সুলাইম রা.

৩। উম্মে আম্মারা রা.। তার ছেলে আম্মারা ইবনে জিয়াদ রা. এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

৪। উম্মে সুলাইত রা.।

এই বীরাঙ্গনা মুসলিম নারীরা যুদ্ধে সীমাহীন সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আনাস রা. বলেন, আমি আয়েশা রা. ও উম্মে সুলাইম রা.-কে দেখেছি, তারা একের পর এক মশকভরতি পানি নিয়ে আহত মুজাহিদদেরকে পান করাচ্ছিলেন। উম্মে আম্মারা রা. অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে তরবারি হাতে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন। এই যুদ্ধে শত্রুর তরবারির আঘাতে তিনি কাঁধের পাশে মারাত্মকভাবে আঘাত পান।

সারিবদ্ধ মুসলিমবাহিনী

সন্ধ্যায় মুসলিমবাহিনী উহুদ পর্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে দেখল, খুব কাছেই শত্রুবাহিনী তাঁবু গেড়ে বসে আছে। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর বাহিনীকে তাঁবু তৈরির নির্দেশ দিলেন। আগামীকালের সূর্য কাদের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে পুবাকাশে উদিত হয়, এই চিন্তায় দুপক্ষের কেউ সারারাত ঘুমাতে পারেনি। অবশেষে রাতের আঁধার ভেদ করে সুবহে সাদিক উদিত হলো। পূর্বাচলের রক্তিম সূর্য উহুদের রক্তক্ষয়ী দৃশ্য দেখতে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো। তাওহিদের অনুগত বাহিনী পরম বিনয়াবনত হয়ে নিজেদের মাথা মহান প্রভুর সামনে ঝুঁকিয়ে দিলেন। ফজরের নামাজ শেষে বিজয় ও সফলতার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন এবং যুদ্ধের অন্যতম প্রধান নীতি সুবিধাজনক জায়গা নির্বাচন করার লক্ষ্যে সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সামনে রেখে উহুদ পাহাড়কে নিজেদের পশ্চাতে রেখে সৈনিকরা সারিবদ্ধ হতে শুরু করল। এই পাহাড়ে এমন একটি গিরিপথ ছিল, যে পথ দিয়ে অনায়াসেই শত্রুরা পেছন দিক থেকে মুসলিমদের ওপরে অতর্কিত হামলা করতে পারবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে এই গিরিপথটির গুরুত্ব

অনুধাবন করলেন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের আনসারি রা.-এর নেতৃত্বে ৫০ জন তিরন্দাজ সাহাবিকে সে পথটি পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন এবং তাদের এ কথাও বলে দিলেন যে, আমার নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না।

সৈনিকদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামজা রা.-কে অগ্রবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করলেন। মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর হাতে পতাকা দিলেন। সৈনিকদের ডান পাশের নেতৃত্ব জুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. ও বাম পাশের নেতৃত্ব মুনজির ইবনে আমর রা.-এর কাঁধে সোপর্দ করলেন। তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের তরবারি আবু দুজানা রা.-কে দান করলেন। এমন মহামূল্যবান উপহার পেয়ে আবু দুজনার যেন খুশির সীমা রইল না। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে তিনি এই তরবারি নিয়ে চারদিকে চক্কর দিচ্ছিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গর্ব ও অহংকারকে অত্যন্ত খারাপ মনে করতেন। তাই তিনি আবু দুজানাকে লক্ষ করে বললেন, আবু দুজানা, এই ধরনের আচরণ আল্লাহ পছন্দ করেন না। কাফেরদের মোকাবিলায় এমন কঠিন পরিস্থিতিতে এভাবে বুক ফুলিয়ে চলাটা তোমার ভেতরের অহংকারের প্রমাণ বহন করে।[৯৬]

সারিবদ্ধ কাফেরবাহিনী

এদিকে কাফেররাও তাদের জানবাজ যোদ্ধাদের সারিবদ্ধ করতে শুরু করল। মূল বাহিনীর ডানপাশে অবস্থানের জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে ১০০ জন অশ্বারোহীকে নির্বাচন করা হলো। আর বামপাশেও অবস্থানের জন্য ইকরামা ইবনে আবু জাহলের নেতৃত্বে ১০০ জন অশ্বারোহীকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। এ ছাড়াও ২০০ অশ্বারোহীকে রিজার্ভ বাহিনী হিসাবে মূল বাহিনীর পেছনে প্রস্তুত রাখা হলো। অতঃপর যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। শুরু হলো মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যকার দ্বিতীয় বৃহৎ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

---

৯৬. ঘটনাটি *আস-সিরাতুন নাবারিয়্যা লি ইবনি হিশামের*, ৩/২২-এ উল্লেখিত রয়েছে। তবে এখানে স্বামীজি আবু দুজানা রা.-এর গর্ব করে চলার বিষয়টিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপছন্দ করেছেন বলে যে উক্তি উল্লেখ করেছেন, তা আমরা কোথাও পাইনি, বরং যুদ্ধের ময়দানে এ রকমভাবে চলাকে সমর্থন করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এটি এমন এক চলার ভঙ্গি, যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। তবে যুদ্ধের ময়দানে এভাবে চলাটা আল্লাহ পছন্দ করেন।-অনুবাদক

এক চালবাজ কুচক্রী বৃদ্ধ

যুদ্ধের বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এক চালবাজ বৃদ্ধের ভণ্ডামি ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারেও কিছু আলোচনা করা দরকার। আবু উমর নামে একজন লোলচর্ম বুড়ো পাদরি ছিল। সে মদিনায় বসবাস করত। ইসলামের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করত। যেদিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় এসেছিলেন, সেদিন সে রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। সে এতটাই রাগান্বিত হয়েছিল যে, মদিনা ছেড়ে মক্কায় গিয়ে কাফেরদের সঙ্গে বসবাস করতে লাগল। সে ছিল মদিনার আউস গোত্রের লোক। এবার উহুদযুদ্ধের সুবাদে মুসলিমদের রক্তনদী বইয়ে দিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে এই বুড়োও কাফেরদের সঙ্গে উহুদপ্রান্তরে এসে উপস্থিত হলো। যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার একটু আগে সে শত্রুশিবির থেকে বেরিয়ে এসে নিজ গোত্র আউসের লোকদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করার আহ্বান করল, কিন্তু মদিনার আনসার সাহাবিরা তাকে এমন দাঁতভাঙা জবাব দিলো যে, লজ্জায় বিফল মনোরথে সে পুনরায় শত্রুশিবিরে ঢুকে পড়ল।[৯৭] এ রকম বুড়ো শয়তানদের ব্যাপারেই বোধ হয় কবি বলেছিলেন,

আফসোস! চুল তোমার হয়েছে সাদা
কর্ম আজও কালোয় ভরা।
কবরপথের যাত্রী তুমি হয়ে গেছ সেই কবে
এখনো মানুষ ফেঁসে যায় পড়ে তোমার ফাঁদে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ

তাওহিদের পতাকাবাহীদের রক্তে লালায়িত কাফেরবাহিনীর একজন প্রসিদ্ধ বীরযোদ্ধা তলজা ইবনে আশরাফ 'আলআতশ আলআতশ' (পিপাসা পিপাসা) বলতে বলতে কাতার থেকে বেরিয়ে এলো। বাতাসে নিজের ধারালো তরবারি ঘুরাতে ঘুরাতে হুংকার ছেড়ে বলল, তোমাদের মাঝে কি এমন কোনো বাহাদুর আছে, যে আমার সামনে এসে আমার তরবারির পিপাসা নিবারণ করতে পারবে? তার এমন দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা শুনেই আলি রা. বিদ্যুৎগতিতে কাতার থেকে বেরিয়ে এলেন এবং চোখের পলকেই এই

[৯৭]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/২৩

দাম্ভিকের দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেললেন। কাফেরদের প্রসিদ্ধ বীরযোদ্ধার মস্তকহীন শরীর মরুভূমির তপ্ত বালুতে ছটফট করতে করতে নিথর হয়ে গেল।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

অতঃপর দুপক্ষের সৈনিকরা একে অন্যের ওপর ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় হামলে পড়ল। শুরু হলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। পুরো উহুদপ্রান্তরের এখানে-সেখানে পড়ে থাকা আহত সৈনিকদের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠল। রক্তপাতের এমন করুণ দৃশ্য দেখে হয়তো সেদিন উহুদ পর্বতও কেঁদেছিল। ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের খুন হওয়ার নির্মম দৃশ্য দেখে মরুভূমির বালুকণাও হয়তো সেদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে ফরিয়াদ করছিল। আল্লাহর চরম অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী জালেম নেতাদের উসকানিতে আজ বাবার হাতে ছেলে খুন হচ্ছে, ভাইয়ের হাতে ভাই নিহত হচ্ছে। এই দৃশ্য বড়ই নিদারুণ। খুবই করুণ।

উহুদযুদ্ধের কিছু করুণ দৃশ্য

বেঁচে গেল হিন্দ বিনতে উতবা

আবু দুজানা রা. নবীজির প্রিয় সাহাবি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের নাঙ্গা তরবারিটি যার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। প্রিয়তমের তরবারি হাতে ক্ষিপ্র গতিতে তিনি ঢুকে পড়লেন কাফেরশিবিরে। একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল মক্কার আল্লাহদ্রোহী কাফের সৈনিকেরা। শত্রুবাহিনীর সেনাপতি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ তার তরবারির নিচে এসে পড়ল। মৃত্যুকে সামনে দেখে সে বিকট চিৎকার করতে করতে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে লাগল। সে তো একজন নারী, যত দ্রুতই ছুটুক না কেন, বীরযোদ্ধা আবু দুজানার পক্ষে তাকে পাকড়াও করা কঠিন কিছু নয়, কিন্তু না, তিনি নিজেকে সংযত করলেন। ভাবলেন, যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর বুকে নারীদেরকে তাদের সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছেন, আজ কী করে তাঁর তরবারি দিয়ে আমি একজন নারীর প্রাণ নিই।[৯৮]

---

৯৮. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/২৫; *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ*, ৬/১০৯; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/১৬

আহা! আবু দুজানা যদি জানতেন একটু পরেই কী হচ্ছে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানের দিকে তাকিয়ে তিনি যে মহিলাকে হত্যা করেননি, আহা! সেই মহিলাই একটু পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় চাচার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে কলিজা বের করে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে!! যুদ্ধ শেষে আবু দুজানা রা. যখন এই ঘটনা শুনেছেন, না জানি তার ভেতরটা তখন কতটা দুঃখ-বেদনা, ঘৃণা ও ক্ষোভে অস্থির হয়ে পড়েছিল।

এ কেমন নৃশংস হত্যা!

আমির হামজা রা. ইসলামের এক বীরযোদ্ধা ও সাহসী মুজাহিদ ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তার অসাধারণ নৈপুণ্য ও বিরল সাহসিকতার কথা শত্রুরাও স্বীকার করেছিল। এই যুদ্ধেও তিনি একের পর এক শত্রুসেনাদের কুপোকাত করছিলেন। মুশরিকবাহিনীর পতাকাধারী তলজাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে তিনি শত্রুদের কচুকাটা করতে করতে কাফেরশিবিরে ঢুকে পড়লেন। এমন সময় ওয়াহশি নামক সেই কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসটা তাকে দেখতে পেল, যাকে তার মনিব জুবাইর ইবনে মুতয়িম ও আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ আমির হামজা রা.-কে হত্যার বিনিময়ে মহামূল্যবান উপঢৌকনের লোভ দেখিয়েছিল। হামজা রা.-কে দেখে সে একটি বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। হামজা রা. যখন কাফেরদের কচুকাটা করতে করতে তার নিকটবর্তী হলেন, শিকারের আশায় ওত পেতে থাকা ওয়াহশি তখন পাথরের আড়াল হতে বেরিয়ে এলো। হামজার বুক বরাবর একটা বর্শা ছুড়ে মারল। নবীজির প্রিয় চাচা শহিদদের সর্দার হামজা রা.-এর বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হামজা রা.-এর শাহাদাতে যখন পুরো মুসলিমবাহিনী শোকে মুহ্যমান। আমির হামজা রা.-এর এই আকস্মিক মৃত্যুর দুঃখটা প্রত্যেক মুসলিম সৈন্যের হৃদয়ে দুমুখো তির হয়ে বিঁধছিল। তখন ওয়াহশির যেন খুশির সীমা নেই। সে চকচকে তরবারি থেকে কোনোরকমে জীবন বাঁচিয়ে হিন্দর কাছে এসে পৌছল। হামজাকে হত্যায় তার গৌরবময় (নাউজুবিল্লাহ) কৃতিত্বের কথা বলতে শুরু করল। এই হামজাই তো বদরের যুদ্ধে হিন্দর আপনজনদের হত্যা করেছিল, আজ সে নিহত হয়েছে?! সত্যিই ওয়াহশি তাকে হত্যা করেছে! আনন্দের আতিশয্যে হিন্দ যেন পাগলপ্রায় হয়ে গেল। ওয়াহশিকে তার যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে হিন্দ দৌড়ে এসে পৌছল হামজার লাশের কাছে।

লাশের সঙ্গে এ কেমন আচরণ!

আবু সুফিয়ানের 'কুচক্রী স্ত্রী' হিন্দ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় চাচা হামজার লাশকে যেভাবে চরম নির্দয়তার সঙ্গে অপমান করেছে, সেই মর্মান্তিক ঘটনা শুনে তো পাথরের ন্যায় শক্ত হৃদয়ের চোখেও অশ্রুর বান ডাকে। এই কাফের মহিলা হামজা রা.-এর নাক-কান কেটে ফেলল। বুক ফেড়ে কলিজা বের করে চিবাতে লাগল এবং থুথু করে ফেলতে লাগল। হায় মানুষ! তুমি কি জানো তোমার এই মানবরূপী দেহটার ভেতরে কতটা পশুত্ব বসবাস করে? হায় নারী! তোমার প্রতিশোধ কতই-না ভয়ংকর হয়!!

মৃত্যুর মুখোমুখি আবু সুফিয়ান

কাফের মহিলাদের নেত্রী হিন্দের ন্যায় তার স্বামী আবু সুফিয়ানও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কপালগুণে বেঁচে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই এভাবে মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ার মাঝে পার্থক্য হলো, হিন্দের বেঁচে যাওয়াটা ছিল আবু দুজানা রা.-এর দয়া-অনুগ্রহ ও নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ফল। আর আবু সুফিয়ান বেঁচে গিয়েছিল তাকে হত্যা করতে উদ্যত হওয়া সাহাবির শাহাদাত বরণ করার কারণে। মুসলিমবাহিনীর বীর মুজাহিদ হানজালা রা. অত্যন্ত বীরবিক্রমে কাফের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে একপর্যায়ে আবু সুফিয়ানের সামনে এসে হাজির হন। তাকে তরবারির এক আঘাতেই জাহান্নামের অতল গহ্বরে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আবু সুফিয়ানের সৌভাগ্য যে ইতিমধ্যে হঠাৎ পেছন থেকে শাদ্দাদ ইবনে আসওয়াদ লাইসি এসে হামলা করে হানজালা রা.-কে শাহাদাতের সুধাপান করালেন।

মিথ্যার ধ্বজাধারীর শেষ পরিণাম

বহুকাল আগ থেকেই মক্কার কুরাইশদের পতাকা বনু আবদুদ দারের লোকেরা বহন করে আসছিল। উহুদযুদ্ধে আবু সুফিয়ান তাদের হাতে পতাকা তুলে দেওয়ার আগে তাদের হৃদয়ে বীরত্ব ও সাহসিকতা পূর্ণরূপে জাগিয়ে তোলার জন্য বলল, এই পতাকার সম্মান রক্ষা করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, তাই আজ আমরা এই পতাকা এমন একজন যোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করব, যে এই পতাকার সম্মান ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করবে, তোমাদের মতো একে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবে না। বদরের যুদ্ধে তোমরা যেভাবে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছ, আজও যদি তা দিতে

প্রস্তুত থাকো, তবেই আমরা তোমাদের হাতে এই পতাকা তুলে দেবো। অন্যথায় আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে তোমাদের অব্যাহতি দেবো। বনু আবদুদ দার আবু সুফিয়ানের এমন উসকানিমূলক কথায় বেশ প্রভাবিত হলো। তারা লাত-উজজার শপথ নিয়ে আবু সুফিয়ানকে আশ্বাস দিলো যে, মনে রাখবেন, এবারও আমরা আমাদের সাহসিকতার কৃতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে শত্রুর হৃদয়ে আমাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার দাগ বসিয়ে দেবো। তাদের আবেগ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে আবু সুফিয়ান তাদের হাতেই পতাকা অর্পণ করল।

এই যুদ্ধে একের পর এক বনু আবদুদ দারের ১২ জন পতাকাবাহী মুসলিম সৈনিকদের হাতে নিহত হয়েছে। যাদের আটজনকে আলি রা. একাই জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ পতাকাবাহীর মৃত্যুর পর আর কারও সাহস হলো না পতাকা বহন করে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার ন্যায় এত বড় ঝুঁকি নেওয়ার।

আবু সুফিয়ানের বাহিনীর বীরযোদ্ধারা বড় নির্দয়ভাবে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করেছিল, কিন্তু অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত বিশাল কাফেরবাহিনীর মোকাবিলায় মুসলিমরা সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় নিজেদের স্থানে অটল-অবিচল রইল। তাদের অবিচলতায় কাফেরবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হলো।

মুসলিমদের বিশৃঙ্খলার ভয়াবহ পরিণতি

কাফেরবাহিনী যখন পরাজিত হয়ে পিছু হটতে লাগল, কাফেরবাহিনীকে রণসংগীত গেয়ে গেয়ে উদ্দীপ্ত করার জন্য যে-সকল নারী এসেছিল তারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাতে লাগল, মুসলিমরা তখন গনিমতের সম্পদ কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তিরন্দাজ বাহিনীকে আশঙ্কাজনক পাহাড়ি পথে প্রহরায় মোতায়েন করেছিলেন, বিজয়ের আনন্দে তারাও গনিমতের সম্পদ কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নিষেধও তারা মানলেন না। সামান্য এই গনিমতের সম্পদ কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ফলাফল হলো, কাফেরবাহিনীর সাহসী যোদ্ধা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ যখন পাহাড়ি পথটিকে অরক্ষিত দেখতে পেল, তখন দীর্ঘ এক মাইল পথ ঘুরে পেছনের পাহাড়ি পথ দিয়ে মুসলিমদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসল। অন্যদিকে ইকরামা ইবনে আবু জাহল তার অধীনস্থ সৈনিকদের নিয়ে পূর্ণোদ্যমে মুসলিমদের ওপর

আক্রমণ করে বসল। যে আবু সুফিয়ান পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে পালাচ্ছিল, সেও রণাঙ্গনের পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ায় পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলো। এবার তো চতুর্দিক থেকে মুসলিমরা কাফেরদের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। গনিমতের সম্পদ তো দূরের কথা, এখন সবার জীবনই বিপন্ন হওয়ার পথে। হতভম্ব মুসলিমবাহিনী পুনরায় তরবারি হাতে নিয়ে চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির ন্যায় তরবারির আঘাতের জবাব দিতে লাগল।

তরবারির ছায়ায় নবীজি

সকল সৃষ্টিজীবের সর্দার, মানবতার গৌরব, হকের সৈনিকদের মহান নেতা প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কয়েকজন প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবিকে নিয়ে কাফেরদের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। তাওহিদের এই ধারকবাহকের রক্তে লালায়িত কাফেরদের তরবারি যেন তাঁর ওপর বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেম-প্রদীপের প্রেমিকগণ পতঙ্গের ন্যায় সেই তরবারি-বৃষ্টির মাঝে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়ে প্রেমাস্পদকে রক্ষা করেছিলেন। বৃষ্টির ন্যায় অনবরত বর্ষণ হওয়া তিরের আঘাত ও বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়া তরবারির আঘাতে তাদের ঢাল আর বুক ঝাঁজরা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যতক্ষণ তাদের দেহে প্রাণ ছিল, শরীরের শেষ বিন্দু রক্তও বাকি ছিল, তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরে কোনো ধরনের আঘাত আসতে দেননি।

নবীজির শাহাদাতের গুজব

মুসলিমবাহিনীর পতাকাবাহী মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশেই ছিলেন। হঠাৎ করে কাফেরদের প্রসিদ্ধ একজন যোদ্ধা ইবনে কামিয়্যা লাইসি তার ওপর আক্রমণ করে তাকে শহিদ করে ফেলে। মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর গঠনাকৃতি অনেকটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো ছিল, তাই ইবনে কামিয়্যা মনে করল যে, সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই হত্যা করেছে। ফলে সে আনন্দে চিৎকার করতে করতে একটি উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা দিলো যে, আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি। এমন সংবাদে কাফেরদের মনোবল তো বহুগুণে বৃদ্ধি পেল, কিন্তু মুসলিমদের হৃদয়গুলো যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। আর মুসলিমশিবিরে ব্যাপকভাবে ভীতি ও

কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ছেয়ে গেল। কিন্তু, মুসলিমবাহিনীতে এমন কিছু সুউচ্চ সাহস ও মজবুত মনোবলের অধিকারী মুজাহিদও ছিলেন, এই মিথ্যা সংবাদে যাদের বীরত্ব ও বাহাদুরি বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। তারা বলতে লাগলেন, সত্যিই যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহিদ হয়ে যান, তাহলে আর আমরা বেঁচে থেকে কী করব? এই কথা বলেই অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সঙ্গে শত্রুদের মাঝে ঢুকে পড়লেন এবং একের পর এক কাফের সৈনিকদের জাহান্নামে পাঠাতে লাগলেন।

তিনি বেঁচে আছেন!

মুহাম্মাদি প্রদীপের আলোধারী সৈনিকেরা একদিকে যেমন জীবন বাজি রেখে লড়াই করছিলেন, অন্যদিকে তাদের কাতরদৃষ্টি বারবার খুঁজে ফিরছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তাদের হৃদয়ের গহিনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের রশ্মি জ্বলজ্বল করছিল। এমতাবস্থায় প্রথমে কাব ইবনে মালিক রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জীবিত অবস্থায় দেখেই তিনি আনন্দের আতিশয্যে 'নারায়ে তাকবির'-এর মাধ্যমে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললেন। সারা ময়দানে ঘোষণা দিতে লাগলেন, হে তাওহিদের বীরযোদ্ধারা! মনোবল হারিয়ো না, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত রয়েছেন। এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ডাক দিলেন, হে দ্বীনের মুজাহিদরা! এই যে আমি আল্লাহর রাসুল বলছি, তোমরা আমার কাছে এসো।

নতুন যুদ্ধকেন্দ্র

এই ঘোষণায় মুশরিকরাও জানতে পারল যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন কোথায় অবস্থান করছেন। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবিদের সঙ্গে তারাও তাঁর দিকে পূর্ণোদ্যমে হামলে পড়ল। যে কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে অবস্থান করছিলেন, সেই স্থানই নতুন এক যুদ্ধকেন্দ্রে পরিণত হলো। কাফেরবাহিনী তাদের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার চেষ্টা করল। হত্যা করার জন্য সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন শুরু করল।

রক্তাক্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সাহাবিদের বেষ্টনীর ভেতরেই কোনো এক সুযোগে আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব জুহরি এগিয়ে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আঘাত করল। তিনি ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পুরোপুরি প্রতিহত করতে পারলেন না। মুহূর্তের মধ্যেই চাঁদের চেয়েও সুন্দর সে চেহারায় রক্তের স্রোত বয়ে গেল। এরই মাঝে অপর এক কাফের মুসআব ইবনে উমায়েরের হত্যাকারী ইবনে কামিয়্যা লাইসিও পূর্ণ শক্তি দিয়ে রাসুলের ওপর আক্রমণ করল। যার কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিরস্ত্রাণের দুটি লোহা ভেঙে তাঁর মুবারক দুচোখের ওপরের হাড্ডিতে ঢুকে গেল। আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. অত্যন্ত কষ্ট করে নিজের দাঁত দিয়ে টেনে সেই লোহা দুটি বের করেছিলেন। যার কারণে তাঁর দুটি দাঁত ভেঙে যায়।

ক্ষমার বিরল দৃষ্টান্ত

আঘাতে আঘাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত, তখনও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামবিরোধী এবং তাঁর প্রাণের শত্রুদের জন্য বদদোয়া করেননি। এমনকি যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক থেকে রক্ত ঝরছিল এবং চতুর্দিক হতে যারা তাঁর প্রাণ নেওয়ার জন্য ধেয়ে আসছিল, শ্রাবণের বৃষ্টি ঝরার ন্যায় যাদের তরবারি তাঁর ওপর অবিরত বর্ষিত হচ্ছিল, সেই মানুষগুলোকে লক্ষ করে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বললেন, আহা! সে জাতি কীভাবে সফলতা অর্জন করবে, যারা শুধু এই কারণেই তাদের সত্য নবীকে তরবারির আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে যে, তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা, ব্যক্তিপূজা ও সংশয় পূজার কালো শিকল হতে মুক্ত করে এক আল্লাহর ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধতে চান?

কিছুক্ষণ পরে আবারও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের গভীর হতে কাতরধ্বনি বের হলো, হে মহান প্রজ্ঞাবান প্রভু! হে সর্বদ্রষ্টা! হে সর্বশক্তিমান! আমার জাতি অবুঝ, তারা তোমার আর তোমার নবীর মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ, দয়া করে তুমি তাদেরকে হেদায়েতের আলোয় আলোকিত করো।

মুহাম্মাদি আলোধারী কয়েকজন সৈনিক

দুশমন যখন চতুর্দিক হতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর হামলে পড়েছিল, সেই মুহূর্তে সাহাবায়ে কেরাম রা. তাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষায় যেভাবে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। আবু দুজানা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে গেলেন, যেন কোনো তির নবীজির চেহারায় বিদ্ধ না হয়। শত্রুর দিকে ফিরে না দাঁড়ানোর কারণ ছিল, হয়তো যখন তিনি শত্রুর তীব্র বেগে ছুটে আসা তিরকে দেখতেন, মানবিক স্বভাবের কারণে অবচেতন মনেই মাথা নিচু করে নিতেন আর সেই তির গিয়ে নবীজির চেহারায় বিঁধত। আহা! আবু দুজানার পিঠ শত্রুর অবিরাম তিরের আঘাতে চালনির ন্যায় হয়ে গিয়েছিল, তবুও তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিক হতে মুখ ফেরাননি!

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও আবু তালহা রা. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামও নিজেদের জীবন বাজি রেখে তাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করেছিলেন।

নবীজির প্রিয় সাহাবি জিয়াদ ইবনে সাকান রা.-ও তার অন্যান্য ভাইদের ন্যায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করতে গিয়ে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দেন।

শত্রুর তরবারির আঘাত যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর পর্যন্ত না পৌঁছে, তাই আবু তালহা রা. নিজের হাতকেই ঢাল বানিয়ে শত্রুর তরবারির আঘাত প্রতিহত করতে লাগলেন। আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত এই হাত একসময় নিথর হয়ে পড়ে। এরপরও নিজের প্রিয় ও অনুসরণীয় নবীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। আম্মার ইবনে জিয়াদ রা.ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বেপরোয়া লড়াই করে শহিদ হয়ে গেলেন।

এক মুসলিম বীরাঙ্গনা

উম্মে আম্মারা রা. একজন প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবি। এসেছিলেন হক-বাতিলের এই চিরন্তন লড়াই দেখতে। একসময় যখন দেখলেন কাফেরদের অপ্রতিরোধ্য কালবৈশাখি ঝড় মুহাম্মাদি প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে নিভিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করছে, তখন তিনিও গর্জে উঠলেন। বিশ্বাস ও

ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও তরবারি আঁকড়ে ধরলেন। আক্রমণ করলেন কুখ্যাত ইবনে কামিয়্যা লাইসির ওপর, যে ব্যক্তি কিছুক্ষণ আগে তার প্রিয় রাসুলের গায়ে আঘাত করেছিল। তিনি তো বেশ জোরেই আঘাত করেছিলেন, কিন্তু এই কাপুরুষ অত্যন্ত মজবুত বর্ম পরিহিত ছিল, যার কারণে সে এই বীরাঙ্গনার তরবারির আঘাত থেকে বেঁচে যায় এবং নিজের রক্তাক্ত তরবারির আঘাতে এই তাওহিদি বৃক্ষের বাহুকে আহত করে দেয়।

নবীজির দাঁত মুবারকের শাহাদাত

রক্তপিপাসু হিংস্র প্রাণীর ন্যায় কাফেররা যখন তাওহিদের অনুসারীদের দেহকে টুকরো টুকরো করতে ব্যস্ত, তখন দূর থেকে এক কাফের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুড়ে মারল। যার কারণে তাঁর ঠোঁট মারাত্মক আহত হয় এবং নিচের দুটি দাঁত শহিদ হয়ে যায়। প্রচণ্ড ব্যথায় নবীজির পা মুবারক কাঁপতে শুরু করল, তিনি একটা গর্তে পড়ে গেলেন। আলি রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরলেন এবং আবু বকর রা. ও তালহা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গর্ত থেকে বের করেন।

উহুদের চূড়ায়

তখন খুব সামান্যসংখ্যক জানবাজ সাহাবি অত্যন্ত অবিচলতার সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে ছিলেন এবং ইতিমধ্যে মক্কার মুশরিকদের হামলাও কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের ইঙ্গিত করে বললেন পাহাড়ে উঠতে। তাঁর এই কৌশল অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। আবু সুফিয়ান ও তার তাগুতবাহিনী মুসলিমদের পিছু নেওয়ার অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। মুসলিমরা পাহাড়ি উপত্যকা হতে এই পরিমাণ পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল যে, কাফেরদের পাহাড়ে ওঠাই অসম্ভব হয়ে পড়ল। যে মুসলিমরা পরাজিত কাফেরবাহিনীর দ্বিতীয়বার আকস্মিক আক্রমণে হতবিহ্বল হয়ে এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন, এখন তারাও সুযোগ পেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশেপাশে একত্র হতে লাগলেন। যে কারণে কাফেরদের হামলা করার বাকি সাহসটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল।

যত গর্জে, তত বর্ষে না

উবাই ইবনে খালফ। মক্কার এক কুখ্যাত কাফের। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ঘৃণ্য প্রতিজ্ঞা করে হুংকার ছাড়তে ছাড়তে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে লাগল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের আদেশ দিলেন, তাকে আসতে দাও, বাধা দিয়ো না। হতভাগা কাফের তার নাঙ্গা তরবারি নাড়াতে নাড়াতে নবীজির কাছে এসে পৌছল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশে দাঁড়ানো হারেস ইবনে সম্মাহ রা.-এর হাত থেকে বর্শা নিয়ে তার গলার নিচের হাড়ে আঘাত করলেন। আঘাতটা খুব বেশি ছিল না, কিন্তু এই সামান্য আঘাতেই কাপুরুষ এমনভাবে আতঙ্কিত হয়ে পালাতে লাগল যে, পেছনে ফিরে তাকানোর সাহস পেল না। তার এমন নির্লজ্জ কাপুরুষতায় স্বয়ং কাফেররাও হাসাহাসি শুরু করল। এই আঘাতের ব্যথার কারণেই সে নিজ মাতৃভূমি মক্কায় ফেরার পথে মারা যায়। দয়া ও করুণার সাগর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধবিগ্রহে মোড়া পুরো জীবনে এই একজন ব্যক্তিকেই তিনি নিজ হাতে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন।[৯৯]

উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়

এখন যেহেতু কাফেরদের আক্রমণ করার সব উৎসাহ-উদ্দীপনাই স্তিমিত হয়ে গেল, তাই পিছু হটার পূর্বে কাফেরবাহিনীর সর্দার আবু সুফিয়ান মুসলমানদের লক্ষ করে উচ্চ আওয়াজে বলল, তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মাদও রয়েছে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে উত্তর না দিয়ে চুপ থাকতে বললেন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মাঝে কি আবু বকরও রয়েছে? নবীজির নির্দেশে এবারও সাহাবিগণ কোনো উত্তর দিলেন না। আবু সুফিয়ান পুনরায় হাঁক ছেড়ে বলল, তোমাদের মাঝে কি উমর ইবনুল খাত্তাবও রয়েছে? এবারও সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না পেয়ে আনন্দে লাফাতে শুরু করল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগল, বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের সৈনিকেরা তাদের সবাইকে হত্যা করেছে। তার এমন কথায় উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নিজেকে আর সংযত করতে পারলেন না। হুংকার ছেড়ে বললেন, আল্লাহর দুশমন! এত খুশি হয়ো না, তারা সবাই এখনো বেঁচে আছেন। খুব শীঘ্রই তোমার গলায় অপমান আর লাঞ্ছনার শিকল পরানো

---

৯৯. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/৩৯; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/৩৪

হবে। উমরের এমন তেজোদীপ্ত কথায় আবু সুফিয়ানের সব হাসি-আনন্দ যেন নিমেষে মাটি হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে স্লোগান দিতে লাগল, হুবলের জয় হোক, হুবলের জয় হোক। প্রত্যুত্তরে সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে মহান আল্লাহর সম্মান ও বড়ত্বের স্লোগান দিয়ে পুরো উহুদ পাহাড় প্রকম্পিত করে তুললেন। আবু সুফিয়ান এবার মুসলিমদেরকে লক্ষ করে বলল, হুবল আমাদের প্রভু, তোমাদের তো হুবল নেই। জবাবে নবীজির নির্দেশে উমর বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের বন্ধু, তোমাদের তো কোনো বন্ধু নেই। এরপর আবু সুফিয়ান বলল, দাঁড়িপাল্লার দুদিকটাই এবার সমান হয়েছে। বদরের যুদ্ধে তোমরা জয়ী হয়েছ। আর এই যুদ্ধে আমরা।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামতো উমর রা. তার জবাবে বললেন, কী করে তোমরা বিজয়ী হলে? যদি তোমরা আমাদের সৈনিকদেরকে বন্দি করে কিংবা গনিমতের সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে, অথবা আমাদেরকে যদি যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করতে বাধ্য করতে, তবেই তো বুঝতাম যে, তোমাদের বিজয় হয়েছে। অথচ আমরা এখনো তোমাদের সামনেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যদি বলো যে, তোমাদের তো অনেক লোক নিহত হয়েছে। তাহলে এতে আশ্চর্য হওয়ারই-বা কী আছে? প্রতিদিনের যুদ্ধবিগ্রহে তো এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। তা ছাড়া তোমাদের নিহত হওয়া আর আমাদের শহিদ হওয়া তো আর এক বিষয় নয়। তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে যাবে আর আমাদের শহিদরা যাবে জান্নাতে। আবু সুফিয়ান এই কথাগুলোর কোনো জবাব দিলো না। কিছুক্ষণ পর বলল, আগামী বছর আবার তোমাদের সঙ্গে বদরপ্রাঙ্গণে আমাদের মোকাবিলা হবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে উমর বললেন, ঠিক আছে, আবার দেখা হবে। এরপর আবু সুফিয়ান সেখান থেকে চলে যায়।[১০০]

কাফেরবাহিনীর ফিরে যাওয়ার দৃশ্য

আবু সুফিয়ান ফিরে যাওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে নির্দেশ দিলেন, যাও, কুরাইশদের ফিরে যাওয়ার দৃশ্য দেখো। যদি তারা উটের ওপর হাওদা বাঁধে এবং ঘোড়াকে মুক্ত রাখে, তাহলে

---

১০০. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/৪৮; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১/২৮৮; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ২/২৯৬-২৯৭; *সহিহ বুখারি (বাবু গাজওয়াতি উহুদ)*

বুঝতে পারবে যে, তারা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। আর যদি তারা উটের ওপর হাওদা না বাঁধে এবং ঘোড়ার ওপর আরোহণ করে, তাহলে বুঝতে পারবে যে, তারা মদিনায় অতর্কিত হামলা করার ফন্দি আঁটছে। এ রকম হলে আমরা এখনই তাদের ওপর হামলা করব এবং তাদেরকে শহর পর্যন্ত পৌছার সুযোগ দেবো না।

নবীজির নির্দেশমতে আলি রা. কাফেরদের ফিরে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে জানালেন যে, তারা উটের ওপর হাওদা বেঁধে নিয়েছে এবং ঘোড়াকে বিচরণ করতে ছেড়ে দিয়েছে। এবার মুসলিম মুজাহিদরা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে পাহাড় থেকে নেমে এলেন এবং শহিদদের দাফনের ব্যবস্থা করলেন।[১০১]

লাশের অবমাননা

কাফেররা শহিদ মুসলিমদের লাশের সঙ্গে অত্যন্ত অসম্মানজনক আচরণ করেছিল। অনেকের দেহকেই টুকরো টুকরো করেছিল। আমির হামজার লাশের সঙ্গে যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে, তা তো একটু আগেই আমরা পড়ে এসেছি। মুসলিমরা তাদের সৌভাগ্যবান শহিদ মুজাহিদদের লাশকে অপারগতাবশত গোসল ছাড়াই প্রত্যেক কবরে দুজন দুজন করে দাফন করে এবং তাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করে।

এক মুসলিম নারীর তুলনাহীন ধৈর্য

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর মা সাফিয়া রা. যুদ্ধের ময়দানে নিজের আপন ভাই হামজা রা.-এর লাশ দেখতে এলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবলেন, যেহেতু মহিলাদের হৃদয় পুরুষদের তুলনায় বেশি সংবেদনশীল তাই সাফিয়া রা. হয়তো নিজের ভাইয়ের এমন বিকৃত লাশ দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারবেন না। তা ছাড়া মাতম করে করে হয়তো অন্যদেরকেও শোকাহত করে তুলবেন। তাই তিনি আদেশ দিলেন যেন সাফিয়াকে তার ভাইয়ের লাশ পর্যন্ত যেতে দেওয়া না হয়। কিন্তু সাফিয়া রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন করলেন,

> হে আল্লাহর রাসুল! আমি জানি যে, তারা আমার ভাইয়ের লাশকে বিকৃত করে ফেলেছে। রাসুল! আমি আমার এই কলিজায় ধৈর্যের

---

১০১. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/৪৮

পাথর বেঁধে নিয়েছি। কথা দিচ্ছি, আমি মাতম করব না, আর্তনাদ করব না। দয়া করে আপনি আমাকে আমার ভাইয়ের লাশ দেখতে দিন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। সাফিয়া রা. ধীরে ধীরে প্রিয় ভাইয়ের লাশের দিকে অগ্রসর হলেন। ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশ দেখে নিজেকে সংযত করলেন এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ে দোয়া করে ফিরে চলে এলেন।[১০২]

আহা! দুর্বল শরীরের অধিকারী এই মুসলিম মহিলা কতটা দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন! আজ কোথায় মুসলিমদের সেই দৃঢ় মনোবল? কোথায় সেই সাহস ও বুকের বল?

নারীরা স্বামীকেই বেশি ভালোবাসে

উহুদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে মুসলিম মুজাহিদরা মদিনায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে মুসলিমবাহিনীর পতাকাবাহী মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর স্ত্রী হামনা বিনতে জাহাশ রা.-এর সঙ্গে দেখা হলো। মুসলিম সৈনিকেরা তাকে তার মামা হামজা রা.-এর শহিদ হওয়ার সংবাদ দিলেন। তিনি 'ইন্না লিল্লাহ' পড়ে ধৈর্যধারণ করলেন। অতঃপর তাকে তার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা.-এর শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা শোনানো হলো। এবারও তিনি 'ইন্না লিল্লাহ' পড়ে মাগফিরাতের দোয়া করে সবর করলেন। এবার তারা তাকে তার স্বামী মুসআব ইবনে উমায়েরের শাহাদাতের হৃদয়বিদারক সংবাদ দিলেন। স্বামীর শাহাদাতের খবর শুনেই হামনা ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। তিনি কাঁদতে লাগলেন। এমন বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একজন বিশ্বস্ত ও পুণ্যবতী নারীর হৃদয়ে সবসময় তার আত্মীয়স্বজনের চেয়ে স্বামীর ভালোবাসাই বেশি থাকে।'[১০৩]

---

১০২. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/৫২; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/৪৪; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১/৬৫

১০৩. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/৫৩

রাসুলের ভালোবাসায় সবকিছু উৎসর্গ

কিছুদূর যাওয়ার পর অপর এক গুণবতী ও পুণ্যবতীর সঙ্গে দেখা। নাম তার উম্মে সাইদ। মুসলিম মুজাহিদরা তাকে দেখে বললেন, যুদ্ধে তোমার পিতা শহিদ হয়েছেন। তিনি 'ইন্না লিল্লাহ' পড়ে সবর করলেন এবং অস্থিরচিত্তে তাদের কাছে জানতে চাইলেন, দয়া করে আমাকে বলো, নবীজি কি সুস্থ আছেন? জবাবে সৈনিকেরা তাকে তার ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ দিলেন। আবারও তিনি 'ইন্না লিল্লাহ' পড়ে কষ্টগুলোকে বুকে পাথরচাপা দিয়ে পুনরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্থ আছেন কি না জানতে চাইলেন। সাহাবিরা এবার তাকে তার কলিজার টুকরো প্রিয় সন্তান সাইদ রা.-এর শাহাদাতের সংবাদ দিলেন। আহা! এবারও উম্মে সাইদ নিজেকে সংবরণ করলেন এবং অস্থির হয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমরা আমাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বলো। কিন্তু না, সাহাবিরা এবার তাকে তার প্রিয় স্বামী শহিদ হওয়ার সংবাদ দিলেন। স্বামীর বেদনাদায়ক মৃত্যুর সংবাদ শুনেও তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল না। বারবার তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলেন। ইতিমধ্যেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখেই এই সতীসাধ্বী পুণ্যবতী নারীর চেহারায় আনন্দের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল। দুচোখের পাতায় খুশির ঝিলিক দেখা গেল। নবীজির বিনিময়ে পৃথিবীর সব কষ্টই যেন তাদের কাছে কিছুই নয়।[১০৪]

আহা! এটাই ছিল তাওহিদের অনুসারী সাহাবায়ে কেরামের রাসুলপ্রীতি। যে ভালোবাসার বরকতে তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছিলেন।

আঁচলের নিচে লুকিয়ে থাকা এক কুখ্যাত মুনাফেক

হারেস ইবনে সুআইদ। আঁচলের নিচে লুকিয়ে থাকা কুখ্যাত মুনাফেক। নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে শরিক হয়েছিল। যুদ্ধ যখন তুমুল আকার ধারণ করে, এই মুনাফেক তখন মিজজার ইবনে যিয়াদ ও কায়েদ ইবনে যায়েদ নামক দুজন মুসলিম মুজাহিদকে হত্যা করে রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করে। কিছুদিন পরে সে চুপিচুপি মদিনায় ফিরে

---

১০৪. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/৫৬; *তারিখুত তবারি*, ২/৭৪

আসে। কিন্তু মুসলিমরা তাকে ধরে ফেলে। উসমান ইবনে আফফান রা. তাকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে তার কৃতকর্মের শাস্তি দেন।[১০৫]

হামরাউল আসাদের যুদ্ধ

পরেরদিন মুসলিমবাহিনীর নেতা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বীরবাহাদুর যোদ্ধাদের নিয়ে মদিনা থেকে আট মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে এসে পৌছলেন। উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশবাহিনীর পিছু নেওয়া। অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এই যুদ্ধে শুধু সেসব মুজাহিদকেই শামিল করা হয়েছিল, উহুদযুদ্ধে যারা নিজেদের বিশ্বস্ততা ও বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন। কারণ, হারেস ইবনে সুআইদের ন্যায় বাহিনীতে লুকিয়ে থাকা মুনাফেকদের দ্বারা বিপদের সময় সাহায্যের বদলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাই বেশি ছিল। হামরাউল আসাদ নামক স্থানে মুসলিমবাহিনী তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। ঘটনাক্রমে মাবাদ ইবনে আবু মাবাদ খুজায়ি নামক এক ব্যক্তি সেই পথ ধরে মক্কায় যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারল যে, মুসলিমবাহিনী আবু সুফিয়ানের বাহিনীকে ধাওয়া করছে। এদিকে 'রাওহা' নামক স্থানে গিয়ে মক্কার কুরাইশবাহিনীর ভেতরে পুনরায় রক্তপাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তারা নিজেরাই নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগল যে, কোন মুখে আমরা মক্কায় গিয়ে বলব যে, আমরা বিজয়ী হয়েছি? অথচ আমাদের সঙ্গে নেই কোনো মুসলিম বন্দি কিংবা গনিমতের সম্পদ। বড় কথা হলো, তাদের উল্লেখযোগ্য মাত্র ছয়জন প্রসিদ্ধ বাহাদুরকে আমরা হত্যা করেছি। অথচ তারা আমাদের ৭০ জন বড় বড় কুরাইশ সর্দারকে হত্যা করেছে। এতসব কথা চিন্তা করে কুরাইশবাহিনী পুনরায় মদিনায় হামলা করার সিদ্ধান্ত নিলো। ইতিমধ্যেই মাবাদ ইবনে আবু মাবাদ খুজায়ি সেখানে এসে হাজির হলো। সে এসে সবাইকে এক অকল্পনীয় সংবাদ শোনাল, মুসলিমবাহিনী তোমাদেরকে ধাওয়া করে পিছু পিছু আসছে। আমি তাদেরকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি।

স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু কুরাইশরা এমন সংবাদ শুনতে প্রস্তুত ছিল না, তাই তারা চরম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মক্কার দিকে পালাতে লাগল। এদিকে মুসলিমবাহিনী যখন কুরাইশদের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ পেল, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে মদিনায় ফিরে এলো।

---

১০৫. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/৪৪: তবে কায়েদ ইবনে যায়েদ রা.-এর হত্যার বর্ণনা সেখানে উল্লেখ করা হয়নি।

তৃতীয় হিজরির কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

এক. এই বছরের রমজান মাসের ১৫ তারিখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের নাতি ইমাম হাসান রা. জন্মগ্রহণ করেন। ফাতেমা রা. হলেন তার সম্মানিত মা এবং আলি রা. ছিলেন তার পিতা।

দুই. এতদিন মুসলিমদের জন্য তাদের পছন্দমতো যেকোনো মুশরিক নারীকে বিয়ে করার সুযোগ ছিল, কিন্তু এই বছর সেটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

তিন. মিরাস বা উত্তরাধিকারের সম্পত্তি বণ্টনসংবলিত আয়াতও এই বছর অবতীর্ণ হয়। যেখানে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চার. এই বছরেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান হাফসা রা.-কে বিয়ে করেন। হাফসা রা. হলেন উমর রা.-এর আদরের মেয়ে। ইবনে হুজাইফা রা.-এর সঙ্গে তার প্রথম বিবাহ হয়। ইবনে হুজাইফা রা. যেহেতু বদরের যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন, সেহেতু হাফসা রা. নবীজির ঘরে স্ত্রী হিসাবে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

পাঁচ. উসমান ইবনে আফফান রা.-এর সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা উম্মে কুলসুম রা.-এর বিয়েও এই বছর সংঘটিত হয়।

চতুর্থ হিজরি

কাফেরদের সঙ্গে মুসলিমদের সাতটি লড়াই

এটি এক মহাসত্য যে, পুরো আরব ভূখণ্ডে দু-একটি গোত্র ছাড়া বাকি সব গোত্রই মুসলিমদের কঠোর দুশমন ছিল। রাতদিন প্রতিনিয়ত যারা ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখত। ইসলামের আলোয় যারা নিজেদের হৃদয়রাজ্যকে আলোকিত করত, যাদের পবিত্র কপাল শুধু এবং শুধুই এক মহান আল্লাহর প্রভাব ও প্রতাপের সামনে নুয়ে পড়ত, এক মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর দরবার ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো ক্ষমতাবান কিংবা প্রতাপশালীর সামনে মাথা ঝোঁকানোও যাদের জন্য ছিল চরম অবমাননাকর, দ্বীনের সেই একনিষ্ঠ অনুসারীরাই এইসব আল্লাহদ্রোহীর হাতে বর্ণনাতীত নির্যাতনের শিকার হতো। কারও কারও দেহ থেকে মাথাকে আলাদা করার জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের ঘোষণা করা হতো। আপাদমস্তক

জাহালতে নিমজ্জিত এই হতভাগারা সেসব পুণ্যাত্মা, পবিত্র ও আলোকিত মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অথচ তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কার ও অজ্ঞতার আঁধারে ছাওয়া এই মানবসমাজকে আলোর পথ দেখানো। পৃথিবীর প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে সভ্যতা, ভদ্রতা ও শালীনতার পবিত্র শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া। বদরের যুদ্ধে যখন অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্রহীন ৩১৩ জন মুসলিমের ছোট্ট একটি বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তিশালী ১ হাজার মিথ্যার পূজারির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল, তখনই সত্যের হুংকারে মিথ্যার রাজপ্রাসাদে কাঁপন শুরু হয়েছিল। মুসলিমদের বীরত্ব ও বাহাদুরি প্রতিটি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছিল।

কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! উহুদযুদ্ধে কিছু মুসলিম সৈনিকের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে একদিকে যেমন যুদ্ধের পরিস্থিতিই ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল। অন্যদিকে সকল ফেতনাবাজ ও শত্রুরাও মাথা তোলার সাহস পেয়ে গেল। যে কারণে হিজরতের চতুর্থ বছরটিতে তৈরি হয়েছিল যুদ্ধবিগ্রহের এক দীর্ঘ উপাখ্যান। এই বছর সাতবার মুসলিমদেরকে ইসলাম ও দ্বীনের হেফাজতের উদ্দেশ্যে কাফেরদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এই যুদ্ধগুলোতে রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্টকারী সব ধরনের ফেতনা ও ষড়যন্ত্রের আগুনকে নেভাতে গিয়ে দুপক্ষেরই বীরযোদ্ধাদের রক্ত ঝরাতে হয়েছিল। এই সাতটি যুদ্ধের উপাখ্যান বড় দীর্ঘ। তাই এখানে শুধু প্রসিদ্ধ কিছু ঘটনার ওপর আলোকপাত করছি।

সারিয়ায়ে কুতন

ইসলামি ইতিহাসে সারিয়া বলা হয় সেই যুদ্ধকে, যে যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না।

এই বছর মহররম মাসের শুরুরদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সংবাদ জানতে পারলেন যে, কুতন নামক স্থানে বনি আসাদ গোত্রের কতক লোক ফেতনা-ফাসাদ ও রক্তপাতের উদ্দেশ্যে একত্র হচ্ছে। যেকোনো সময় তারা মুসলিমদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ষড়যন্ত্রকারীদের শায়েস্তা করার জন্য আবু সালামা মাখজুমি রা.-এর নেতৃত্বে দেড়শ সৈনিকের ছোট্ট একটি বাহিনীকে প্রেরণ করেন, কিন্তু কাফেররা মোকাবিলা করার সাহস পেল না। মুজাহিদদের আগমনের খবর শুনেই তারা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে গেল। কিছু

কিছু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক কিছুটা ভিন্নতার সঙ্গে এই ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বনি আসাদ গোত্রের সব ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-এর নেতৃত্বে ২০০ জন মুজাহিদের একটি বাহিনীকে প্রেরণ করেছিলেন। কুতন নামক স্থানে হক-বাতিলের মুখোমুখি সংঘাত হলো এবং হকের তীব্র আলোকচ্ছটায় বাতিলের চোখ ঝলসে গেল। মাত্র দুঘণ্টার ভেতরেই বনি আসাদের সমস্ত বীরযোদ্ধা পরাজিত হলো। পরেরদিন মুসলিমবাহিনী বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আল্লাহু আকবার স্লোগান দিতে দিতে মদিনায় ফিরে এলেন। এই যুদ্ধে তিনজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন এবং তিনজন কাফের নিহত হয়। পরবর্তী সময়ে আর কখনো বনি আসাদ গোত্র ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোনো ধরনের বিরুদ্ধাচরণ বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়নি।[১০৬]

কট্টর কাফের সুফিয়ান ইবনে খালিদের মৃত্যু

আরাফার ময়দানের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম উরনা। যেখানে সুফিয়ান ইবনে খালিদ হুজালি নামক এক কট্টর কাফের বসবাস করত। শয়নে-স্বপনে, জাগরণে, প্রতিনিয়ত-প্রতিক্ষণ তার শুধু একটাই চিন্তা, কীভাবে পৃথিবীর মানচিত্র হতে ইসলামের নামচিহ্ন মুছে দেওয়া যায়! কীভাবে মুসলিমদের জীবনকে আরও বেশি দুর্বিষহ করে তোলা যায়।

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, সুফিয়ান ইবনে খালেদ হুজালি মুসলিমদের ওপর হামলা করার জন্য একটি বাহিনী গঠন করছে। বিভিন্ন মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টির সত্যতা যাচাই করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, যদি সুফিয়ান ইবনে খালিদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আরও কিছুদিন চলতে দেওয়া হয়, তাহলে সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন আরব্য মরুভূমি অসংখ্য নিষ্পাপ ব্যক্তির রক্তে সে নিজের পিপাসা নিবারণ করবে। তাই উত্তম হলো এই ফেতনাটাকে গোড়াতেই নির্মূল করে দেওয়া হোক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রা.-এর কাঁধে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করলেন। নবীজির এই প্রিয় সাহাবি দিনের বেলায় কাফেরদের চোখ এড়াতে কারও ঘরে আত্মগোপন করে থাকতেন এবং রাতের বেলায় সফর করতেন। এভাবেই একদিন তিনি উরানা নামক স্থানে

---

১০৬. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/৬৪

এসে পৌঁছলেন এবং এমন বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সঙ্গে এই কাফেরের দেহ থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেললেন যে, কেউ তাকে গ্রেফতার করতে পারল না। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘ ১৮ দিন পরে এই সাহসী মুসলিম নিজের মিশনে সফল হয়ে মদিনায় ফিরে এলেন।(১০৭)

রজি-এর মর্মান্তিক ঘটনা

ইসলামের সবুজ-সতেজ ভূমিকে ফেতনা-ফাসাদ ও রক্তপাতের প্রজ্বলিত আগুনে ভস্ম করে দিতে কাফেররা কোনো ধরনের অপচেষ্টাই বাকি রাখেনি, কিন্তু এখনো তারা সফলতার মুখ দেখেনি। ইসলামের জানবাজ বীরযোদ্ধারা তাদের সব পরিকল্পনাই নস্যাৎ করে দিয়েছে। তাই এবার তারা ভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আশ্রয় নিলো। যোদ্ধারা ব্যর্থ হওয়ায় এবার তাদের বুদ্ধিজীবীরা মাঠে নামল। (হাজারবার লানত ও ধিক্কার এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীর ওপর) কুরাইশরা আজল ও কারা নামক দুটি গোত্রকে নিজেদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের হাতিয়ারস্বরূপ গ্রহণ করল। তারা তাদের সামনে এই প্রস্তাবনা পেশ করল যে, তোমাদের কিছু লোক মদিনায় মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও আগ্রহের সঙ্গে নিজেদের মুসলিম হওয়ার কথা বর্ণনা করবে। তার দরবারে তারা যখন গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যাবে, তখন নিজেদের গোত্রে ইসলাম প্রচারের অজুহাতে কিছু মুসলিমকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে এবং হত্যা করবে। আজল ও কারা গোত্রদ্বয় তাদের এমন ঘৃণ্য প্রস্তাব মেনে নিলো এবং তাদের ১০ জন ব্যক্তিকে গভীর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য মদিনায় প্রেরণ করল।

চক্রান্ত সফল হলো

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কুরাইশদের এমন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সফল হলো এবং আজল ও কারা গোত্রদ্বয়ের চক্রান্তকারীরা নিজেদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে বসল। দয়া ও করুণার সাগর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো মানুষের হেদায়েতের জন্য সর্বদা ছটফট করতেন। তাই তারা সহজেই তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে পারে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে দ্বীনের দাওয়াতের জন্য ১০ জন মুবাল্লিগকে প্রেরণ করেন। এই ধোঁকাবাজরা যখন 'রজি' নামক স্থানে এসে পৌঁছল তখন তাদের মধ্য হতে একজন লোক সংগোপনে কাফেলা থেকে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে

---

১০৭. *জাদুল মাআদ*, ৩/২২১

গেল এবং মুসলিম মুবাল্লিগদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে ২০০ জন সশস্ত্র সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। মুসলিমরাও-বা কম কীসে? তারাও তো তরবারির ছায়াতেই বেড়ে উঠেছেন। তাই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি বুঝতে পেরে তারা নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে উঠে গেলেন এবং তরবারি কোষমুক্ত করে শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কাফেররা অবস্থা বেগতিক দেখে নতুন ফন্দি আঁটল। এবার তারা মুসলিম মুবাল্লিগদের নেতা আসেম ইবনে সাবিত রা.-কে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমরা তো তোমাদের সাহস ও বীরত্বের পরীক্ষা নিতেই এমনটা করেছি। ওসব যুদ্ধটুদ্ধ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু আসেম ইবনে সাবিত রা. তো আর দুগ্ধপোষ্য শিশু নন যে, তাদের এমন ছেলে-ভোলানো কথায় গলে যাবেন। তিনি পাহাড়ের টিলা থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন, কখনো না। আমরা তোমাদের অমন মনভোলানো কথায় পাহাড় হতে নিচে নামব না। তারা তাকে আরও আশ্বস্ত করার জন্য বলল, ঠিক আছে, তোমরা যদি এটাই মনে করো যে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাহলে শোনো, আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিচ্ছি, তোমরা এবার নিচে নেমে এসো। জবাবে আসিম রা. বললেন, কোনো কাফেরের ওয়াদায় আমি ভরসা করি না। এবার কাফেররা আর কোনো উপায় না দেখে তির নিক্ষেপ শুরু করল।

মুবাল্লিগদের শাহাদাত এবং গ্রেফতারি

মুসলিমরাও নিজেদের আত্মরক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করলেন, কিন্তু টিকতে পারলেন না। একদিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শয়তানের চেলাদের বিশাল বাহিনী, অন্যদিকে সহায়-সম্বলহীন মাত্র ১০ জন মুসলিম, তবুও বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয় তাওহিদের এই বিশ্বস্ত সেনাদের সুদৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার দিকে। শরীরের শেষ বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত তারা কাফেরদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তারা হকের স্লোগান দিয়ে গেছেন এবং কাফেরদেরকে নিজেদের তরবারির চমক দেখিয়েছেন। অবশেষে আটজন মজলুম মুজাহিদ রক্তপিয়াসি জালেমদের সঙ্গে লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করেন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের চিত্তাকর্ষক ফুলের মাতোয়ারা ঘ্রাণে নিজেদের মন-প্রাণ সজীব করতে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে আখেরাতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। শারীরিকভাবে দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ হলেও অত্যন্ত দৃঢ়মনোবলের অধিকারী দুই সাহাবি খুবাইব ও যায়েদ রা. তাদের

হাতে বন্দি হন। এই দুই সাহাবির সঙ্গে সেই রক্তপিয়াসি হিংস্র পশুরা যে পাশবিক আচরণ করেছে, প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালনকারী অমুসলিমেরও উচিত তার ওপর নিন্দা করা।

অন্যদিকে খুবাইব ও যায়েদ রা. যে অসাধারণ সাহসিকতা ও সুদৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অবশ্যই পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। প্রত্যেক সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির উচিত তা হৃদয়ের মণিকোঠায় সংরক্ষণ করে রাখা।

ষড়যন্ত্রের জালে বন্দি এই দুই মুসলিম মুজাহিদকে কাফেররা মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দিলো। বদরযুদ্ধে খুবাইব রা. হারেস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন। তাই তাকে হারেসের ছেলেরা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ক্রয় করে নিলো। আর মক্কার প্রসিদ্ধ কাফের সফওয়ান ইবনে উমাইয়া যায়েদ রা.-কে ক্রয় করে নিলো। দীর্ঘ দু-মাস পর্যন্ত তারা রাসুলের এই মহান দু-সাহাবিকে কারাগারে আবদ্ধ রেখে বর্ণনাতীত জুলুম-নিপীড়নের শিকার বানাল। অবশেষে একদিন তাদের দুজনকে জনসম্মুখে নিয়ে যাওয়া হলো। পুরো মক্কার মানুষ সেদিন জড়ো হয়েছিল নিষ্পাপ মানুষ হত্যার তামাশা দেখতে। আহা! যে মাথা এতদিন মহান প্রভুর ইবাদতে নত হয়েছে, কাফেরদের নাপাক তরবারির আঘাতে আজ বুঝি তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।

বিপদে মানুষ চেনা যায়

১. মানুষের স্থিরতা ও লক্ষ্যের দৃঢ়তা, ২. ধর্মীয় অনুশাসনের অনুসরণ, ৩. বন্ধুর বিশ্বস্ততা ও ৪. মহিলাদের ভালোবাসা—এই চার জিনিসের বাস্তবতা বিপদের সময় বোঝা যায়। এই জগৎসংসারের সর্দার, সমস্ত সৃষ্টিজীবের গৌরব মুহাম্মাদের পবিত্র জীবন যে সময়ে অতিবাহিত হয়েছে, সেই সময়ের মুসলিমদের ঈমানের পরীক্ষা যদি এই মাপকাঠিতে করা হয়, তবে যেকোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই তাদের খাঁটি মুমিন হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন। মৃত্যুশয্যাকে আমি ফুলশয্যা মনে করি। সততা বিক্রি করে জীবনের সওদা করার আশা আমার নেই। আমি মুসলিম, মৃত্যু তো আমার জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসের সুখের বার্তা। এমন সুমহান দাবি তো যে-কেউ করতে পারে, কিন্তু তাতে পরিপূর্ণ উত্তীর্ণ হওয়া তখনই কঠিন হয়ে যায়, যখন একদিকে থাকে মৃত্যুর করাল গ্রাস আর অন্যদিকে দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য, আরাম-আয়েশ হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। এমন কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তেও যে

বীরবাহাদুর নিজের আদর্শ থেকে এতটুকুও পিছু হটে না, সত্যিই সে এক সিংহ-হৃদয় বীর, যে নিজের কথায় সত্যবাদী, আদর্শে অবিচল ও নীতিতে আপসহীন।

খুবাইব ও যায়েদ রা.-কে যখন পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় হত্যার স্থানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো, সেই মুহূর্তটিও তাদের জন্য চরম পরীক্ষার সময় ছিল। একদিকে মক্কার কুরাইশরা রাসুলের এই দুই প্রিয় সাহাবিকে ইসলাম ত্যাগের বিনিময়ে নেতৃত্ব, ধনদৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেওয়ার লোভ দেখাচ্ছিল, অন্যদিকে আপন ঈমানের ওপর অটল-অবিচল থাকলে যে কতটা ভয়ানক পরিণতি হতে পারে, তা তো তারা স্বচক্ষেই দেখছিলেন। বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়া বর্শার স্তূপ এক পাশে পড়ে আছে, অথচ তারা নির্ভীক, প্রশান্তচিত্ত। সততা ও ঈমানদারির এমন বিস্ময়কর বিরল প্রদর্শনী দেখে যেকোনো দাম্ভিক ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষও নিজের হৃদয়কে শক্ত ও অন্যকে অবমূল্যায়নের কালো ছায়ায় ঢেকে রাখতে পারবে না। অবশ্যই তারা এই দুই বীরবাহাদুর মুসলিমের যোগ্যতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। ইসলামি বাতির এই দুই উৎসর্গীকৃত প্রাণ-পতঙ্গ দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ ও ক্ষমতার মোহে নিজেদের ঈমানকে কাফেরদের সঙ্গে সওদা করেননি, বরং অত্যন্ত সুদৃঢ় মনোবল ও প্রশান্তচিত্তে শূলে চড়তে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। খুবাইব রা.-কে শূলে চড়ানোর কিছুক্ষণ আগে আবারও কাফেররা তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এটা মেনে নেবে যে, আমরা তোমাকে জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার জন্য জীবিত ছেড়ে দেবো, আর তোমার স্থানে তোমার রাসুল মুহাম্মাদকে শূলে চড়াব? দীর্ঘদিনের নির্যাতনের কারণে খুবাইবের যে ক্লান্তশ্রান্ত দেহটা এতক্ষণ নুয়ে পড়েছিল, মুহূর্তেই যেন তার মাঝে বিদ্যুৎ খেলে গেল! কারও পায়ের নিচে পিষ্ট হলে বিষাক্ত সাপ যেমন রাগে-ক্ষোভে ফণা তুলে ফুঁসতে থাকে, খুবাইবও তেমনই ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন, এটা কেমন বেয়াদবি? নিজেদের মুখ সামলাও। আল্লাহর কসম! আমি নিজে সব ধরনের দুঃখ-যাতনা আর অপমান-অবহেলা নীরবে সইতে পারব, কিন্তু আমার প্রিয়তম রাসুলের শানে কারও বেয়াদবিমূলক একটা শব্দ শুনতেও আমি প্রস্তুত নই। আমার প্রিয়তম কোনো কারণে সামান্য আহ শব্দ করুক, তাও আমি মেনে নেব না। হতভাগার দল! কীভাবে তোমরা এমন আশা করলে যে, আমি তোমাদের প্রস্তাব মেনে নেব?

অতঃপর খুবাইব রা. শূলিতে ওঠার পূর্বে দু-রাকাত নামাজ পড়ার অনুমতি চাইলেন। কাফেররা তাকে অনুমতি দিলো। নামাজ শেষ করে তিনি

কাফেরদের লক্ষ করে বললেন, হৃদয় তো চায় একটু দীর্ঘ সময় নিয়ে নামাজ পড়ি, কিন্তু ভাবলাম, তোমরা যদি এ কথা বলে বসো যে, খুবাইব মৃত্যুভয়ে টালবাহানা করছে, তাই দ্রুত নামাজ শেষ করেছি।[১০৮]

আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো

অবশেষে মুশরিকরা ঈমানের নুরে আলোকিত আল্লাহর এই প্রিয় বান্দাকে শূলে চড়িয়ে শহিদ করে ফেলল। মৃত্যুর আগমুহূর্তে খুবাইব রা. কাবাঘরের দিকে তাকালেন। কাফেররা এটা মেনে নিতে পারল না। তারা জোরজবরদস্তি করে তার মাথাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলো। তিনি বেশ নির্ভরতার সঙ্গে তাদের বললেন, ঠিক আছে, তোমাদের যেদিকে ইচ্ছা হয় ঘুরিয়ে দাও। মনে রেখো, সেদিকেও আমার আল্লাহ আছেন।

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দুহাত প্রসারিত করলেন। অত্যন্ত বিনয়-কাতরতার সঙ্গে মহান প্রভুর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, ওগো প্রভু! চেয়ে দেখো, এখানে এমন কেউ নেই, যে আমার সালাম ও আনুগত্যের কথা তোমার প্রিয়তমের নিকট পৌঁছে দেবে। তাই তোমার কাছেই আমার আকুতি, দয়া করে আমার শেষ সালাম তুমি তোমার রাসুলের কাছে পৌঁছে দাও।

নবীজির কাছে খুবাইবের সালাম

মদিনার মসজিদে নববিতে সাহাবিরা বসে আছেন রাসুলের অপেক্ষায়। একটুপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এমন সময় তাঁর ওপর ওহি নাজিল হতে শুরু করল। সাহাবায়ে কেরাম নতুন কোনো নির্দেশনা শোনার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসে আছেন। ওহি নাজিল হওয়া শেষ হলে নবীজির মুখ দিয়ে প্রথম উচ্চারিত হলো, 'ওয়া-আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।' অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, কাফেররা এই মুহূর্তে আমার খুবাইবকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছে। জিবরাইল আমিন আমার কাছে তাঁর সালাম পৌঁছে দিতে এসেছিলেন।[১০৯]

এই ঘটনার কিছুদিন পর মক্কা থেকে কিছু লোক মদিনায় এসেছিল, যারা খুবাইবের শাহাদাতের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা মদিনায় এসে এই কথার সত্যায়ন করল যে, কাফেররা ঠিক সেই মুহূর্তেই তাকে হত্যা

---

১০৮. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/১১৫

১০৯. *ফাতহুল বারি*, ৭/৩৮৪

করেছিল, যখন মদিনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার সালাম পৌছানো হয়েছিল।

যেভাবে শহিদ হলেন তিনি

রক্তপিপাসু মুশরিকরা খুবাইবকে শূলে চড়িয়ে অনবরত ধারালো বর্শা দিয়ে তার পুরো শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে শুরু করল।[১১০] এভাবেই শহিদ হয়ে গেলেন সত্যের জন্য লড়াই করা মুসলিমদের আপসহীন এক বীর। সুবিশাল আকাশের নিচে, ইবরাহিম ও ইসমাইলের পুণ্যভূমিতে শূলির কাঠে ঝুলে আছে রক্তাক্ত মানবতা। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে মা হাজেরার জমজম কূপের পানিপিয়াসিরা। জমজমের ছলাৎ ছলাৎ উপচে পড়া মিঠা পানি দেখে একদিন যারা এই ভূমিতে বসতি স্থাপন করেছিল, আজ তারা মা হাজেরার সন্তানদের পবিত্র রক্তের নোনা স্বাদে উন্মাদ। জমজমের ঢেউখেলানো পানির কলকলধ্বনি তাদের কানে পৌছে না।[১১১]

শূলে যায়েদ রা.

খুবাইব রা.-এর ন্যায় যায়েদ রা.-কেও মুশরিকরা চেয়েছিল ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করতে। কখনো লোভ দেখিয়ে, কখনো হুমকি দিয়ে, কিন্তু তিনিও নিজের অগ্রজ সহযোদ্ধার মতো পরম মমতায় নিজের ঈমানকে বুকের সঙ্গে আগলে রাখলেন। মৃত্যুর বিছানাকেই ফুলশয্যা মনে করে হাসতে হাসতে শূলে চড়লেন। সত্যিই এমন দুঃসাহসী, স্বাধীনচেতা ও আপন আদর্শে অবিচল ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ করলেও নির্জীব দেহে প্রাণসঞ্চার হয়, আশাহত হৃদয়ে আশার ফুল ফোটে।

৭০ জন মুসলিম মুবাল্লিগের শাহাদাত

উরাত-এর একজন সর্দার আবু বারা আমের ইবনে মালেক ঘটনাক্রমে একদিন মদিনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, যদি আমার পুরো গোত্র মুসলিম হয়, তাহলে আমিও মুসলিম হব। কারণ, আমি আমার গোত্রের লোকদের বিরোধিতা করতে ভয় পাই। এখন তার গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের

---

[১১০]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/১২৮ (দারুল কিতাবিল আরাবি)

[১১১]. অনুবাদক।

আলোয় আলোকিত করার একটা পদ্ধতি ছিল, তার সঙ্গে কয়েকজন মুসলিম মুবাল্লিগকে তার গোত্রে পাঠানো, যারা সেখানে গিয়ে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেবে। কিন্তু ইতিপূর্বে আজল ও কারা গোত্রদ্বয় মুসলিম মুবাল্লিগদের সঙ্গে যে নিকৃষ্ট আচরণ করেছিল, তার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিধান্বিত ছিলেন। আবু বারা আমের নবীজির কাছে এই মর্মে অঙ্গীকার করলেন যে, আপনি আমার ওপর ভরসা রাখুন। আমি আমার নিজ আশ্রয়ে আপনার লোকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। কিন্তু আফসোস! আবু আমের তার ওয়াদা রক্ষা করতে পারেননি। তিনি যখন ৭০ জন মুসলিম মুবাল্লিগকে নিয়ে বিরে মাউনা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তার ভাতিজা আমের ইবনে তুফায়েল তার সৈন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে আক্রমণ করে এবং মুনজির ইবনে উমরের নেতৃত্বে দ্বীনের তাবলিগের জন্য আগত ৭০ জন মুবাল্লিগকে শহিদ করে ফেলে। আবু বারা আমের এই ব্যথা সইতে না পেরে কয়েকদিন পরেই ইন্তেকাল করেন। তার জালেম ও পাপিষ্ঠ ভাতিজাও এক মাসের মধ্যেই মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে জাহান্নামে পাড়ি জমায়।

একটি রক্তস্নাত ভুল

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বারা আমেরের সঙ্গে মুসলিম মুবাল্লিগদের যে দলকে প্রেরণ করেছিলেন, তারা ছিলেন ৭০ জন। আমের ইবনে তুফায়েল একে একে সবাইকে হত্যা করে উমর ইবনে উমাইয়া জিমরি নামক এক সাহাবিকে জীবিত ছেড়ে দেয়। এর কারণ ছিল, একবার আমেরের মা একজন গোলাম আজাদ করার মানত করেছিলেন। তাই আমের নিজের মায়ের মানত পূরণার্থে বাকি মুবাল্লিগদের সঙ্গে উমর ইবনে উমাইয়াকে হত্যা না করে বন্দি করে বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়মানুযায়ী তার দাড়ি কেটে তাকে ছেড়ে দেয়। উমর ইবনে উমাইয়া এই জালিমের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে দ্রুত মদিনার উদ্দেশে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বনু আমের গোত্রের দুই লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি প্রতিশোধস্পৃহায় উদ্‌বেলিত হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করে ফেলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি যে দুই লোককে শত্রু ভেবে হত্যা করেছিলেন, তাদের গোত্র বনু আমের মুসলিম মুবাল্লিগদের শহিদ করেনি।

রক্তপণ আদায়

মদিনায় পৌঁছে উমর ইবনে উমাইয়া রা. অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিদের সামনে মুবাল্লিগদের

নিষ্ঠুরভাবে হত্যার ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তার হাতে বনু আমেরের দুইজন লোক নিহত হওয়ার ঘটনাও বিস্তারিত বর্ণনা করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ৭০ জন প্রিয় সাহাবির এভাবে শাহাদাত বরণ করায় অত্যন্ত ব্যথিত হন। কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও উদাস হয়ে বসে ছিলেন। বনু আমেরের দুইজন ব্যক্তিকে হত্যার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা তো অপরাধী নয়। আমাদের সঙ্গে তো তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তুমি যেহেতু তাদেরকে ভুলে শত্রু মনে করে হত্যা করেছ, তাই আমাদেরকে এর রক্তপণ দিতে হবে।

ইহুদিদের গভীর ষড়যন্ত্র

মদিনার ইহুদি গোত্রগুলোর মধ্যে অবাধ্য একটি গোত্র হলো বনু নাজির। বনু আমেরের সঙ্গে তাদেরও মৈত্রীচুক্তি ছিল। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তপণের বিষয়ে বনু নাজিরের নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই তাদের এলাকায় গেলেন। তার সঙ্গে ছিলেন তার প্রিয় সহচর আবু বকর, উমর ও আলি রা.। বনু নাজির প্রকাশ্যে তাদের সঙ্গে বেশ ভালো আচরণ করল এবং নিজেরাও রক্তপণে শরিক থাকবে বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশ্বস্ত করল। গোত্রের অন্য লোকদেরকে ডেকে আনার বাহানায় তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথিদেরকে বসিয়ে রেখে সেখান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু আড়ালে গিয়ে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রের ছক তৈরি করতে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দুর্গের দেয়ালের ছায়ায় বসে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন। সেই দেয়ালের ওপর অত্যন্ত বড় ও ভারী একটি পাথর রাখা ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, একজন ব্যক্তি ওপাশ থেকে দেয়ালের ওপর আরোহণ করবে এবং ধাক্কা দিয়ে সেই পাথরটি নিচে ফেলে দেবে। ব্যস, মুহাম্মাদ ও তাঁর তিন বন্ধু একসঙ্গে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে। তাদের এমন ঘৃণ্য ও ভয়ংকর ষড়যন্ত্রকে সফল করতে উমর ইবনে মাহাসিন নামক এক শক্তিশালী ব্যক্তি দেয়ালের ওপর চড়ে বসল।[১১২]

---

[১১২]. তবে অন্যান্য বর্ণনায় তার নাম আমর ইবনে জাহহাশ উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/১৩২; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/৭৭; সুরা হাশর, আয়াত, ১১

রাখে আল্লাহ মারে কে!

উমর ইবনে মাহাসিন নিজের ভয়ংকর ইচ্ছা পূরণ করার পূর্বেই সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে ওহির মাধ্যমে তাদের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে উঠে মসজিদে নববির উদ্দেশে রওয়ানা হন। ইহুদিরা তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তাদের বলে দেন যে, তোমরা গোপনে আমাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছ, তাই আমরা আর তোমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছি না। প্রত্যুত্তরে ইহুদিরা তাদের অপরাধের কথা স্বীকারও করল না আবার ষড়যন্ত্রের বিষয়টিকে অস্বীকারও করল না। মদিনায় পৌঁছেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের কাছে বার্তা পাঠালেন, যেহেতু তোমরা পুরোনো শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করেছ, সেহেতু আবার নতুন করে চুক্তিনামা প্রস্তুত করো। কিন্তু ইহুদিরা তা করতে অস্বীকার করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে দ্বিতীয়বার বার্তা পাঠালেন, যদি তোমরা আমাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করতে না চাও, তাহলে আমাদের দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা তোমাদেরকে দেশত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার আদেশ দিতে বাধ্য হব।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ইহুদিরা

ইহুদিরা দেশত্যাগ করতে অস্বীকার করল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর সাহাবিদেরকে নিয়ে তাদের এলাকায় আক্রমণ করে দুর্গের ভেতরে তাদের অবরুদ্ধ করে ফেললেন। কুখ্যাত মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল, সব ধরনের সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছিল। সে তাদেরকে বলেছিল, চিন্তা করো না, যেকোনো পরিস্থিতিতে আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হও, তাহলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব না। মুসলিমদের রক্তে নিজেদের হাত রঙিন করতে পিছপা হব না। যদি তোমরা দেশত্যাগ করতে রাজি হয়ে যাও, তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করব।

এই ধরনের আশ্বাসবাণীতে ইহুদিরা বেশ সাহসী হয়ে উঠল। দীর্ঘ ১৫ দিন পর্যন্ত তারা দুর্গে অবরুদ্ধ ছিল। অবশেষে তারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে বার্তা পাঠাল, যদি তুমি মুহাম্মাদের নিকট থেকে আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে দিতে পারো, তাহলে আমরা দেশত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাব।

দেশত্যাগের আদেশ

মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইহুদিদের বার্তা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে দিলো। সেইসঙ্গে জোরালো সুপারিশও করল, যেন ইহুদিদের হত্যা না করে নিরাপদে দেশত্যাগের সুযোগ দেওয়া হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জীবনের নিরাপত্তা দিলেন। তাদের প্রতি সদয় হয়ে অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত যে-সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি উটের পিঠে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়, সেগুলো নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। বনু নাজির নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামতো নিজেদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উটের পিঠে বহন করে দেশত্যাগ করে চলে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নিকৃষ্ট-দুশ্চরিত্রদের রেখে যাওয়া সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

এই ঘটনার মাধ্যমে একদিকে যেমন চরম বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গাহাঙ্গামাকারীদের ফেতনা-ফাসাদ হতে দেশ নিরাপদ হয়ে গেল, অন্যদিকে দরিদ্র মুসলিমরাও কিছু সম্পদের মালিক হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের সঙ্গে এমন আচরণ কখনো করতেন না, যদি না তারা তাকে এমনটা করতে বাধ্য করত। তারপরও তিনি তাদের সঙ্গে দয়া ও অনুগ্রহের যে আচরণ করেছেন, তা স্মরণ করলে আজও মানবীয় চরিত্রে উদারতা ও মহানুভবতার জন্ম হয়। যুদ্ধে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর পৃথিবীর কোনো সেনানায়ক লুটতরাজ, হত্যা ও নির্যাতন থেকে বিরত থাকতে পারে? অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারও জানমালের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেননি। শুধু দেশত্যাগ করে আবারও যেন ফেতনা সৃষ্টি করতে না পারে, তাই তাদের অস্ত্রশস্ত্র রেখে দেওয়া হয়েছিল। তারা যে সামান্য সম্পদ রেখে গিয়েছিল, তা যুদ্ধের শাস্তি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। আরব সভ্যতায় এমন দয়া ও করুণার আচরণ সত্যিই এক নতুন মোড় সৃষ্টি করেছিল। আরবজাতি নতুন করে ভাবতে শিখেছিল।

জাতুর রিকা-এর যুদ্ধ

ইসলামের শত্রুরা অধীর আগ্রহে সেই সময়ের অপেক্ষা করছিল, যখন তারা পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নামচিহ্ন মুছে দিতে পারবে। বনু নাজিরের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার এক মাস না যেতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেলেন যে, বনু মুহারিব ও বনু সাকিলা নামক দুই গোত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সৈন্যবাহিনী গঠন করছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সংবাদ শুনেই উসমান ইবনে আফফান রা.-কে মদিনার শাসক নিযুক্ত করলেন। ৪০০ সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেই ওই রক্তলোলুপদের রক্তক্ষুধা নিবারণের জন্য রওয়ানা হলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত মুসলিমদের যুদ্ধ করতে হলো না। স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলিমবাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়েই তাদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। তারা এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল।

ইসলামি ইতিহাসে এই যুদ্ধকে জাতুর রিকা-এর যুদ্ধ বলা হয়। কারণ, এই যুদ্ধে পাথুরি ভূমির ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে মুসলিম মুজাহিদদের পা মারাত্মক আহত হয়েছিল। যে কারণে তারা নিজেদের পায়ের ক্ষতস্থানে কাপড়ের টুকরো দিয়ে পট্টি বেঁধেছিলেন। আর আরবি ভাষায় কাপড়ের টুকরোকে রিকা বলা হয়।

বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ

সুহৃদ পাঠক, ইতিপূর্বে আপনারা পড়ে এসেছেন, উহুদযুদ্ধের শেষে মক্কার মুশরিকবাহিনীর সর্দার আবু সুফিয়ান মুসলিমদেরকে ধমক দিয়ে বলেছিল, আগামী বছর আবার আমাদের দুঃসাহসী সৈনিকদেরকে নিয়ে বদরপ্রাঙ্গণে তোমাদের সামরিক সক্ষমতা দেখতে আসব। মুসলিম মুজাহিদদের মহান সিপাহসালার তার জবাবে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, ঠিক আছে, মুসলিমরাও কখনো কারও সামনে মাথানত করে না। কারও হুমকি-ধমকি বা চোখ রাঙানোতে ভীত হয় না। সত্যিই যদি তোমাদের আগমন রক্তপাতের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে আমরাও তোমাদেরকে আমাদের সক্ষমতা দেখিয়ে দেবো।

এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। আবারও ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত ঝরার সেই কঠিন মুহূর্ত এলো, কিন্তু মহান আল্লাহ চাননি আবারও রক্তপাত হোক। তাই তিনি মিথ্যার ধ্বজাধারীদের হৃদয়ে এমন ভীতি ছড়িয়ে দিলেন যে, তরবারি কোষমুক্ত করার আগেই তারা রণাঙ্গন থেকে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল।

যেন চিঠিবিহীন রঙিন খাম

আবু সুফিয়ান যেহেতু মুসলিমদেরকে আগামী বছর বদরের মাঠে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল, তাই সে পুরোদমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

চতুর্দিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে একটি দুঃসাহসী বাহিনী গঠনে রাতদিন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নুআইম ইবনে মাসউদ নামের এক চতুর ও বাকপটু ব্যক্তিকে এই দায়িত্ব দিয়ে মদিনায় পাঠাল যে, তুমি মদিনায় গিয়ে তোমার উপস্থাপনার শক্তি দিয়ে মানুষের মনে এই ভীতি ছড়িয়ে দেবে যে, মক্কার লোকেরা যেভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, এবার আর মুসলিমদের রক্ষা নেই। তারা কুরাইশদের সামনে টিকতেই পারবে না। আবু সুফিয়ান তাকে প্রতিশ্রুতি দিলো, যদি তুমি তোমার কথার জাদু দিয়ে মুসলিমদের এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারো যে, তারা আমাদের ভয়ে মদিনা থেকে বের হওয়ার সাহস না পায়, তাহলে আমি তোমাকে ২০টি উট পুরস্কার দেবো।

মদিনায় নুআইম ইবনে মাসউদ

নুআইম ইবনে মাসউদ মদিনায় এসে নিজের জাদুময় বক্তৃতা ও উপস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে কুরাইশদের শক্তিসামর্থ্য ও সক্ষমতার ব্যাপারে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিলো। কিছু কিছু দুর্বল ঈমানের মুসলিম ভীত হয়ে এ কথা ভাবতে লাগল যে, হায়! এবার বুঝি আর রক্ষা নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় পেয়ো না। সত্য কখনো পরাজিত হয় না। মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সত্যের জন্মই হয়েছে সফলতা ও বিজয় লাভের জন্য। সামান্য এই তুফান দেখে তোমরা ভড়কে গেলে? মনে রেখো, ইসলাম এমন কোনো প্রদীপ নয় যে, তীব্র বাতাসের ঝটকায় ধপ করে নিভে যাবে। খুব ভালোভাবে মনে রেখো, তোমাদের কেউ যদি আমার সঙ্গে নাঙ্গা তরবারি হাতে কাফেরদের মোকাবিলার জন্য বের না হয়, তাহলে আমি একাই আমার তরবারি হাতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। নবীজির কথায় মুসলিমদের দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো। প্রিয় রাসুলের সঙ্গে তারাও প্রস্তুত হয়ে গেল।

পালিয়ে গেল আবু সুফিয়ানের বাহিনী

আবু সুফিয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মুসলিমরা নুআইম ইবনে মাসউদের রটনায় প্রভাবিত হয়ে মদিনার বাইরে বের হওয়ারই সাহস পাবে না, কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-কে[১১৩] মদিনার গভর্নর নিযুক্ত করে নিজে

---

১১৩. তবে অন্য বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল-এর নাম রয়েছে, দেখুন, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/১৪৯

দেড়হাজার সৈন্য নিয়ে কাফেরদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বদরপ্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেখানে কাফেরদের নামচিহ্নও ছিল না। আবু সুফিয়ান তখন তার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দুহাজার সৈনিক নিয়ে আসফান নামক স্থানে এসে পৌঁছেছিল, কিন্তু সেখানে এসে সে যখন শুনল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেড়হাজার সৈনিকের বিশাল বাহিনী নিয়ে বদরের মাঠে আগেই এসে তাঁবু গেড়ে বসে আছেন! তখন সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। এদিকে তার বাহিনীও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। কারণ, এই বদরপ্রাঙ্গণেই তাদের যুদ্ধে পারদর্শী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক হাজার সৈনিকের বিশাল বাহিনী রসদপত্রহীন মাত্র ৩১৩ জন মুসলিমের কাছে চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল। সেই যুদ্ধে মুসলিমদের অনেক সৈন্যই ছিল কম বয়সী তরুণ। আজ তারা আরও বেশি শক্তিসামর্থ্যের অধিকারী হয়েছে। তা ছাড়া উহুদযুদ্ধেও কুরাইশবাহিনী তেমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। অথচ এখন দু-দলের সৈন্যসংখ্যা প্রায় বরাবর। বুকের গহিনে এতদিনের লালিত বিজয়ের স্বপ্ন যেন নিমেষে উবে গেল। আতঙ্ক আর হতাশায় তারা পুনরায় মাতৃভূমি মক্কার দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখল না।

লড়তে নয় ছাতু খেতে গিয়েছ

সে বছর মক্কায় খুব অভাব-অনটন দেখা দিয়েছিল। তাই আবু সুফিয়ানের এই বাহিনী শুধু ছাতু খেয়েই দিন কাটাত। যে কারণে এই বাহিনীকে জাইশুস সাভিক বা ছাতুবাহিনী বলে অভিহিত করা হয়। কুরাইশরা যখন মুসলিমদের ভয়ে ভীত হয়ে যুদ্ধ না করেই আসফান নামক স্থান থেকে মক্কায় ফিরে গেল, তখন মক্কার মহিলারা তাদেরকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে বলতে লাগল, তোমরা তো আর যুদ্ধ করতে যাওনি, গিয়েছ ছাতু খেতে। পুরো মক্কার অলিগলিতে, জনে জনে, মুখে মুখে এমন অপমানের বাক্য রটে গেল। ঘরে গেলে মহিলারা তাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। বাইরে বের হলে বাচ্চারা টিপ্পনী কাটে। পরবর্তী সময়ে যখনই এই যুদ্ধের আলোচনা উঠত, তখনই মানুষের মুখ দিয়ে প্রবাদবাক্যের ন্যায় এই কথা বের হয়ে আসত, গিয়েছ তো ছাতু খেতে, লড়তে তো আর যাওনি।

মুসলিমশিবিরে স্বস্তি

মুসলিমবাহিনী আটদিন পর্যন্ত বদরপ্রাঙ্গণে কাফেরদের অপেক্ষায় ছিল। অষ্টম দিন। মাবাদ ইবনে আবু মাবাদ খুজায়ি সংবাদ নিয়ে এলেন, আবু

সুফিয়ানের বাহিনীর পালিয়ে গেছে। এমন সুসংবাদে মুসলিমদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এলো। তারা এবার নিজেদের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

চতুর্থ হিজরির আরও কিছু ঘটনা

এক. ইসলামের শহিদদের মুকুট, নবীজির আদরের নাতি হুসাইন রা. এই বছর দুনিয়াতে আগমন করেন। কুখ্যাত ইয়াজিদ যাকে কারবালার ময়দানে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

দুই. এই বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সহধর্মিণী জয়নাব বিনতে খুজাইমা রা. ইন্তেকাল করেন। এই বছরই নবীজির সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল।

তিন. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতি, উসমান রা.-এর ছেলে আবদুল্লাহ এই বছর ইন্তেকাল করেন। তার চোখে মোরগ ঠোকর দিয়েছিল। সেই ব্যথা ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়ায় ইন্তেকাল করেন।

চার. এই বছর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামা রা.-কে বিয়ে করেন।

পাঁচ. মদ হারাম হওয়ার বিধানসংবলিত আয়াতও এই বছর নাজিল হয়। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর মদিনার বাজারগুলোতে মদ পানির ন্যায় প্রবাহিত হতে লাগল। কারণ, মুসলিমরা নিজেদের মদের পেয়ালা, মটকা ও সুরাহি ভেঙে সমস্ত মদ রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন।

পঞ্চম হিজরি

গাজওয়ায়ে বদরে সুগরা বা বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর মুসলিমরা প্রায় ছয়-সাত মাস বেশ নিশ্চিন্ত সময় পার করল। কোথাও কোনো ধরনের ফেতনা-ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা হয়নি। কিন্তু পঞ্চম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে দীর্ঘদিনের ছাইচাপা আগুন আবারও প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন যে, দুমাতুল জান্দালের শাসক আকিদার ইবনে মালিক একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনায় হামলা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, মদিনা থেকে যে-সমস্ত কাফেলা শামে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে যেত, সে তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের সব সম্পদ লুট করে নিত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নতুন শত্রুকে দমন করার জন্য এক হাজার সৈনিকের একটি

বাহিনী নিয়ে দীর্ঘ দশ মনজিল অতিক্রম করে দুমাতুল জান্দালে এসে পৌছলেন। মুসলিমবাহিনী যখন তাদের গন্তব্যে পৌছার মাত্র এক রাত সময়ের দূরত্বে এসে পৌছল, তখন বাহিনীর পথপ্রদর্শক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাল যে, শত্রুদের চারণভূমি খুব কাছেই রয়েছে। যদি প্রথমেই তাদের চারণভূমিকে দখলে নেওয়া যায়, তাহলে তাদের কোমর ভেঙে যাবে। অবশেষে তাই করা হলো। প্রথমে শত্রুদের চারণভূমিকে দখলে নিয়ে তাদের সব গবাদি পশু ও ফসলাদি নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেওয়া হলো। অতঃপর মুসলিমরা দুমাতুল জান্দালে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে গিয়ে মুসলিমবাহিনী হতবাক হয়ে গেল। পুরো এলাকা নিস্তব্ধ-নিথর। কোথাও শত্রুর নামচিহ্নও নেই। একজন কাফেরকে গ্রেফতার করে পুরো ঘটনা জানা গেল। তার বক্তব্যমতে দুমাতুল জান্দালের শাসক যখন মুসলিমবাহিনীর অতর্কিত আগমনের সংবাদ পেল, তখন সে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। প্রসিদ্ধ সাহসী সেনাদের নেতৃত্বে পুরো বাহিনীকে ছোট ছোট সেনাদলে ভাগ করে আশপাশের এলাকায় শত্রুর খোঁজে প্রেরণ করলেন, কিন্তু কোথাও কোনো শত্রুকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এভাবেই শামের সীমান্তে নিজের প্রভাব বিস্তার করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে এলেন।

বনি মুসতালিকের যুদ্ধ

আরবের মরুভূমির প্রতিটি বালুকণা মুসলিমদের রক্তপিয়াসি ছিল। ইসলাম ও মুসলিমদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। কুখ্যাত ইহুদিদের একটি গোত্র বনু মুসতালিক এবার নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে মাঠে নামল। এই গোত্রের সর্দার ছিল হারেস ইবনে জিরার। সে তার অধীনস্থ এলাকায় ইসলামের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ইহুদিদের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে বিশাল শক্তিশালী একটি বাহিনী গঠন করল। এমনিতেই আরবের ইহুদিদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। তারা এমন কাউকে খুঁজছিল, যার দূরদর্শী নেতৃত্বে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে আরব-উপদ্বীপে নিজেদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবে। আরবের সমস্ত ইহুদি হারেস ইবনে জিরারের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করল। অন্যান্য আরব গোত্রগুলোও নিজেদের সৈন্য ও রসদসামগ্রী নিয়ে হারিসের বাহিনীতে

শামিল হলো। আরবের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইসলামের শত্রুরা সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিল। এখন সুযোগ বুঝে সবাই হারিসের পতাকাতলে আসতে শুরু করল। ইসলামের এই দুশমন তার বিশাল বাহিনী ও বিপুল অস্ত্রশস্ত্র দেখে ভাবতে লাগল আজ আমার নেতৃত্বে আরবের সমস্ত গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যে তুফান সৃষ্টি করেছে, তার এক ঝটকাতেই মুসলিমরা খড়কুটায় পরিণত হবে।

মদিনায় নবীজির নিকট তাদের এমন ষড়যন্ত্রের সংবাদ পৌঁছে গেল। তিনি একজন বিশ্বস্ত গোয়েন্দা পাঠালেন পুরো বিষয়টা সম্পর্কে দ্রুত খোঁজখবর নিয়ে আসতে। সে এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাল যে, হারেস ইবনে জিরার মুশরিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিশাল একটি বাহিনী গঠন করেছে। খুব শীঘ্রই সে মদিনায় হামলা করবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সংবাদ শুনেই মুজাহিদদের একটি দলকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে ফেললেন। তারপর অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এই নতুন ফেতনা নির্মূলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এই সৈন্যদলে কিছু ঘোড়া ছিল। কয়েকজন আনসার ও মুহাজির সাহাবি সেগুলোর মালিক ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাহিনীর আনসার ও মুহাজির সাহাবিদেরকে দুভাগে বিভক্ত করে দিলেন। আনসার সাহাবিদের পতাকা ছিল সাদ ইবনে উবাদা রা.-এর হাতে। আর মুহাজিরদের পতাকা ছিল আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর হাতে।

কুচক্রী মুনাফেকদের যোগদান

মুজাহিদদের এই বাহিনীতে কুখ্যাত মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও নিজের সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে যোগদান করে। কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতায় তারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, মুসলিমরা কখনো যুদ্ধে পরাজিত হয় না, বরং শত্রুদেরকে কুপোকাত করে বিপুল গনিমত সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে মদিনায় ফিরে আসে। তাই এই যুদ্ধেও অংশগ্রহণ না করে তারা গনিমতের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতে চায়নি। মুসলিমবাহিনীতে যোগ দিয়েই তারা তাদের কাজ শুরু করে দিলো। তাদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল মুসলিমশিবিরে বিভেদ সৃষ্টি করা। এই কাজে তারা অত্যন্ত কৌশলে এগোতে লাগল। প্রথমেই মুসলিম সৈনিকদের একে-অন্যের সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা ধীরে-ধীরে সেটাকে সাম্প্রদায়িক বিভেদে রূপ দিতে আনসার ও মুহাজিরদের দীর্ঘদিনের সৌহার্দ ও সম্প্রীতিকে নষ্ট করার অপচেষ্টা করল। এমনকি এই

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা রা.-এর ওপর চারিত্রিক অপবাদ আরোপ করতেও দ্বিধা করেনি! এই বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব।

মুরাইসি কূপের পাশে

মুরাইসি নামক কূপের পাশে মুসলিম ও মুশরিকবাহিনী মুখোমুখি হলো। দু-পক্ষের লড়াকু যোদ্ধারা একে-অন্যের ওপর তীব্র বেগে আক্রমণের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা ও সাহসিকতার প্রমাণ দিতে লাগল, কিন্তু মহান আল্লাহর সাহায্য ও ভালোবাসা মুসলিমদের সঙ্গে ছিল। যার কারণে এবারও রণাঙ্গন মুসলিমদের দখলে চলে এলো এবং কাফেররা পলায়ন করতে শুরু করল। মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার অনুসারীদের হৃদয়ে লোভ ও প্রাচুর্যের যে তীব্র ক্ষুধা দাউদাউ করে জ্বলছিল, তা নেভানোর ব্যবস্থাও হয়ে গেল। বিজয়ী মুসলিমবাহিনী দুই হাজার উট এবং পাঁচ হাজার বকরিসহ বিপুল গনিমতের সম্পদের মালিক হলো। এই যুদ্ধে ৬০০ ইহুদি বন্দি ও ১০ জন নিহত হলো।

নবীজির ঘরে হারেস তনয়া

যুদ্ধবন্দিদের মাঝে শত্রুবাহিনীর নেতা হারেস ইবনে জিরারের আদরের মেয়ে জুওয়াইরিয়া রা. ছিলেন। গনিমতের সম্পদ বণ্টনে তিনি যায়েদ ইবনে কায়েস রা.-এর ভাগে আসেন, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে মুসলিম হয়ে গেলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। মুসলিমবাহিনী যখন এই সংবাদ জানতে পারল, তখন তারা এই বলে সমস্ত যুদ্ধবন্দিকে মুক্ত করে দিলেন যে, যে গোত্রের সর্দারের মেয়ে আমাদের প্রিয়তম রাসুলের স্ত্রী, আমাদের আম্মাজান, সে গোত্রের লোকদেরকে কীভাবে আমরা দাস-দাসী বানিয়ে বন্দি করে রাখি? হারেস ইবনে জিরার যখন এই সংবাদ শুনে, তখন ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়ে। দ্রুত সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে নিজের সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চায় এবং আগামী দিনে নবীজির একান্ত অনুগত একজন মানুষ হয়ে জীবনযাপন করার অঙ্গীকার করে। মুসলিম মুজাহিদরা যুদ্ধবন্দিদেরকে মুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি গনিমতলব্ধ সম্পদও তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। দয়া ও সহমর্মিতার এমন বিরল আচরণে অসংখ্য ইহুদি মুসলিম হয়ে যায়। আর যারা মুসলিম হয়নি, তারাও চিরদিনের জন্য মুসলিমদের কল্যাণকামী ও বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়।

এই কারণেই আমি বলি, ইসলামের শত্রুরা তাদের বিরোধিতা ও বিদ্বেষের মাধ্যমে ইসলামের দুর্নিবার এগিয়ে যাওয়াকে তো প্রতিহত করতে পারেইনি, উলটো তাদের এইসব কর্মকাণ্ডে ইসলামের প্রচার-প্রসারই বৃদ্ধি হয়েছে।

অপবাদের ঘটনা

আরবি ভাষায় ইফক অর্থ অপবাদ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনাবহুল জীবনে ইফকের ঘটনা অন্যতম, যা ছিল মুসলিম সেনাদের মধ্যে মুনাফেকদের শামিল হওয়ার এক দুঃখজনক ফলাফল। যেহেতু তারা বাহ্যিকভাবেই নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করত, ইসলামের বিধানাবলি মেনে চলত, তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মুজাহিদ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হতে নিষেধ করতে পারেননি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে কম বয়সী স্ত্রী ছিলেন আয়েশা রা., অন্যদিকে তিনি ছিলেন নবীজির সবচেয়ে কাছের বন্ধু, গুহায় আত্মগোপনের সময়কার সঙ্গী আবু বকর রা.-এর আদরের কন্যা। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী মহিলা ছিলেন। নবীজির স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই কুমারী অবস্থায় নবীর ঘরে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তার বাহ্যিক ও আত্মিক গুণাবলির কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এই সফরে নবীজির সঙ্গে তিনিও শরিক ছিলেন। যুদ্ধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনকালে সেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, যা ইসলামি ইতিহাসে ইফক বা অপবাদের ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। পুরো ঘটনাটি হলো—

একদিন সন্ধ্যাবেলায় কোনো এক স্থানে কাফেলা যাত্রাবিরতি করল। আয়েশা রা. প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নেওয়ার জন্য তাঁবু থেকে বেরিয়ে দূরে কোথাও চলে গেলেন। তখন তার গলায় একটি মুক্তার হার শোভা পাচ্ছিল। কোনো কাঁটাদার ঝোপের সঙ্গে লেগে হারটি ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং মুক্তার দানাগুলো এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। তিনি মুক্তার দানা কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যে কারণে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। এদিকে কাফেলাও তাঁবু গুটিয়ে সামনের দিকে রওয়ানা হলো। যে উটের পিঠে পর্দা দিয়ে আয়েশা রা.-এর জন্য হাওদা প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেটাও কাফেলার সঙ্গে চলে গেল। কারণ, উটের চালক ভেবেছিলেন তিনি হাওদার ভেতরেই রয়েছেন। তিনি যখন কাফেলার যাত্রাবিরতির স্থানে এসে পৌছলেন, তখন ময়দান পুরো ফাঁকা। আম্মাজান আয়েশা রা. ভাবলেন, আমি কাফেলার সঙ্গে

নেই এই খবর যখন জানাজানি হবে, তখন নিশ্চয় কেউ এদিকে আমায় খুঁজতে আসবে। তাই তিনি চাদর গায়ে জড়িয়ে সেখানেই বসে থেকে কোনো অনুসন্ধানকারীর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সফওয়ানের আগমন

নিয়ম ছিল, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পর কেউ না কেউ অবশ্যই পুনরায় যাত্রাবিরতির স্থানে ফিরে আসত। যাতে করে কেউ কোনোকিছু ফেলে গেলে সে তা নিয়ে যেতে পারে। উক্ত সফরে এই দায়িত্ব সফওয়ান ইবনে মুআত্তালের কাঁধে ছিল। কারণ, তিনি কিছুটা দেরিতে ঘুম থেকে উঠতেন। কাফেলা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর সফওয়ান রা. নিজের উটের ওপর আরোহণ করে চারদিকে খুঁজতে বেরোলেন। দূর থেকে গায়ে চাদর জড়িয়ে কাউকে বসে থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? ওখানে কে বসে আছে? আম্মাজান আয়েশা রা. জবাবে বললেন, আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী। সফওয়ান রা. এ কথা শুনেই উট থেকে নেমে পড়লেন এবং আম্মাজানকে উটে সওয়ার হতে অনুরোধ করলেন। আয়েশা রা. উটের ওপর আরোহণ করলে সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল উটের লাগাম ধরে আগে আগে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই তারা কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন।[১১৪] নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনা জানতে পেরে প্রিয় সহধর্মিণীর জন্য পৃথক পর্দাবৃত হাওদার ব্যবস্থা করলেন।

মুনাফেকদের কুৎসা রটনা

মূল ঘটনা কী ছিল, তা এখন আর আমাদের সুহৃদ পাঠকের অজানা নয়। ঘটনাটি এখানেই শেষ হতে পারত। তাহলে আর মুনাফেকদের জীবনের সার্থকতা কোথায়? কতদিন বাদে তারা এমন একটা সুযোগ পেল। মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলার একেবারে মোক্ষম সময়। অভিশপ্ত মুনাফেকরা এই ঘটনাটিকে তিলকে তাল করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত স্ত্রীর ব্যাপারে কুৎসা রটাতে লাগল। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কিছু সরলমনা মুসলিমও এতে বিভ্রান্ত হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এমন জঘন্য অপবাদ সম্পর্কে জানতে পেরে খুব দুঃখ

---

১১৪. *সহিহ বুখারি*, ৪১৪১

পেলেন। ওদিকে আম্মাজান আয়েশা রা.-এর অবস্থা কেমন ছিল? একজন মহিলার জন্য এমন নিকৃষ্ট অপবাদ যে কতটা বেদনাদায়ক, তা এক সতীসাধ্বী মহিলাই বোঝে। আম্মাজান আয়েশা রা. এমন মিথ্যা অপবাদ শুনে বেদনায় মুষড়ে পড়লেন। আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে তিনদিন পর্যন্ত তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিভিন্ন দিক চিন্তাভাবনা করে তার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগলেন। আম্মাজানের জন্য এই ব্যথা আরও বেশি বেদনাদায়ক ছিল। অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তিনি বাবার বাড়ি চলে গেলেন।

বড় বড় সাহাবিরা নবীজিকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, আয়েশা রা.-কে নিয়ে যা-কিছু বলা হচ্ছে বা রটানো হচ্ছে, তার সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার, মুত্তাকি ও পূতপবিত্র মহিলা। তার চরিত্রে এমন নিকৃষ্ট কাজের ছিটেফোঁটাও লাগেনি। তার মতো এমন পূতপবিত্র ও আল্লাহভীরু নারীর ব্যাপারে যারা এসব কুৎসা রটাচ্ছে, তারা মূলত শয়তানের দোসর।

সাহাবিরা আরও বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! যে সফওয়ান ইবনে মুআত্তালের সঙ্গে আম্মাজান আয়েশাকে জড়িয়ে এই সমস্ত অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, তিনিও অত্যন্ত ইবাদতগুজার, দুনিয়াবিমুখ ও খাঁটি ঈমানদার একজন মানুষ। শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ তিনি করতেই পারেন না।

এসব কথা চলতে চলতেই প্রায় এক মাস হয়ে গেল। এই দিনগুলোতে আম্মাজান আয়েশা রা. দিনরাত শুধু কান্না করতেন।

সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহর সাক্ষ্য

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজানের ঘরে গিয়ে সালাম দিয়ে বসলেন। তাঁর সুন্দর চেহারাখানি আজ মলিন। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জানো লোকেরা তোমার ব্যাপারে কী বলছে? জবাবে আম্মাজান বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ওই বদ লোকদের কথা শুনে সবর করা ছাড়া আমার পক্ষে আর কীই-বা করা সম্ভব? আমি জানি, মানুষ যা-কিছু বলছে, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র; কিন্তু মানুষের মুখ বন্ধ করা তো আমার সাধ্যের বাইরে। আমি শুধু আল্লাহর কাছেই ইনসাফের প্রার্থনা করছি। আমি দোয়া করছি, যদি আমি সত্যবাদী হই, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমার পবিত্রতা ও সতীসাধ্বী হওয়া প্রমাণ করবেন, সেই বদ লোকদের অপদস্থ করবেন।

আম্মাজান আয়েশা রা. নিজের হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ের মালিকের কাছে জানিয়ে চুপ হয়ে গেলেন। এমন সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহি নাজিল হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হলো। প্রচণ্ড শীতের মৌসুম ছিল। তবুও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে লাগল। একটু পরে তিনি সেই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন, যেগুলো এইমাত্র আয়েশা রা.-এর পূতপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। নবীজির মুখ থেকে আয়াতগুলো শুনে আয়েশা রা. সীমাহীন আনন্দিত হলেন। বারবার মহান আল্লাহর কুদরতি কদমে সেজদা করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার ওপর তোমার দয়া-অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আমি কোন ভাষায় আদায় করব? তুমি তোমার অপার অনুগ্রহে শুধু আমার পবিত্রতাই বর্ণনা করোনি, বরং তা কেয়ামত পর্যন্ত তোমার পবিত্র কুরআনে সংরক্ষিত থাকবে, মানুষ তা পাঠ করবে।

মুনাফেকদের পাপের শাস্তি

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন আয়েশা রা.-এর নিরপরাধ হওয়ার ব্যাপারে আয়াত নাজিল হলো, তখন আর কারও বাজে কথা বলার সাহস রইল না। তবে যারা এমন নিকৃষ্ট অপবাদ আরোপ করেছে, তার শাস্তি তো তাদের অবশ্যই পেতে হবে। তাই আল্লাহর বিধানমতে এই অপবাদ আরোপের শাস্তিস্বরূপ চারজন ব্যক্তিকে আশিবার বেত্রাঘাত করা হলো। সেই চারজনের নাম হলো,

এক. মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই

দুই. হামনাহ বিনতে জাহাশ

তিন. হাসসান ইবনে সাবিত

চার. মিসতাহ বিনতে উসাসা।

সততা সব আত্মীয়তার উর্ধ্বে

পৃথিবীর ইতিহাসে এ কথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, সততার প্রশ্নে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমনকি খুব কাছের লোকদের ভালোবাসার পরোয়া করতে নেই। বড়দের কথা মানা জরুরি, কিন্তু তা সবক্ষেত্রে নয়। শুধু জায়েজ ও বৈধ ক্ষেত্রে। হিন্দুধর্মে পুত্রের জন্য পিতার আনুগত্যের প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটাকে ধর্মের একটি অংশ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ছোট ভাইয়ের জন্য বড় ভাইয়ের আনুগত্য করা ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ,

যতটা বড় ভাইয়ের জন্য পিতার আনুগত্য। এখন বড় ভাই যদি ছোট ভাইকে আদেশ করে যে, তুমি বাবাকে একটা থাপ্পড় দাও। তাহলে কি ছোট ভাইয়ের জন্য এই আদেশ মানা জরুরি? কখনোই না। কারণ, বড় ভাই নিজেই এখানে ধর্মবিরোধী কাজ করছে। তাই এ ক্ষেত্রে তার আদেশ মানা জরুরি নয়। ভক্ত প্রহলাদের ঘটনা তো হিন্দুস্তানের সবার মুখে মুখে রয়েছে। প্রহলাদ সততার পথে চলতে গিয়ে নিজের বাবার আদেশও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যে কারণে তার ধার্মিকতায় কারও আপত্তি বা সংশয় হয়নি। উলটো তিনি নিজেই সবার কাছে ধর্মের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে গেছেন।

মানুষ বলে, ভালোবাসার ক্ষেত্রে আইনকানুনের দোহাই দিলে চলে না। ভালোবাসা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। ভালোবাসা নিজেই সব আইনকানুনকে গোলাম বানিয়ে রাখে। সে কখনো আইনের গোলাম হয় না। কিন্তু প্রিয় পাঠক, বিশ্বাস করুন, এসব শুধু একজন কবির রঙিন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও এই কথা প্রায়শ আমাদের মাঝে সত্য হয়ে প্রকাশিত হয় এবং আমাদের প্রতিদিনের যাপিত জীবনে আমরা নিজেরাই এমন ঘটনার সাক্ষী, কিন্তু এটা তো বিবেকের ওপর আবেগকে প্রাধান্য দেওয়ার এক দুঃখজনক ফলাফল। বিষয়টি যদি ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় কথাটা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু যদি কোনো আইন বা বিধিবিধান সম্পর্কিত হয় তাহলে কথাটি মিথ্যা।

আমি জানি, এই পৃথিবীতে যে মানুষটি ভালোবাসার খাঁচায় আবদ্ধ হয়েছে, সব ধরনের আইনকানুন ও ধর্মাচার থেকে সে নিজেকে স্বাধীন করে নেয়। প্রেমাস্পদের আরাধনা ও তার সব বৈধ-অবৈধ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা প্রেমিকের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, মানুষের পুরো জীবনটাই প্রেমের পাগলামি। তাই পাগলামিটা যে ধরনেরই হোক না কেন, তা মানুষের জন্য এক দুর্লভ বস্তু, যা তাকে পশুত্বের স্তর থেকে ফেরেশতার কাতারে পৌঁছে দিতে পারে।

ভাই! আমি মানি যে, কোনো ব্যক্তি বা কোনোকিছুর জন্য কুরবানি দেওয়াটা অনেক বড় সম্মানের ব্যাপার। যে লোক নিজের স্বাধীনতাকে অপরের আদেশ অনুসরণে উৎসর্গ করে দিয়েছে, অন্যের আঁচলের একটু ছোঁয়া, দুঠোঁটের মিষ্টি হাসির জন্য জীবনের সব লক্ষ্য বিসর্জন দিয়েছে, মানলাম সে অনেক বড় কাজ করছে; কিন্তু একটু চিন্তা করুন, এই হতভাগা লোকটির পাগলামি তাকে কতটা অপরিণামদর্শী করে তুলেছে যে, তার মতোই একজন মানুষের

হাসি-আনন্দ আর সাধ-আহ্লাদ পূরণেই সে নিজের জীবনটা ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই লোকটি যদি ভালোবাসার পরীক্ষায় নিজের জীবনটাই উৎসর্গ করে দেয় (এই ধরনের লোকের সংখ্যা যদিও সামান্য, তবুও মেনে নিলাম যদি অসংখ্য মানুষও এই ধরনের কাজ করে), তাহলেও কি ভালোবাসা নিয়মের বেড়ি পরে না—এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেককে আবেগের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলা যাবে? আবেগের গোলামি হতে যতদিন না মানুষ মুক্ত হবে, ততদিন পর্যন্ত তারা সত্য ও ন্যায়ের সুমহান পথে চলার উপযুক্ত হবে না।

একটি সত্য ধর্ম বা মতাদর্শের নিয়মকানুন মেনে চলা একজন ভালো মানুষের অবশ্যকর্তব্য। একটি সত্য ধর্মই পারে মানুষকে সততা আর ন্যায়ের পথ দেখাতে। পারে ইহকাল ও পরকালের সফলতা এনে দিতে। ধর্মের পথ ছেড়ে আমরা যে পথেই যাই না কেন, কোনো পথেই সফলতা মিলবে না। ধর্মের কথা হলো, যে কথা মানার মধ্যেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত, সেই কথা নির্দ্বিধায় মেনে নাও। হোক না পুরো পৃথিবী তোমার বিরোধী। আর যে কথা বিশ্বাস করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন, অথবা বলি, যে কথা সত্য ও ন্যায়ের বিপরীত, তা কখনো বিশ্বাস করো না। হোক না পুরো পৃথিবী তাতে খুশি।

সত্যের আনুগত্যের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত

ইসলামি ইতিহাসের পরতে পরতে এমন অসংখ্য অভূতপূর্ব ঘটনা আছে, যেগুলোতে মুসলিমরা সত্য ও ন্যায়ের প্রশ্নে প্রিয়জনদের ভালোবাসাকেও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা ও প্রভাবশালীর শক্তি ও রক্তচক্ষুর পরোয়া করেনি। আফসোস! আজকের মুসলিমবিশ্ব তার এমন উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যকে হারিয়ে ফেলেছে। ইসলামের কথা বলে আর লাভ কী? সব ধর্মের অনুসারীরাই আজ নিজেদের ধর্মের মূল আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। ধর্ম তো এখন মানুষের কাছে সেকেলে হয়ে পড়েছে। পশ্চিমাদের নাস্তিক্যবাদ আজ প্রতিটি হিন্দুস্তানির মন-মস্তিষ্কে সামেরির জাদুর ন্যায় প্রভাব বিস্তার করেছে। ধনদৌলত আর বাড়ি-গাড়ির বাজার তো এখন সরগরম। লালসার গলিপথে 'চাই চাই'-এর ছুরি দিয়ে দ্বীন, মাজহাব, সভ্যতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের সব নিয়মকানুনকে নির্দ্বিধায় জবাই করা হচ্ছে। দুনিয়াপাগল এই লোকগুলো কখনো কল্পনাও করতে পারবে না যে, সুবিশাল ওই আকাশের নিচে, আকাশের ওই চন্দ্র-সূর্যের আলোতেই

পৃথিবীর এই বুকে প্রতিটি জাতির মাঝেই এমন কিছু সাহসী লোক অতিবাহিত হয়েছে, ন্যায়ের প্রশ্নে যারা নিজের রক্তের সম্পর্কেরও পরোয়া করেনি। এই মুহূর্তে আমি এখানে এমনই এক সাহসী মানুষের আলোচনা করব, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত কোনো গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা আছে।

ইতিপূর্বে মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর আলোচনা হয়েছে। সে মুসলিমবাহিনীতে শামিল হয়ে আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের হৃদয়ে কপটতার বিষ ছড়ানোর অপচেষ্টা করেছিল। ইফকের সেই মর্মান্তিক ঘটনাটিও তার কুকর্মেরই ফল ছিল। অসংখ্য কুকর্মের পাশাপাশি লোকটির ভাষাও সীমাহীন অশালীন ছিল। একজন মুসলিম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রমাণসহ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কিছু অশালীন বক্তব্য তুলে ধরল এবং তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল, কিন্তু রহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন না। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রিয় পুত্র যখন এই সংবাদ জানতে পারল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে তার বাবার সব কুকীর্তি ও অশালীন বক্তব্যকে প্রমাণসহ পেশ করা হয়েছে এবং তাকে হত্যা করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে, তখন তিনি নিজের নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতাকে তার কুকর্মের শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, আপনজনদের ভালোবাসার চেয়েও ইসলামের ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নবীজি মুচকি হেসে তার আবেদন ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করার ব্যাপারে এখনো কোনো বিধান আসেনি। তোমরা শান্ত হও।

এই দুঃসাহসী যুবক তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার থেকে নীরবে বের হয়ে চলে এসেছেন, কিন্তু রাস্তার মাঝপথে গিয়ে নাঙ্গা তরবারি হাতে বাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখনও মদিনায় প্রবেশ করেনি। তার খাঁটি ঈমানদার পুত্রের সুস্পষ্ট কথা, এই মুনাফেককে মদিনায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। হোক না সে আমার বাবা। এরপর তিনি পিতাকে লক্ষ করে বলেন, তুমি একজন মুনাফেক, হকের অনুগত সেজে হকের বিরোধিতা করো। আমি জানি তুমি আমার বাবা কিন্তু সত্য আর ন্যায়ের ভালোবাসা আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়েও অধিক

গুরুত্বপূর্ণ। সততার পোশাক পরে তুমি মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিচ্ছ। আজ আমি তোমাকে মদিনায় প্রবেশ করতে দেবো না।

নাঙ্গা তরবারিধারী ছেলের সামনে অসহায় মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দাঁড়িয়ে আছে, মদিনায় প্রবেশ করতে পারছে না। ওদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো ঘটনা জানতে পেরে খবর পাঠালেন, আবদুল্লাহকে মদিনায় প্রবেশ করতে দাও।[১১৫]

আহজাবের যুদ্ধ

এটা নবী-জীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাওহিদের পতাকাবাহী মুসলিমদের ইসলাম প্রতিষ্ঠার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আরবগোত্রপতিরা যতগুলো যুদ্ধ করেছে, সেগুলোর মধ্যে আহজাব বা খন্দকের যুদ্ধ সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। যে যুদ্ধে আরবের বড় বড় সমস্ত গোত্রের সর্দাররা অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈনিকের কাছে এই বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। যদ্দরুন পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, দুনিয়ার যত বড় শক্তিই হোক না কেন, পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইসলামের নামচিহ্ন মুছে দেওয়ার শক্তি কারও নেই।

বিতাড়িত ইহুদিদের অপকর্ম

চতুর্থ হিজরিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বনু নাজিরের যে-সমস্ত দুষ্কৃতকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী ইহুদিকে মদিনা হতে খাইবারে বিতাড়িত করেছিলেন, তারা নিজ এলাকা হতে বিতাড়িত হয়েও নিজেদের অপকর্ম থেকে বিরত রইল না। উলটো নিজেদের নেতৃত্বাধীন এলাকায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন উসকে দিতে লাগল। ইতিপূর্বে মুজাহিদরা যে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেগুলোতেও এই কুচক্রী ইহুদিদের উসকানি ছিল। তারা যখন দেখল এই ছোট ছোট যুদ্ধগুলোর মাধ্যমে মুসলিমদের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা যাচ্ছে না, তখন তারা আপন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য বিশাল একটি বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের নামচিহ্ন মুছে দেওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করল। ওদিকে কুরাইশের প্রতিটি বয়োবৃদ্ধ, যুবক-তরুণ আর শিশু-কিশোর পর্যন্ত

---

১১৫. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/২১৭, (দারুল হাদিস); *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/১৬১-১৬২

মুসলিমদের বিরোধিতায় সোচ্চার ছিল। যে কারণে উদ্দেশ্য পূর্ণ করা ইহুদিদের জন্য সহজ মনে হতে লাগল।

ঐক্যের সফল চেষ্টা

এক মহারক্তক্ষয়ী যুদ্ধের নীলনকশা তৈরি করে ইহুদিরা সাহায্যের জন্য মক্কার কুরাইশ নেতাদের নিকট গেল এবং তাদের সামনে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পুরোপুরি তুলে ধরল। কুরাইশ নেতারা তাদের কাছে কথায়, কাজে, অস্ত্রশস্ত্রে, জনবলে, সর্বদিক দিয়েই সহযোগিতার অঙ্গীকার করল। যুদ্ধে ব্যয় করার জন্য বিপুল অর্থ ও সাহসী সৈন্যবাহিনী নিয়ে হামলায় শামিল থাকার ওয়াদা করল। ইহুদি নেতারা এ রকম আরও অনেক গোত্রের সর্দারদের নিকট সাহায্যের আবেদন নিয়ে গেল। সবার কাছ থেকেই সাহায্যের অঙ্গীকার নিয়ে ফিরে এলো। এরপরে আরবের প্রায় ৫০ জন বড় বড় সর্দার কাবাঘরে গিয়ে এই মর্মে শপথ নিলো যে, ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে তারা কোনোপ্রকারের প্রচেষ্টাই বাকি রাখবে না। পৃথিবীর বুক থেকে মুসলিমদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিতে প্রয়োজন হলে নিজের শরীরের শেষ বিন্দু রক্ত বিসর্জন দিতেও তারা দ্বিধা করবে না। এই কাজগুলো খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে করা হলো, যেন মুসলিমরা জানতে পেরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে না পারে।

জানতে পারলেন নবীজি

কাফেররা এই মহাযুদ্ধের ব্যাপারে খুবই গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিল। তাই যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পূর্বে মদিনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিরা এই সম্পর্কে জানতে পারলেন। কাফেরদের এমন জঘন্য চক্রান্ত সম্পর্কে জানার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে নিয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য জরুরি পরামর্শসভার আয়োজন করলেন। উপস্থিত সবাই মতামত দিলেন খোলা ময়দানে গিয়ে এই বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করা উচিত হবে না, বরং বুদ্ধিমানের কাজ হবে শহরের ভেতরে থেকেই শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করা।

সালমান ফারসি রা. যেহেতু ইরানের অধিবাসী ছিলেন, সেহেতু খন্দক খনন করে যুদ্ধ করার রীতি তার ভালোই জানা ছিল। তাই তিনি খন্দক খননের মতামত দিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরামর্শ অনুযায়ী খন্দক খননের আদেশ দিলেন। পেছনে পাহাড় এবং একদিকে ঘরবাড়ি রেখে অন্যদিকে পাঁচ গজ গভীর ও পাঁচ গজ চওড়া খন্দক খনন করা

হলো। এতে করে পুরো মদিনা শহর যেন একটি ডিম্বাকৃতির কেল্লায় পরিণত হলো। যে কেল্লায় পুরোপুরি সংরক্ষিত অবস্থায় মুসলিমরা কাফেরদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

দুপক্ষের সৈন্যবাহিনী

এই যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ছিল সর্বমোট তিনহাজার। আর শত্রুবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ২৪ হাজার। পৃথিবীর বুকে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টিকারী অসত্যের পূজারিদের নির্বুদ্ধিতায় গড়ে ওঠা এই বিশাল বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে সীমিতসংখ্যক সত্যের অনুসারী মুজাহিদ খন্দক খননে ব্যস্ত, তখন এমন এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল, যার অস্বাভাবিকতায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ইসলামের শত্রুরা হাসিঠাট্টা করতে শুরু করল। মুনাফেক ও মুশরিকরা এই অস্বাভাবিক ঘটনায় খুব তালি বাজাল। মহাসত্যবাদী, পৃথিবীর সকল দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মাথার মুকুট, সত্য নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মস্তিষ্ক বিকৃতির (নাউজুবিল্লাহ) কারণ হিসাবে এই ঘটনাটি সাব্যস্ত করল। কিন্তু সামান্য কদিনের ব্যবধানেই তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিপদাপদের প্রচণ্ড ঝড় এ কথা প্রমাণ করে দিলো যে, সত্য কোনো ঠাট্টা বা বিদ্রুপের বস্তু নয়। সত্যকে কখনো লুকিয়ে রাখা যায় না। সত্যের গূঢ় রহস্য সদা পর্দাবৃত থাকে। কিন্তু যখনই তা বিকশিত হওয়ার সময় হয়, তখন দুনিয়ার কোনো শক্তি তাকে ঢেকে রাখতে পারে না। এই ঘটনা ঘটার অল্প কিছুদিন পরেই ইসলামের বিজয়ের অপ্রতিরোধ্য সয়লাবে হককে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীরা খড়কুটার ন্যায় ভেসে গিয়েছে। একজন সত্য নবীর মুখে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

বিদ্রুপের কেন্দ্রবিন্দু যে ঘটনা

খন্দক খননের জন্য যতটুকু জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা সমান ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক অংশে খননের জন্য ১০ জন সাহাবিকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। দ্বীনের মহান সিপাহসালার তাওহিদের সংরক্ষক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ইসলামের এই ক্রান্তিলগ্নে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে সাহাবিদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। হঠাৎ এক স্থানে এমন একটি পাথরের গায়ে কোদালের আঘাত পড়ল, শক্তিশালী নওজোয়ান সাহাবিদের পক্ষেও যাকে ভাঙা বা সরানো সম্ভব হচ্ছিল না। খন্দকের এই অংশে যে সাহাবিরা খননের

কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তারা নিরাশ হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে আবেদন করলেন, যেন খন্দকের দিক পরিবর্তন করে অন্যকোনো দিকে খনন করা হয়। দ্বীনের এই একনিষ্ঠ প্রেমিকদের আবেদন শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কোদাল নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। পাথরের দিকে একবার তাকিয়ে জোরে কোদাল দিয়ে তাতে আঘাত করলেন। এক আঘাতেই পাথরের মাঝে গভীর ফাটল সৃষ্টি হলো। সেই ফাটল দিয়ে উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ বেরিয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল। এই সময় নবীজির মুখ থেকে ইসলামের জানবাজ মুজাহিদরা এই কথা শুনতে পেল, শামের ধনভান্ডার আমাকে দেওয়া হয়েছে। এই কথা বলে তিনি পুনরায় পাথরের গায়ে কোদাল মারলেন। আবারও একটি উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ আকাশের দিকে উঠে গেল। তিনি এবার বললেন, পারস্যের ভাগ্য মুসলিম শাসকদের শাসনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়বার আঘাত করতেই পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল এবং আবারও একটি আলো চমকাল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার বললেন, ইয়ামেনের রাজত্বের দরজা আমার উম্মতের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।[১১৬]

নবীজির সত্যবাদিতার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ

প্রিয় পাঠক! দেখুন, একদিকে স্বল্পসংখ্যক মুসলিমদের কী দৈন্যদশা, অপরদিকে মুহাম্মাদের এমন বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্‌বাণী! এমন অবস্থায় মুসলিমদের নিয়ে কাফেররা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে আর কীই-বা করার ছিল? তাদের চর্মচক্ষু তো বর্তমানকে দেখছিল। আর ভবিষ্যৎ? সে তো মুসলিমদেরও চোখের আড়াল ছিল।

গুটি কয়েক মুসলিম নিজেদের ঈমান ও দ্বীনের হেফাজতের জন্য দিনের আরামকে হারাম করে অবিরত কাজ করে যাচ্ছিলেন। সারারাত নির্ঘুম কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। ২৪ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী তাদেরকে নাস্তানাবুদ করতে রণসাজে সজ্জিত হয়ে মদিনার দিকে আসছিল। মরুভূমির প্রতিটি বালুকণা যখন মুসলিমদের রক্তলোলুপ হয়ে আছে, মিথ্যার পূজারি অত্যাচারীদের ভয়ে কোথাও মাথা লুকানোর এতটুকু জায়গা যখন তাদের নেই, সে অবস্থায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বড় বড় রাজত্ব ও পুরো পৃথিবী জয়ের গল্প শোনাচ্ছিলেন!

---

১১৬. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/১০৪; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/১৫৬; *আস-সুনানুন নাসায়ি*, ৩১৭৮; *খাসায়িসুল কুবরা*, ৪৩২ (বাংলা), খন্দকের যুদ্ধ।

প্রিয় পাঠক, সেই মুহূর্তে এই ভবিষ্যদ্‌বাণীটি যতই বিস্ময়কর ও হাস্যকর মনে হোক না কেন, ইতিহাস সাক্ষী, তাঁর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পরবর্তী সময়ে পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে উচ্চারিত প্রতিটি দেশের সিংহাসনই মুসলিমদের পদচুম্বন করেছে এবং অন্য কোনো জাতি-গোষ্ঠীর অংশীদারি বা সহযোগিতা ছাড়াই মুসলিমরা এই সমস্ত রাষ্ট্রে একক প্রভাব বিস্তার করেছে। বলুন, এই ঘটনাটি কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মামুর মিনাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট হওয়ার দলিল নয়?

বনু কুরাইজার চুক্তিভঙ্গ

ইসলাম নামক নতুন বাগানকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে তাওহিদের মুজাহিদরা যখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খন্দক খননে ব্যস্ত। ঠিক তখনই মরুভূমির ঠান্ডা বাতাসে ভর করে এক ভয়ংকর দুঃসংবাদ এলো, মুসলিমদের সঙ্গে বনু কুরাইজার ইহুদিরা ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ-সম্প্রীতি রক্ষার যে অঙ্গীকার করেছিল, আজকের এমন দুর্দিনে নাকি তারা তা ভঙ্গ করেছে। শুধু তাই নয়, গাদ্দারি আর চুক্তিভঙ্গের এক ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে শত্রুদের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে শামিল হয়েছে। তাদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সেনানায়ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই প্রিয় সাহাবি সাদ ইবনে মুআজ ও সাদ ইবনে উবাইদা রা.-কে পাঠালেন অবস্থা যাচাই করে বনু কুরাইজার সর্দারকে পুরোনো সেই মিত্রতার চুক্তি স্মরণ করিয়ে দিতে।

বুদ্‌বুদের মতো ওয়াদা

ইহুদিদের বন্ধুত্ব ও সন্ধিচুক্তি ছিল বুদ্‌বুদ কিংবা পানির ওপর গড়ে তোলা ঘর সমতুল্য। বাতাসের সামান্য ঝাপটাতেই যা বিলীন হয়ে যায়। যখনই তারা দেখল, ইসলামের সবুজ-শ্যামল বাগানের অপরূপ সৌন্দর্যকে মলিন করে দিতে প্রলয়ংকরী এক ঝড় উঠেছে, তখনই তারা নিজেদের সব চুক্তি ভেঙে দিয়ে ইসলামবিরোধিতায় সর্বাত্মকভাবে মাঠে নামল। তারা সাদ ইবনে মুআজ ও সাদ ইবনে উবাইদা রা.-এর কথা আমলে নেওয়া তো দূরের কথা, শুনতেই অস্বীকার করল। শুধু কি তাই? মদিনার সম্মানিত দুই সর্দারকে তারা খুব বাজেভাবে সম্বোধন করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে অত্যন্ত অশালীন বাক্য উচ্চারণ করল। যারা এসেছিল বন্ধুত্ব ও

ভালোবাসার হাত বাড়াতে, লাঞ্ছনা আর বিদ্রুপের কালো শব্দে তাদেরকে বরণ করা হলো। শান্তির বার্তা নিয়ে যারা এসেছিল, যুদ্ধের ঘোষণা তাদেরকে শুনতে হলো।

লাঞ্ছনার কালো দাগ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের আলোয় আলোকিত হৃদয়ে অসত্যের পূজারি ইহুদিদের চুক্তিভঙ্গে বড় বেশি ধাক্কা লাগল। এই কাপুরুষেরা ইসলামকে বিপদাপদের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে দেখেই তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মতো অমানবিক কাজ করে বসল। বন্ধুত্ব, মিত্রতা ও সহযোগিতার চুক্তি তো ঠিক সেই সময়কে সামনে রেখেই করা হয়, যখন শান্তি ও নিরাপত্তার ভূমিতে অশান্তির বজ্রাঘাত হতে থাকে। এমন কঠিন মুহূর্তে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করা এবং নিজেদের মিত্রদের সঙ্গ ত্যাগ করা মানবিক রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহুদিদের এই চুক্তিভঙ্গ ছিল আরবের প্রতিশ্রুতি রক্ষার ইতিহাসে ও বাহাদুরির ললাটে লাঞ্ছনার কালো দাগ। বাতিলের পূজারি এই কাপুরুষেরা তো মানবতা আর বীরত্ব-বাহাদুরির সমস্ত নিয়মকানুনকেই অবজ্ঞা করেছিল। ইহুদিদের এই চক্রান্ত ও চুক্তিভঙ্গে মুসলিমদের হৃদয়ে তো অবশ্যই কিছুটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তা তাদের দৃঢ়-মনোবলকে এতটুকুও দমাতে পারেনি। সত্যের বিজয়ে তারা ছিল পূর্ণ আশাবাদী। একের পর এক বিপদাপদের ঝড়তুফান তো বাড়ছিল, কিন্তু তাতে কী? তারা যে তাদের তরি ওই ওপরওয়ালার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন! ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ের ভেতর দিয়েই তারা নির্ভয়ে এগিয়ে নিচ্ছিলেন তাদের আশার তরি। কারণ, তারা জানতেন, যারা নিজেদের সাহায্য করে, আল্লাহও তাদের সাহায্য করে।

সংঘাতময় সেই মুহূর্ত

আরবের মরুভূমির বালিতে সত্যের অনুসারীদের রক্তনদী বইয়ে দেওয়ার যে স্বপ্ন ইহুদিরা দেখেছিল, এসে গেল সেই স্বপ্ন পূরণের কাঙ্ক্ষিত সময়, প্রতিটি অভিশপ্ত বেঈমানের হাতের খোলা তরবারি যখন সূর্যের আলোয় চকচক করে ডাকছিল মুসলিমদের দেহ থেকে মাথাকে আলাদা করতে, কিন্তু তাতে কী? ইসলাম নামের সুবিশাল বৃক্ষের জন্মই তো হয়েছিল বিজয় ও সফলতার মন মাতানো সুবাসে আরবের প্রতিটি মানুষের মন-মস্তিষ্ককে সুবাসিত করতে। অন্যদিকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দম্ভভরে যে কুফফার এসেছিল বিজয়ের স্বাদ নিতে, তার কপালে তো ছিল পরাজয়ের গ্লানি। তাই

তো অতীতের ন্যায় আজও ইসলামের বিজলি চমকে জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে কাফেরদের নিজ ভূমি। হকের মোকাবিলায় প্রস্তুত বাতিলের সব যুদ্ধাস্ত্র আজ পড়ে আছে পুরোনো দিনের কোনো ময়লা কাগজের টুকরোর ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে।

হয় প্রাণ না হয় ঈমান

এই রঙিন পৃথিবীর ভোগবিলাসের হাতছানি আর রঙিলা রমণীদের হেলে পড়া বাঁকা চুলে বন্দি যারা, জীবনের চেয়ে অতি প্রিয় আর কীই-বা আছে তাদের? কিন্তু যারা পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে বিশ্বাসী, যাদের ঈমান আকাশের ওই সুদূরে গিয়ে মিলিত হয়, জীবন রক্ষার চিন্তা করাটাই তো তাদের কাছে হাস্যকর। মুষ্টিমেয় কজন মজলুম মুসলিম ইসলামের এই কেল্লা ও মহান দ্বীনের হেফাজতের জন্য জালেম কাফেরের ধারালো তরবারির সামনে নিজের বুক পেতে দিয়ে জীবন দেওয়াকেই পুণ্য ভেবে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

ইসলামের যুদ্ধ কি আক্রমণাত্মক ছিল না প্রতিরোধক?

অনেকেই বলেন, ইসলামের এই যে মানমর্যাদা ও পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া, তার পেছনে রয়েছে যুদ্ধবিগ্রহের এক রক্তমাখা উপাখ্যান। শুধু তাই নয়, তারা আরও বলেন, মুসলিমরা নাকি দাঙ্গাহাঙ্গামা আর রক্তপাতে বিশ্বাসী এক জাতি। ভাই! আমিও বিশ্বাস করি, ইসলাম রক্তদান করেই নিজের পথ তৈরি করে নিয়েছে, অকল্পনীয় মানমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। তবে সত্য তো এটাই যে, অসংখ্য শহিদের লাল রক্তে ইসলামের আজাদির ইতিহাস রঙিন হয়েছে। ইসলামি বাগানে দোল খাওয়া এই গোলাপের বুকের লালে তো সেসব মজলুম মুসলিমদের রক্তের দাগ লেগে আছে, যারা ইসলামের সুরক্ষায় নির্ভীকচিত্তে তরবারির সামনে নিজেদের বুক পেতে দিয়েছেন; কিন্তু এই কথা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও অবাস্তব যে, রক্তপাত বা যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি মুসলিমদের হৃদয়ের কোনো আকর্ষণ বা আকাঙ্ক্ষা ছিল। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির ইতিহাসেই এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন রক্তপাত করা তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে জাতি ও আদর্শের সুরক্ষায় জীবন বিলিয়ে দেওয়া থেকে যে ব্যক্তি পিছু হটে, তাকে চরম অপরাধী বলে বিবেচনা করা হয়। মুসলিমদের জীবনেও এমন কিছু মুহূর্ত এসেছিল, যখন তরবারি হাতে তুলে নেওয়াই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়ে ছিল।

মৃত্যুতেই আসে চিরস্থায়ী জীবন

প্রিয় বন্ধু, সেসব মুসলিম তো নিজেদের বুকের ভেতরে এমন এক ব্যথাতুর হৃদয় পুষতেন, যে হৃদয় মানবতার প্রতিটি বিষয়েই সজাগ থাকত। তাদের বিচক্ষণ ও বাস্তবদৃষ্টিতে মানুষের রক্তের প্রতিটি ফোঁটাই ছিল পূতপবিত্র। শত্রুর রক্তাক্ত শরীরকে মাটিতে ছটফট করতে দেখলেও তারা সহ্য করতে পারতেন না।

কিন্তু যখন সেই সময় এলো, পৃথিবীর নব্য ফেরাউন ও নমরুদরা যখন আপন আপন শয়তানি শক্তি নিয়ে ধর্ম ও সভ্যতার সব নিয়মকানুনকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে একাট্টা হয়েছিল, তখন তাদের কাছে শরীরের প্রতি ফোঁটা রক্তই মূল্যহীন হয়ে পড়ল। ইসলামি বাগানে সিঞ্চনের জন্য রক্তদানই এখন তাদের কাছে জরুরি হয়ে পড়ল।

বিপদের ঘোর অমানিশায় মুসলিমরা

আরবের মুশরিকরা ইহুদিদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইসলামের নাম ও নিশানা পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মদিনা অবরোধ করল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, বিপদের এই কালো মেঘে চাঁদ হারিয়ে গিয়ে তার আলো থেকে পৃথিবীর মানুষকে বঞ্চিত করে দেবে। কিন্তু সবার অগোচরে কুদরত তাঁর আপন হাতে বাতিলের এই বিশাল বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করার সব আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। পুরো পৃথিবীর সমস্ত বালুকণাও যদি কেউ ওড়ায়, পূর্ণিমার ওই চাঁদ কি তাতে এতটুকুও আলোহীন হবে? হ্যাঁ, সেই আলোকিত বাতিঘর, সৃষ্টিকুলের প্রতিটি বিন্দুই যেখানে দীপ্তিময়; তা হয়তো কিছুটা মলিন হবে। বাতিলের এই সম্মিলিত বিশাল বাহিনী এসেছিল হককে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। হায়! তারা যদি জানত, তাদের এই সাধ যে সাধ্যের বাইরে! তারা শুধু সামান্য সময়ের জন্য হকের অনুসারীদেরকে জীবন বিপন্নকারী মুসিবতের বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে।

ইহুদি ও মুশরিকদের এই সম্মিলিত বাহিনী যখন নিজেদের রক্তপিপাসা মেটাতে মদিনার নিকটে এসে পৌঁছল, তখন তারা খন্দক দেখে সীমাহীন ভড়কে গেল। রাগে-ক্ষোভে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। কারণ, খন্দকের এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা তাদের কল্পনাতেও ছিল না। এখন আর কী করা? খন্দক পাড়ি দিয়ে ওপারে যাওয়া যেহেতু অসম্ভব, তাই কেল্লা অবরুদ্ধ করে রাখা ও এপার থেকে ওপারে তির নিক্ষেপ করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না।

এক-দুই করে এভাবে প্রায় ২০ দিন অতিবাহিত হলো। মুসলিমদের দুশ্চিন্তার যেন অন্ত নেই। অবরোধকারী কাফেরদের তো প্রতি মুহূর্তে চারদিক থেকে খাদ্য ও রসদ আসছিল। কিন্তু মুসলিমদের জন্য এ দুটি সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ছিল। রসদ প্রায় শেষের দিকে। একদিন দুজন সাহাবি এসে নবীজির কাছে প্রচণ্ড ক্ষুধার কথা জানালেন, জামা উলটিয়ে কোমর সোজা রাখার তাগিদে পেটে বাঁধা পাথর দেখালেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজের জামার আঁচল ওঠালেন। সাহাবিরা হতভম্ব হয়ে দেখেন, তিনিও ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে দুটি পাথর বেঁধে রেখেছেন! খাদ্য-পানির সমস্যা ছাড়াও এমন অনেক সমস্যাতে মুসলিমরা জর্জরিত হয়ে পড়েছিল, যা তাদের জন্য প্রাণবিনাশী হয়ে দেখা দিয়েছিল।

তুলনাহীন ধৈর্যশক্তি

মুসলিমদের তুলনাহীন ধৈর্যশক্তির প্রশংসা ও বিবরণ আমার কলমের দ্বারা লেখা অসম্ভব। একদিকে খাদ্যের অভাব মানুষকে দুর্ভিক্ষের দারপ্রান্তে নিয়ে এসেছিল, অন্যদিকে রাতদিনের অবরোধ তাদেরকে সন্তানদের ব্যাপারেও শঙ্কিত করে রেখেছিল। কারণ, তারা মদিনার ছোট একটা দুর্গে অবস্থান করছেন। অথচ মদিনার প্রতিটি বিন্দুই আজ তাদের রক্তপিপাসু। শহরের ভেতরে অবস্থানরত ইহুদিরা কাফেরদের সঙ্গে হাত মেলানোয় মুসলিমদের সংকট আরও প্রকট হলো। ওদিকে মুসলিমবাহিনীতে মিশে যাওয়া মুনাফেকদের দ্বারা যেকোনো সময় খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ারও আশঙ্কা ছিল। দিনে চামড়া ঝলসে দেওয়া সূর্যদাহের উষ্ণ বায়ু ও পায়ের নিচের উত্তপ্ত বালু, আর রাতে কুয়াশাবৃষ্টি। হায়! রাতও যেন মুসলিমদের করুণ অবস্থায় অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে। একদিকে রাতের আঁধারে দুচোখ একটু বন্ধ করতে গেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রিয়জনের রক্তাক্ত চেহারা। নাকে আসে চেনা রক্তের বিদঘুটে দুর্গন্ধ। ঘুম কি আর আসে? এভাবেই কেটে যায় বাকি রাত। অন্যদিকে আছে দুশমন ও মুনাফেকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ, দেখো দেখো, কায়সার ও কিসরার রাজত্বের স্বপ্নে বিভোর যারা, তাদের অবস্থা দেখো। এখন তো দেখছি তাদের বেঁচে থাকাই দায়।

এমন ক্রান্তিলগ্নেও মুসলিমরা বেঈমানের সঙ্গে সন্ধি বা আপস করাকে চরম অপমান মনে করলেন। তাই বেঈমানের দিকে আপসের হাত না বাড়িয়ে ওপরের ওই মালিকের দয়া ও করুণার দিকে তারা দুহাত বাড়িয়ে দিলেন।

আলি রা.-এর বীরত্ব

অবরোধের দিনগুলোতে মিথ্যার ধ্বজাধারীরা কয়েকবার খন্দক পার হয়ে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সত্যের অনুসারীদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে তাদের সেসব চেষ্টা বিফল হয়ে গেল। যে রক্তপিয়াসি স্বপ্নের ঘোরে তারা ছুটে এসেছিল এই মরুপ্রান্তরে, উত্তপ্ত সূর্যের আলোয় চমকে ওঠা মুসলিম তরবারির আঘাতে সে ঘোর কেটে গেল।

ইহুদিনেতারা প্রতিনিয়ত খন্দক পার হওয়ার চেষ্টা করছিল আর মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছিল। কাফেরবাহিনীতে একজন প্রসিদ্ধ সাহসী ও বীরযোদ্ধা ছিল আমর ইবনে আবদুদ। আরবের দিগ্‌দিগন্তে যার বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। যাকে এক হাজার সশস্ত্র অশ্বারোহীর সমান মনে করা হতো। আমর ইবনে আবদুদের দুর্ভাগ্য একদিন তাকেও খন্দকের ভেতরে নিয়ে এলো। নিজের বীরত্ব ও তরবারি চালনায় তার বেশ অহংকার ছিল। অহংকারের নেশায় পাগল হয়ে সে নিজের মণি-মুক্তাখচিত তরবারি বাতাসে নাড়াত নাড়াতে আরবের যুদ্ধনীতি অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করল, যদি মুসলিমদের মধ্যে এমন কোনো বাহাদুর থাকে যে আমার মোকাবিলা করতে পারবে, তবে সে যেন আমার সামনে আসে। দেখে নেব আজ তার বাহাদুরি।

আলি রা.-এর ন্যায় সাহসী ও লড়াকু যোদ্ধার পক্ষে এমন হুংকার নীরবে সয়ে যাওয়া কী করে সম্ভব? নাঙ্গা তরবারি হাতে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন মুসলিমবাহিনী থেকে এবং আমর ইবনে আবদুদকে লড়াইয়ের আহ্বান করলেন। আমরের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। নিজের সক্ষমতা ও বীরত্বের ওপর তার এতটাই অহংকার ছিল যে, এই মুসলিম নওজোয়ানের বীরত্ব ও সাহসের পরোয়া না করে বলল, যুবক! আরবের শ্রেষ্ঠ বীরযোদ্ধার মোকাবিলায় এসে মিছেমিছি কেন নিজের জীবনটা শেষ করতে চাচ্ছ? বাছা! তোমার নবযৌবনের প্রতি আমার দয়া হয়। তুমি বরং ফিরে যাও, আমি তোমার সঙ্গে লড়তে চাই না।

আলি রা.-এর ধারালো তরবারি বারকয়েক বাতাসে ঘুরপাক খেল। কালো মেঘে ছেয়ে যাওয়া আকাশে যেন আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়ল। মেঘের গর্জনের ন্যায় হুংকার ছেড়ে আলি রা. বললেন, ফিরে যাওয়ার জন্য তো আসিনি। মারব না হয় মরব। আমার সঙ্গে লড়তে চাও না তো আমি তোমার সঙ্গে লড়ব। তোমাকে আগে বেড়ে আক্রমণ করার অনুমতি দিলাম। আমি তার জবাব দেবো।

আমর ইবনে আবদুদ রাগে ফেটে পড়ল। সে আলি রা.-এর ওপর প্রচণ্ড জোরে আক্রমণ করল। আলি রা. নিজের ঢাল দ্বারা তা প্রতিহত করলেন। তারপরও আরবের বিখ্যাত এই যোদ্ধার তরবারির আঘাত তার কপালে এসে লাগল। এবার ছিল মুসলিম নওজোয়ানের পালা। আলি রা.-এর এক আঘাতেই আমর ইবনে আবদুদের বীরত্ব ও সাহসের সমস্ত অহংকার নিমেষে মাটিতে গড়াগড়ি খেল। পুরো মুসলিমবাহিনীতে আল্লাহু আকবার-এর ধ্বনি উঠল। আর কাফেরশিবির থেকে এক বেদনাদায়ক আহ ধ্বনি ভেসে এলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন বীরত্বের কারণে আলি রা.-কে আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করলেন।[১১৭]

সাফিয়া রা.-এর বীরত্ব

শত্রুরা মদিনায় আক্রমণ করার পূর্বেই মুসলিমরা তাদের বিবি-বাচ্চাদেরকে একটি ছোট্ট কেল্লায় নিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুসলিমবাহিনী যখন নিজেরাই আবদ্ধ হয়েছিল, তখন মদিনার ভেতরের ইহুদিরা বিপদে পড়া মুসলিমদেরকে আরও কষ্টে ফেলার জন্য চরম নির্লজ্জ এক ফন্দি আঁটল। চুপিচুপি মুসলিমদের স্ত্রী-সন্তান মেরে ফেলার ভয়ংকর ষড়যন্ত্র করল। এক ইহুদি আততায়ী খুবই সতর্কতার সঙ্গে দুর্গের দেয়ালে উঠতে সক্ষম হলো। ভেতরে প্রবেশ করে সে চুপিচুপি দুর্গের ফটক খোলার সুযোগ তালাশ করতে লাগল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু সাফিয়া রা. এই নির্লজ্জ ইহুদিকে দেখে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ এই বীরাঙ্গনা মহিলা তার করণীয় ঠিক করে ফেললেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি নিজের তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে মনুষ্যত্বহীন নির্লজ্জ এই ইহুদির মাথায় আঘাত করলেন, যে লোক অত্যন্ত নীচুতা ও কাপুরুষতার সঙ্গে শিশু-কিশোর ও মহিলাদেরকে হত্যা করার গোপন সুযোগ তালাশ করছিল, সাফিয়ার আঘাতে তার মাথা ফেটে গেল এবং সে দেয়ালের ওপর থেকে মাটিতে পড়ে গেল। সাফিয়া রা.-ও বিদ্যুৎগতিতে এই শয়তানটার পিছু ধাওয়া করে তার মাথার কাছে এসে পৌঁছলেন। চাকু দিয়ে তার দেহ থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেললেন। নির্লজ্জ ইহুদি একটা চিৎকার দিয়ে চিরতরে ঠান্ডা হয়ে গেল। সাফিয়া রা. ইহুদির কাটা মাথা দুর্গের পূর্বদিকের ফটকের বাইরে নিক্ষেপ করলেন। যেখানে অনেক ইহুদি অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতার সঙ্গে মুসলিম মা-

---

১১৭. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/১৬১; *জাদুল মাআদ*, ৩/২৪৬; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/১০৯

বোন ও শিশুদের ওপর হামলা করার জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। নিজেদের সহযোগীর কর্তিত মাথা যখন তাদের সামনে এসে পড়ল, তখন ভয়ে তাদের কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেল। বুকে ধুকপুক শুরু হলো। ভাবল, নিশ্চয় দুর্গের ভেতরে শুধু মুসলিম মহিলা ও শিশুরাই নয়, বরং কোনো লড়াকু বাহিনীও আছে। তাই তারা নিরাশ হয়ে নিজেদের শয়তানি ষড়যন্ত্র থেকে বিরত হয়ে চুপিচুপি সেখান থেকে ফিরে এলো। আর এভাবেই নবীজির সাহসী ফুফুর অসাধারণ বিচক্ষণতা ও সাহসিকতায় মুসলিমদের স্ত্রী-সন্তানদের জীবন রক্ষা হলো।[১১৮]

সুপ্রভাত খন্দক

রাতের আকাশ যতই কালো আঁধারে ঢাকা হোক, প্রভাতের সোনালি কিরণে তা আলোকিত হবেই। ওই দূর নীলাকাশ যতই কালো মেঘে ছেয়ে থাকুক, সূর্যের হাসি তাতে ফুটবেই। জীবন বিতৃষ্ণ করে তোলা দুঃখ-যাতনা যতই থাকুক না কেন, অনাবিল সুখ আর ভালো লাগার মুহূর্ত তো আসবেই। পূর্ণিমার মায়াবী আলো যদি কালো মেঘে ছেয়ে থাকা আঁধারের চাদরে সোনালি-রুপালি ফিতা বুনতে পারে, তবে কেন সবকিছুতে সক্ষম ওই সত্তা তাঁর প্রিয়তমের জীবনের দুঃখ-যাতনার আঁধার ঘুচিয়ে তাকে আলোয় আলোয় ভরিয়ে দেবেন না? ফেলে আসা দিনগুলোতে ইসলামের আকাশ কত-না প্রাণঘাতী মুসিবতের কালো মেঘে ছেয়েছিল। এখন সময় হয়েছে তা ছড়িয়ে পড়ার, টুকরো টুকরো মেঘেদের ভেসে বেড়ানোর। শুরু হলো তাওহিদের অনুসারীদের বিজয় প্রস্তুতি, সবার অলক্ষে, পর্দার অন্তরালে।

ইহুদিদের অকৃতজ্ঞতা

বাতিলের চিমনিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামের আলো তার দ্যুতি ছড়ানো বন্ধ করেনি, বরং সত্যের আলো এখনো মিথ্যার কালো আঁধার ভেদ করে সৌভাগ্যবানদের হৃদয়ের অলিগলিতে মিটিমিটি আলো জ্বালানোর কাজ করছিল। এ দিনগুলোতেই ইসলামের সুমহান মহানুভবতার শিক্ষায় অভিভূত হয়ে গাতফান গোত্রের একজন সর্দার নুআইম ইবনে মাসউদ নবীজির কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। গাতফানের এই নেতার বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। মদিনার ইহুদি ও মক্কার কাফেরদের নিকট তিনি খুব মর্যাদাবান ও

১১৮. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/১৬৩; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৪/৫১; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/১১১

মান্যবর ছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তখনও জানাজানি হয়নি। তাই তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতিক্রমে ইহুদি ও কাফেরদের মধ্যে নিজের প্রভাবকে কাজে লাগাতে চাইলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি মদিনার ইহুদি ও কাফেরবাহিনীর পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসে চির ধরাতে সক্ষম হলেন। প্রথমেই এই সর্বজনস্বীকৃত ও মান্যবর নেতা বনু কুরাইজার সর্দার কাব ইবনে উসাইদের নিকট গেলেন এবং তাকে এ কথা বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, তোমরা ইহুদিরা মারাত্মক ভুলের মধ্যে আছ। একটু ভেবে দেখো, মক্কার কুরাইশরা এখানে (প্রায় ৩০০ মাইল) দূর থেকে এসেছে। আর মুসলিমরা তো তোমাদের সঙ্গেই এই মদিনায় বসবাস করছে। একবার ভেবে দেখো, কুরাইশদের বন্ধুত্বের কীই-বা নিশ্চয়তা আছে? তারা যদি পরাজিত হয়, তবুও তারা পলায়ন করে (প্রায় ৩০০ মাইল দূর) নিজেদের ভিটে-বাড়িতে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে, কিন্তু তোমরা তখন কী করবে? তোমরা তো তখন মুসলিমদের দাস-দাসীতে পরিণত হয়ে তাদের দয়া ও করুণার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে থাকবে। আর তখন তোমাদের নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তাই উচিত হবে তোমরা মক্কার কুরাইশদের দিক থেকে বন্ধুত্বের হাত গুটিয়ে নাও এবং জাজ্বল্যমান ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও। তোমরা আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বলো, সে যেন তাদের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট জামানতস্বরূপ পাঠায়। এতে করে তোমরা নিশ্চিত হতে পারবে যে, কুরাইশরা তোমাদেরকে মুসলিমদের দয়া-অনুগ্রহের ওপর ফেলে রেখে পলায়ন করবে না।

কাব ইবনে উসাইদের হৃদয়ে নুআইম ইবনে মাসউদের সীমাহীন ভক্তি ও প্রভাব ছিল। তা ছাড়া তার পরামর্শটাও বেশ যৌক্তিক ছিল। কাবের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, বাস্তবেই সে একটা ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছে। সে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে নুআইম ইবনে মাসউদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।

কাব ইবনে উসাইদের নিকট থেকে ফিরে এসে নুআইম ইবনে মাসউদ রা. মক্কার কুরাইশনেতা আবু সুফিয়ানের কাছে গেলেন। আবু সুফিয়ান অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে মদিনার এই বিখ্যাত নেতাকে স্বাগত জানালেন। প্রথমেই কিছুক্ষণ কুশল বিনিময়ের পর নুআইম রা. যুদ্ধের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করলেন। আবু সুফিয়ানকে লক্ষ করে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে আমি বড় একটি গোপন ভেদ সম্পর্কে অবগত করতে চাচ্ছি যেটা

জানার মধ্যে তোমাদের জীবনের নিরাপত্তার রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। আর এ বিষয়ের অজ্ঞতা তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে।

শিশুরা যেমন দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে চমকে ওঠে, আবু সুফিয়ানও ঠিক তেমনই চমকে উঠল। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বলল, আপনার প্রতিটি কথাই আমাদের কাছে ঐশী বিধান সমতুল্য। আপনি মদিনার মহান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একজন। আপনি যদি দয়া করে আমাদেরকে সেই গোপন বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেন, যার সঙ্গে আমাদের বাঁচা-মরা সম্পৃক্ত। তাহলে আমরা সারা জীবন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

নুআইম ইবনে মাসউদের চেহারায় সফলতার ঝলক দেখা গেল। নিজেকে কিছুটা সংযত করে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, পৃথিবীতে বন্ধুবেশী শত্রুর চেয়ে জঘন্য আর কিছুই হতে পারে না। বনু কুরাইজার এই লোকগুলো, যারা ইতিপূর্বে মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ ছিল। আজ তারা তোমাদের সঙ্গ দিচ্ছে। এটা মূলত তাদের গভীর চক্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়। তোমার ন্যায় এমন চতুর ও বিচক্ষণ যুদ্ধবাজ সর্দারও যা বুঝতে সক্ষম হয়নি। বাস্তবতা হলো, তারা তো রাতদিন প্রতিনিয়ত মুসলিমদের সঙ্গেই বসবাস করে। তাদের ছেড়ে কী করে তারা তোমাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে? তারা কি জানে না যে, তোমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী এসেছে, কিছুদিন মদিনায় হাঙ্গামা হবে, হইহুল্লোড় হবে। এরপরে আবার তোমরা মদিনাকে বিদায় জানিয়ে নিজ নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যাবে। তখন তাদের কী অবস্থা হবে? তারা তো মুসলিমদের দয়া ও করুণার ভিখারি হয়ে যাবে। এবার তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, কীভাবে তারা তোমাদের সত্যিকার বন্ধু হতে পারে? তারা কি এই বিষয়টি বোঝে না? এদিকে তোমরা ভাবছ তারা তোমাদের পক্ষে কাজ করছে! আসলে তারা তোমাদের ধোঁকা দিচ্ছে। আবু সুফিয়ান, বাস্তবতা অনুধাবনের চেষ্টা করো। নতুবা সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তোমাদের এই বিশাল শক্তিশালী বাহিনীর একজন সৈন্যও মদিনা থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারবে না। আমি যতটুকু জানি, এই মুহূর্তে বনু কুরাইজার ইহুদিরা চাচ্ছে, যেভাবেই হোক তোমাদেরকে মুসলিমদের ফাঁদে আটকানো। যেন পরবর্তী সময়ে তারা মুসলিমদের সুদৃষ্টি লাভ করতে পারে। সম্ভবত দু-একদিনের মধ্যেই তোমাদের নিকটে বনু কুরাইজার পক্ষ থেকে এমন কোনো প্রস্তাব আসবে যে, যদি তোমরা তাদের চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব চাও, তাহলে যেন তাদের নিকট তোমাদের কয়েকজন

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে জামানতস্বরূপ প্রেরণ করো। তোমাদের সেসব ব্যক্তির ভাগ্যে কী জুটবে, তা তো পরেই বোঝা যাবে।

আলোচনা শেষে নুআইম ইবনে মাসউদ ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। আবু সুফিয়ান অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাকে বিদায় জানাল। নুআইম ইবনে মাসউদের গভীর কৌশলের জাদুকরী প্রভাবের কাছে আবু সুফিয়ান ধরাশায়ী হয়ে গেল।

বনু কুরাইজার সর্দার কাব ইবনে উসাইদের পক্ষ হতে আবু সুফিয়ানকে শর্ত দেওয়া হলো, তোমরা বনু কুরাইজার দিক হতে কোনো ধরনের সহযোগিতা চাইলে, নিজেদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আমাদের কাছে জামানতস্বরূপ প্রেরণ করো। আবু সুফিয়ান তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে কাব ইবনে উসাইদের প্রস্তাবের জবাবে জানিয়ে দিলো, আমরা আমাদের একজন নেতাকেও তোমাদের হাতে সোপর্দ করব না। এখন ইচ্ছা হলে আমাদের সঙ্গ দাও, আর নয় ছেড়ে যাও।

প্রত্যুত্তরে ইহুদি সর্দার জানিয়ে দিলো, আজ থেকে তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। আমরা আমাদের সন্ধিচুক্তি থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। ভবিষ্যতে আমাদের থেকে আর কোনো সহযোগিতার আশা করো না।

এবার আবু সুফিয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস হলো, নুআইম ইবনে মাসউদ গাতফানি যা-কিছু বলেছিল, তা সম্পূর্ণ সত্য। দুশ্চিন্তা তাকে কাবু করতে শুরু করল। চোখে-মুখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগল। বারবার মনে হচ্ছিল, নিজেদের বিশাল বাহিনী থাকা সত্ত্বেও আজ তারা শত্রুর বেড়াজালে খুব বাজেভাবে ফেঁসে গেছে। আজ প্রায় এক মাস হলো মুসলিমরা তাদের কেল্লায় আবদ্ধ। অথচ এখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনোরূপ দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে না। কোনোভাবেই তারা কুরাইশদের শক্তির সামনে মাথানত করতে প্রস্তুত ছিল না। শুরু থেকেই তো আবু সুফিয়ান বিষয়টি মানতে পারছিল না। আজ আবার বনু কুরাইজা পৃথক হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা যেন তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষায় পানি ঢেলে দিলো। উপরন্তু মুসলিম ও ইহুদিদের সম্মিলিত কাল্পনিক কোনো সূক্ষ্ম চক্রান্তের ভয়ে তার বিবেকবুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম হলো। এমতাবস্থায় মুসলিমদের সঙ্গে লড়াইয়ে বিজয়ের আশা করা তো আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।[১১৯]

---

১১৯. *জাদুল মাআদ*, ৩/২৪৭; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/১৬৪

পর্দার অন্তরালে বিজয়ের প্রস্তুতি

নুআইম ইবনে মাসউদের কৌশল আর ইসলামের বীর মুজাহিদদের অভূতপূর্ব দৃঢ়তা এমনিতেই আবু সুফিয়ানের পায়ের নিচের মাটিতে ভূমিকম্প তৈরি করে দিয়েছিল। এখন আবার তার দুর্ধর্ষ বাহিনীর রক্তক্ষুধা নিবারণ ও তাদের দাউদাউ করে জ্বলা আশা-আকাঙ্ক্ষার আগুনে পানি ঢালতে আল্লাহর পক্ষ হতে কয়েক ধরনের ব্যবস্থা হলো। দেখতে না-দেখতেই আকাশের বিশাল শূন্যতায় কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা গেল। একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। রাতের গাঢ় জমাট কালো আঁধারের সঙ্গে আকাশে কালো মেঘের ঘণ্টা এবং অবিরত বৃষ্টির তীব্রতায় যেন নিজের হাত নিজেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। খানিকবাদে বাতাসের তীব্র ঝাপটায় তাঁবুর খুঁটিগুলো উপড়ে গেল। চুলার ওপরের রান্নার পাতিলগুলো উলটে পড়ল। তীব্র বৃষ্টির কারণে কাদা জমে গিয়েছিল, তাই কাফেরবাহিনীর দাঁড়িয়ে থাকাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। রসদসামগ্রী তো আরও আগেই প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছিল। বাকি যা ছিল, তা তুফানের সঙ্গী হয়ে অজানায় হারিয়ে গেল। কী আর করা। জান বাঁচিয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কীই-বা করার আছে? আশ্রয় নেওয়ারও তো কোনো জায়গা নেই। তাই এই ঘোর আঁধারে জ্ঞানশূন্য হয়ে একেকজন একেকদিকে ছুটে পালাল। যারা সত্যের সুমহান শক্তিকে ফেরাউনি ও নমরুদের শয়তানি কার্যকলাপে ধ্বংস করতে এসেছিল, আজ তারাই নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে কোনোরকম জানটা বাঁচিয়ে মক্কায় ফিরে গেল।

ইসলামের বিরুদ্ধে আরবের সমস্ত কুফরি শক্তির সম্মিলিত বাহিনীর সীমাহীন অহংকারের এই ছিল পরিণাম। চরম অপমান-অপদস্থতাই ছিল যার সর্বশেষ চিত্র। এরপর থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে আরবের কাফেরদের এমন বিরাট সংঘবদ্ধ বাহিনীর বিরুদ্ধে ইসলামকে নিয়ে আর কখনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মতো পরীক্ষার প্রয়োজন হয়নি।

বনু কুরাইজার পথে

রাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহির মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, কাফেরবাহিনী পলায়ন করেছে, সকালে তিনি হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা.-কে কাফেরশিবিরের অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন যে, ওখানে শত্রুদের কোনো নামগন্ধও বাকি নেই।

শত্রুশিবিরের পুরো প্রান্তর যেন তাদের ধ্বংস ও পরাজয়ের জন্য শোকাহত হয়ে কবরস্থানের ন্যায় নির্জীব-নিশ্চুপ হয়ে আছে। এমন খুশির সংবাদে মুসলিমদের হৃদয় মহান প্রভুর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। তাদের জীর্ণ-শীর্ণ শরীর ও উদাসী চেহারায় আনন্দের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল। এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাজ আদায় করেই সবাইকে বনু কুরাইজার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার আদেশ দিলেন। যাতে করে সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘনকারী অভিশপ্ত ইহুদিদেরকে তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করাতে পারেন। যারা মুসলিমদের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে সাহায্যের বদলে শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাদের সদুপদেশ দিতে যাওয়া নবীজির সম্মানিত প্রতিনিধিদেরও তারা অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশমতো সাহাবিরা ফজরের নামাজ আদায় করে নিজেদের বিজয়ের জন্য মহান প্রভুর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বনু কুরাইজার উদ্দেশে রওয়ানা হন। আলি রা. অগ্রবাহিনীর প্রধান হিসাবে ইসলামি পতাকা হাতে সর্বাগ্রে রওয়ানা হয়ে গেলেন। অপরাপর মুজাহিদ বাহিনীও জোহরের নামাজের সময়ের ভেতরেই ইহুদি বসতিতে গিয়ে পৌছল।

দুর্গ অবরোধ

বনু নাজির গোত্রের অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির, ধূর্ত ও চালবাজ একজন নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব। আলি রা.-এর পূর্বেই সে বনু কুরাইজার দুর্গে পৌছে ইহুদিদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। এর পরিণাম এতটাই গুরুতর হলো যে, কিছু হতভাগা ইহুদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে নিকৃষ্ট শব্দে গালমন্দ করতে লাগল, কিন্তু আলি রা.-এর আগমনে সবার মুখে তালা লেগে গেল। ভয়ে সবাই চুপসে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন মুসলিমদের পর্যাপ্ত সৈন্য সেখানে এসে পৌছল, তখন চতুর্দিক থেকে তাদের দুর্গ অবরুদ্ধ করা হলো, যাতে করে অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তারা তা বুঝতে পারে। তরবারির ভাষায় আজ ইহুদিরা বুঝবে যে,

'মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করা মানে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা।'

ইহুদিদের হতাশা

বনু নাজিরের ফেতনাবাজ নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবও বনু কুরাইজার দুর্গে যুদ্ধের আগুন উসকে দিতে অবস্থান করছিল। মুসলিমরা যখন দুর্গ অবরুদ্ধ করে ফেলল, তখন সেও বনু কুরাইজার সঙ্গে সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। প্রায় ২০-৩০ দিন পর্যন্ত এই দীর্ঘ অবরোধ। অবরোধের দীর্ঘতায় ইহুদিরা একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ল। যেকোনোভাবে হোক সন্ধি করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। সন্ধি ছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না। কতদিন আর এভাবে দুর্গে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায়? একদিকে রসদ ফুরিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে বাহির থেকে কোনো রসদ পৌছতে পারছে না। এমতাবস্থায় হুয়াই ইবনে আখতাবও নিজের সব লক্ষঝম্প ছেড়ে সবাইকে সন্ধিতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল।

কাব ইবনে উসাইদের তিন প্রস্তাব

মুসলিমদের অবরোধে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল তখন বনু কুরাইজার সর্দার কাব ইবনে উসাইদ ইহুদিদের সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করল, যেগুলোর কোনো একটি মেনে নিলেই তার মতে ইহুদিরা এই বিপদ হতে মুক্তি পাবে। সে তার অনুসারীদের লক্ষ করে বলল, এ কথা তো এখন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ একজন সত্য নবী। তিনি অত্যন্ত সহমর্মী ও ক্ষমাশীল ব্যক্তি। মানবিক উত্তম গুণাবলির অধিকারী। তাকে সত্যায়ন করা, তাঁর সহযোগী হওয়া এবং তাঁর সংশ্রব অর্জন করা নিজেদের মহাসৌভাগ্য অর্জন ও জানমাল হেফাজতের মাধ্যম হবে। তাহলে কেন আমরা এই সৌভাগ্যের আলো দ্বারা নিজেদের হৃদয়রাজ্যকে আলোকিত করব না?

কিন্তু আফসোস! অন্যান্য ইহুদিদের হৃদয় ছিল উদাসীনতা ও সীমালঙ্ঘনের আবরণে আবৃত। যে উপদেশ তাদের ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তির কারণ হতো, তারা তাকে অত্যন্ত তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করল। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিলো, আমরা আমাদের বাপদাদার ধর্ম ছাড়তে আদৌ প্রস্তুত নই। পূর্বসূরিদের দেখানো পথই আমাদের জীবন চলার একমাত্র পথ। তাদের রেখে যাওয়া আদর্শই আমাদের জন্য উত্তম জীবনব্যবস্থা।

কাব ইবনে উসাইদ এবার তার দ্বিতীয় প্রস্তাব পেশ করল, তাহলে চলো আমরা নিজেদের বুকে পাথর বেঁধে প্রত্যেকেই তরবারি হাতে বীরযোদ্ধার ন্যায় প্রথমেই নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করি। অতঃপর বীরবিক্রমে নির্দ্বিধচিত্তে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করি। যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে তো পুনরায় স্ত্রী-সন্তান পাওয়া যাবে, আর যদি আমরা নিহত হই, তাহলে সসম্মানে নিশ্চিন্তে মরতে পারব।

ইহুদিরা এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল। বলল, জয়-পরাজয় তো ভাগ্যের লিখন। তবে কেন আমরা আগেই আমাদের স্ত্রী-পরিজনকে হত্যা করব?

এবার কাব তার তৃতীয় প্রস্তাব পেশ করল, যদি তোমরা এটাও অস্বীকার করো, তবে আমার তৃতীয় প্রস্তাব হলো, এমন একটা উপায় বের করো, যেন সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। আমার মতে শনিবার যেহেতু আমরা যুদ্ধবিগ্রহ হতে বিরত থাকি, যেহেতু মুসলিমরা এই দিন আমাদের দিক থেকে উদাসীন থাকবে। এ সুযোগে আমরা শনিবার দিনে বা রাতে তাদের ফাঁদে ফেলে দেবো। এতে করে আমরা তাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করতে পারব, কিন্তু ইহুদিরা তার এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল। তাদের ভাষায়, আমরা আমাদের পবিত্র দিনকে অসম্মান করতে পারব না।

এবার কাব ইবনে উসাইদের নীরব হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকল না। সে তো নিজের সব প্রস্তাবই পেশ করেছে। কিন্তু তার লোকেরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে। সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচলে পড়ে তার হৃদয়ের গভীরে বিশাল দুঃখ-বেদনার ঝড় বইতে শুরু করল। সে বুঝতে পারছিল না যে, এখন তাদের কী পরিণতি হবে। বারবার সে সেই অশুভ সময়ের প্রতি অভিশাপ করছিল, যখন সে বাতিলের প্রচণ্ড দাপট ও জাঁকজমক দেখে ইসলামের শক্তিকে হেয় করেছিল, মুসলিমদের সঙ্গে কৃত সন্ধিচুক্তি ভেঙে কাফেরদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তখন যদি সে এবং তার গোত্র চুক্তিভঙ্গ না করত, তাহলে আজ তাদের এমন অবস্থা হতো না। এখন আর হা-হুতাশেই-বা কী হবে? ফেলে আসা সময় কি আর পুনরায় ফিরিয়ে আনা যায়? এখন তো মাথার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সেই পানিতে তলিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচার উপায় খোঁজাই এখন একমাত্র কাজ। শুধু কাব ইবনে উসাইদই নয়, তার পুরো গোত্রই নিজেদের পাপের পরিণামে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। যেকোনোভাবেই হোক, নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি থেকে বাঁচার পথ খুঁজছিল।

ইহুদিদের সন্ধিপ্রস্তাব

অনেক চিন্তাভাবনা ও শলা-পরামর্শের পরে ইহুদিদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবি সাদ ইবনে মুআজ আনসারি রা.-এর কাঁধে তাদের বিচারের ভার ন্যস্ত করেন, তাহলে তারা আত্মসমর্পণ করবে। সাদ ইবনে মুআজ রা. ছিলেন আউস গোত্রের সর্দার এবং তাদের পুরোনো মিত্র। তাই বনু কুরাইজার লোকেরা ভাবল, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহলে তো তাদের সৌভাগ্যের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকবে না। অবশেষে এই প্রস্তাব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সবসময়ই চাইতেন, কীভাবে যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি ও রক্তপাত হতে দূরে থাকা যায়। বনু কুরাইজার এই প্রস্তাব পেয়েই তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করে নিলেন। এ খবর শুনে ইহুদিদের অলিগলিতে যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। কারণ, সিদ্ধান্তের ভার যখন তাদের পুরোনো দিনের বন্ধুর কাঁধে, তখন আর চিন্তা কীসের?

সাদ ইবনে মুআজ রা.-এর সততা

মদিনার আনসার সাহাবিরা যখন জানতে পারলেন যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইহুদিদের প্রস্তাব এসেছে, তখন আউস গোত্রের কিছু লোক এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করলেন, ইসলামপূর্ব যুগে যখন আমাদের এবং খাজরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ হতো, তখন বনু কুরাইজা আমাদের সহযোগিতা করত। ইতিপূর্বে খাজরাজের এক ব্যক্তির সিদ্ধান্তমতে আপনি বনু কাইনুকা গোত্রকে হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই এবার বিচারক বা মীমাংসাকারী হিসাবে আমাদের আউস গোত্রের কাউকে নির্বাচন করুন। জবাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো আগে থেকেই তোমাদের সর্দার সাদ ইবনে মুআজকে বিচারক হিসাবে নির্বাচন করেছি। আনসার সাহাবিরা এ কথা শুনে যারপরনাই আনন্দিত হলেন।

সাদ ইবনে মুআজ রা. খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। এই মুহূর্তে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাই কোনো একটা বাহনে করে তাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত করা হলো। রাস্তা দিয়ে

আসার সময় মানুষ তাকে সম্বোধন করে বলছিল, সাদ, পুরোনো দিনের বন্ধুদের বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি রক্ষার এটাই তো সুবর্ণ সুযোগ। সারা পৃথিবী আজ দেখবে বন্ধুর প্রতি বন্ধু কতটা সহমর্মী ও কল্যাণকামী হয়। প্রত্যুত্তরে সাদ রা. শুধু একটাই জবাব দিচ্ছিলেন, আমি আমার বিবেক-বোধের আলোকেই ফয়সালা করব। কারও প্রতি একরত্তি ছাড়ও দেবো না।

বনু কুরাইজার এখনো বিশ্বাস ছিল যে, সাদ রা. তাদের সঙ্গে তাদের ধারণাতীত বন্ধুত্ব ও সৌহার্দের আচরণ করবেন। কিন্তু কে জানত যে, আল্লাহর এই প্রিয় বান্দা যা-কিছু বলবেন, নিজের বিবেক-বোধের আলোকেই বলবেন। যা-কিছু করবেন, সততার মূলনীতির আলোকেই করবেন। তার সিদ্ধান্তে ইহুদিদের আশার গুড়ে যেন কেউ বালি ফেলে দিলো।

সাদ ইবনে মুআজ রা.-এর রায়

যখন সাদ ইবনে মুআজ রা.-এর বাহন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে পৌঁছল, তখন তিনি সাহাবিদেরকে তার অভ্যর্থনার আদেশ দিলেন। সাদ ইবনে মুআজ রা.-কে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হলো। তারপর বনু কুরাইজার ইহুদিদের উপস্থিতিতেই তাকে মীমাংসাকারী হিসাবে মনোনীত করা হলো। সাদ রা. প্রথমেই দু-পক্ষকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা কি আমাকে মীমাংসাকারী হিসাবে মেনে নিয়েছ? দু-পক্ষই ইতিবাচক জবাব দিলো। এবার তিনি ইহুদিদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা আল্লাহকে হাজির-নাজির (সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা) জেনে সবার সামনে এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আমি এখন যে সিদ্ধান্তই দেবো, চাই তা তোমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে হোক, তোমরা নির্দ্বিধায় তা মেনে নেবে এবং কোনোরূপ আপত্তি বা বিশৃঙ্খলা করবে না।

বনু কুরাইজার ইহুদিরা তার এই দাবি মেনে নিলো। এবার সাদ রা. নবীজির নিকট হতেও একই সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন।

লোকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ ছিল, বাতাস কোন দিকে বয় তা দেখার জন্য। ইহুদিদের বিশ্বাস ছিল, অবশ্যই তাদের পক্ষে উত্তম সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু তাদের সব আশাভরসা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল। মৃত্যুর আগেই যেন মৃত্যুর বিভীষিকা তাদের চেহারায় ছেয়ে গেল; যখন সাদের মুখ থেকে এই ঘোষণা উচ্চারিত হয়ে সারা মদিনার অলিগলিতে গুঞ্জরিত হতে শুরু করল, আমি রায় দিচ্ছি যে, বনু কুরাইজার সমস্ত যোদ্ধা পুরুষকে হত্যা করা হোক।

তাদের স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে যুদ্ধবন্দিদের ন্যায় আচরণ করা হোক এবং তাদের ধনসম্পদ মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হোক।[১২০]

রায়ের ওপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

এখন দু-পক্ষই নিজেদের কৃত অঙ্গীকারমতো এই রায়ের ওপর আমল করতে বাধ্য ছিল। ফলে সাদ ইবনে মুআজের এক আদেশে প্রায় চার শতাধিক ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। সম্ভাবনা রয়েছে যে, বর্তমান সময়ের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার করলে এই রায়ে চরম জুলুম-নির্দয়তা খুনোখুনির একটি চিত্র ফুটে উঠবে। কিন্তু আজকের এই আধুনিক পৃথিবীতে যা-কিছু হচ্ছে, তার দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলে এই রায়কে স্বাভাবিক মনে হবে। এই ব্যাপারে কারও বাগ্‌বিতণ্ডা বা কলম ধরার সুযোগ থাকবে না। এ ছাড়াও যদি মদিনার পুরো মুসলিম জনপদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের গভীর ষড়যন্ত্র, চুক্তিভঙ্গ করা, বিদ্রোহ উসকে দেওয়া, নারী ও শিশুদের ওপর গুপ্ত হামলা চালানো এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিষয়টিকে সামনে রাখা হয়, তাহলেও এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই বিচারের মাধ্যমে দেশ ও দেশের মানুষের শত্রু, যারা প্রতিনিয়ত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিল, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল, অসহায় নারী-শিশুরা পর্যন্ত যাদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি, তাদের থেকে তো দেশ ও দেশের মানুষ মুক্তি পেয়েছে।

হ্যাঁ, যদি এতে কারও ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকত, তাহলে হয়তো মানবতা, দয়া ও সহনশীলতার প্রতি লক্ষ রেখে এ কথা বলা যেত যে, কাজটা চরম অন্যায় হয়েছে। অথচ আমরা দেখেছি যে, এখানে এমন কিছুই হয়নি। যে ইসলামি ফৌজ নাঙ্গা তরবারি হাতে এসে বনু কুরাইজার দুর্গ অবরোধ করেছিল, তাদের না ছিল কোনো পার্থিব চাহিদা, না ছিল কোনো ব্যক্তিস্বার্থ। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল দ্বীনধর্মের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা। সাদ ইবনে মুআজের রায়ও ছিল রাষ্ট্রের কল্যাণ এবং ধর্মের সুরক্ষার তাগিদে। বনু কুরাইজার সঙ্গে তো তার পরম হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব ছিল। এ ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের তো প্রশ্নই আসে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তো বলা হয়, রহমাতুল লিল আলামিন। অর্থাৎ তিনি পুরো বিশ্বজগতের জন্য দয়া ও করুণার আধার। কতবার এমন হয়েছে যে, কঠিন শাস্তির উপযুক্ত চরম অপরাধীকেও তিনি পরম দয়া ও মমতায়

---

১২০. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৩/১৭১; *সহিহ বুখারি*, ৩০৪৩

ক্ষমা করে দিয়েছেন। একজন মমতাময়ী মা তো তার প্রিয় সন্তানের উহ-আহও সহ্য করতে পারেন না। তাহলে ওই ওপরওয়ালা তো মমতাময়ী মায়ের চেয়েও বড় বেশি দয়ালু, তিনি কি বান্দার প্রতি অবিচার করতে পারেন? তবে হ্যাঁ, তিনি ইনসাফ করেন। তিনি ইনসাফের আলোকে তাঁর পাপী বান্দাকে সাজা দেন। আপনি আগুন হাতে নেবেন তো হাত পুড়ে যাবে। কোনো উঁচু স্থান থেকে লাফ দেবেন তো আঘাত পাবেন। ডাক্তারের দেওয়া নির্দেশনার বিপরীতে আপনি ওষুধ সেবন করবেন, নিজস্ব রুচি ও পছন্দমতো চলাফেরা ও খাওয়াদাওয়া করবেন, এতে আপনার শরীর আরও অসুস্থ হলে কি চিকিৎসককে দায়ী করবেন? তাহলে যারা প্রতিশ্রুতি ও শিষ্টাচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদেরকে শাস্তি প্রদানে দোষ কোথায়? মদিনার ইহুদিরা মুসলিমদের সঙ্গে সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার চুক্তি করেছিল। কিন্তু যখন পুরো আরবের কুফরি শক্তি মুসলিমদের রক্তপিয়াসি হয়ে মদিনায় আক্রমণ করেছিল, প্রতিটি যুবক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ আর শিশুরা যখন জালিমের জালে আবদ্ধ, ঠিক তখনই এই ইহুদিরা নিজেদের চুক্তিভঙ্গ করে শত্রুবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ঘরে-বাইরে শত্রুর ঠাট্টা-বিদ্রুপ তখন প্রতিটি মুসলিমদের বুকে বিষতিরের ন্যায় বিঁধছিল। সৌহার্দ-সম্প্রীতি আর শান্তিচুক্তি কি তবে শুধু কাগজে লেখা ক-টি শব্দ ছিল? এই চুক্তি কি সেদিনের জন্য ছিল, যেদিন সারা পৃথিবীতে মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, দেশের মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করবে? না সেদিনের জন্য ছিল, যেদিন চতুর্দিক হতে জালেম তার হিংস্র দাঁত বের করে দানবের ন্যায় ধেয়ে আসবে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়বে? এমন যুদ্ধপরাধীরা কী কঠিন শাস্তির উপযুক্ত ছিল না?

বাস্তবতার আলোকে যদি এই পুরো বিষয়টিকে দেখা হয়, তাহলে সাদ ইবনে মুআজের রায়ের ব্যাপারে অতিরিক্ত কোনো পর্যালোচনারও প্রয়োজন পড়ে না। এটা যেমন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবেই ইনসাফ ও সততার মানদণ্ডে উন্নীত হয়েছে, তেমনই সময়োপযোগী একটি উত্তম সিদ্ধান্তও ছিল। এই ঐতিহাসিক রায় যেমন একত্ববাদের ধর্মকে চিরদিনের জন্য শক্তিশালী ও ধূর্ত এক শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ করেছে, তেমনই অন্যান্য শত্রুর হৃদয়েও ইসলামের প্রভাব বিস্তার করেছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর মানুষ এই সত্যটাও উপলব্ধি করতে পেরেছে, মুসলিম শুধু দয়া ও করুণাই দেখায় না, প্রয়োজনে কঠিন শাসনও করতে জানে। মুসলিম যেমন যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে নিজের প্রিয় মেহমানের চেয়েও ভালো আচরণ করে, তেমনই প্রয়োজনে শত্রুর দেহ থেকে

মাথা আলাদা করতেও দ্বিধা করে না। মুসলিম তো সত্যের অনুসারী। সত্যের বিপরীতে তার কাছে নিজের বা অপরের জীবনের কোনো মূল্য নেই। একজন প্রকৃত মুসলিম তো নিজের শরীরের রক্তের ফোঁটা দিয়ে সত্যের মূল্য পরিশোধ করতে জানে। তাহলে এই মুসলিম যদি তাদের বিচারের স্বার্থে শত্রুর শরীরের রক্ত দাবি করে, তাতে কারও আপত্তি বা কপাল কুঁচকানোর সুযোগ কোথায়?

নবীজির দয়া

এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে যারাই কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। আর তা হলো, তাঁর কথায় কাজে মিল ছিল। এই বিষয়টি এতটাই দুর্লভ যে, পৃথিবীর এই নাট্যশালায় কত-না মহান ক্ষণজন্মা মুনিঋষি ও জগৎজোড়া বিখ্যাত মনীষীরা অতিবাহিত হয়েছেন, তাদের জীবনীতেও এর তুলনা মেলা ভার। কিন্তু প্রিয় মুহাম্মাদের আঁচল এমন অনেক দুর্লভ মণি-মুক্তায় ভরপুর ছিল, যেগুলোর আলোয় সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণুই আলোকিত হতে পারবে।

ইসলাম যতটা দয়া, সহমর্মিতা ও সভ্যতা-ভদ্রতার কথা বলে, অন্য ধর্মের গ্রন্থগুলোতে তা খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাণের দুশমনের সঙ্গেও দয়া ও সহমর্মিতার আচরণ করা এমনই এক দুর্লভ গুণ, যা দুঃসাহসী ও রাজ্যের পর রাজ্য বিজয় করা কোনো সেনাপতির জীবনীতে পাওয়া তো দূরের কথা, শান্তি-নিরাপত্তা ও সৌহার্দ-সম্প্রীতির বুলি আওড়ায় যারা, তাদের জীবনেও খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু ইসলামের নবী তাঁর শিক্ষা ও কর্মের মাধ্যমে প্রাণের দুশমনের সঙ্গেও যথাসম্ভব দয়া, সৌহার্দ ও সুন্দর আচরণের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমি এখানে তাঁর দয়া ও উত্তম শিষ্টাচারের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

ছুমামা ইবনে উছালের ইসলামপ্রীতি

ইয়ামেনের ইয়ামামা এলাকার একজন সর্দার ছুমামা ইবনে উছাল ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার কুরাইশরা ইয়ামামা হতে তাদের খাদ্য আমদানি করত। ছুমামা ইবনে উছাল রা. মদিনা থেকে দেশে ফিরে মক্কায় খাদ্য রপ্তানি বন্ধ করে দিলেন। এদিকে খাদ্যের অভাবে মক্কাবাসী চরম কষ্টের সম্মুখীন হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যখন এই সংবাদ পৌছল,

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুমামা ইবনে উছাল রা.-কে মক্কায় খাদ্য রপ্তানির আদেশ দিয়ে পত্র লিখলেন।[১২১]

এ কথা তো বলাই বাহুল্য যে, মক্কার কুরাইশরা কতটা ইসলামবিরোধী ছিল। যে শত্রুর ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে পুরো আরবে বছরের পর বছর ধরে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগেছিল, পৃথিবীর বুক হতে ইসলামের নামচিহ্ন মুছে দিতে যারা নিজেদের সর্বস্ব ব্যয় করেছিল, নবীজির দেহ মুবারক থেকে পবিত্র মাথাকে আলাদা করার জন্য যারা মহামূল্যবান পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছিল, নবীজির চাচার বুক চিরে কলিজা বের করে যারা চিবিয়েছিল, বর্শা নিক্ষেপ করে যারা নবীজির প্রিয় কন্যার গর্ভপাত ঘটিয়েছিল, ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতিসাধনে যারা কোনো সুযোগই হাতছাড়া করেনি। সেই প্রাণের দুশমনদের সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন দয়া ও সহমর্মিতার আচরণকে আধুনিক বিশ্বের তথাকথিত শিক্ষা ও সভ্যতার দাবিদার রাষ্ট্রগুলোর নির্লজ্জ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে দেখুন! ১৯১৪ সালের সেই ভয়াল বিশ্বযুদ্ধের সময় একে অপরকে খাদ্য-পানি থেকে বঞ্চিত করতে কি-না করেছিল।

প্রিয় পাঠক, একটু ভাবুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের প্রতি কতটা দয়ার্দ্র ছিলেন। তাঁর যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সৈন্যবাহিনী গঠন করা ক্ষমতা অর্জন বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কত উর্ধ্বে ছিল! যা বর্তমান সময়ের সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী শক্তিগুলোর এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সফলতা অর্জন করে এ ধরনের মানবতাবিরোধী কাজ হতে বিরত থাকতেন। অথচ এমন মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড বর্তমান সময়ের যুদ্ধগুলোর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পঞ্চম হিজরির আরও কিছু প্রসিদ্ধ ঘটনা

যুদ্ধবিগ্রহ হতে দূরে থাকার সুযোগ মুসলিমদের খুব কমই হয়েছিল। ঘরে-বাইরে শত্রুরা সবসময় ওত পেতে থাকত। শত্রুর আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র হতে দেশ-জাতিকে নিরাপদ রাখতে মুসলিমদের সবসময় তরবারি হাতে প্রস্তুত থাকতে হতো। এ বছর আহজাবের যুদ্ধ ছাড়াও আরও কিছু স্থানে মুসলিমদের সৈন্যবাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন হলো। কারণ, মরু-আরবের

---

[১২১]. *জাদুল মাআদ*, ৩/২৫১; *সহিহ বুখারি*, ৪৩৭২; *সহিহ মুসলিম*, ১৭৬৪; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৪/৪৯২

প্রতিটি ভূমিই মুসলিমদের রক্তের প্রতি লালায়িত ছিল। তবে এই বছর আর এমন কোনো প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, যা এখানে উল্লেখ করা যায়। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধ ছাড়াও এই বছর আরও কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের অবগতির জন্য যা এখানে উল্লেখ করছি।

পর্দার চিমনিতে সতীত্বের চেরাগ

এতদিন মুসলিম নারীরা চেহারা অনাবৃত রেখেই বাজারে যেতে পারতেন। কিন্তু এই বছর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলো। সকলকে তাই এই নির্দেশ দেওয়া হলো যে, আজ হতে পর্দাবৃত না হয়ে কোনো নারী যেন বাইরে না আসে। এতে করে নারীদের সৌন্দর্যে আরও বেশি চাঁদের জোছনা যুক্ত হলো এবং জনসাধারণের কাছে তাদের সম্মান ও অবস্থান আরও বৃদ্ধি হলো।

তায়াম্মুমের বৈধতা

পঞ্চম হিজরিতে অবতীর্ণ বিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম বিধান হলো তায়াম্মুমের বিধান। ইসলামের বীর মুজাহিদরা যখন বনি মুসতালিকের যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফিরছিলেন, তখন এক স্থানে এসে পানি শেষ হয়ে গেল। একদিকে সুবহে সাদিকের বেশি দেরি নেই, অন্যদিকে দয়াবান প্রভুর প্রেমিক বান্দাদের হৃদয়েও ভালোবাসার বিশাল সমুদ্রে ঢেউ উঠতে শুরু করল। ওপরওয়ালার ওই সুমহান দরবারে সেজদায় নিজেকে উৎসর্গ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠল প্রেমিক হৃদয়। কিন্তু হায়! অজু করার জন্য যে কোথাও এক ফোঁটা পানি নেই! বনজঙ্গলের প্রতিটি স্থান তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। কোথাও পানির দেখা মিলল না। প্রেমিক হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখে অদৃশ্যের ওই মালিক তাঁর প্রিয় বন্ধুর নিকটে তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল করে মুসলিমদের সমস্যার সমাধান করলেন।

অপবাদের সাজা

এই বছরই কোনো সতীসাধ্বী নারীর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়। তদ্রূপ কোনো সচ্চরিত্রবান, নেককার ও মুত্তাকি ব্যক্তির চরিত্রে যদি কেউ অপবাদের কালি লাগায়, তার জন্যও শাস্তিস্বরূপ ৮০ বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়। যাতে করে কোনো দুশ্চরিত্র, বজ্জাত ও আত্মপূজারি ব্যক্তি কোনো সতীসাধ্বী নারী বা সচ্চরিত্রবান পুরুষের ওপর অপবাদ আরোপের পূর্বে ভেবে দেখে যে, পৃথিবীতেই এর পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে। এটা তো শুধু এপারের শাস্তি। ওপারে যে তার

জন্য কতটা মর্মন্তুদ শাস্তি অপেক্ষা করছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এর দ্বারা পৃথিবীর প্রতিটা মিথ্যাবাদী ও দুশ্চরিত্রবান ব্যক্তি যেন এই কথা ভুলে না যায় যে, চাঁদের দিকে যে ব্যক্তি মাটি নিক্ষেপ করে, সে তো চাঁদের বুকে কলঙ্ক লাগাতে পারেই না, উলটো নিজেই সমাজের কাছে নিন্দিত ও কলঙ্কিত হয়ে যায়।

জয়নাব রা. ও একটি ভুলের সংশোধন

এই বছর একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটল। বিষয়টি না বোঝার কারণে আরবের কাফের-মুশরিকদের একটি নির্বোধ দল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব নিন্দা করল। যার কারণে আজও ইসলামের শত্রুরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূতপবিত্র ও সূচি-শুভ্র চরিত্রকে কলঙ্ক ও অপবাদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে রেখেছে। দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট সেই বিষয়ের ওপর হতে আজ আমরা ভুল ধারণা ও মিথ্যার সেই আবরণ ওঠানোর চেষ্টা করব, যার কারণে এই বিষয়টি দুর্বোধ্য ও জটিল আকার ধারণ করেছে।

যায়েদ রা.। পুরো নাম যায়েদ ইবনে হারেসা। নবীজির একান্ত কাছের এক সাহাবি। একসময় ক্রীতদাস ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্ত করে শুধু নিজ ঘরেই নয়, হৃদয়ের বসতঘরেও জায়গা দিয়েছিলেন। যায়েদ রা.-কে তিনি পুত্রের মর্যাদা দিলেন, নবীজির একজন ফুফাতো বোন ছিলেন জয়নাব বিনতে জাহাশ রা.। যার সৌন্দর্যে চাঁদ-সূর্যও বুঝি লজ্জা পায়। দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক সৌন্দর্যেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যায়েদ রা.-এর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিলেন। যেহেতু একসময় যায়েদ রা. ক্রীতদাস ছিলেন, তাই স্ত্রী জয়নাব রা. তাকে মেনে নিতে পারছিলেন না। নববধূর ঘৃণা আর অবহেলা যায়েদেরও সহ্যের বাইরে ছিল। যে কারণে দুটি মনের ভালোবাসা কখনো এক হতে পারেনি। ফোটেনি তাদের হৃদয়ের বাগানে কোনো ভালোবাসার ফুল। দিনরাত প্রতিনিয়ত একের প্রতি অপরের মান-অভিমান ও অযত্ন-অবহেলায় দাম্পত্যজীবন বিষিয়ে উঠেছিল। অবশেষে যায়েদ রা. সইতে না পেরে জয়নাব রা.-কে তালাক দিয়ে দিলেন। কতই-না উৎকৃষ্ট ও কল্যাণপ্রসূ ইসলামের ওই বিধানটি যার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ে বিষিয়ে ওঠা দুটি হৃদয় মুক্তি পেয়েছে। যায়েদের হৃদয়ে হয়তো স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার চারাগাছ জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীর অযত্ন আর অবহেলা

তার জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। তাই তো তালাক দেওয়া ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালোবাসাটা ঐচ্ছিক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা অনৈচ্ছিক। ভালোবাসাকে তখনই আইনের বেড়াজালে বন্দি করা যায়, যখন তা বিবেক-বোধের অধীন থাকে। কিন্তু যে ভালোবাসা স্বাধীন হতে চায়, ডানা মেলে মুক্ত আকাশে উড়তে চায়, তাকে কীভাবে আইনের বেড়াজালে বন্দি করা যায়? কে জানে, হয়তো যায়েদ রা.-কে জয়নাব রা. এই কারণেই ভালোবাসতে পারছিলেন না যে, তার হৃদয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের সঙ্গে বাঁধা ছিল। কে জানে, হয়তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জনের জন্য তার হৃদয়ের গহিনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঢেউ খেলছিল। আর ১০ জন নারীর ন্যায় তিনিও তো একজন নারীই ছিলেন। তারও তো একটি সুন্দর হৃদয় ছিল। হৃদয়ের গভীরে কারও জন্য ভালোবাসার মালা গাঁথা ছিল। তাহলে কী করে সেই হৃদয়ে অন্য কারও জন্য ভালোবাসার ফুল ফুটবে? এই কারণেই যায়েদ রা.-এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরও তাকে ভালোবাসতে পারেননি, বরং তার প্রতি একটা অভক্তি ও ঘৃণা ভাব তৈরি হয়েছিল। যায়েদ রা.-এর ক্রীতদাস হওয়া অথবা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তীব্র ভালোবাসা, কিংবা এই দুটিই ছিল যায়েদের প্রতি তার অবহেলার কারণ। আল্লাহই জানেন বাস্তবতা কী! তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পরে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁর সৌভাগ্যবান স্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিধান্বিত ছিলেন। কারণ, এটা ছিল আরবদের প্রথাবিরোধী। লোকেরা বলাবলি করবে যে মুহাম্মাদ নিজের পুত্রবধূকে বিবাহ করেছে। জয়নাব রা. পুনরায় গভীর আকুলতায় নিবেদন করলেন, যায়েদের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। তবুও শুধুই আপনার ইচ্ছা পূরণার্থে আমি তাকে বিয়ে করেছি। এখন আপনি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন। তার কথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

জয়নাবের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে যায়েদের কাছে বিয়ে দেওয়ার পরিণাম কী হয়েছে, তা তো তিনি দেখেছেন। এখন একই কাজ যদি পুনরায় করা হয়, তবে কে জানে, হয়তো তার অবস্থা পূর্বের চেয়েও দুঃখজনক হবে। অন্যদিকে তার আবেদনমতে তাকে বিয়ে করলেও তিনি আরবদের সমালোচনার পাত্র হবেন। বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি এক আশ্চর্যধরনের

অস্থিরতায় ছিলেন। অবশেষে দুশ্চিন্তার আঁধার কেটে প্রশান্তির আলো ছড়িয়ে পড়ল। মহান আল্লাহই ওহির মাধ্যমে এই উভয় সংকটের সমাধান করে দিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় জয়নাব রা. নবীজির স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করে নিজের ব্যাকুল হৃদয়ে কূল খুঁজে পেলেন।

প্রাচীন কাল থেকেই আরবরা তাদের পালকপুত্রের স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা চরম গুনাহের কাজ মনে করত। কিন্তু মহান আল্লাহ যেহেতু পৃথিবীর বুকে তাঁর নতুন বিধান চালু করতে চাইছিলেন, তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার আদেশ দিয়ে নতুন নিয়মের গোড়াপত্তন করলেন। সামাজিক বিধিনিষেধ ও দেশের প্রচলিত রীতি-রেওয়াজকে উপেক্ষা করে নিজের পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করাতে তো কোনো দোষের কিছু নেই। পালকপুত্রকে নিজের ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় পূর্ণ মায়া-মহব্বত ও আদর-স্নেহ করা যেতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্ককে রক্তের সম্পর্কে রূপ দেওয়া মানবিক স্বভাব ও শক্তির বাইরে। এটা তো সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাধীন। অপরিচিত কাউকে নিজের ছেলে দাবি করলে হয়তো পুত্রের মর্যাদা পেতে পারে কিন্তু রক্তসম্পর্কীয় পুত্র তো আর মুখের কথায় বানানো সম্ভব না!

প্রিয় পাঠক! ধরে নিন কোনো এক রূপসি আপনার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আপনার হৃদয়রাজ্যকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ করে দিলো। অত্যন্ত আগ্রহ ও আকুলতায় বাসরঘরে গিয়ে যখন আপনি নববধূর চেহারা থেকে আবরণ সরালেন, গভীর ভালোবাসায় তাকে দেখতেই আপনি চমকে উঠলেন, আরে! এ তো সেই সুন্দরী, আজ থেকে ছয় বছর পূর্বে অমুক বাগানে যাকে আমি দেখেছি। টাঙ্গায় আরোহণ করতে গিয়ে তার সুন্দর হাতপাখাটি হাত থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে আমি কুড়িয়ে নিয়ে—বোন, আপনার হাতপাখাটি নিয়ে যান বলে তাকে ফেরত দিয়েছিলাম। স্পষ্টভাবে আপনার পুরো ঘটনা মনে আছে। সেদিনের সেই সুন্দর চেহারায় আজ হয়তো যৌবনের রং লেগেছে। নিষ্পাপ-মায়াবী দুটি চোখের আকর্ষণীয় চাহনি হয়তো আপনাকে ধোঁকা দিতে পারে, কিন্তু আপনার বিবেক কি আপনাকে ধোঁকা দিতে পারে? সেদিনের সেই বোন বলে সম্বোধন করা সরলমতি বালিকাটি আজ আপনার আঁধার ঘরে আলো জ্বালতে এসেছে।

প্রিয় ভাই! বুকে হাত দিয়ে বলুন, এই মুহূর্তে আপনি কী করবেন? ছয় বছর পূর্বে যাকে মনের গভীর থেকেই বোন বলে সম্বোধন করেছেন, এখন বলুন আজ তাকে কী বলবেন?

এবার আসুন আরবের রীতি-রেওয়াজ নিয়ে কিছু কথা বলি। এটা তো এমন একটি বিষয়, যা গিরগিটির ন্যায় নিজের রং পরিবর্তন করে এবং চোরের ন্যায় ঢং পরিবর্তন করে। কোনো দেশের রীতিনীতিও সে দেশের সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। যেহেতু যুগের পরিবর্তনে শিক্ষা-সভ্যতার মাঝেও পরিবর্তন আসে, সেহেতু কোনো দেশে চিরকাল একই রীতিনীতি বহাল থাকতে হবে, এমন কথা খামখেয়ালি ছাড়া কিছুই নয়। বাস্তবতার সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। যে রীতিনীতি আর সংস্কৃতিকে আজ রাষ্ট্রের গর্ব ও অহংকার মনে করা হয়, এটা অসম্ভব কিছু নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে তাকে দেশের জন্য লজ্জাকর মনে করা হবে। মানুষ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রাচীন হিন্দুস্তানি নিয়মকানুন, হিন্দুধর্মের রসম-রেওয়াজ এবং মুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করুন। তবেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বের হিন্দুদের জীবনযাপন এবং বর্তমান সময়ের হিন্দুদের জীবনযাপনে তো আকাশপাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজন পশ্চিমা মেয়ের জন্য ছোটখাটো আঁটোসাঁটো পোশাকই তার ভদ্রতা ও সভ্যতার প্রমাণ বহন করে। অথচ তা একজন মুসলিম মেয়ের জন্য চরম লজ্জার কারণ হবে। হিন্দুস্তানের কোনো ভদ্র ঘরের মেয়ে যদি তার হবু-বরের সঙ্গে কোথাও গিয়ে নিভৃতে বসে খোশগল্প করে, সারা পৃথিবী তখন তার দিকে ভর্ৎসনার আঙুল তুলবে।[১২২] অথচ ইউরোপীয় সমাজের দৃষ্টিতে এই মেয়ে খুবই সাধারণ একটা কাজ করেছে। কোনো সন্দেহ বা তিরস্কারের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকানো মানে তাকে অপমান করা আর নিজেকে অসভ্য-বর্বর হিসাবে প্রমাণ করা।

সুতরাং এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, যে কাজ কোনো দেশ বা জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপরীত হয়, জরুরি নয় যে তা আসলেই মন্দ বা অযৌক্তিক হবে। এ রকম অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলো অনেক দেশ ও জাতির সংস্কৃতির বিপরীত। কিন্তু মানুষের বিবেক সেগুলোকে স্বাভাবিক বলে মনে করে।

এখানে আমাকে আরও একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তা হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসময় আরবদের রীতি-রেওয়াজের

---

১২২. এটা লেখকের সময়ের কথা। বর্তমানে উপমহাদেশেও পশ্চিমা অপসংস্কৃতি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে।-সম্পাদক

বিপরীতে নিজের পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কেন বিয়ে করলেন? আমার পূর্বের আলোচনাতেই এর উত্তর রয়েছে। আমি আবারও বলছি, কোনো পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা দোষের কিছু নয়। কারণ, সে তো আর ঔরসজাত সন্তান নয়। তা ছাড়া কোনো দেশের রীতিনীতি এবং বাস্তবতা ও সত্যতা, দুটি কি একই বস্তুর দুটি নাম! না ভিন্ন ভিন্ন দুটি বিষয়? মানুষ মনে করে, দেশের প্রচলিত রীতি-রেওয়াজ, তা যাইহোক, সম্পূর্ণ সত্যতা ও সভ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখন কেউ যদি বলে, তাহলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন আরবদের এই রীতি ভাঙতে গেলেন? তাহলে তাকে বলব, ভাই, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবদের এই একটি রীতিই ভাঙেননি বরং আরবদের ভুলেভরা অসংখ্য রীতি-সংস্কৃতির সংশোধনেই তাঁর পুরো জীবন কেটেছে। তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি, ধ্যানধারণা, আকিদা-বিশ্বাস ও উপাসনা-আরাধনা, সবকিছুর বিপরীতেই তো তিনি পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি বিশ্বব্যাপী এক বিপ্লব সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। অথচ মাত্র একটা রীতি-প্রথার বিরোধিতা করায় আপনারা মাতম শুরু করে দিয়েছেন! একজন দুনিয়াবিমুখ পূতপবিত্র হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির ওপর ঢের অপবাদ চাপিয়ে দিচ্ছেন! অথচ তিনি তো সমগ্র আরবে পরিবর্তনের এক জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন, দেশ ও সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিলেন।

ওপরের আলোচনাটুকু বাদ দিয়ে একজন মহান সংস্কারকের কল্পনা করা যায় কি? যিনি সমাজের প্রচলিত সকল রীতি-প্রথার অনুসরণ করবেন! সংশোধনের মানেই তো হলো, সমাজের যে ক্ষেত্রেই কোনো ভ্রান্তি রয়েছে, তা পরিবর্তন করে দেওয়া। চাই পৃথিবীর সূচনালগ্ন হতেই তার পূজা চলে আসুক না কেন। যে সমাজসংস্কারক নিজেই সমাজের সব রীতি-প্রথা মেনে চলে, তবে সে কীসের সংস্কারক? একজন সত্যিকার সমাজসংস্কারকের পুরো জীবনটাই তো তার জাতি ও সম্প্রদায়ের নিয়মকানুন ও রুচি-প্রকৃতির ভুলভ্রান্তিগুলো সংশোধনে ব্যয় হবে এবং জাতির সামনে তিনি যে নতুন জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করতে চাইছেন, তার আলোকে সর্বাগ্রে তিনি নিজের জীবনটাই ঢেলে সাজাবেন। জাতির নিস্পৃহ-নির্জীব দেহে তিনি যে নবপ্রাণের সঞ্চার করবেন, তার নিজের ভেতরেই সে প্রাণের ঝলমলে উপস্থিতি পরিলক্ষিত হবে। উন্নতি ও সমৃদ্ধির যে মহাসড়কে তিনি নিজের জাতিকে দেখতে চান, সে পথে তো আগে তাকে পা ফেলতে হবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা আদৌ (নাউজুবিল্লাহ) অনৈতিক বা চরিত্রহীনতা ছিল না, বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত সময়োপযোগী একটি সিদ্ধান্ত ছিল। তাই বিবেক-বোধ রয়েছে এমন যে-কারও পক্ষে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বৈধ কাজকে কলঙ্কিত করার কোনো সুযোগ নেই।

ষষ্ঠ হিজরি

কাফেরদের নির্লজ্জ কূটচালের একটা দৃষ্টান্ত

রণাঙ্গনে তরবারি হাতে তো আরবের মুশরিকরা কখনোই মুসলিমদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তবে হ্যাঁ, তাদের নির্লজ্জ কূটচালে মাঝেমধ্যেই মুসলিমরা চরমভাবে আক্রান্ত হয়েছে। রাতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে হামলা করা কোনো বীরত্ব নয়, এটা তো কাপুরুষতার চরম বহিঃপ্রকাশ। ধোঁকা ও প্রতারণার এক অভিশপ্ত দৃষ্টান্ত। বীরযোদ্ধা তো রণাঙ্গনে জানবাজি রেখে লড়াই করে। আর কাপুরুষ ঝোপঝাড়ে ওত পেতে বসে থাকে শিকারের আশায়। মুসলিমদেরকে পরাজিত করতে মুশরিকরা অনেকগুলো গোপন চাল চেলেছে। প্রতিনিয়তই এমন কোনো ঘটনা ঘটত, যাতে তারা মুসলিমদের দয়া-অনুগ্রহের বিনিময়ে সাপের বিষদাঁতের কামড় বসিয়ে শোধ করত। নিচে এ রকম দুটি ঘটনা উল্লেখ করব, যে দুটিতে ইসলামের শত্রুদের বিকৃত রুচি-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা লাভ করা যাবে।

উক্ল গোত্রের কিছু লোক উরাইনা নামক একটা উপত্যকায় বসবাস করত। একবার তারা মদিনায় এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অত্যন্ত আগ্রহভরে ইসলাম গ্রহণ করে। প্রকাশ্যে ইসলামের বিধিবিধান পালনের প্রতি তারা নিজেদেরকে খুব উৎসাহী ও সচেতন বলে প্রকাশ করত। কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের হৃদয়ে খুবই ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্রের আগুন চাপা দিয়ে রেখেছিল। এই কূটচক্রান্তের ছাইচাপা আগুনের স্ফুলিঙ্গ দাউদাউ করে জ্বালিয়ে ইসলামকে ছারখার করে দেওয়ার একটা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় বসেছিল। কিছুদিন মদিনায় অবস্থান করার পরে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, দুধ খেয়েই আমরা জীবনযাপন করি। আমরা গম খেয়ে অভ্যস্ত নই। মদিনায় এসে গম খাওয়ার কারণে আমাদের গায়ে খোসপাঁচড়া দেখা দিয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অভিযোগ শুনে পরম দয়া ও মমতায় তাদেরকে

কোবা এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত উটের চারণভূমি ছিল। এই শয়তানের দোসররা নিজেদের মনগড়া অভিযোগ করে নিজেদের জন্য যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে তারা খুব পরিতৃপ্ত হয়ে উটের দুধ পান করল। এভাবে কয়েকদিন খাওয়াদাওয়া করে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে এসে গেল তাদের সেই মোক্ষম সময়। এসে গেল দয়া ও অনুগ্রহের বিনিময়ে বিষছোবল মারার সেই কাঙ্ক্ষিত দিনক্ষণ। প্রথমেই তাদের আক্রমণের শিকার হয়ে নির্মমভাবে শহিদ হলেন নবীজির রাখাল ইয়াসার রা.। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাকে হত্যা করার পর তার বিকৃত লাশকে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গেল।

এমন মর্মান্তিক ঘটনা শোনার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরজ ইবনে খালেদ আলফাহরি রা.-এর নেতৃত্বে ২০ জন মুজাহিদের ছোট্ট একটি বাহিনীকে ওই শয়তানদের ধাওয়া করার জন্য প্রেরণ করলেন। তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওই অকৃতজ্ঞদের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং হাত-পা বেঁধে সবাইকে মদিনায় নিয়ে এলেন। সেখানে তাদের সঙ্গে তেমন আচরণই করা হলো, অত্যাচারী শ্রেণির সঙ্গে এবং কুৎসিত হৃদয়ের মানুষের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয়।

অকৃতজ্ঞতার আরও একটি দৃষ্টান্ত

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর সাহাবিদেরকে নিয়ে দুমাতুল জান্দালের যুদ্ধ হতে মদিনায় ফিরছিলেন, পথিমধ্যে উয়াইনা ইবনে হুসাইন নামক এক সর্দার নবীজির সঙ্গে দেখা করে আবেদন করলেন, রহমাতুল লিল আলামিন, যদি আপনি আমায় কিছু সাহায্য করেন, তাহলে দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হওয়া থেকে আমি এবং আমার স্ত্রী-পরিজন রক্ষা পাব। অনাবৃষ্টির কারণে আমার চারণভূমিতে পশুরা পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়া তো দূরের কথা, জীবন বাঁচানোর মতো ঘাসও সেখানে নেই। যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি আমার পশুগুলোকে আপনার সবুজ-শ্যামল চারণভূমিতে পাঠিয়ে দেবো।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুহূর্তও চিন্তা না করে তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। এই সর্দার দুবছর যাবৎ নবীজির দয়া-অনুগ্রহে ধন্য হলো। অবশেষে দয়া-অনুগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ সে নবীজির উটগুলোর ওপর

অতর্কিত হামলা করল। বনু গিফার গোত্রের এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গেল।[১২৩]

মুসলিমরা তরবারি হাতে তার পিছু ধাওয়া করল। এক সাহাবি এতে শাহাদাত বরণ করেন।

এই ধরনের আরও অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাসত্ত্বেও রহমাতুল লিল আলামিনের দরজা ধনী-গরিব, দাস-স্বাধীন, বড়-ছোট সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। ঠিক যেমন আকাশের অবারিত বারিধারার দয়া-অনুগ্রহ হতে শহর-গ্রাম, বনজঙ্গল, মরুপ্রান্তর আর নদীবন্দর কিছুই বাদ থাকে না।

* * *

---

১২৩. জাদুল মাআদ, ৩/২৩১

চতুর্থ পর্ব

হুদাইবিয়ার সন্ধি

উল্লেখ করার মতো মর্মস্পর্শী ছোট ছোট প্রায় ২০টি ঘটনা এবং ফাদাক ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়ে এখন আমি আপনাদের সামনে যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি উল্লেখ করব, আমার মতে তা ইসলামি ইতিহাসের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। এটা মূলত একটি সন্ধিচুক্তির ঘটনা। যা মক্কা থেকে এক মনজিল দূরত্বে[১২৪] অবস্থিত হুদাইবিয়া নামক একটি কূপের নিকটে মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। জায়গার নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এই সন্ধিচুক্তিকে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি নামে অভিহিত করা হয়।

হজের বিধান

আল্লাহর ঘরের দর্শন মানে প্রিয়তমের বাড়ি দর্শন করা। এটা সেই পুণ্যভূমি, যেখানে বড় বড় নবী-রাসুলদের কপাল মহান প্রভুর সামনে সেজদাবনত হয়েছিল। এই ঘর তো সেই ঈর্ষণীয় পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত, যে ভূমির অলিগলির ধূলিকণা মহান প্রভুর প্রিয়তম বন্ধুর পায়ের ধূলি ছোঁয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। নবী প্রেমিকদের জন্য তো এই ভূমির পবিত্র মাটিতে সেই ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি ছড়িয়ে রয়েছে, আকাশের ওই চাঁদ-সূর্যের জ্যোতির্ময় আলোও যার কাছে লজ্জিত হয়। চাঁদ-সূর্য তো শুধু এই পৃথিবীতে আলো বিলায়, কিন্তু প্রিয়তমের বাড়ির ধূলিকণা তো অসংখ্য হৃদয়রাজ্যকে শত-সহস্র চাঁদ-সূর্যের চেয়েও বেশি আলোকিত করে দেয়। জীবনে একবার, অন্তত একবার হলেও সামর্থ্য অনুযায়ী পবিত্র কাবাঘরের জিয়ারত করা প্রত্যেক মুসলিমদের ধর্মীয় দায়িত্ব। ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে নবম হিজরিতে পবিত্র হজ ফরজ হয়।

---

১২৪. মসজিদে হারাম থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার আর হারামের সীমানা থেকে হুদায়বিয়া ২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।-সম্পাদক

বাইতুল্লাহর পথে

তাওহিদের জ্যোতির্ময় প্রদীপ যদিও-বা শিরকের আঁধারে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বাইতুল্লাহ যদিও বাইতুল আসনাম (মূর্তির ঘর)-এ পরিণত হয়েছিল, তবুও আরবদের নিকট এই ঘরের সম্মান এতটুকু কমেনি। ইবাদতের পদ্ধতি যদিও পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু ইবাদতের প্রেম তখনও প্রতিটি মুশরিকহৃদয়ে জাগরূক ছিল। আরবের দিগ্‌দিগন্ত হতে প্রতি বছর অসংখ্য প্রেমিক ভালোবাসায় টইটম্বুর হৃদয় নিয়ে হাজির হতেন কাবাঘরের আঙিনায়। যে কপাল শুধু এক আল্লাহর সামনে সেজদাবনত হওয়ার কথা ছিল, সে কপাল অসংখ্য অসহায় ও অক্ষম মূর্তির সামনে অত্যন্ত অপদস্থতার সঙ্গে অবনত হয়ে আবার নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেত। কিন্তু আর কতদিন? যে ঘর ইবরাহিম আ.-এর ন্যায় আল্লাহর পরম একনিষ্ঠ ও সহনশীল বন্ধুর পদধূলি ছোঁয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, আল্লাহর এই পবিত্র ঘর প্রতিনিয়ত প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিল যেসব মানুষের, যারা নিজেদের মাথাকে এক আল্লাহর সুমহান দরবার ছাড়া অন্য কোনো দরবারে ঝোঁকানোর ন্যায় অপমান কখনো সহ্য করবে না। শিরকের প্রতিটি ধ্যানধারণাকেই যারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে। আরবের কপাল থেকে মূর্তিপূজার অভিশপ্ত দাগ ধুয়ে দিতে যারা সবকিছুকে উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। বাইতুল্লাহকে হাতে গড়া দেবতাদের নাপাকি হতে মুক্ত করতে যারা এতটুকু সময়ও বিলম্ব করবে না।

হজের মাস সন্নিকটে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবিদের নিকট হতে বাইতুল্লাহ দর্শনের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। মুহাজির সাহাবিরা একবাক্যে নিজেদের সম্মতি প্রকাশ করলেন। কারণ, নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে আজ কতদিন হলো তারা পরবাসী! নিজ বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয় দেখতে কার না মনে চায়? তাই তারা ফেলে আসা জন্মভূমিকে পুনরায় দুচোখভরে দেখতে নিদারুণ ব্যাকুল ছিলেন। মুহাজির সাহাবিরা ছাড়াও আনসার সাহাবিদের বড় একটি অংশও এই সৌভাগ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। অবশেষে প্রায় ১৪০০ সাহাবির এক বিশাল কাফেলা নবীজির নেতৃত্বে মদিনা হতে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করল। মক্কার কুরাইশরা যেন এই কাফেলাকে কোনো সামরিক ফৌজ মনে না করে সেইজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে সফর না করে। তবে হ্যাঁ, শুধু একটি কোষবদ্ধ তরবারি সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি আছে।

মক্কায় হইহুল্লোড়

একদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ১৪০০ সাহাবি ইহরামের কাপড় পরিহিত অবস্থায় কুরবানির উট ছাড়া যুদ্ধের কোনো সরঞ্জামই সঙ্গে আনেননি, অন্যদিকে কে যেন মক্কার অলিগলিতে এই সংবাদ রটিয়ে দিলো যে, মুহাম্মাদ তাঁর ১৪০০ সাহাবির বিশাল দুঃসাহসী বাহিনী নিয়ে মক্কা বিজয় করতে ছুটে আসছেন। বিদ্যুৎগতিতে এই খবর মক্কার আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়ল। কাফেরদের সারা শরীরে যেন আগুন লেগে গেল। তারা পেরেশান হয়ে এদিক-সেদিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আরবের প্রতিটি গোত্রের নিকট বার্তাবাহকের মাধ্যমে এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে কুরাইশদের ধ্বংস করতে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। এই সংবাদ শুনেই চতুর্দিক হতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন গোত্রের সৈনিকেরা কুরাইশদেরকে সাহায্য করার জন্য মক্কায় আসতে শুরু করল। মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত ইয়ালদাহ নামক স্থান কুরাইশদের বিশাল সৈন্যশিবিরে পরিণত হলো। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। প্রসিদ্ধ বীরযোদ্ধা খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে (তিনি তখনও মুসলিম হননি) একটি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান করে আলগামিম নামক স্থানে মুসলিমবাহিনীর মোকাবিলা করতে পাঠানো হলো। মোটকথা, একটা ভিত্তিহীন ও ভুয়া খবরে বড় ধরনের একটা হাঙ্গামা শুরু হলো।

জানতে পারলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

যেকোনোভাবেই হোক, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে পারলেন। তিনি খুজাআ গোত্রের বশির ইবনে সুফিয়ান নামক এক ব্যক্তিকে পুরো অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করলেন। বশির ইবনে সুফিয়ান আসফান নামক স্থান হতে মক্কার সমস্ত খবরাখবর জেনে এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। তিনি জানালেন, কুরাইশরা বেশ হাঙ্গামা বাধানোর সংকল্প নিয়েছে। পুরো মক্কায় হইচই শুরু হয়েছে। তাদের কথা হলো, মুসলিমরা যদি হজের উদ্দেশ্যেও মক্কায় আগমন করে, তবুও তাদেরকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফেলা একেকটি মনজিল[১২৫] সফর করতে করতে কুরাউল গামিমে এসে পৌছল। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ মুসলিমদের আকস্মিক আগমনের সংবাদ পেয়ে নিজের অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল যে, মক্কার কুরাইশদের মনে নিশ্চয় কোনো দুরভিসন্ধি আছে। কিন্তু তিনি যেহেতু কোনো যুদ্ধ বা লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে নয়, বরং হজের[১২৬] মহান দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে আগমন করেছেন, তাই তিনি যুদ্ধের বিষয়ে কিছু না ভেবে প্রশান্তচিত্তে পথচলা অব্যাহত রাখলেন।

হুদাইবিয়ার কূপে রহমতের ধারা

পবিত্র মক্কা নগরী হতে এক মনজিল দূরত্বে অবস্থিত হুদাইবিয়া নামক কূপের কাছে পৌছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফেলা যাত্রাবিরতি করল। সেখানে পানির খুব সংকট ছিল। কূপে খুব সামান্য পরিমাণ যে পানি ছিল, তা নিমেষে শেষ হয়ে গেল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একনিষ্ঠ অনুরাগী সাহাবিরা তাঁর কাছে প্রচণ্ড তৃষ্ণার অভিযোগ করলেন। তিনি বারা ইবনে আজেব রা.-কে নিজের তূণীর হতে একটা তির দিয়ে বললেন, এটাকে কূপে নিক্ষেপ করো। তির নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই নবীজির মুজেজায় কূপের নিচ থেকে এই পরিমাণ পানি নির্গত হতে শুরু করল যে, সকল সাহাবির জন্য তা যথেষ্ট হয়ে গেল।[১২৭]

কথিত বিজ্ঞানমনস্করা হয়তো আমার এই কথার ওপর নাক সিটকাবেন। এটাকে তারা আমার অন্ধবিশ্বাস বা কল্পনাপূজা বলে অভিহিত করবেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস হলো, আল্লাহর প্রিয় আশেক বান্দাদের শুধু চোখের ইশারাতেই এমন অস্বাভাবিক আধ্যাত্মিক শক্তি তৈরি হতে পারে, যা শুষ্ক মরুপ্রান্তরকেও ফুলে-ফলেভরা বাগানে পরিণত করতে পারে এবং সবুজ-শ্যামল উদ্যানকেও বিজন মরুপ্রান্তরে রূপান্তরিত করতে পারে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের যেহেতু এই ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশে আগ্রহ থাকে না এবং তাঁরা নিজেদের ভেতরের শক্তিকে গোপন রাখতেই বেশি পছন্দ করেন, তাই এমন আশ্চর্য ও অস্বাভাবিক ঘটনা কথিত বিজ্ঞানমনস্কদের দৃষ্টিতে খুব

---

১২৫. ভ্রমণপথের বিশ্রাম স্থান।-সম্পাদক

১২৬. ওমরা উদ্দেশ্য ছিল। লেখক হজের কথা লিখেছেন।-সম্পাদক

১২৭. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনে হিশাম*, ৩/২৩১-২৩২; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/১৬৯; *জাদুল মাআদ*, ৩/২৬২; *সহিহ বুখারি*, ২৭৩১

কমই পড়ে। আর এই কারণেই তারা যে বিষয়টিকে মানবিক জ্ঞানের আলোকে বুঝতে সক্ষম হয় না, সেটাকেই রূপকথার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। কিন্তু আজকের এই আধুনিক বিশ্বেও তো বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতেই এমন অনেক অস্বাভাবিকতা সুস্পষ্টভাবেই মানুষের সামনে প্রমাণিত হচ্ছে। তাহলে তো বিজ্ঞানেরও এই কথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, মানুষের ভেতরে এমন দুর্বোধ্য অসীম আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত রয়েছে, যদি তাকে জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-কণা তার ইশারায় চলবে। অচিরেই যখন আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেজা বিষয়ে আলোচনা করব, তখন এই রুহানি শক্তির বিষয়টি নিয়েও পূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত আলোচনা করব।

কুরাইশদের প্রতিনিধি

মক্কার কুরাইশরা যখন হুদাইবিয়ার প্রান্তরে মুসলিমদের অবস্থানের কথা শুনল, তখন তাদের আগমনের কারণ জানার জন্য একের পর এক দুজন প্রতিনিধিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করে। প্রথমজন হলো বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা খুজায়ি, আর দ্বিতীয়জন হলো মুলাইস ইবনে আলকামা কিনানি। বুদাইল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে পুরো বিষয়ে অবগত হয়ে প্রশান্তচিত্তে ফিরে গেল। ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে লক্ষ করে বলল, দেখো! মুসলিমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, বরং ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেছে। তাই তাদেরকে ওমরা করতে বাধা দেওয়া আদৌ ঠিক হবে না। কিন্তু কুরাইশরা তো এত তাড়াতাড়ি দমে যাওয়ার পাত্র নয়। বুদাইলের কথায় তারা শান্ত হতে পারল না। তারা বলল, যে উদ্দেশ্যেই আসুক, আমরা তাদেরকে মক্কায় ঢুকতে দেবো না। পুনরায় আহাছিস গোত্রের সর্দার হালিস ইবনে আলকামা কিনানিকে সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করল। তিনি যখন ইহরামের কাপড় পরিহিত অবস্থায় কুরবানির উট সঙ্গে নিয়ে আসা মুসলিমদেরকে দেখলেন, তখন নীরবে ফিরে চলে গেলেন। কুরাইশদের নিকট এসে বললেন, তোমরা কি পাগল হয়েছ? তারা তো ইহরামের কাপড় পরে কুরবানির উট সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছে। আমি তো তাদের কাছে যুদ্ধের কোনো সরঞ্জামও দেখিনি। শোনো, তোমাদের ন্যায় তাদের অন্তরে এতকিছু নেই। তাই তাদেরকে ওমরা করতে বাধা দেওয়া তোমাদের একেবারেই উচিত হবে না।

কুরাইশরা এবারও তাদেরই প্রেরিত প্রতিনিধিকে ধমক দিয়ে বলল, তুমি এসবের কী বুঝবে? কোনোভাবেই আমরা তাদেরকে শহরে প্রবেশ করতে দেবো না। তাদের কথা শুনে হালিস ইবনে আলকামা কিনানি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। গর্জন দিয়ে বললেন, কাউকে ওমরা করতে বাধা দেওয়ার তোমরা কে? মুসলিমরা তো শুধু ওমরার উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছে। এখন তোমরা যদি তাদেরকে শহরে ঢুকতে না দাও, তাহলে আমি আমার গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

কুরাইশরা দেখল এ তো ভারি মুসিবত! এখনই তাকে শান্ত করা দরকার। তাই হুংকার না দিয়ে এই বেদুইন সর্দারের রাগের আগুনকে তারা সৌহার্দ ও বন্ধুত্বের মিঠা পানি দিয়ে ঠান্ডা করল এবং ধীরে ধীরে তাকে বুঝিয়ে পুনরায় নিজেদের দলে ভেড়াল।

মক্কায় মুসলিমদের প্রতিনিধি

মক্কায় কুরাইশদের সার্বিক অবস্থা ও তাদের কুমতলব সম্পর্কে জানার জন্য খারাশ ইবনে উমাইয়া খুজায়ি রা.-কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় পাঠালেন, কিন্তু কুরাইশরা তার উট কেড়ে নিলো। তার সঙ্গে এমন রূঢ় আচরণ শুরু করল যে, তার জীবন বাঁচানোই দায় হয়ে পড়ল। হালিস ইবনে আলকামা কিনানির লোকেরা যদি কুরাইশদের বাধা না দিত, তাহলে মক্কার এই কাফের রাজত্বে হয়তো তার দেহ রক্ত আর বালিতে গড়াগড়ি খেত। সেখানকার রক্তপিপাসুদের কাছ থেকে কোনোক্রমে প্রাণটা বাঁচিয়ে তিনি যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে পৌঁছলেন, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কাউকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ, মুশরিকদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে উমর রা.-এর ন্যায় দুঃসাহসী ও বীরযোদ্ধাকে পাঠাতে চাইলেন। পরে মনে হলো, তার গোত্র বনু আদি ইবনে কাব-এর এমন কোনো লোক তো এখন শহরে নেই যে বিপদের সময় তাকে কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করবে। তাই তিনি উসমান রা.-কে এই কাজের দায়িত্ব দিলেন। কারণ, তার গোত্র বনু উমাইয়ার অনেক নেতৃস্থানীয় ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা এখনো শহরে আছে। শহরে প্রবেশ করতেই উসমান রা.-এর সঙ্গে তার গোত্রের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি আয়াল ইবনে সাইদ ইবনুল আস-এর দেখা হলো। তার হেফাজতে তিনি কুরাইশদের নিকট পৌঁছলেন এবং তাদেরকে শান্তির বার্তা শুনিয়ে কোনো যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই

শহরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু কুরাইশরা কবে কার কথা শুনেছে? তা ছাড়া ইসলামের সঙ্গে তো তাদের ধর্মীয় শত্রুতা ছিলই। তারা উসমান রা.-কে বলল, তুমি চাইলে একাকী বাইতুল্লাহ জিয়ারত করে যেতে পারো, কিন্তু হুদাইবিয়ায় অবস্থানরত এই বিশাল মুসলিমবাহিনীকে আমরা কখনো শহরে প্রবেশের অনুমতি দেবো না। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, এটা অসম্ভব যে, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমার অন্যান্য মুসলিম ভাইদেরকে ছাড়া একাকী কাবাঘরের তাওয়াফ করব। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্য মুসলিমদের কথা শুনেই কুরাইশরা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে নিজেদের আসল রূপ দেখাল। উসমান রা.-কে তারা গ্রেফতার করে ফেলল।

বাইয়াতে রিদওয়ান

এদিকে উসমানের আগমনের পথপানে চেয়ে থেকে মুসলিমদের দুচোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অথচ তিনি এখনো আসছেন না! এমতাবস্থায় কে যেন সংবাদ দিলো যে, কাফেররা উসমান রা.-কে শহিদ করে ফেলেছে। এমন জুলুম ও পৈশাচিক আচরণের কথা শুনে মুসলিমদের দুচোখ দিয়ে যেন প্রতিশোধের আগুন ঠিকরে পড়ছিল। তাদের মাথায় তখন একটাই চিন্তা, আমরা তো এসেছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে ওমরা পালন করে দেশে ফিরে যেতে, সন্ধির জন্য আমরা কী না করেছি? অথচ তারা আমাদের সন্ধির বার্তাবাহককে হত্যা করে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করেছে! ঠিক আছে। যদি তারা বন্ধুত্বের ভাষা না বোঝে, তাহলে আমরাও তাদের সঙ্গে তরবারির ভাষায় কথা বলতে রাজি আছি। রক্তেই যদি তারা এতটা লালায়িত হয়, তবে এসো, দেখি কতটা রক্তের স্বাদ নিতে পারো। উসমানের প্রতিটি ফোঁটা রক্তের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমাদের তরবারি কোষবন্দি হবে না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নিচে বসে সবার কাছ থেকে জিহাদের বাইয়াত নিলেন। সকল জানবাজ সাহাবি আল্লাহকে উপস্থিত জেনে এই সাক্ষ্য দিলেন যে, যদি তারা উসমানকে শহিদ করে, তাহলে আমরা আমাদের শরীরের একবিন্দু রক্ত বাকি থাকা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব। রণাঙ্গন থেকে আদৌ পিছু হটব না। যুদ্ধাস্ত্র আমাদের কাছে নেই তাতে কী? একটা অবিচল হৃদয় তো আছে। জালিমের তিরের সামনে পেতে দেওয়ার মতো একটা বুক তো আছে। কুরাইশদের বিশাল সৈন্যসামন্ত আর যুদ্ধাস্ত্র আমরা ভয় পাই না। আজ আমরা তাদের বুঝিয়ে

দেবো যে, একজন নিষ্পাপ-নিরপরাধ মানুষকে হত্যার পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে।

মুসলিমরা যখন নবীজির হাতে হাত দিয়ে উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার বাইয়াত নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই উসমান রা. কাফেরদের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে মুসলিমদের কাছে ফিরে এলেন, তার আগমনে মুসলিমদের শরীরে যেন প্রাণসঞ্চার হলো। যেন উসমান রা. তাদের কাছে কবর হতে উঠে এসেছেন।

উরওয়া ইবনে মাসউদকে দাঁতভাঙা জবাব

মক্কার কুরাইশরা বনু ছাকিফ গোত্রের সর্দার উরওয়া ইবনে মাসউদকে তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠাল। সে এসেই অত্যন্ত অপমানজনকভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলল, মুহাম্মাদ, তুমি এই সহায়সম্বলহীন বাহিনী নিয়ে মক্কা বিজয় করতে এসেছ? এরা তো কুরাইশের দুঃসাহসী পালোয়ানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখেই ময়দান ছেড়ে পালাবে। তোমাদের তো দেখছি কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁইও মিলবে না।

একত্ববাদে বিশ্বাসী সৈনিকদের সামনে তাদের প্রিয়তম নবীর সঙ্গে কেউ এমন অমর্যাদাকর কথা বলবে আর তারা তা নীরবে সহ্য করে নেবে, এটা কীভাবে সম্ভব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় বন্ধু আবু বকর রা. এগিয়ে এসে উরওয়া ইবনে মাসউদকে তার বেয়াদবির এমন দাঁতভাঙা জবাব দিলেন যে, সে চরম লজ্জিত ও হতভম্ব হয়ে বসে রইল। সে ভাবতেই পারেনি মুসলিমরা তাদের নবীকে এতটাই ভালোবাসে যে, প্রয়োজনে তারা তাদের প্রিয়তমের জন্য হাজারো প্রাণ উৎসর্গ করে দেবে, তবুও তাঁর ব্যাপারে সামান্য অমর্যাদাও সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। উরওয়া ইবনে মাসউদ যখন কিছুটা ধাতস্থ হলো, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ করে অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষায় বললেন, কুরাইশরা চরম ভুল ধারণায় রয়েছে। আমি তো যুদ্ধের জন্য আসিনি। আমার আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল কাবার জিয়ারত করা। প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকা তোমাদের সীমালঙ্ঘন ও আস্ফালন দেখে এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যদি তোমার গোত্র আমাকে আগমনের পুণ্যময় উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে বাধা দেয়, তাহলে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়াই করব। যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা অন্য কোনো নির্দেশ দেন।

একবার নিজের শিষ্টাচার লঙ্ঘনের যথোপযুক্ত জবাব পেয়েও উরওয়া ইবনে মাসউদের পুরোপুরি হুঁশ হয়নি। আচার-আচরণের পরিবর্তন আসেনি। তাই নিজেকে সংযত না করে আবারও সে একটি মারাত্মক বেয়াদবি করে বসল। নবীজির সঙ্গে যখন সে যুদ্ধের বিষয়াদি নিয়ে আলাপ করছিল তখন মাঝেমধ্যেই সে অতি উৎসাহ ও উত্তেজনায় হাত নাড়াতে নাড়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি মুবারকের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মুগিরা ইবনে শোবা রা. এই অসৌজন্যতা সহ্য করতে পারলেন না। কোষ হতে তরবারি বের করে তার হাতে আঘাত করে বললেন, শিষ্টাচার লঙ্ঘন করো না, ভদ্রভাবে কথা বলো।

এমন অপ্রত্যাশিত জবাবে উরওয়ার টনক নড়ল। এবার তার আচরণ পুরোপুরি সংশোধিত হলো। সে বুঝে গেল, আমি তো চরম ভুল ধারণায় ছিলাম। এই লোকগুলো তো কখনো তাদের নেতাকে ময়দানে একা ফেলে যাবে না। এরা তো তাদের নবীর ঘামের বিনিময়ে নিজেদের রক্ত বইয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না।

নবীজির সম্মান

উরওয়া ইবনে মাসউদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে বিদায় নিয়ে কুরাইশদের কাছে পৌঁছল। হুদাইবিয়ার ছোট্ট তাঁবুতে যা-কিছু সে শুনেছে, তাদেরকে তা শোনানোর চেষ্টা করল। তার হৃদয় যা-কিছু অনুভব করেছে, নিজ সঙ্গীদেরকেও তা অনুভব করানোর চেষ্টা করল। সে তাদেরকে লক্ষ করে বলল, ভাইয়েরা! আমি ইরান ও রোমের রাজপ্রাসাদের অত্যন্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ দরবার দেখেছি। কিন্তু এমন কোনো মহাপ্রতাপশালী ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী ব্যক্তিকে তার অধীনস্থদের কাছে এতটা প্রিয় ও মর্যাদাবান হতে দেখিনি, যতটা মর্যাদা এই নির্ধন নেতাকে তার অনুসারীরা দিতে প্রস্তুত থাকে। দেহ থেকে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হওয়াকে তারা হাসিমুখে মেনে নিতে পারে, কিন্তু তাদের প্রিয়তমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে তারা কখনো মেনে নিতে পারে না। তারা তাঁকে এতটাই ভালোবাসে যে, তাঁর অজুর পানিও জমিনে পড়তে দেয় না, হাতে নিয়ে তা তাদের চোখে-মুখে-বুকে লাগাতে থাকে। তিনি যখন কথা বলেন, তখন তারা খুবই মনোযোগের সঙ্গে শোনে। আদবের কারণে তাঁর চোখে চোখ রেখেও কখনো কথা বলে না। তাই আমার মতে যেভাবেই হোক, তাঁর সঙ্গে তোমাদের সন্ধি করাটাই শ্রেয় হবে। তিনি তো ওমরা করতে এসেছেন,

ভালোয় ভালোয় তোমরা তাঁকে ওমরা করতে দাও। নতুবা এর পরিণাম কিন্তু ভালো হবে না।

সুহাইল ইবনে আমরের আগমন

এবার কুরাইশরা অনেক শলা-পরামর্শ করে সুহাইল ইবনে আমরকে প্রতিনিধি মনোনীত করে মুসলিমদের কাছে প্রেরণ করল। উদ্দেশ্য, যেভাবেই হোক তিনি যেন মুসলিমদের এই বছর ওমরা পালন করতে বাধা দেন এবং দুপক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তির ব্যবস্থা করেন।

সুহাইল ইবনে আমর হুদাইবিয়ায় এসে পৌছলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের লক্ষ করে বললেন, এখন তো সুহাইল এসে গেছে, তাই বিষয়টাও সহল (সহজ) হয়ে গেছে। পরে ঠিক এমনই হয়েছিল। দুপক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি হয় এবং একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতে হতেই বন্ধ হয়ে যায়। যে শর্তগুলোর ওপর ভিত্তি করে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মুসলিমরা রক্তপাতে বিশ্বাসী নয়, বরং শান্তি ও সন্ধিচুক্তিই তাদের কাছে অধিক প্রিয় ছিল। কারণ, মক্কার কাফেররা তো তাদের ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন করতে বাধা দিচ্ছে। উচিত তো ছিল এর কঠিন জবাব দেওয়া। কিন্তু না, নবী তা করেননি। যেহেতু ধর্মীয় এই বিধান আগামী বছরও আদায় করা যাবে, তাই তিনি হানাহানি ও রক্তপাত না করাটাই শ্রেয় মনে করলেন। যেকোনোভাবেই হোক, সন্ধি করতে রাজি হলেন। এমনকি যে শর্তগুলোর ওপর ভিত্তি করে এই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেগুলো সুস্পষ্টভাবেই মুসলিমদের জন্য চরম লাঞ্ছনাকর হওয়া সত্ত্বেও।

আমি এখন আপনাদের সামনে হুদাইবিয়ায় অনুষ্ঠিত সেই সন্ধিচুক্তির শর্তগুলো উল্লেখ করছি, এগুলো পড়ার পরেও কি কেউ এই কথা বলতে পারবে যে, মুসলিমরা সন্ধিবান্ধব ও শান্তিপ্রিয় ছিল না?

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ

এক. মুসলিমরা যদিও এই বছর ওমরার উদ্দেশ্যে এসেছে, কিন্তু তারা এই বছর ওমরা না করেই ফিরে যাবে। আগামী বছর তারা পুনরায় ওমরার উদ্দেশ্যে আগমন করবে। তবে তখন তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসতে পারবে না। শুধু একটা কোষবদ্ধ তরবারি সঙ্গে থাকবে।

দুই. এই সন্ধিচুক্তির মেয়াদ হলো দশ বছর। এই সময়ের ভেতরে কেউ কারও জানমালের ওপর আক্রমণ করতে পারবে না।

তিন. দুপক্ষেরই এই অধিকার রয়েছে যে, তারা আরবের যেকোনো গোত্রের সঙ্গেই হোক, মৈত্রীচুক্তি করতে পারবে এবং আরবের অন্য গোত্রগুলোও এই দুপক্ষের যে-কারও দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবে। দুপক্ষের মতৈক্যে লিখিত চুক্তিগুলো তখন সেসব গোত্রকেও মানতে হবে।

চার. যদি কুরাইশদের কোনো লোক মক্কা হতে পলায়ন করে মদিনায় চলে যায়, তাহলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু মুসলিমদের কেউ যদি মক্কায় কুরাইশদের কাছে চলে যায়, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

মৈত্রীস্থাপনের প্রচণ্ড আগ্রহ

শান্তি ও সন্ধির নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের গহিনে শান্তি ও সন্ধি স্থাপনের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, তারই দুটি উদাহরণ হলো নিম্নে বর্ণিত ঘটনা। চুক্তি লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব আলি রা.-কে দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিয়মমাফিক শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লিখলেন। সুহাইল ইবনে আমর তাতে আপত্তি উত্থাপন করে বললেন, আরবের পুরোনো নিয়ম বিসমিকা আল্লাহুম্মা দিয়ে লেখা শুরু করো। কারণ, আমরা তো তোমাদের এসব ইসলামি নিয়মকানুন মানি না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আলি, তার কথাই থাকুক। তিনি যেভাবে বলেছেন, তুমি সেভাবেই লেখো।

আলি রা. আরবের পুরোনো নিয়ম অনুযায়ী বিসমিকা আল্লাহুম্মা লিখে দিলেন। অতঃপর সন্ধির শর্তগুলো লিখতে গিয়ে তিনি যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ লিখলেন, তখন সুহাইল এর ওপরও আপত্তি করে বললেন, মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ নয়, বরং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ লেখো। তোমাদের আর আমাদের মধ্যে এই নিয়েই তো এত দ্বন্দ্ব। যদি আমরাও তাঁকে রাসুল বলে মেনে নিতাম, তাহলে তো এত যুদ্ধবিগ্রহ আর সন্ধির প্রয়োজন হতো না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, সুহাইল, তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করো। অথচ আল্লাহর কসম! আমি একজন সত্য নবী। আলি, তুমি রাসুলুল্লাহ শব্দটি মুছে দিয়ে সেখানে ইবনে আবদুল্লাহ লিখে দাও। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের প্রতি তীব্র ভালোবাসার কারণে আলি রা. এই কথা মেনে নিতে পারছিলেন না যে, তিনি নিজ হাতে রাসুলুল্লাহ শব্দটি মুছে দেবেন! তাকে দ্বিধান্বিত দেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আমাকেই দেখিয়ে দাও ওই শব্দটি কোথায়? আমি নিজেই তা মুছে দেবো। আলি রা. নবীজির নির্দেশ পালন করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধির খাতিরে নিজেই তা মুছে দিলেন।

প্রিয় পাঠক, শান্তি ও কল্যাণ কামনার এমন বিরল দৃষ্টান্ত আপনি কোথায় খুঁজে পাবেন?

জুলুম-নিপীড়নের এক মর্মান্তিক উপাখ্যান

সন্ধিচুক্তির সকল কার্যক্রম সমাপ্ত হয়ে গেল। আরবের মরুপ্রান্তরের বিশাল শক্তিশালী দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের দামামা বাজা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিনের জন্য হলেও বাহ্যিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলো, কিন্তু আকস্মিক মুসলিমরা কাফেরদের জুলুম-নিপীড়নের এক মর্মান্তিক উপাখ্যান শুনতে পেল। খুবই অসহায় ও বিপদগ্রস্ত এক সাহাবি আবু জান্দাল রা. মক্কার কাফেরদের বন্দিশালা হতে পলায়ন করে মুসলিমদের কাছে আশ্রয়ের জন্য এলেন। তার অপরাধ শুধু এতটুকুই ছিল যে, তিনি বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামকে বুকে ধারণ করেছেন। এমন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তিনি কাফেরদের চরম জুলুম-নিপীড়নের শিকার হন। মজবুত শিকল দিয়ে বেঁধে তাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হয়। আঘাতে আঘাতে তার সারা শরীরে দাগ বসিয়ে দেওয়া হয়। নিজের জীবনের সেসব দুঃসহ কষ্টগুলো এখন মুসলিম ভাইদের নিকট বর্ণনা করে তাদের সাহায্য কামনা করলেন। তাদের আশ্রয় চাইলেন। বিপদাপদের অক্টোপাস ও জালিমের বন্দিশালা হতে কোনোক্রমে পালিয়ে এসেছেন নিজ ভাইদের কাছে। একটু শান্তিতে ঘুমানোর আশায়, স্বাধীনতার সুখ অনুভবের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু হায়! সন্ধির চতুর্থ শর্ত যে মুসলিমদের সাহায্য ও সহমর্মিতার হাত বেঁধে রেখেছে! কাফেরদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের বেড়াজালে আবদ্ধ মুসলিমরা পারছিল না শিকলে আবদ্ধ তাদের ভাই আবু জান্দালকে মুক্ত করতে। কারণ, এতে শর্ত লঙ্ঘন হবে। অন্যদিকে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া মানে একজন সত্যের প্রেমিককে মিথ্যা ও জুলুমের লক্ষ্যস্থল বানানো। প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়েই রক্তক্ষরণ শুরু হলো। সন্ধির মুহূর্তে যখন এই শর্তগুলো লেখা হচ্ছিল, তখনই তাদের মনে হয়েছিল যে, এগুলো তাদের জন্য চরম অপমানজনক। যা

কেউই মেনে নিতে পারছিল না। এই শর্ত মেনে নেওয়া মানে একজন বিপদগ্রস্তকে আরও বেশি বিপদে ফেলা। একজন মজলুমের ওপর আরও বেশি জুলুম করা। অসহায়ের আর্তনাদ শুনে নির্লিপ্ত থাকা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিষয়টি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু একটি ভয়ংকর রক্তাক্ত যুদ্ধে অসংখ্য মানুষের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে গড়াগড়ি করার চেয়ে একজন ব্যক্তির নিপীড়িত হওয়াকে তিনি মেনে নিতে বললেন। কারণ, এখন তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জান্দালের পিতা সুহাইল ইবনে আমরের কাছে বিনীতভাবে নিবেদন করলেন। বন্ধুর কাছে বন্ধুর নিবেদন করার মতো। যে নিবেদনে মনুষ্যত্বের শর্ত ছাড়া আর কোনো শর্ত থাকে না। তুমি আবু জান্দালকে আমাদের নিকট থাকতে দাও। এটা আমাদের ওপর তোমাদের দয়া হবে। এই অসহায়ের ওপর একটু দয়া করো। কিন্তু এই জালেম কোনো কথাই শুনল না, কোনো কথাই মানল না, বরং নিজের কলিজার টুকরোকে ধর্মত্যাগের অপরাধে প্রহার করতে করতে মক্কাভিমুখে চলে গেল। এমন অমানবিক জুলুম ও নির্দয় আচরণে প্রতিটি হৃদয়ে কতটা দুঃখ-বেদনার ঝড় বয়েছিল? কিন্তু তারা ছিলেন নিরুপায়। দয়া ও করুণার আধার তবে অস্ত্রশস্ত্রহীন বীরযোদ্ধা।

ক্ষুব্ধ উমর

একজন মুসলিম জুলুমের শিকলে বন্দি, মুসলিমরা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা আর অশ্রু বিসর্জন দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারছে না। উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ন্যায় এমন দুর্জয় বীরবাহাদুর এটা মেনে নিতে পারলেন না। তার ইসলামি মূল্যবোধ ও আত্মমর্যাদার গায়ে যেন আগুন ধরে গেল। ঘৃণা এবং রাগে তার সারা শরীরে যেন রক্ত টগবগ করতে লাগল। তিনি আহত বাঘের ন্যায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে হাজির হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন।

: আপনি কি সত্য নবী নন?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে আমি সত্য নবী।

উমর বললেন, আমরা কি মুসলিম না!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অবশ্যই তোমরা মুসলিম!

উমর বললেন, তারা কি মুশরিক নয়!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অবশ্যই তারা মুশরিক!

এবার উমর উত্তেজিত হয়ে বললেন, তাহলে দ্বীনের বিষয়ে কেন আমরা অপমান আর লাঞ্ছনা সহ্য করব? একজন মুসলিম চরম জুলুম-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে অথচ আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আর আফসোস করছি। এরচেয়ে বড় অপমান আর কী হতে পারে? এটা তাহলে কেমন ইনসাফ আর কেমন ইসলামি আত্মমর্যাদাবোধ?

উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সর্ববিষয়ে অবগত ও সর্বজ্ঞ মহান প্রভুর এটাই আদেশ। তাঁর আদেশ লঙ্ঘনের দুঃসাহস আমি দেখাতে পারব না। উমর, তুমি কী করে বুঝবে, এতে আল্লাহ তাআলার কী প্রজ্ঞা লুক্কায়িত আছে? আল্লাহর কৌশল বোঝার সাধ্য কার? তোমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দ্বারা অদূর ভবিষ্যৎ দেখা সম্ভব নয়। সম্ভবত আর কিছুদিন পরই এই অপমানজনক শর্তগুলোই তোমাদের কল্যাণ ও আনন্দের কারণ হবে। এখন যা-কিছুই হোক না কেন, আল্লাহর আদেশ থেকে আমি এক পা-ও পিছু হটতে পারব না। এখন এটাই আমাদের কর্তব্য। আশা করি এতেই আমাদের কল্যাণ রয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শেষ হতেই উমর রা. রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেলেন। কিন্তু একটু পরই যখন রাগ কমল এবং মস্তিষ্ক স্বাভাবিক হলো, তখন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায়-অনুতাপে হায় হায় করতে লাগলেন।[১২৮] আফসোস! আমার দেহ-মন যার জন্য কুরবান, যিনি আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী, পরম আপনজন, দুনিয়া-আখেরাতে আমার পথপ্রদর্শক, তাঁর সঙ্গে আমি এ কেমন আচরণ করলাম! এ কেমন দুঃসাহস দেখালাম! আমি তো তাঁর সঙ্গে এতটাই রাগান্বিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, মনে হচ্ছিল যেন দুনিয়ার যে বিষয়েরই যৌক্তিকতা বা বাস্তবতা আমার বুঝে না আসবে, তা আমি দুপায়ে মাড়িয়ে ফেলব! এ আমি কী করলাম!

পরবর্তী সময়ে সারা জীবন তিনি এই কাজের জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত এবং অস্থির ছিলেন। নবীজির কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। আল্লাহর পথে অনেক দান-সদকা করেন। তবুও এমন অসংলগ্ন আচরণের কথা স্মরণ হলেই তিনি অনুশোচনায় মাথা ঝুঁকিয়ে রাখতেন। দুচোখ টলটল করত অনুশোচনার অশ্রুতে। অনুতাপের জ্বালা ভেতরটা যেন কুরে কুরে খেত।

প্রিয় পাঠক, মনে রাখবেন, এভাবেই অন্তর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। হৃদয়টা আরও বেশি হৃদয়ের মালিকের কাছে যায়।

---

১২৮. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/১৭২; *জাদুল মাআদ*, ৩/২৬৬-২৬৭; *সহিহ বুখারি*, ২৭৩১-২৭৩২

সুস্পষ্ট বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধিটা বাহ্যিকভাবে মুসলিমরা খুবই অপমানজনকভাবে সম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু এর মাঝে যে আল্লাহ তাআলার গভীর একটা প্রজ্ঞা লুকিয়ে ছিল, তা বোঝার জন্য বা অনুধাবন করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো একজন সত্য নবীর মেধা ও বিবেকের প্রয়োজন। যেহেতু সাধারণ মুসলিমরা এই সন্ধিচুক্তিকে নিজেদের জন্য খুবই লাঞ্ছনাকর মনে করেছিল, তাই মহান দয়াময় প্রভু মুসলিমদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য একটি আয়াত নাজিল করলেন। যে আয়াতে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে করে কোনো কোনো মুসলিমের হৃদয়ের সকল সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয়ে গেল। কিন্তু এরপরও কেউ কেউ চিন্তিত ছিলেন। কিছুদিন পর ঘটে যাওয়া ঘটনা এ কথা প্রমাণ করে দিলো যে, বাস্তবেই 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' এক সুস্পষ্ট বিজয় ছিল। এর লজ্জাজনক শর্তগুলোর মাঝেই দেশ ও জাতির শান্তি, নিরাপত্তা ও সফলতার গূঢ় রহস্য লুক্কায়িত ছিল।

বিষয়টি নিয়ে যদি গভীর চিন্তা করা হয়, তাহলে সাধারণ মুসলিমরাও এই অপমানজনক হারকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে মনে করত। কারণ, ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্যই তো ছিল শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও সৌহার্দ-সম্প্রীতি স্থাপন করা। তিনি যদি নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, তাহলে অসংখ্য দেহ থেকে মাথা আলাদা হয়ে যেত। অগণিত মহিলা বিধবা ও শিশু এতিম হতো। কিন্তু তিনি তা করেননি, বরং অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে নিজের বিশাল বাহিনীর পরোয়া না করে তির-তরবারি ছাড়াই যে আশ্চর্যকর সফলতা অর্জন করেছেন, ইসলামের বীরযোদ্ধারা তির-তরবারির মাধ্যমেও তা অর্জন করতে পারতেন না। তা ছাড়া সন্ধির চতুর্থ শর্ত, অর্থাৎ মদিনা থেকে কেউ মক্কায় পালিয়ে গেলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না, আর মক্কার কেউ মদিনায় পালিয়ে এলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে, এই শর্ত বেশিদিন বহাল থাকেনি। কারণ, পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে স্বয়ং কুরাইশরাই তা রহিত করতে বাধ্য হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকছি। কারণ, এতেও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে।

সপ্তম হিজরি

খাইবারের ইহুদিদের ষড়যন্ত্র

মুসলিমরা যখন মক্কার কুরাইশদের দিক থেকে কিছুটা নিরাপদ হলো, তখন খাইবারের ইহুদিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে তারা কোমর বেঁধে মাঠে নামল। আরবের গোত্রগুলোকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করল। মূলত খন্দকের যুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর তাদের দাউদাউ করে জ্বলা হঠকারিতার আগুন ঠান্ডা হওয়ার পরিবর্তে আরও বেশি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে চারদিকে স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে লাগল। এবার তারা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল যে, তাওহিদের অনুসারীদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে তবেই তারা শান্ত হবে।

আহজাবের যুদ্ধেও তারা এমন বাঁচা-মরার শপথ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু অদৃশ্য পর্দার আড়ালে মুসলিমদের বিজয়ের জন্য এমন কিছু ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছিল যে, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে কবর দিয়ে খুবই করুণ অবস্থায় তাদের পালাতে হয়েছিল। এটা তাদের জন্য কম লজ্জার ছিল না। তারা বুঝতে পারল যে, তাদের বড় বেশি ক্ষতি হয়ে গেছে। এর উসুল উঠিয়ে নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলিমদের রক্ত দিয়ে নিজেদের ক্ষত পরিষ্কার করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আরবের আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন স্বাধীন জাতিগুলোর সামনে মুখ দেখাতে পারবে না।

পূর্বের ব্যর্থতাকে সামনে রেখে এবার তারা পুরোদমে যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করল। আরবের মরুভূমিতে বসবাসরত অনেক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত গোত্রের সঙ্গে তারা মৈত্রী স্থাপন করল। এমনকি মদিনার মুনাফেকদেরও তারা নিজেদের বাগে নিয়ে নিলো। তাদের মাধ্যমে মদিনা থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে অবস্থান করেও তারা মুসলিমদের সব খবরাখবর পেতে লাগল। ইসলামের শত্রুরা গোত্রের অভিজ্ঞ বীরযোদ্ধাদেরকে ইহুদিদের পতাকাতলে একত্র করছিল। এদিকে ভাগ্য তাদের পরাজয় দেখে মুখ টিপে হাসছিল। কতবার কতভাবেই-না সত্যের মজবুত পাথরের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে এই মিথ্যা নিজেদের মাথা ফাটিয়েছিল। তবুও তাদের হুঁশ ফেরেনি। সত্যের অনুসারীদের পেছনে তো সর্বশক্তিমান প্রভুর নির্ভরতার হাত রয়েছে। মিথ্যার অনুসারীরা তাদের সকল প্রকার উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা সত্ত্বেও সত্যের অনুসারীদের এক টোকাতেই তারা অতলে তলিয়ে যাবে।

খাইবারের মহান বিজয়

ইহুদিরা তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মুসলিমরা তাদের গোপন ভেদ সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়। মুসলিমবাহিনীর সিপাহসালার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের নিয়ে ইহুদিদের সমস্ত ষড়যন্ত্র নির্মূল করতে খাইবারে এসে পৌছলেন। খাইবারে ইহুদিদের প্রসিদ্ধ ছয়টি মজবুত ও অজেয় দুর্গ ছিল। কিন্তু মুসলিম বাহাদুররা খুব দ্রুতই নিজেদের ঈমানি শক্তি দিয়ে সেগুলো জয় করে নিলেন। এই যুদ্ধে ৯৩ জন ইহুদি এবং ১৫ জন মুসলিমের রক্তে আরবের মরুভূমি রঞ্জিত হলো। মুসলিমদের জন্য খাইবারের বিজয় ছিল এক মহাবিজয়। শত্রুও ধ্বংস হলো এবং মক্কায় সর্বস্ব ছেড়ে আসা মুহাজিরদেরও আগামী দিনের ব্যবসাবাণিজ্য ও সম্পদ উপার্জনের একটা মাধ্যম অর্জিত হলো। কারণ, খাইবার খুবই উর্বর ভূমি ছিল। পরাজিত ইহুদিরা তাদের অর্জিত ফসলের অর্ধেক প্রতি বছর করস্বরূপ দিতে সম্মত হয়ে সন্ধি করেছিল। যে কারণে খুব দ্রুতই মুসলিমরা উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই যুদ্ধে ফাদাক নামক একটি ভূমি যুদ্ধলব্ধ সম্পদস্বরূপ লাভ করেন। সেই ভূমির আয় দিয়ে তিনি নিজ পরিবার ও এতিম-বিধবাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন।

এই যুদ্ধেরও বিস্তারিত বিবরণ কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বাদ দিয়েছি, আসলে এই গ্রন্থটি রচনা করার উদ্দেশ্য রক্তস্নাত উপাখ্যানগুলো তুলে ধরা নয়; বরং দৃঢ়সংকল্প, সচ্চরিত্র ও সততার সেই মহান মূলনীতিগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরা উদ্দেশ্য, যেগুলোর ওপর আমল করে যেকোনো মানুষ মানমর্যাদা ও উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌছতে পারবে। বদর এবং উহুদযুদ্ধের আলোচনা এইজন্যই কিছুটা বিস্তারিত করা হয়েছে, যাতে সুহৃদ পাঠক ইসলামের যুদ্ধনীতি সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত হতে পারেন।

বিভিন্ন রাজাবাদশার উদ্দেশে নবীজির পত্র

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের মূল উদ্দেশ্যই তো দ্বীনের প্রচার-প্রসার করা। কিন্তু কখনো কখনো তাকে নিজের রাস্তা থেকে খড়কুটা সরানোর তাগিদে তরবারির ঝলকও দেখাতে হয়েছিল। আর স্বাভাবিকভাবেই এতে ইসলামের প্রচার-প্রসারে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। মিথ্যা যখন তার ফেরাউনি ফণা তুলে সত্যকে ছোবল মারতে চাইত, তখন নবীজি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ফণা তোলা মাথাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। আর যখন এই কাজ থেকে অবসর হতেন, তখন নিজের মন-মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তিই সত্যের দাওয়াত পৌছাতে নিবেদিত করে দিতেন। এখন যেহেতু তিনি কুফর ও মিথ্যার দাউদাউ করে জ্বলা আগুনকে ঠান্ডা করতে পেরেছেন, তাই তিনি আরবের বাইরের শক্তিগুলোকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করার প্রতিজ্ঞা করলেন। বড় বড় দাপটশীল রাজাবাদশার প্রতি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লিখলেন। সেই পত্রগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আমি উল্লেখ করব না। এখানে শুধু একটি পত্র নিয়ে আলোচনা করব।

রোমের বাদশাহকে ইসলামের দাওয়াত

রোমের প্রভাবশালী বাদশাহর উদ্ধত মাথাকে ইসলামের সত্যতার সামনে অবনত করার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে যে পত্র লিখেছিলেন নিম্নে তুলে ধরা হলো।

'এই চিঠি আল্লাহর রাসুল ও বান্দা মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের নামে। হেদায়েতের অনুসারীদের প্রতি সালাম। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। যদি আপনি তা গ্রহণ করেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। আর যদি আপনি আমার দাওয়াত গ্রহণ না করেন, তাহলে আপনার অধীনে থাকা সমস্ত শাসক ও প্রজার গুনাহের ভার আপনাকেই বহন করতে হবে।

হে আহলে কিতাব![১২৯] আসুন, আমাদের এবং আপনাদের মাঝে যে বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে, আমরা তার অনুসরণ করি—আর তা হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আপনি যদি এই একত্ববাদের প্রবক্তা না হন, তাহলে জেনে রাখুন, আমরা তার প্রবক্তা ও বিশ্বাসী।

দাহিয়া কালবি রা.-এর এই দাওয়াতনামা নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য হলো। দামেশকের হুরান নামক এলাকা আরবের এক খ্রিষ্টান পরিবার শাসন করত। যারা ছিল রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের প্রতিনিধি। দাহিয়া কালবি রা. প্রথমেই তার কাছে পৌছলেন। হিরাক্লিয়াস যেহেতু তখন বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছিলেন, তাই হুরানের শাসক দাহিয়া কালবি রা.-কে রাসুল

---

১২৯. আহলে কিতাব : এরা হলো সেইসব জাতি, যাদের ওপর আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল। ইসলামি পরিভাষায় আহলে কিতাব বলা হয় ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের।-সম্পাদক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রসহ সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। রোমের বাদশাহ এই চিঠি পড়েই আদেশ দিলেন, যদি তোমরা এখানে কোনো আরবীয় ব্যক্তিকে পাও, তাহলে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। দাহিয়া কালবি রা. ততদিন সেখানেই অবস্থান করলেন।

কয়েকদিন পর রোমের বাদশাহর সভাসদরা ইসলামের শত্রু আবু সুফিয়ানকে তার দরবারে উপস্থিত করল। ব্যবসার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান তখন রোমে অবস্থান করছিল। তাকে দেখেই দাহিয়া কালবি রা.-এর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন নৈরাশ্যে পরিণত হলো। কিন্তু তিনি কী করে বুঝবেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা আবু সুফিয়ানের মনেও বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল! ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরোধিতা তো কেবল তার আরবীয় নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব প্রদর্শনের জন্য ছিল। তার ভয় ছিল, যদি কুরাইশের লোকরা বলতে শুরু করে, দেখো দেখো, আমাদের নেতাও ইসলামের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে নিজের বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে।

রাসুলের সত্যতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

> "সত্য নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ঘূর্ণিঝড় তোলে, যে ঘূর্ণিঝড় সত্যের বীজ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়।"[১৩০]

হিন্দুস্তানের এক ক্ষণজন্মা কবি ঠাকুরের এই কথার বাস্তবিকতা অনস্বীকার্য। সেই সত্য কতই-না উজ্জ্বল ও অনস্বীকার্য, শত্রুর হৃদয়েও যার দাগ পড়ে। আবু সুফিয়ান কতটা ইসলামবিরোধী ছিল এতক্ষণে আমাদের পাঠক সে বিষয়ে অনবগত থাকার কথা নয়। ইসলাম ও মুসলিমদের নামনিশানা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এমন কোনো পন্থা নেই যা সে প্রয়োগ করেনি, কিন্তু রোমের বাদশাহর দরবারে তার জিহ্বাও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতার স্বীকৃতিতে সিক্ত হয়ে গেল। বাদশাহর মানমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে ভীত হয়ে শুরুতেই সে মিথ্যা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। পুরো বিষয়টিকে সে বাস্তবিকতার আলোকেই

---

১৩০. হুবহু উক্তিটি পাওয়া যায়নি। তবে কবিগুরুর 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতার সঙ্গে আংশিক মিল রয়েছে। কবিতাটি হলো,

"সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভান্ডারে।"-সম্পাদক

বাদশাহর সামনে তুলে ধরল। রোমের বাদশাহ তাকে ভরা দরবারে ডেকে পাঠালেন। বাস্তবতা জানতে আগ্রহী বাদশাহ ও আবু সুফিয়ানের মাঝে যে কথোপকথন হয়েছিল, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

হিরাক্লিয়াস : নবুয়তের দাবিদার এই লোকটিকে তুমি ব্যক্তিগতভাবে চেনো?

আবু সুফিয়ান : জি, তিনি আমার বংশের লোক।

হিরাক্লিয়াস : তাঁর বংশ সম্পর্কে তুমি কী জানো?

আবু সুফিয়ান : তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোক।

হিরাক্লিয়াস : ইতিপূর্বে কি তাঁর বংশের অন্য কেউ নবুয়তের দাবি করেছিল?

আবু সুফিয়ান : কখনোই না।

হিরাক্লিয়াস : তাঁর বংশের কেউ কি কখনো বাদশাহ হয়েছিল?

আবু সুফিয়ান : জি না।

হিরাক্লিয়াস : কোন শ্রেণির লোকেরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে?

আবু সুফিয়ান : অধিকাংশই গরিব-মিসকিন।

হিরাক্লিয়াস : দিন দিন কি তাঁর অনুসারী বাড়ছে না কমছে?

আবু সুফিয়ান : দিন দিন বেড়েই চলেছে।

হিরাক্লিয়াস : তোমরা কখনো তাঁকে মিথ্যা বলতে শুনেছ?

আবু সুফিয়ান : একেবারেই না। পুরো মক্কায় তো তাঁর সততার প্রসিদ্ধি ছিল। নবুয়তের দাবি করার পূর্ব পর্যন্ত লোকেরা তাঁকে সাদিক (সত্যবাদী) ও আমিন (বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

হিরাক্লিয়াস : সে কি নিজের অঙ্গীকার পূরণ করে? কথাকাজে মিল রাখে?

আবু সুফিয়ান : আমি তাঁকে আজ পর্যন্ত তাঁর কথার বিপরীত কিছু করতে দেখিনি। তবে এখন তাদের সঙ্গে আমাদের হুদাইবিয়ার সন্ধি চলছে। জানি না তিনি তা রক্ষা করবেন কি না।

হিরাক্লিয়াস : কখনো কারও সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে?

আবু সুফিয়ান : হ্যাঁ, আমরাই তাদের সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধ করেছি।

হিরাক্লিয়াস : যুদ্ধের ফলাফল কী?

আবু সুফিয়ান : দু-পক্ষই বরাবর। কখনো তারা বিজয় লাভ করে, কখনো আমরা।

হিরাক্লিয়াস : তাঁর শিক্ষা কী?

আবু সুফিয়ান : তাঁর শিক্ষা একেবারেই সহজ। তবে তা আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিপরীত। তাঁর কথা হলো, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। মূর্তিপূজা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। একে অপরকে ভাই মনে করবে। আল্লাহর পৃথিবীতে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করবে না। আল্লাহকে ভয় করো এবং মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকো ইত্যাদি।

রোমের বাদশাহর সত্য অনুধাবন

রোমের বাদশাহ একজন সত্যান্বেষী মানুষ ছিলেন। তিনি আবু সুফিয়ানের জবাব শেষ হওয়ার পর তাকে লক্ষ করে বললেন, তুমি নিজেই বলেছ যে, ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী এই ব্যক্তিটি একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ। তিনি এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ যে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশে নবী-রাসুল প্রেরণ করেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তুমি এটাও বলেছ যে, ইতিপূর্বে তাঁর বংশের কেউ নবুয়তের দাবি করেনি। যদি করত, তাহলে আমি মনে করতাম যে, তাঁর নবুয়তের দাবিটাও বংশীয় প্রভাবে হয়েছে। তুমি বলেছ, তাঁর বংশে কেউ কখনো বাদশাহ হয়নি। যদি হতো, তাহলে আমি মনে করতাম যে, হারানো ক্ষমতা ফিরে পেতে সে এসব করছে। তোমার কথা অনুযায়ী তাঁর অনুসারীদের অধিকাংশই হলো গরিব ও অসহায়। নিঃসন্দেহে যেকোনো ধর্মের শিক্ষাই প্রথমে গরিব-মিসকিনদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। তুমি স্বীকার করেছ যে, দিন দিন তাঁর অনুসারী বাড়ছে, তাঁর ক্ষমতার পরিধি বৃদ্ধি হচ্ছে। নিশ্চয় তিনি একজন সত্য নবী। কারণ, মিথ্যুক কখনো উন্নতি করতে পারে না। তুমি বলেছ, তাঁর সত্যবাদিতা প্রবাদতুল্য। এটা অবশ্যই সঠিক যে, ধর্মের পতাকাবাহীরা কখনো মিথ্যা কথা বলে না। তুমি স্বীকার করে নিয়েছ যে, তিনি সত্যকথন ও প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর। নিঃসন্দেহে নবীগণ সর্বদা সত্য কথা বলেন এবং অঙ্গীকার পূরণ করেন। তোমরা তাঁর সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধ করেছ, কখনো তোমরা বিজয়ী হয়েছ, কখনো তারা। ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাদের জীবনেও এমনটি পাওয়া যায়। তারাও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কখনো বিজয় লাভ করতেন, আবার কখনো পরাজিত হতেন। তাঁর আদর্শ ও শিক্ষার ব্যাপারে তুমি যা বলেছ, তার দ্বারা বোঝা যায় তিনি আরববাসীকে একনিষ্ঠভাবে শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের সরল-সোজা পথে পরিচালিত করতে চান।

সুতরাং মনে হচ্ছে, তিনিই সেই শেষ নবী, যুগ যুগ ধরে আহলে কিতাবরা যার আগমনের অপেক্ষা করছে। আহা! রাষ্ট্রীয় কাজে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। না হয় নিজেই তাঁর পবিত্র দরবারে হাজির হয়ে ইসলামের সত্যতার ঝরনায় নিজেকে পরিশুদ্ধ করতাম। সত্যান্বেষী মানুষের উচিত, খুব দ্রুত তাঁর শিক্ষা ও হেদায়েত দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা।

পাদরিদের ভ্রু কুঞ্চন

রোমের বাদশাহর দরবারে তখন একদল পাদরিও উপস্থিত ছিল। বাদশাহকে ইসলাম ও ইসলামের নবীর গুণকীর্তন করতে শুনে, সাম্প্রদায়িকতা ও হীন মানসিকতার কারণে তাদের কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করল। বাদশাহর প্রতিটি কথা তাদের বুকে তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বিঁধছিল। বাদশাহ দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে পাদরিদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সেদিনের মতো বৈঠক সমাপ্ত করার মধ্যেই কল্যাণ মনে করলেন। তারপর একান্তে দাহিয়া কালবি রা.-কে ডেকে নিয়ে বললেন, আমার জন্য নিজের মন্ত্রিপরিষদ ও পাদরিদের অসন্তুষ্ট করে ইসলাম গ্রহণ করা অনেক বেশি কষ্টকর। তাই ইসলামের নবী যেন আমাকে ক্ষমা করেন। যদিও আমি সবার সামনে এই সরল-সঠিক ধর্মের অনুসারী হওয়াকে অস্বীকার করি, কিন্তু আমার হৃদয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। তাঁকে এবং তাঁর শিক্ষাকে আমি সম্মান করি। সারা জীবন আমি তাঁর শিক্ষাকে এই হৃদয়ে লালন করে যাব। যেন তাঁর আনীত বার্তা অনুযায়ী আমল করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারি। আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম জানাবে এবং আমার অক্ষমতার কথাও তাঁকে ভালোভাবে জানাবে। অতঃপর বাদশাহ দাহিয়া কালবি রা.-এর নিকট নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে তাকে সসম্মানে বিদায় জানালেন।[১৩১]

বাইতুল্লাহ জিয়ারতের সফল বাসনা

প্রিয় পাঠক, ইতিপূর্বে আপনারা পড়েছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কাবা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় গিয়েছিলেন। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির একটা শর্তমতে সে বছর তাদেরকে মদিনায় ফিরে আসতে হয়। এই বছর পুনরায় যখন হজের মৌসুম

---

[১৩১]. *সহিহ বুখারি*, ৭

এলো, তখন পুরোনো সেই আকাঙ্ক্ষা আবারও ভেতরটাকে নাড়া দিতে শুরু করল। তা ছাড়া সন্ধির শর্তও তাদেরকে এই বছর বাইতুল্লাহর জিয়ারত থেকে বাধা দিতে পারবে না। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই হাজার সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র মক্কায় আগমন করলেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিমের কাছে শুধু কোষবদ্ধ একটি তরবারি ছিল। বাকি সব হাতিয়ার তারা মদিনায় রেখে এসেছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তারা পবিত্র কাবা তাওয়াফ করলেন এবং ওমরার অন্য কার্যাদি সম্পাদন করলেন। সেখানে তিনদিন অবস্থান করে পুনরায় তারা মদিনার উদ্দেশে রওয়ানা হন।

অষ্টম হিজরি

নববি জীবনের সবচেয়ে বড় বিজয়

বাতিল এবং কুফর ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তার ভূমিতে ফেতনা-ফাসাদের অগ্নিগোলা নিক্ষেপের কোনো সুযোগই হাতছাড়া করেনি। তাওহিদের অনুসারীদের নাম আরবের মানচিত্র থেকে মুছে দিতে তারা তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই তাদের জীবনের মূলে ধারালো ছুরি হয়ে বিঁধেছে। ইসলামের সত্যতার আলোকোজ্জ্বল চাঁদের দিকে তারা যে কাদা ছুড়ে মেরেছিল, তা তাদের চোখেই এসে পড়েছে। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তারা যত ফেতনাই সৃষ্টি করেছিল, তা ইসলামের শক্তি ও একতাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। তারা যত বেশি জুলুম করেছে, আল্লাহ তত বেশি তাঁর প্রিয় বান্দাদের মমতার চাদরে জড়িয়ে নিয়েছেন। ওপরওয়ালা এতদিন কাফের-বেঈমানদের সব অবিচারই দেখেছেন। এখন তাঁর শক্তিশালী হাতের থাবায় জালিমের সকল অন্যায়-অবিচার ধ্বংস করার সময় এসে গেল। এসে গেল সেই সময়, যখন মজলুম মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে আর জালেম আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। অদৃশ্য পর্দার অন্তরালে তার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। যাদের বিষাক্ত তরবারি প্রতিনিয়ত মুসলিমদের রক্তে লালায়িত ছিল, ইসলামের শত্রুতা ও বিরোধিতা ছাড়া যারা কিছুই বুঝত না, সময়ের চাকা ঘুরতেই তারা মুসলিমদের দয়া-অনুগ্রহের ভিখারি হয়ে গেল। তাদের উদ্ধত মাথা ইসলামের সত্যতার সামনে অবনত হয়ে গেল। পবিত্র মক্কার অলিগলির যে বাড়িঘরগুলোতে প্রতিনিয়ত মূর্তিপূজা ও শিরকের শিলাবৃষ্টি বর্ষণ হতো, তাকবিরের ধ্বনিতে সেগুলো কেঁপে উঠল। শত শত বছর ধরে যে কাবাঘর মূর্তিশালায় পরিণত হয়েছিল, পুনরায় তা বাইতুল্লাহয় পরিণত হলো।

কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গ ও অন্যায়

হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তিতে একটি শর্ত এমন ছিল যে, আরবের অন্যান্য গোত্রগুলো চাইলে দুপক্ষের যে-কারও সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করতে পারবে এবং সেই গোত্রগুলোকেও এই সন্ধিচুক্তির শর্তগুলো পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। বনু খুজাআ ও বনু বকর নামে আরবের প্রসিদ্ধ দুটি গোত্র ছিল। যাদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে কঠিন শত্রুতা চলে আসছিল। তারাও এই চুক্তিতে শামিল হয়ে গেল। বনু খুজাআ মুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের গৌরব অর্জন করল। আর বনু বকর কুরাইশদের সঙ্গে হাত মিলাল।

সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এখন এই দুটি গোত্রের মাঝেও মিত্রতা স্থাপন হলো। বেশ কিছুদিন তা বহালও থাকল। মনে হচ্ছিল তাদের এতদিনের শত্রুতা আর কোনোদিন জেগে উঠবে না, কিন্তু দেড় বছর অতিক্রান্ত না হতেই সেই ছাইচাপা আগুন থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতে শুরু করল। বনু বকর রাতের আঁধারে বনু খুজাআর ওপর কাপুরুষোচিত হামলা চালাল। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করতে শুরু করল। কুরাইশরা সন্ধির সব শর্তকে অমান্য করে বনু বকরের সাহায্যে আদাজল খেয়ে মাঠে নামল। অসহায় লোকজন দৌড়ে গিয়ে পবিত্র কাবাঘরে এসে আশ্রয় নিলো। কিন্তু জালিমের কালো থাবা সেখানেও গিয়ে পৌঁছল। বনু খুজাআর নিরপরাধ লোকদের রক্তে লাল হয়ে গেল পবিত্র কাবার আঙিনা।

কোনো কারণ ছাড়াই রাতের আঁধারে এভাবে নিরস্ত্র মানুষের ওপর অতর্কিত হামলা করে গণহত্যা করাটা যে কতটা ধিকৃত কাজ, তা বনু বকর ও তার দোসর কুরাইশরা কী করে বুঝবে? বনু খুজাআ কল্পনাও করতে পারেনি যে আজ রাতে তাদের ওপর কতটা ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। তা ছাড়া সন্ধিচুক্তির শর্তগুলোকে অমান্য করে কুরাইশদের এভাবে সহযোগিতা করাটাও ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। এর মাধ্যমে কুরাইশরা তাদের পুরোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও হঠকারী চরিত্রের নির্লজ্জ প্রদর্শনী করল। শান্তি ও নিরাপত্তার সবুজ-শ্যামল ভূমিতে আবারও তারা শত্রুতা ও হানাহানির দাবানল ছড়িয়ে দিলো।

নবীজির দরবারে বনু খুজাআ গোত্রের সাহায্য কামনা

নিপীড়িত খুজাআ গোত্রের লোকেরা বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার নেতৃত্বে তাদের ৪০ জন ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদল মদিনায় সাহায্যের আশায় প্রেরণ করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে

তাদের দুঃখের কাহিনি শুনলেন। তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, চিন্তা করো না, অচিরেই তোমরা এই অত্যাচার ও পৈশাচিক আচরণের ক্ষতিপূরণ পাবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও চাচ্ছিলেন যেন সন্ধি ও সম্প্রীতির অবস্থানটা বজায় থাকে। পুনরায় ফেতনা-ফাসাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। কিন্তু মহান পরাক্রমশালী প্রভু চাচ্ছিলেন অন্যকিছু। তিনি কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গ ও সীমালঙ্ঘনের পেছনে মুসলিমদের বিজয় ও সফলতা রেখেছিলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদেরকে সন্ধিচুক্তির শর্তগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করলেন। তিনি এসে কুরাইশ গোত্রের সামনে নবীজির বার্তা শোনালেন এবং বনু খুজাআকে ক্ষতিপূরণ দিতে বললেন। সর্বোপরি আগামী দিনে যেন এমন ভুল আর না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁর সঙ্গে এমন উদ্ধত আচরণ করল যে, তিনি কোনো কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন।

তারা নবীজির বার্তাবাহককে লক্ষ করে বলল, আমরা মুসলিমদের গোলাম নই যে, তাদের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। আমাদের কাছে যা ভালো মনে হয়েছে, আমরা তা-ই করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব। আমরা কোনো ধরনের চুক্তি মেনে চলার প্রয়োজন মনে করি না।

যুদ্ধ নিয়ে আসে সংকীর্ণতা

এমনিতেই মক্কার কাফেররা যে কতটা পাষণ্ড আর জালেম, তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। এরপরও নিজেদের কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত না হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানকে চরম অহংকার ও ঘৃণা প্রদর্শন করে প্রত্যাখ্যান করাটা তাদের সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও সীমালঙ্ঘনের বহিঃপ্রকাশ ছিল। ভাবখানা এমন, যেন তারাই পুরো পৃথিবীর একক ক্ষমতার অধিকারী। যাচ্ছেতাই করে যাবে, কারও আপত্তি করারও সুযোগ নেই।

কাফেরদের এমন পাশবিক অত্যাচার ও চুক্তিভঙ্গের পরও যদি মুসলিমরা নির্লিপ্ত থাকত, তাহলে ওই ওপরওয়ালাই জানেন, তারা তাদের জুলুম-নিপীড়নের মাধ্যমে কীরূপ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যেত। এই কারণেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া তাদের সীমালঙ্ঘনের জবাব তির-তরবারির ভাষায় দেওয়াটাই সমীচীন মনে করলেন। দরবারে নববি থেকে ইসলামের বীরবাহাদুরদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আদেশ দেওয়া হলো।

সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী মুসলিমদের সাহসী বাহিনী

মক্কার কাফের কুরাইশদের জুলুম-নিপীড়নের যথোপযুক্ত জবাব দিতে মুসলিমদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী বাহিনী মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলো। রওয়ানা হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ জানত না যে, কাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধপ্রস্তুতি! সবকিছু এতটাই গোপনে হয়েছে যে, এই ব্যাপারে কারও সামান্য ধারণাও ছিল না।

১২ হাজার সেনাসদস্যের এক বিশাল বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পবিত্র মক্কা থেকে ৩ বা ৪ মাইল দূরত্বে এসে তাঁবু গাড়ল। মহান দূরদর্শী ও বিচক্ষণ সিপাহসালার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চারদিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেক দলই পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের তাঁবুর জায়গায় আগুন জ্বালাল। এভাবেই রাতের আঁধারে আকাশের নিচে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়া ১২ হাজার সেনাসদস্যের বিশাল দুঃসাহসী বাহিনীকে অগণিত পঙ্গপালের ন্যায় মনে হচ্ছিল। যা দেখে যে-কারও চোখ ছানাবড়া হতে বাধ্য ছিল।

কুরাইশদের পেরেশানি

পাহাড়ের উপত্যকায় ভেড়া-বকরি চরানো রাখালদল কুরাইশদের সংবাদ দিলো যে, অদূরেই এক বিশাল বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁবু গেড়ে সকালের অপেক্ষায় বসে আছে। এমন সংবাদে কুরাইশদের পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গেল! পেরেশান হয়ে তারা ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য ছুটোছুটি শুরু করল। তাদের নেতা আবু সুফিয়ান কয়েকজন সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে এমন ভীতিকর দৃশ্য দেখে এলো যে দৃশ্যের কথা শুনে মক্কাবাসীর চেহারায় যেন মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এলো। রাতের আঁধারে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা দেখল, চতুর্দিকে অসংখ্য মশাল জ্বলছে। যেদিকেই তাকায়, সেদিকেই বিশাল বাহিনীর সাজ সাজ রব। এমন দৃশ্য দেখে তারা ঘাবড়ে গেল। হায়! এখন তো শহরের প্রতিটি ইটই ধ্বংস হয়ে যাবে। এত বড় বাহিনীর মোকাবিলা করার সাধ্য কার? তা ছাড়া হাতে সময় আছে শুধু এই রাতটুকুই। সকালে না আমরা থাকব, না আমাদের ক্ষমতা থাকবে। হতভম্ব হয়ে তারা এদিক-সেদিক দেখছিল। এমন সময় আব্বাস রা. একটা খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে এদিকে এলেন।

নবীজির দরবারে আবু সুফিয়ান

আব্বাস রা. নওমুসলিম ছিলেন। হিজরত করে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে মদিনায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মুসলিমবাহিনীর সাক্ষাৎ পেলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রী-সন্তানদের মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তাকে সৈন্যবাহিনীতে শামিল করে নিলেন। আব্বাস রা. তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের এমন দুরবস্থা দেখে খুবই পেরেশান হয়ে গেলেন। তার মনে চাচ্ছিল, যেকোনোভাবেই হোক, ওই নির্বোধ লোকগুলো আজ রাতের মধ্যেই ইসলামের শান্তি ও কল্যাণের শিক্ষা গ্রহণ করুক, সরল-সঠিক দ্বীনের অনুসারী হয়ে যাক। তাহলেই তাদের জানমালের হেফাজত হবে এবং ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হবে।

নিজ জাতির জন্য এক বুক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার কারণেই কাউকে না জানিয়ে তিনি মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যেন সেখানে অবস্থানরত তার বোকা ও অপরিণামদর্শী বন্ধুদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে মুসলিম বানাতে পারেন।

রাতের আঁধারে পথ চলছিলেন আব্বাস রা.। হঠাৎ আবু সুফিয়ানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান তাকে দেখেই অত্যন্ত পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করল, এত বিপুল সৈন্যসামন্ত কোত্থেকে এলো?

জবাবে তিনি বললেন, এরা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানবাজ সাহাবি। আগামীকাল সকালেই তারা শহরে হামলা করবে।

এ কথা শুনেই আবু সুফিয়ানের মাথায় যেন বজ্রপাত হলো, যে মুসলিমদের পৃথিবীর জমিন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে কোনো চেষ্টা-ষড়যন্ত্রই তারা বাকি রাখেনি, আজ তারাই তার জাতিকে সমূলে উৎখাত করতে ওত পেতে বসে আছে! আহা! আমার জাতির বুঝি আজ রক্ষা নেই? পরাজয় ও অনুশোচনার আশঙ্কা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। শিকারির হাতে সদ্য ধরা পড়া পাখির ন্যায় তার প্রাণও যেন ছটফট করছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না। সে ভাবতেই পারছিল না যে, এই পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তির কোনো পথ আছে কি না।

আব্বাস রা. তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমি তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি। তুমি আমার পেছনে আরোহণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে চলো। সেখানে কোনো না কোনো সমাধান তো অবশ্যই হবে। আব্বাস রা.-এর পরামর্শমতো কাজ করা ছাড়া আবু সুফিয়ান আর কোনো উপায় দেখল না।

উমর রা.-এর ক্রোধ

উমর রা. একদল সৈনিক সঙ্গে নিয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। যাতে করে রাতের আঁধারে শত্রুরা অতর্কিত হামলা করতে না পারে। ইসলামের চরম দুশমন আবু সুফিয়ানকে দেখেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তাৎক্ষণিক নিজের ধারালো তরবারির আঘাতে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে তাকে তার কৃতকর্মের সাজা ভোগ করাতে চাইলেন। আব্বাস রা. তাকে বাধা দিয়ে বললেন, দেখো উমর, বাড়াবাড়ি করো না। আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। সে আমার সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাচ্ছে। এই কথা বলে আব্বাস রা. খচ্চরের গায়ে আঘাত করে দ্রুত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাঁবুতে গিয়ে পৌছলেন। পেছনে পেছনে উমরও নাঙ্গা তরবারি হাতে ছুটে এলেন। তাঁবুতে পৌছেই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, খুব সহজেই এই মহামূল্যবান শিকার আজ আমাদের হাতে ধরা দিয়েছে। দয়া করে আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই কাফেরের দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দেবো।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর রা.-কে অনুমতি না দিয়ে যুদ্ধ ও সন্ধির বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

উমর রা. আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কিন্তু শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতি বিশ্বমানবতাকে আহ্বানকারী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যদি বেয়াদবি হয়ে যাওয়ার ভয় না থাকত, তাহলে চোখের পলকেই ইসলামের এই শত্রুর কর্তিত মাথা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি করত। উমর রা. অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলেন। কিন্তু আর কতক্ষণ? আবারও তিনি আবু সুফিয়ানকে হত্যার অনুমতি চাইলেন।

উমর রা.-এর এমন অস্থির অবস্থা দেখে আব্বাস রা. বললেন উমর, আজ যদি সে তোমার নিকটাত্মীয় হতো, তাহলে কখনোই তুমি তাকে হত্যা করতে এতটা উতলা হতে না।

উমর রাগান্বিত হয়ে বললেন, আব্বাস, তুমি মুসলিম হওয়ায় আমি এতটাই আনন্দিত হয়েছিলাম যে, বোধ হয় আমার পিতা মুসলিম হলেও আমি এতটা খুশি হতাম না। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন তোমরা মুসলিম হও। আব্বাস, আমাদের সব সম্পর্কের ভিত্তিই হলো ইসলাম। ইসলামের সম্পর্ক ছাড়া কারও প্রতি ভালোবাসা বা কোনো সম্পর্ক নেই।[১৩২]

---

১৩২. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৪/৩১১; *জাদুল মাআদ*, ৩/৩৬৬

কুরাইশদের সর্বোচ্চ নেতার ইসলামগ্রহণ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানকে পুরো রাত চিন্তা করার সুযোগ দিলেন। সবকিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সে যেন নিজের এবং জাতির ভালো-মন্দ ও লাভ-লোকসানের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেয়।

ইতিপূর্বে কুরাইশরা সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পরও গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে গেছে। অথচ মুসলিমরা এখনো ফেতনা-ফাসাদ ও হানাহানি থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে। এই যে বিশাল বাহিনী এই দ্বীপজ্বলা রাতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের উদ্দেশ্য দাঙ্গাহাঙ্গামা নয়, বরং দাঙ্গাহাঙ্গামা ও ফেতনা-ফাসাদের শিকড় উপড়ে ফেলে সেখানে সত্যের চারাগাছ রোপণ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

সে রাত আবু সুফিয়ান আব্বাস রা.-এর তাঁবুতেই কাটিয়ে দেয়। পরদিন সকালবেলা। পূর্ব দিগন্ত আলোকিত করে সকালের সোনালি সূর্য উদিত হলো। আলোয় আলোয় ভরে গেল আরবের মরুভূমি। আবু সুফিয়ানের আঁধার হৃদয়েও ইসলামের নুরের ঝলক দেখা দিলো। নবীজির কাছে এসে তিনি মুসলিম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মুসলিমবাহিনী মহীয়ান প্রভুর সাহায্যকে পুঁজি করে শহরের উদ্দেশে রওয়ানা হলো।

ভালোবাসার পয়গাম

মুসলিমবাহিনী মক্কার কুরাইশদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কুরাইশদের হাতে মাত্র একটা রাতই ছিল। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে এত কম সময়ে এত বিশাল বাহিনীর মোকাবিলায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব নয়। মুসলিমরা যদি অন্যান্য জাতির মতো রক্তপাতে বিশ্বাসী হতো তাহলে সামান্য সময়ের মধ্যেই পুরো মক্কা নগরীতে রক্তের স্রোত বয়ে যেত। অসংখ্য কর্তিত মাথা অলিগলিতে পড়ে থাকত। প্রতিটি ঘর থেকে স্বামী-সন্তান ও সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের আর্তচিৎকার ভেসে আসত।

কিন্তু না, প্রিয় পাঠক! এমন কিছুই হয়নি। পরম দয়ালু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের ক্ষমার অযোগ্য এতসব অপরাধসত্ত্বেও তাদের শাস্তি দিলেন না, বরং সেই মুহূর্তে তিনি নিজের সৈনিকদের যে আদেশ দিয়েছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাঁর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি শব্দে যেন ভালোবাসা ঝরে পড়ছিল। প্রতিটি শব্দ যেন মুখ থেকে নয়, হৃদয়ের গহিন থেকে ভালোবাসা ও সহমর্মিতার প্রলেপ

জড়িয়ে মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল, যা ভাবলে আজও মানুষের চারিত্রিক অনুভূতিতে এক আশ্চর্যকর উন্নতি ও সমৃদ্ধি সৃষ্টি হয়। পরম ভালোলাগায় বুক ভরে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি কাবাঘরে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি নিজ ঘরে আশ্রয় নিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তার ওপর আক্রমণ করা হবে না। যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে কিংবা অলিগলিতে যাদের নিরস্ত্র অবস্থায় পাওয়া যাবে, তারাও নিরাপত্তা লাভ করবে।

প্রিয় ভাই! শান্তি ও সৌহার্দের এমন বিরল দৃষ্টান্ত আপনি ইতিহাসের কোথায় খুঁজে পাবেন? কুরাইশদের জুলুম-নিপীড়ন ও ষড়যন্ত্র তো ক্ষমার অযোগ্য পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, মুসলিমরা চাইলে আজ মনভরে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু অপ্রতিরোধ্যভাবে মক্কা বিজয় করা সত্ত্বেও তারা কাফেরদের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত না করে বরং তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। শুধু গুটি কয়েক সীমালঙ্ঘনকারী ছাড়া, যারা এ রকম শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে শহরে প্রবেশ করার সময়ও হট্টগোল ও ফেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল।

নিরাপদে শহরে প্রবেশ

সততা, দৃঢ়তা আর কুদরতের এক আশ্চর্যকর কারিশমা দেখুন। মক্কার এই বিশাল ভূমি একদিন যার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অনিরাপত্তা ও গোলযোগের মুখে একদিন যিনি এই ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আজ তিনি সেই ভূমির শাসকরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। একদিন যে অলিগলিতে তাঁর পদচারণাই কুরাইশদের কাছে ছিল অসহ্য, আজ সেগুলো তাঁর সম্মানে তারানা গাইছে, নত হয়ে সালাম দিচ্ছে। আহা! এই তো সেই ঘর, সেই প্রিয় মাতৃভূমি। আপনজনদের ডেরা, শৈশবের খেলার মাঠ, মায়ের মমতার স্মৃতি, দাদার হাত ধরে কাবাঘরে যাওয়া।

ওই তো প্রিয়তমা খাদিজার বসতঘর, দক্ষিণের খোলা জানালা আর সেই মন মাতানো মধুর হাসি। সব যেন আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেন গতকালের ঘটনা। অথচ হিজরতের আট বছর হতে চলেছে।

আহা! আজ যদি চাচা আবু তালেব বেঁচে থাকতেন। বিশাল বাহিনীর মহান সিপাহসালার ও শাসকরূপে এভাবে ভাতিজাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেখে কতই-না খুশি হতেন! ভাতিজার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি পুরো মক্কার

বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। শিআবে আবু তালেবে তিনটি বছর অনাহারে-অর্ধাহারে কাটিয়েছেন।

আহা! চাচা হামজা আজ কোথায়? জান্নাতের ফুলবাগানে বসে তিনিও কি দেখছেন ভাতিজার এই বিজয়যাত্রা? যে ভাতিজাকে গালি দেওয়ায় তিনি খোলা তরবারি হাতে আবু জাহলের মুণ্ডুপাত করতে ছুটে গিয়েছিলেন। যে ভাতিজার জন্য তিনি সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

ইসলামের বিজয়ে মহান আল্লাহর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুচোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। যেন গোলাপের পাপড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা শিশির ঝরে পড়ছে। অবনত মস্তকে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। চোখে আনন্দাশ্রু আর মুখে পরম করুণাময়ের শোকর ও কৃতজ্ঞতার তাসবিহ। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আর উচ্চকণ্ঠে পড়ছিলেন,

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ»

> এক আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং নিজ বাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একান্ত অনুরাগী সাহাবিদের নিয়ে পবিত্র কাবাঘরের আঙিনায় প্রবেশ করলেন। তাকবিরের ধ্বনিতে পুরো মসজিদুল হারাম আন্দোলিত হলো। মূর্তিপূজারিরা যে 'বাইতুল্লাহ'-কে 'বাইতুল আসনাম' (মূর্তিশালা) বানিয়ে রেখেছিল দেখতে না-দেখতেই তা পুনরায় 'বাইতুল্লাহ'-য় পরিণত হলো। মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে বাইরে ছুড়ে মারা হলো। সব ধরনের অপবিত্রতা থেকে কাবাঘর পবিত্র করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবার আঙিনায় দাঁড়িয়ে এই ভাষণ দিলেন।

> আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি ছাড়া অন্য কাউকে আমরা ইবাদতের উপযুক্ত মনে করি না। তিনি ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদের সাহায্য করেছেন। সত্য দ্বীনের শত্রুদের পরাজিত করেছেন। হে কুরাইশ সম্প্রদায়, জাহেলিয়াতের সমস্ত ধোঁকা, প্রতারণা ও বংশীয় অহংকার আজ মিটিয়ে দেওয়া হলো। সকল মানুষই আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। যার অর্থ হলো,

> হে লোকসকল, আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি। যাতে করে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। (কিন্তু স্মরণ রেখো) আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবার চেয়ে বেশি পরহেজগার ও আল্লাহভীরু। আল্লাহ তাআলা (সবার দোষ-গুণ ও ভেতর-বাহির) সবকিছু সম্পর্কেই অবগত। [সুরা হুজুরাত : ১৩][১৩৩]

সাধারণ ক্ষমার এক বিরল দৃষ্টান্ত

পবিত্র কাবাঘরের আঙিনায় ইসলামের শত্রুরা সারিবদ্ধভাবে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল। কেমন শত্রু? যারা রাসুলের দেহ থেকে মাথাকে আলাদা করতে চেয়েছিল। নবীজির কলিজার টুকরা মেয়ের পেটে বর্শা দ্বারা আঘাত করে যারা গর্ভপাত করেছিল। তাঁর প্রিয় চাচার বুক চিরে কলিজা বের করে যারা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছিল। প্রতিটি সম্ভবপর উপায়ে নবীজির ব্যাপারে কুৎসা রটনা ও তাকে কষ্ট দিতে যাদের হাত-ঠোঁট এতটুকুও কাঁপেনি। মন-মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তিই যারা ইসলামের চারাগাছ উপড়ে ফেলার কাজে ব্যয় করেছিল। সেই শত্রুদের দিকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার চোখ তুলে তাকালেন। অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জানো আজ তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে?

সবাই সমস্বরে জবাব দিলো, আজ পর্যন্ত আমরা তো আপনাকে অত্যন্ত করুণাময় ও দয়ার সাগর হিসাবেই জেনে এসেছি। তাই আজও আমরা আপনার কাছ থেকে দয়া ও করুণার আশা করি।

নবীজির দুঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক দেখা গেল। পরম মমতা ও ভালোবাসাভরা দুচোখে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আজ আমি তোমাদের সেই কথাই বলব। ইউসুফ আ. যা তার অত্যাচারী ভাইদের বলেছিলেন। তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আমার কোনো অভিযোগ নেই। যাও তোমরা সবাই মুক্ত!

---

১৩৩. *জাদুল মাআদ*, ৩/৭১; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৪/৩১৯; *সুনানু আবি দাউদ*; *আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি*; *সুনানু ইবনি মাজাহ*; *দালায়িলুন নুবুওয়াহ লিল বাইহাকি*; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/৩০৪

মুহূর্তের মধ্যেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলেন। অথচ তখন তারা পরাজিত, গোলাম এবং মুসলিমদের হাতে বন্দি। যখন তাদের মাঝে না আছে কোনো লড়াইয়ের শক্তি, না আছে কোনো প্রতিশোধস্পৃহা। অত্যন্ত রিক্ত ও নিঃস্ব অবস্থায় তারা মুসলিমদের দয়া ও করুণার ভিখারি হয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল। মুসলিমদের এমন অনুকূল সময়েও তারা দুনিয়ার মানুষকে এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, প্রকৃত অভিজাত ও মর্যাদাবান তো তারাই, যারা প্রতিশোধ নিতে পুরোপুরি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের প্রাণের দুশমনের ওপর দয়া করে। এটা এমন এক বিরল ঘটনা, পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ইসলাম তখনই রক্তপাতের অনুমতি দেয় যখন পৃথিবীর ফেরাউনি ও নমরুদি শক্তিগুলো পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ন্যায় ও সত্যের নামচিহ্ন মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। অন্যথায় দয়া, করুণা ও সহমর্মিতা তো মুসলিমদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এদিকে মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করাটা এতটাই বরকতময় ও কল্যাণকর হয়েছে যে, ইসলামের নবীর দয়া ও করুণার আকর্ষণে সেদিনই কুরাইশদের সকল কাফের স্বেচ্ছায়-সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করে।

মূর্তিপূজার মূলোৎপাটন

তাওহিদের অনুসারীদের মুবারক কদম মক্কার মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি বালুকণা হতে 'আল্লাহু আকবার'-এর তাকবিরধ্বনি গুঞ্জরিত হতে শুরু করল। তারা শহরে প্রবেশ করতেই প্রতিটি মূর্তিপূজার মহলে পরাজয়ের ছাপ ফুটে উঠতে শুরু করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন 'বাইতুল্লাহ'-কে বাইতুল আসনাম-এর শিরকের নাপাকি থেকে পবিত্র করলেন, তখন তিনি শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে তৈরিকৃত মন্দিরগুলোর প্রতি নজর দিলেন। তাঁর প্রিয় সাহাবিরা তাওহিদের বলে বলীয়ান হয়ে সেখানকার অসংখ্য প্রসিদ্ধ মূর্তিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলো। মন্দিরগুলোর দেয়ালকে চূর্ণবিচূর্ণ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলো। এতদিন যারা নিজেদের এই সমস্ত শক্তিশালী মূর্তিদের পূজা করত, তারা ভেবেছিল, মুসলিমরা আমাদের এমন মহান ক্ষমতাবান প্রভুদের কোনো ক্ষতি করবে? নিশ্চয় আজ তারা মূর্তিদের রাগের আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে। কিন্তু আজ মুসলিমরা যখন চোখের পলকে সেসব ক্ষমতাবান মূর্তিকে ভেঙে টুকরো

টুকরো করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলো, তখন পূজারিরাও বুঝতে পারল যে, সারা জীবন তারা কিছু মিথ্যা প্রভুর পূজা করেই জীবনটা বরবাদ করে দিয়েছে। যে প্রভুর এতটুকু শক্তি নেই যে, নিজেকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে, তাহলে নিজ অনুসারীদের সে কোন আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করবে?

হুনাইনযুদ্ধ

মুসলিমদের এক শিক্ষণীয় অধ্যায়

ভুল বোঝাবুঝি অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক এক ব্যাধি। দুনিয়ার অনেক বড় বড় যুদ্ধ শুধু এই কারণেই হয়েছে। কখনো কখনো তো এর পরিণাম এমন মারাত্মক বিপদাপদ ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাসই পালটে দিয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পর মুসলিমরা কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী গোত্রগুলো এই ভুল ধারণার শিকার হলো যে, মুসলিমরা তো মক্কা বিজয় করে নিয়েছে। এবার নিশ্চয় তারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে। এই আশঙ্কায় ওরা নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পুরোদমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। এই ক্ষেত্রে বনু সাকিফ ও বনু হাওয়াজিন গোত্রদ্বয়ের ভূমিকা ছিল বেশি।

মুসলিম বীরযোদ্ধাদের আগমন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এমন ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জানতে পেরে তখন সাহাবিদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিলেন। এই ফেতনা নির্মূল করা খুবই জরুরি ছিল। অন্যথায় আশঙ্কা ছিল যে, যদি কোনোভাবে তারা বড় ধরনের কোনো যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে নেয়, তাহলে মক্কার যেসব লোক অন্যদের দেখাদেখি মুসলিম হয়েছে, তারাও এদের দলে শামিল হয়ে যাবে। তখন নতুন এক আপদ মুসলিমদের সামনে এসে দাঁড়াবে। তাই এ ফেতনার শুরুতেই মূলোৎপাটন জরুরি।

মুসলিমরা খুব গর্বের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশে রওয়ানা হলো। তাদের মনে আজ সংখ্যাধিক্য ও বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের বড়াই। তারা ভাবছিল, আজ তো আমাদের বিপুল সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রভান্ডার রয়েছে। তাহলে এমন কে আছে যে আমাদের সঙ্গে লড়াই করার সাহস করবে? যখন আমাদের সৈন্যসংখ্যা কম ছিল, যুদ্ধাস্ত্রও যথেষ্ট ছিল না। তখনও আমরা শত্রুর বিষদাঁত ভেঙে

দিয়েছিলাম। আর আজ তো আমরা আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী। যেদিকেই আমরা তাকাব, বিজয় আমাদের স্বাগত জানাবে।

অহংকার পতনের কারণ

আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের এই ভাবনা পছন্দ করলেন না। তাই তিনি তাদেরকে এমন অবস্থার মুখোমুখি করলেন, যাতে তারা বুঝতে পারল যে, সৈন্যসংখ্যা যত বেশিই হোক, কিংবা অস্ত্রভান্ডারও যত ভরপুর থাকুক না কেন, মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কখনো বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে।

> এবং হুনাইনের সেদিনের ঘটনা স্মরণ করো। যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের মোহে আচ্ছন্ন ছিলে। কিন্তু তা কোনো কাজে আসেনি। পৃথিবীর জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও (সেদিন তোমাদের জন্য) সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ও মুমিনদের হৃদয়ে প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছেন এবং তোমাদের সাহায্যার্থে এমন বাহিনী প্রেরণ করেছেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর কাফেরদের দিয়েছেন শাস্তি। এটাই তো তাদের কর্মফল। [সুরা তাওবা : ২৫]

হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ

নিজেদের সংখ্যাধিক্যে গর্বিত ও বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর মুসলিমবাহিনী সুবহে সাদিকের আগমুহূর্তে হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করল। এই উপত্যকায় পৌঁছার পাহাড়ি রাস্তাগুলো বেশ আঁকাবাঁকা ছিল। শত্রুসেনারা সেই পথে ওত পেতে বসে ছিল। যখন মুসলিমরা উপত্যকায় প্রবেশ করতে শুরু করল, তখন চতুর্দিক থেকে তিরবৃষ্টি শুরু হলো। এমন আকস্মিক হামলায় মক্কার নওমুসলিমদের পা টলে গেল। তারা শত্রুকে পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করতে শুরু করল। তাদের পালাতে দেখে আনসার ও মুহাজির সাহাবিরাও পালাতে শুরু করল।

নবীজির অসাধারণ সাহসিকতা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে প্রায় ১২ হাজার সৈনিক ছিল। যাদের মধ্যে প্রায় দু-হাজার ছিল মক্কার নওমুসলিম। এই নওমুসলিমরা পালাতে শুরু করলে অন্যান্য বীরবাহাদুর মুসলিমদের মনোবলও ভেঙে যায়।

চরম কাপুরুষতা ও পরাজয়ের লজ্জাজনক দৃশ্যের অবতারণা ঘটল তখন। কেউ কেউ তো বলেই ফেলল, এতদিন যারা আরবের জমিনে দাপটের সঙ্গে একের পর এক ভূমি দখল করে নিয়েছে, আজ বুঝি তাদের বিদায়ের ঘণ্টা বাজার সময় হয়েছে!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচণ্ড সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাহাবিদের এভাবে পলায়ন করতে দেখেও তাঁর পা মুবারকে সামান্য কাঁপনও সৃষ্টি হয়নি। অত্যন্ত বীরত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে হাজার হাজার শত্রুর মোকাবিলা করতে লাগলেন। আর আব্বাস রা.-কে বলে দিলেন, আমার আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের ডাক দাও।

মহান বিজয়

আব্বাস রা. পলায়নপর মুসলিমদের ডাক দিলেন, হে আনসার সাহাবিরা, হুদাইবিয়ার প্রাঙ্গণে গাছের নিচে নবীজির হাতে হাত রেখে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণকারীরা!

এমন প্রভাব সৃষ্টিকারী আওয়াজে মুসলিমদের হুঁশ ফিরে এলো। পুনরায় দলে দলে সবাই নিজেদের মহান নেতার চারদিকে জড়ো হতে শুরু করল। প্রায় ১০০ জন মুসলিম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছতে পারল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সামান্যসংখ্যক সাহাবিকে নিয়েই শত্রুকে পিছু হটতে বাধ্য করলেন। অন্য মুসলিমরাও তা দেখে অনুপ্রাণিত হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসাধারণ সাহসিকতায় সামান্য সময়ের ব্যবধানেই রণাঙ্গনের পরিস্থিতি পালটে গেল। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে যারা মুসলিমদের পালাতে বাধ্য করেছিল, এখন তারাই যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। একটু পরেই ময়দান খালি হয়ে গেল। অগণিত ধনসম্পদ মুসলিমদের হস্তগত হলো। ধারণা করা হয়, এই সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৪ হাজার উট, ৪৪ হাজারেরও বেশি ভেড়া-বকরি, চার হাজার উকিয়া রৌপ্যমুদ্রা এবং ছয় হাজার বন্দি।

মুক্ত করে দেওয়া হলো যুদ্ধবন্দিদের

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধমা হালিমা সাদিয়া রা. বনু হাওয়াজিন গোত্রের আত্মীয় ছিলেন। তাই সেই গোত্রের লোকেরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে হালিমার দোহাই দিয়ে

যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করে দেওয়ার আবেদন করল। তিনি তাদের বললেন, এখন যাও, আসরের নামাজের পর আবার এসো। সকল মুসলিমদের সামনে পুনরায় আবেদন করো।

তারা অবনত মস্তকে রাসুলের কথা মেনে নিয়ে চলে গেল। আসরের নামাজের পর তারা আবার এলো। মুসলিমদের সামনে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির আবেদন করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার এবং আমার বংশের লোকদের ভাগে যেসব বন্দি রয়েছে তারা সবাই স্বাধীন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবিরা তা শুনে আর বিলম্ব না করে সমস্বরে বলে উঠলেন, রাসুলুল্লাহর অংশ মানে আমাদেরও অংশ। সুতরাং তিনি যখন নিজের কয়েদিদের মুক্ত করে দিলেন, তখন আমরাও আমাদের কয়েদিদের মুক্ত করে দিলাম।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচক্ষণতায় মুহূর্তের মধ্যেই ছয় হাজার যুদ্ধবন্দি মুক্ত হয়ে গেল। কোনো মুসলিমই তাতে দ্বিমত পোষণ করেননি।

একটি ভিত্তিহীন গন্ডগোল

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে অর্জিত গনিমতের অধিকাংশই কুরাইশদের দান করে দিলেন। কারণ, তারা নওমুসলিম ছিলেন। তাই তাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করার জন্য তিনি এই বণ্টন করলেন। কিন্তু কতক অপরিণামদর্শী আনসার যুবক তা মেনে নিতে পারল না। তারা বলতে শুরু করল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন নিজ আত্মীয়দের বেশি বেশি দিচ্ছেন, আর আমাদের পুরোনো দিনের অনুগ্রহের কথা ভুলে গেছেন।

এমন ভুল ধারণার কারণে খুব দ্রুতই বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলো। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত নিজের দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও বাকপটুতার মাধ্যমে আনসারদের এই ভুল ধারণা দূর করে দিলেন। তিনি এই বিষয়ে অবগত হয়েই আনসারদের তলব করলেন এবং তাদের সবাইকে লক্ষ করে জিজ্ঞেস করলেন, বাস্তবেই কি তোমরা এমন কথা বলেছ যে, গনিমতের সম্পদ থেকে আমি আমার নিজ আত্মীয়দেরকে বেশি দিয়েছি?

প্রত্যুত্তরে আনসার সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কোনো সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি তো আপনার শানে এমন বেয়াদবিমূলক কথা বলার

দুঃসাহস করবে না। তবে হ্যাঁ, কয়েকজন অপরিপক্ব ও আবেগি নওজোয়ান এমন কথা বলছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদের লক্ষ করে বললেন, এটা কি সঠিক নয় যে, একসময় তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে, আল্লাহ তাআলা আমার মাধ্যমে তোমাদের হেদায়েত দান করেছেন? আগে তোমরা হতদরিদ্র ও অসহায় ছিলে, আল্লাহ তাআলা আমার মাধ্যমে তোমাদের সচ্ছলতা ও সুদিন ফিরিয়ে দিয়েছেন? এটা কি সত্য নয় যে, একসময় তোমরা একে অন্যের প্রাণের দুশমন ছিলে, আর আল্লাহ তাআলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে একে অন্যের জানের দোস্ত বানিয়ে দিয়েছেন?

আনসার সাহাবিরা প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবেই বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসুল, নিশ্চয় আমরা এমনই ছিলাম। আপনি এসে আমাদের পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আমাদের ওপর মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে।

পুনরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের লক্ষ করে বললেন, তোমরাও তো চাইলে আমাকে এ কথা বলতে পারো যে, পুরো পৃথিবী যখন আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, তখন আমরাই আপনাকে সত্যায়ন করেছি। পুরো পৃথিবী আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আর আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি প্রয়োজনগ্রস্ত ছিলেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। তোমাদের এই সব কথাই আমি স্বীকার করে নেব। কিন্তু হে আমার প্রিয় আনসার সাহাবিরা, তোমরা কি এতে খুশি হবে না যে, অন্য লোকেরা নিজেদের ঘরবাড়িতে ভেড়া-বকরি নিয়ে ফিরে যাবে, আর তোমরা নিজেদের বাড়িতে মুহাম্মাদকে নিয়ে ফিরে যাবে?

এমন যৌক্তিক কথায় আনসারদের হৃদয়ে গভীর দাগ কাটল। কাঁদতে কাঁদতে অনেকের দাড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। কান্নাভেজা কণ্ঠে সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, লাগবে না, আমাদের কিছুই লাগবে না। আপনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা শুধু আপনাকেই চাই।

এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বুঝিয়ে বললেন, দেখো, আমি তাদেরকে এই কারণে সম্পদ বেশি দিইনি যে, তারা মানমর্যাদায় তোমাদের চেয়েও উত্তম, বরং তাদের যে লোকেরা নতুন মুসলিম হয়েছে তাদের হৃদয়কে আরও বেশি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যই আমি এই কাজ করেছি। এতে আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।[১০৪]

---

১০৪. *জাদুল মাআদ*, ৩/৪৪১-৪৪২; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৪/৩৮৭

এই বছরে সংঘটিত আরও কিছু ঘটনা

এক. এই বছর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলে ইবরাহিম রা.-এর জন্ম হয়। পুত্রের আগমনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। যে ব্যক্তি প্রথমে এসে তাকে এই সুসংবাদ শুনিয়েছিল, তিনি তাকে একটি খেজুরবাগান উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু যাকে নিয়ে হৃদয়ের অন্দরে কত শত স্বপ্নরা উঁকি দিতে শুরু করেছিল, সে বেশিদিন এই পৃথিবীর বুকে আলো হয়ে জ্বলতে পারেনি। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এপারের কোল ছেড়ে ওপারের দোলনায় উঠে গেল।

দুই. এই চোখের মণি, কলিজার টুকরার বিরহের দাগ না শুকাতেই মৃত্যুর দূত ধৈর্যের পরীক্ষা করতে আবারও এসে হাজির হলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে। তাঁর আদরের দুলালি যাইনাব রা.-ও এই বছর স্নেহশীল বাবার বুক খালি করে চিরদিনের জন্য বিরহের দাগ দিয়ে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

নবম হিজরি

তাবুকযুদ্ধ

নবম হিজরির সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো 'তাবুকযুদ্ধ'। তাই আমি এখানে সংক্ষিপ্তাকারে সেই ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করব। অষ্টম হিজরিতে শামের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মুসলিমদের একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তার আলোচনা বাদ দিয়েছি। সেই যুদ্ধে নওমুসলিম খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বাহিনীর কাছে খ্রিষ্টানরা চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল। তাদের তুলনায় মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা যদিও খুবই সামান্য ছিল, কিন্তু তারপরও বিজয় ও সফলতা মুসলিমদের পদচুম্বন করেছিল। সেই ঘটনার পর মুসলিমদের প্রতি খ্রিষ্টানদের ঘৃণা ও ক্ষোভ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। গুটি কয়েক মুসলিমের কাছে এমন অপমানজনক পরাজয় তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। খ্রিষ্টানরা চুপচাপ বসে থাকার পাত্র ছিল না। তারা পুনরায় মহাসমারোহে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং মদিনার মুনাফেকদেরও তাদের সঙ্গে শরিক করে নিলো।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধ শেষ করে মদিনায় ফিরে এসেছিলেন। তিনি যখন মুনাফেকদের গোপন ষড়যন্ত্র ও সীমান্তবর্তী

খ্রিষ্টানদের যুদ্ধপ্রস্তুতির বিষয়ে অবগত হলেন তখন তিনিও সাহাবিদের প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিলেন। কয়েকদিন পরই ৩০ হাজার বীরবাহাদুর সাহাবির এক বিশাল বাহিনী নিয়ে খ্রিষ্টানদের দমন করতে রওয়ানা হলেন।

তাবুক নামক স্থানটি মদিনা হতে ১৪ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। এই সফর ছিল খুবই কষ্টদায়ক ও সীমাহীন ধৈর্যের পরীক্ষা। কিন্তু এই দীর্ঘ কষ্ট ও ক্লান্তি শেষে তারা যখন তাবুকে গিয়ে পৌছলেন, তখন তাদের খুশির সীমা রইল না। কারণ, তাঁরা দেখলেন যে, কোনো যুদ্ধ বা রক্তপাত ছাড়াই তাদের উদ্দেশ্য সমাধান হয়ে গেছে। খ্রিষ্টানদের সেনাপতি যখন জানতে পারল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ৩০ হাজার বীরযোদ্ধা নিয়ে এগিয়ে আসছেন, তখন সে তার ৪০ হাজার সেনা নিয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল। মুসলিমবাহিনী ২০ দিন তাবুকে অবস্থান করল এবং শত্রুদের লড়াইয়ের আহ্বান করতে থাকল। কিন্তু তারা এগিয়ে আসার সাহস করল না। মুসলিমরা তাদের চরম ভীতি ও কাপুরুষতার কথা বুঝতে পেরে মদিনায় ফিরে এলো।

তাবুকযুদ্ধের পর

সম্ভবত তাবুকের যুদ্ধই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশগ্রহণ করা সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল। এরপর তিনি মদিনায় অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর অধিকাংশ সময়ই আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদের থেকে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করে অতিবাহিত হতো। এই বছর এত বিপুলসংখ্যক গোত্র নিজেদের প্রতিনিধির মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে যে, যার কারণে এই বছর আমুল উফুদ, অর্থাৎ প্রতিনিধির বছর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই বছরের আরও কিছু ঘটনা

এই বছরের আরও কিছু প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো, এই বছর জাকাতের বিধান, সুদ হারাম, জিজিয়া-কর ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হয়।

ইসলামি ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ইলা-এর প্রসিদ্ধ ঘটনাও এই বছর সংঘটিত হয়। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো, কোনো কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এক মাস পর্যন্ত তাদের থেকে আলাদা থাকেন। অবশেষে তারা যখন নিজেদের ভুল স্বীকার করে তওবা করে নেয়, তখন তিনিও তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে নেন।

দশম হিজরি

বিদায় হজ

অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক মুহূর্তটি যেন খুব দ্রুতই আসছিল। যা যেকোনো মানুষের মানমর্যাদা ও আভিজাত্যের উপাখ্যান সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করে। অজান্তেই যে মুহূর্তটির দিকে আমরা সবাই দ্রুত এগিয়ে চলেছি। হ্যাঁ ভাই, এটাই সেই মুহূর্ত, যার পর আমাদের জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার ফয়সালা করা হবে।

হজের দিনগুলো এসে গেল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অনুসারীদের আদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে কাবা জিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করতে চায়, সে যেন হজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কে জানে, হয়তো এই পৃথিবী পুনরায় আমাকে বাইতুল্লাহর জিয়ারত করতে দেখবে না।

আদেশ পেয়েই মুসলিমরা প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আরাফার ময়দানে পৌঁছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের সংখ্যা গণনা করার আদেশ দিলেন। ধারাবাহিকভাবে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ এই গণনার কাজ অব্যাহত ছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনামতে জানা যায়, মুসলিমদের সংখ্যা সেদিন সোয়া লক্ষ হতে কম ছিল না।

আহা! এমনও দিন ছিল যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। আর আজ? তাঁর এক আদেশেই সোয়া লক্ষ মুসলিম তাঁর নেতৃত্বে বাইতুল্লাহ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে জমা হয়েছেন, মাত্র ১০ বছরের ব্যবধানে কত বড় বিপ্লব!

স্মরণীয় নববি ভাষণ

পবিত্র কাবাঘর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে মুসলিমরা। বিশাল সমাবেশ কাবাপ্রাঙ্গণে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উটের ওপর আরোহণ করলেন, মুসলিমজাতির উদ্দেশে প্রদান করলেন তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ। যার প্রতিটি শব্দই ইসলামি ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে। নিম্নে সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি উল্লেখ করা হলো—

> হে তাওহিদের অনুসারীরা, এটা কোন মাস? এটা কি জিলহজ মাস নয়? এটা কোন দিন? এটা কি কুরবানির দিন নয়? এটা কোন শহর? এটা কি সেই শহর নয়, যেখানে রক্তপাত নিষিদ্ধ?

হে সত্যের অনুসারীরা! যেমনইভাবে এই মাসে রক্তপাত নিষিদ্ধ, যেমনইভাবে এই দিনেও এই শহরে রক্তপাত নিষিদ্ধ, ঠিক তেমনইভাবে তোমাদের রক্তও একে অপরের জন্য নিষিদ্ধ। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তোমরা হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিদান লাভ করবে। সুতরাং, আল্লাহকে ভয় করো, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পথ অবলম্বন করো!

হে মুসলিমরা, সাবধান! আমার পরে তোমরা সিরাতে মুস্তাকিম হতে বিচ্যুত হয়ো না। আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে কাফের-মুশরিকদের ন্যায় একে অন্যের রক্তপাতে লিপ্ত হয়ো না। একই ধাতু থেকে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা সবাই একে অপরের ভাই। তাই এই সম্পর্কের মূল্যায়ন করবে। আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করবে না।

হে মুসলিমরা, মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে নিজেদের জন্য অপমান বা বোঝা মনে করো না। সুখের দিনগুলোতে তারা যেমন তোমাদের হাসিখুশিতে মাতিয়ে রাখে, তেমনই দুঃখের দিনেও তারা তোমাদের ব্যথায় ব্যথিত হয়। আল্লাহ তাআলা তোমাদের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের দায়িত্ব হলো, তারা তোমাদের মানসম্মান রক্ষা করবে। আর তোমাদের দায়িত্ব হলো তোমরা তাদেরকে মন-প্রাণ উজাড় করে ভালোবাসবে। তাদের খাওয়াদাওয়া ও ভরণপোষণের প্রতি খেয়াল রাখবে।

হে মুসলিমরা, আমার পরে আমি তোমাদের কাছে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি—যদি তোমরা সে অনুযায়ী আমল করো, তাহলে কখনো সিরাতে মুসতাকিম তথা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের সুন্নত।

এই ধরনের আরও কিছু বিষয়ের জরুরি দিক-নির্দেশনা ও তালিম দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের লক্ষ করে বললেন, কেয়ামতের দিন যখন তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে তখন তোমরা কী উত্তর দেবে? উপস্থিত লোকেরা সমস্বরে বলে উঠল, আমরা বলব যে, আপনি নবুয়তের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার করেছেন। হেদায়েতের আলোকে সমুজ্জ্বল করেছেন। আল্লাহভোলা মানুষকে সরল-সঠিক পথ দেখিয়েছেন। অসহায়, এতিম ও

বিধবাদের লালনপালন করেছেন। মহিলাদের সঙ্গে দয়া ও সহমর্মিতার আচরণ করেছেন। ইতিপূর্বে তাদের লুটে নেওয়া অধিকারসমূহ ফিরিয়ে দিয়েছেন। মোটকথা, আমাদের সংশোধন ও হেদায়েতের জন্য আপনি কোনোপ্রকারের চেষ্টাই বাকি রাখেননি।

এমন সময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত নাজিল হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে উঠলেন,

> আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকেই জীবনব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করলাম।[১৩৫] [সুরা মায়েদা: ৩]

এই হজে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ভাষায় ভাষণ দিলেন, যেন তিনি নিজের অনুসারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছেন আর তারাও তাদের প্রিয়তমের কাছ থেকে। এ কারণেই এই হজের নাম বিদায় হজ। আর যেহেতু এই সময় তিনি ইসলামের মূলনীতিগুলো পৌছানোর দায়িত্ব তাঁর উম্মতকে দিয়ে গেছেন, তাই এই হজকে হাজ্জাতুল বালাগও বলা হয়।

একাদশ হিজরি

মৃত্যুর কর্তৃত্ব বিশ্বময়

মানবজীবনের কত শত সুখ-দুঃখ আর হাসি-কান্নার এই উপাখ্যান ধীরে ধীরে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। জীবনের এই স্বপ্নিল ভুবনে যতই রঙিন ফানুস উড়ুক না কেন, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তা মূল্যহীন বস্তুতে পরিণত হয়। সারা পৃথিবীতে যদি কারও একক কর্তৃত্ব থেকে থাকে, তবে সে হলো মৃত্যু। দিগ্‌বিদিক বিজয়ী পৃথিবীর বড় বড় শাসক ও সেনাপতিরা, যাদের বিজয়ের দীর্ঘ অভিযাত্রায় কত-না জনপদ বিরান হয়ে গেছে, দুদিনের এই ধোঁকার পৃথিবীতে যারা বড় দাপট ও প্রভাবশালী শক্তির সামনেও শির নত করেনি, একদিন তারাও খুব অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের সঙ্গে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

---

১৩৫. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি হিশাম*, ৪/৪৬৬-৪৬৭; *সহিহ মুসলিম*, *সুনানু আবি দাউদ*, *সুনানু ইবনি মাজাহ* (কিতাবুল হজ)

জীবনের বেদনাদায়ক মুহূর্ত

পৃথিবীর এই পুষ্পকানন ও বিচিত্র পাখিদের কলকাকলি ছেড়ে যাওয়ার কল্পনাই মানুষের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও মর্মস্পর্শী। আমাদের এই জীবনযাত্রা প্রতিদিনের এই আলোয় ভরা জীবন থেকে মৃত্যুর আঁধার রাতের দিকে ক্রমধাবমান। আহা! ভাবতেই যেন গা শিউরে ওঠে। বসন্তের সকালে কোকিলের মিষ্টি গান যে শুনেছে, শিশিরভেজা ফুলেদের নেশা ধরা ঘ্রাণ যে পেয়েছে, হেমন্তের ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তো তার হৃদয়ের গহিনে মাতম উঠবেই। নিজের চিরচেনা এই ঘরবাড়ি, প্রিয়জনের মুখের হাসি, সবাইকে আর সবকিছুকে পেছনে ফেলে এক অন্ধকার অজ্ঞাত দুনিয়ার দিকে এমন অবশ্যম্ভাবী যাত্রায় হৃদয়ের পাঁজর তো চূর্ণবিচূর্ণ হবেই। জীবনের সেই সুখস্বাচ্ছন্দ্য, যা কখনো শেষ হওয়ার নয় মনে হতো, সেই সম্মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, যা কখনো পরিবর্তন হওয়ার নয় ভাবা হতো, আহা! মৃত্যুর এক কালো থাবায় সব মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

মৃত্যুর চাদরে প্রশান্তির সুঘ্রাণ

মৃত্যুর ভয়ংকর কল্পনা যতই বেদনাস্পর্শী ও হাসি-আনন্দ বিনষ্টকারী হোক না কেন, বাস্তবতা হলো, দুনিয়ার সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর হাসি-আনন্দের গোপন রহস্য এই অজানা-অচেনা কালো পর্দাতেই আবৃত। বাগানের এই মন মাতানো ফুলের কমনীয়তা তো দুদিনের বসন্তেই সীমাবদ্ধ। যে মহান ব্যক্তিরা এই নশ্বর পৃথিবীর বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, জীবনের মানে বুঝতে পেরেছেন, ক্ষণস্থায়ী এই মোহ ত্যাগ করে যাওয়াটাও তাদের জন্য পরম প্রশান্তির কারণ হয়। অথচ মানুষ সেটাকে ভয়ানক মৃত্যু বলে অভিহিত করে। এই প্রতারণাময় দুনিয়ার মনভোলানো বাগানে তারাও বিচরণ করেন, কিন্তু তারা দুদিনের এই সৌন্দর্যের মোহে নিজেকে বন্দি করেন না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই মহান ব্যক্তিদের মধ্যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। যিনি নিজের দূরদৃষ্টির মাধ্যমে জীবনের রং-বেরঙের এই বিচিত্র ফুলেদের সৌরভের আড়ালে হেমন্তের ধ্বংসলীলা দেখতে পেয়েছেন। তাই তো দুনিয়ার কোনো চাকচিক্যের সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতা তৈরি হয়নি।

এক দুনিয়াদার নবীর দ্বীনদারি

একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি শুধু একজন মহান নবীই নন, একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন বাদশাহও। তবে কেন এই ব্যস্ত জীবনে কিছুটা হলেও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করছেন না? কায়সার ও কিসরা তো আকাশচুম্বী অট্টালিকায় ফুলের পাপড়ির ওপর ঘুমায় অথচ দ্বীন ও দুনিয়ার এই মহান বাদশাহ সাধারণ একটা কুঁড়েঘরে শক্ত ও কষ্টদায়ক বিছানায় ঘুমিয়ে জীবন কাটায়?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে দুচোখ দুদিনের এই চিত্তবিনোদনের মঞ্চের আড়ালে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখেছিল, সেই দুচোখে অশ্রুর বান ডাকল। অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বললেন, জানো, এই দুনিয়া বড়ই স্বার্থপর। আজ পর্যন্ত কারও সঙ্গেই সে নিজের ভালোবাসার বিশ্বাস রক্ষা করেনি। এই পৃথিবী বড়ই অভিশপ্ত। যা-কিছু তার মধ্যে রয়েছে সেগুলোও অভিশপ্ত, শুধু আল্লাহর জিকির এবং যে-সমস্ত বস্তু তাঁর জিকির ও ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত করে সেসব ছাড়া।

দুনিয়ার এই খেয়াপাড়ে থাকবে সদা জগদ্‌বাসী,
মনে হচ্ছে দেখে তাদের অট্টালিকা উচ্চাভিলাষী।

এই পৃথিবী ভালোবাসার বিশ্বাস রক্ষা করার নীতিতে বিশ্বাসী নয়। নশ্বর এই পৃথিবী দুদিনের এক সরাইখানা। যার এক দরজা দিয়ে একদল মুসাফির প্রবেশ করছে এবং অন্য দরজা দিয়ে আরেকদল মুসাফির বেরিয়ে যাচ্ছে। দুদিনের এই জীবনে এত আরাম-আয়েশের কী প্রয়োজন? এই পৃথিবীর ভোগবিলাসের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি তো সেই মুসাফিরের ন্যায়, যে পথ চলতে চলতে কোনো একটি গাছের নিচে বসে সামান্য জিরিয়ে নেয়।

প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন মহান নবী ছিলেন, যার জীবনাদর্শ মানুষের জীবনের প্রতিটি শাখায় অনুসরণের এক সর্বোত্তম উদাহরণ হতে পারে। তিনি যদিও দুনিয়ার সমস্ত কাজেই আগ্রহভরে অংশ নিয়েছেন এবং পার্থিব জীবনের অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আঞ্জাম দিয়েছেন, তবুও দুনিয়ার প্রতি তাঁর সীমাহীন অনীহা ছিল। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি নিজের প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুল থাকতেন। অবশেষে প্রতীক্ষার প্রহর গোনা শেষ মুহূর্তটি এসে গেল।

মৃত্যুর আড়ালে চিরন্তন জীবন

পেছনের পাতাগুলোতে তো সুহৃদ পাঠক এই মহান মনীষীর কীর্তি ও অবদানের ঝলক দেখেছেন। তাই তাঁর সেসব বিরল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি নিয়ে এখানে পুনরায় আলোকপাতের প্রয়োজন নেই, যেগুলো তাঁর পবিত্র জীবনকে অভাবনীয়ভাবে সফল ও সার্থক করে তুলেছে। যে বিশাল আধ্যাত্মিক বিপ্লবের জন্য তাকে এই নশ্বর পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল, সেই বিপ্লব তো তার পূর্ণ রূপ নিয়ে পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই এবার তিনি অবিনশ্বর পৃথিবীর দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

স্বপ্নের জীবন বলতে যেহেতু মৃত্যুই বোঝানো হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি কতই-না ভাগ্যবান, যে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে পূর্ণরূপে আদায় করে মৃত্যুর ফেরেশতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ রকম মৃত্যু তো নিরাশার কালো আঁধারে ছেয়ে যাওয়া সন্ধ্যা নয়, বরং চিরস্থায়ী জীবনের আলোয় উদ্ভাসিত প্রভাত। আহা! এমন এক মহান সফল সেনাপতির মৃত্যুতে অশ্রু বিসর্জন দেওয়া মানে পৃথিবীর এক বড় সফলতা ও সার্থকতার জন্য শোকগাথা পড়া, তাই আমার মন একেবারেই চাচ্ছে না যে, আমি আমার বর্ণনার ভঙ্গিটাকে কিছুটা বেদনাকাতর করে তুলতে কলমের ওপর চাপ সৃষ্টি করি।

নবীজির দেহ মুবারক এখন এই পৃথিবীতে নেই। তাতে কী? হকের যে বাতি তিনি প্রজ্বলিত করে গিয়েছেন, তা আজও বিরামহীন আলো বিলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর পবিত্র জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই প্রামাণিক সূত্রে আমাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তাঁর শিক্ষা ও হেদায়েতের প্রতিধ্বনি আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। তাহলে কী করে আমি মেনে নিই যে, তিনি জীবিত নেই? তাঁর জীবন, সে তো কোনো ক্ষণস্থায়ী জীবন ছিল না; বরং সে জীবন তো ছিল এক চিরন্তন-চিরস্থায়ী জীবন। তাহলে তাঁর মৃত্যুতে কী করে আমি মাতম করি? তাঁর মৃত্যু তো ছিল শুধু ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে চিরস্থায়ী জীবনের সূচনা।

জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো

ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বেই প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও জ্বর দীর্ঘ সফরের বার্তা নিয়ে নবীজির কাছে হাজির হলো। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর মাথা মুবারক অত্যন্ত কাছের ও প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা রা.-এর উরুতে রাখা ছিল। ঠিক এমন সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, ওগো আল্লাহ! ওগো আমার পরম বন্ধু!

এরপরেই সবকিছু শান্ত, নিস্তব্ধ। অগণিত আশেক হৃদয়ে যেন শোকের মাতম উঠল, বুকে চিনচিন ব্যথা শুরু হলো। হাজারো চোখে অশ্রুর বান ধরল। সবাই তো আছে, সবকিছুই তো আছে, নেই শুধু একজন। তবুও সবকিছু যেন খালি খালি লাগছে। বুকের কোথাও থেকে যেন একমুঠো বাতাস বেরিয়ে গেল। আলো-ঝলমল এই পৃথিবী হঠাৎ যেন অমানিশার ঘোর আঁধারে ছেয়ে গেল। দূর আকাশের ওই চাঁদ-সূর্যের জ্বলজ্বলে আলো আর তারাদের ঝিলিমিলি যেন নিমেষে ম্লান হয়ে গেল। বসন্ত-বাতাসে দোল খাওয়া ফুলেরা যখন নিজেদের সৌন্দর্য ও সুবাস হারিয়ে ফেলল, তখন হৃদয়ের বকুলতলায় কোকিলের কুহুকুহু ডাকও বন্ধ হয়ে গেল।

পবিত্র সমাধি

আম্মাজান আয়েশা রা. এই মহা সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন যে, এমন একজন মহান মনীষীকে তার কামরাতেই দাফন করা হয়েছে, যার পুরো জীবনটাই ছিল এক আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ। যে প্রদীপ নিজেও আলোকিত ছিল এবং তাঁর সংস্পর্শে যারা আসত, তাদেরও আলোকিত করে দিত। আহা! তাঁর পবিত্র কবরের মুবারক মাটির প্রতিটি ধূলিকণার আলোয় কেয়ামত পর্যন্ত ওই চাঁদ-সূর্যের আলোও বুঝি ম্রিয়মাণ হয়ে রবে।

।। সমাপ্ত ।।

অনুবাদক পরিচিতি

শাহাদাত হুসাইন

জন্মগ্রহণ করেন ১৯৯৫ সালে নোয়াখালী জেলাধীন বেগমগঞ্জ উপজেলার পৌর হাজীপুর গ্রামে। নিজ গ্রামে অবস্থিত কাসেমুল উলুম নুরানি মাদরাসায় মকতব ও প্রাথমিক পড়াশোনার হাতেখড়ি। এরপর ভর্তি হন নোয়াখালী জেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া উসমানিয়ায়। সেখানে দীর্ঘ ১০ বছর অধ্যয়ন করে মেশকাত (ফজিলত ২য় বর্ষ) সম্পন্ন করেন। ২০১৫ সালে দারুল উলুম মাদানীনগর ঢাকা থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) সমাপন করে ঢাকার একটি উচ্চতর গবেষণামূলক দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুই বছর কিসমুদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ বিষয়ের ওপর গবেষণা করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষে তিনি ঢাকার মিরপুর-১১ নম্বরে অবস্থিত জামেয়া ইসলামিয়া কাসেমুল উলুম মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বর্তমানে তিনি 'আলমাদরাসাতুল আরাবিয়া মিরপুর' (মিরপুর আরবি মাদরাসা) নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এবং 'আলহাসানাত কল্যাণ ট্রাস্ট' নামে একটি দাওয়াহ ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

এ ছাড়াও তিনি 'দ্বিমাসিক কিশোর কলম' নামে একটি শিশু-কিশোর সাহিত্য সাময়িকীর প্রকাশক ও সম্পাদক। ইতিহাসপাঠ, সাহিত্যচর্চা ও লেখালেখি তার আগ্রহের বিষয়। আমরা তার সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

বর্তমান যুগের হিন্দুস্তান বনাম জাহেলি যুগের আরব

প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। পছন্দ-অপছন্দ থাকে। এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে আমার দৃষ্টিতে, বর্তমান সময়ে আমাদের প্রিয় হিন্দুস্তানের সামনে, যে মহান মনীষীর আদর্শ ও জীবনীকে পেশ করা যেতে পারে, তিনি হলেন নবী-রাসুলদের সর্দার মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আজকের এই শিক্ষিত ও সভ্য হিন্দুস্তানের সঙ্গে জাহেলি যুগের আরবের যে কতটা গভীর মিল রয়েছে, তা আমাদের হিন্দুস্তানিদের জীবনব্যবস্থার দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বলুন, আজকের এই হিন্দুস্তানে কি সভ্যতা, ভদ্রতা ও শালীনতার আইনকানুনকে ধনদৌলত ও অর্থোপার্জনের কসাইখানায় নির্দ্বিধায় জবাই করা হচ্ছে না? প্রকাশ্যে মদ্যপান কি শিক্ষিত ও সভ্য মানুষদের আনন্দ-বিনোদন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না? কুপ্রবৃত্তির কামনা ও পাশবিক চাহিদার নির্লজ্জ ঘটনাগুলো কি বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় উপস্থাপন করাকে গর্বের ও কৃতিত্বের বিষয় বলে ভাবা হচ্ছে না?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নীতি-নৈতিকতাহীন এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করলেও কি মানবতার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে না? স্বয়ং লজ্জা বা শরমও বোধ হয় লজ্জায় মাথা নত করে ফেলে। বিশ্বাস করুন, এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে বারবার আমার কলম কেঁপে উঠেছে। দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছে। আহা আমার হিন্দুস্তান! প্রিয় হিন্দুস্তান!

—স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ

মাকতাবাতুল হাসান